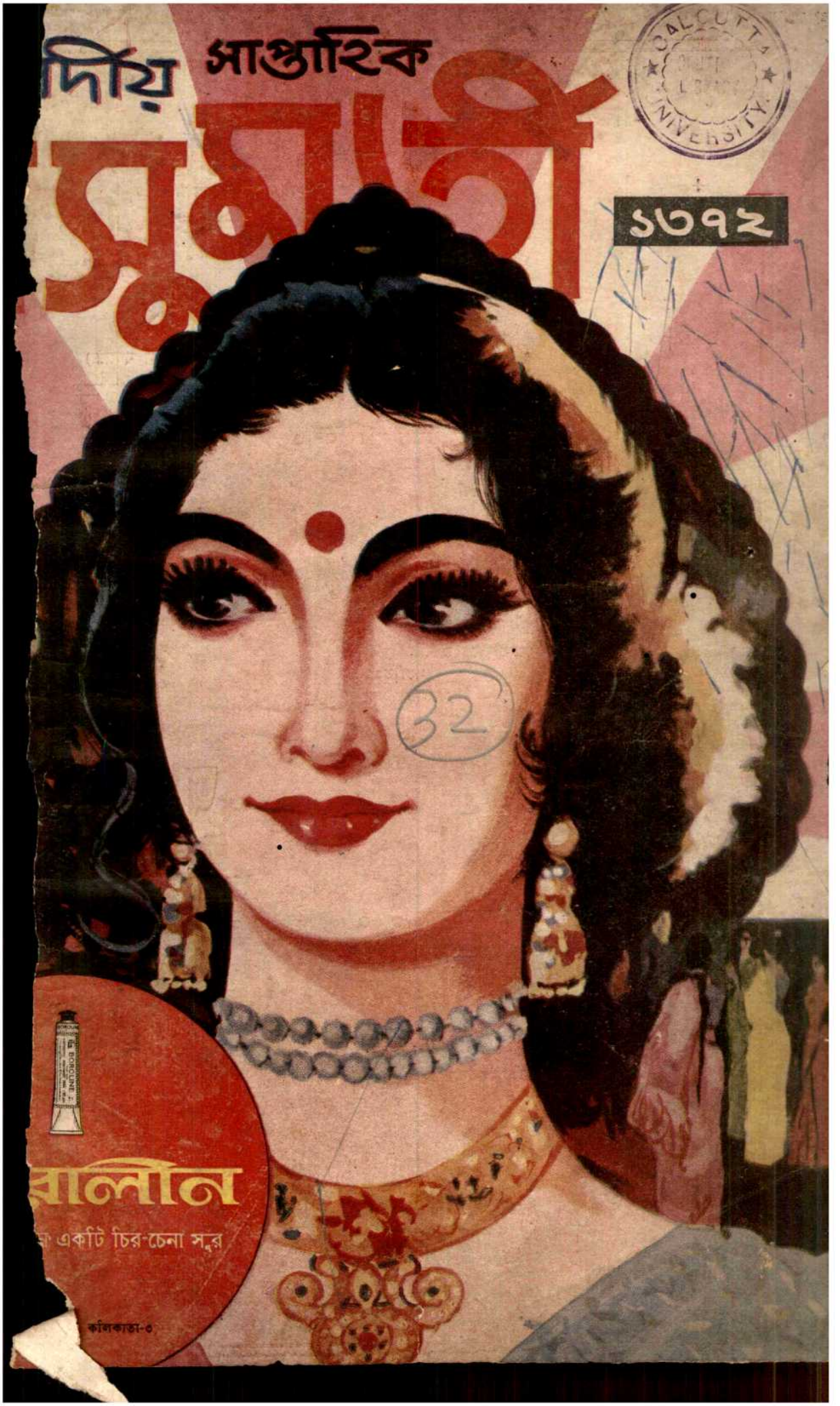
দীয়
সাপ্তাহিক
সুমাত্রী
১৩৭৮
CALCUTTA UNIVERSITY
32
BORCLINE
বালীন
একটি চির-চেনা সুর
কলিকাতা-৩

10 V 1965

শারদীয়ার সানন্দ ঘোষণা !!

শুভমুক্তি শুক্রবার ১লা অক্টোবর

শশী কাপুর ॥ নন্দা অভিনীত

যব যব ফুল খিলে

(ইস্টম্যান কলার)

॥ অপেরা এবং অন্যত্র ॥

মুক্তি প্রতীক্ষিত ৩টি অসামান্য ছবি

রহস্যে, রোমাঞ্চে রমণীয়...

এন, এন, সিপ্পি-র

গুমনাম

(ইস্টম্যান কলার)

শ্রেঃ মনোজকুমার ॥ নন্দা

পরিচালনাঃ রাজা নওয়াথে

সংগীতঃ শংকর-জয়কিষণ

পি, এস, ভি, ফিল্মস্ নিবেদিত

ভীরাপ্পা-র

আদমী

(ইস্টম্যান কলার)

শ্রেঃ দিলীপকুমার ॥ ওয়াহীদা রহমান

পরিচালনাঃ এ, ভীম সিং

সংগীতঃ নৌশাদ

বি, এস, প্রোডাকসন্স-এর

পাল্কী

শ্রেঃ রাজেন্দ্রকুমার ॥ ওয়াহীদা রহমান

সংগীতঃ নৌশাদ

একমাত্র পরিবেশকঃ

জগৎ পিকচার্স,

১৮৪, ধর্মতলা স্ট্রীট,

কলিকাতা-১৩

৩৩ - H04360 - 32 - P3616

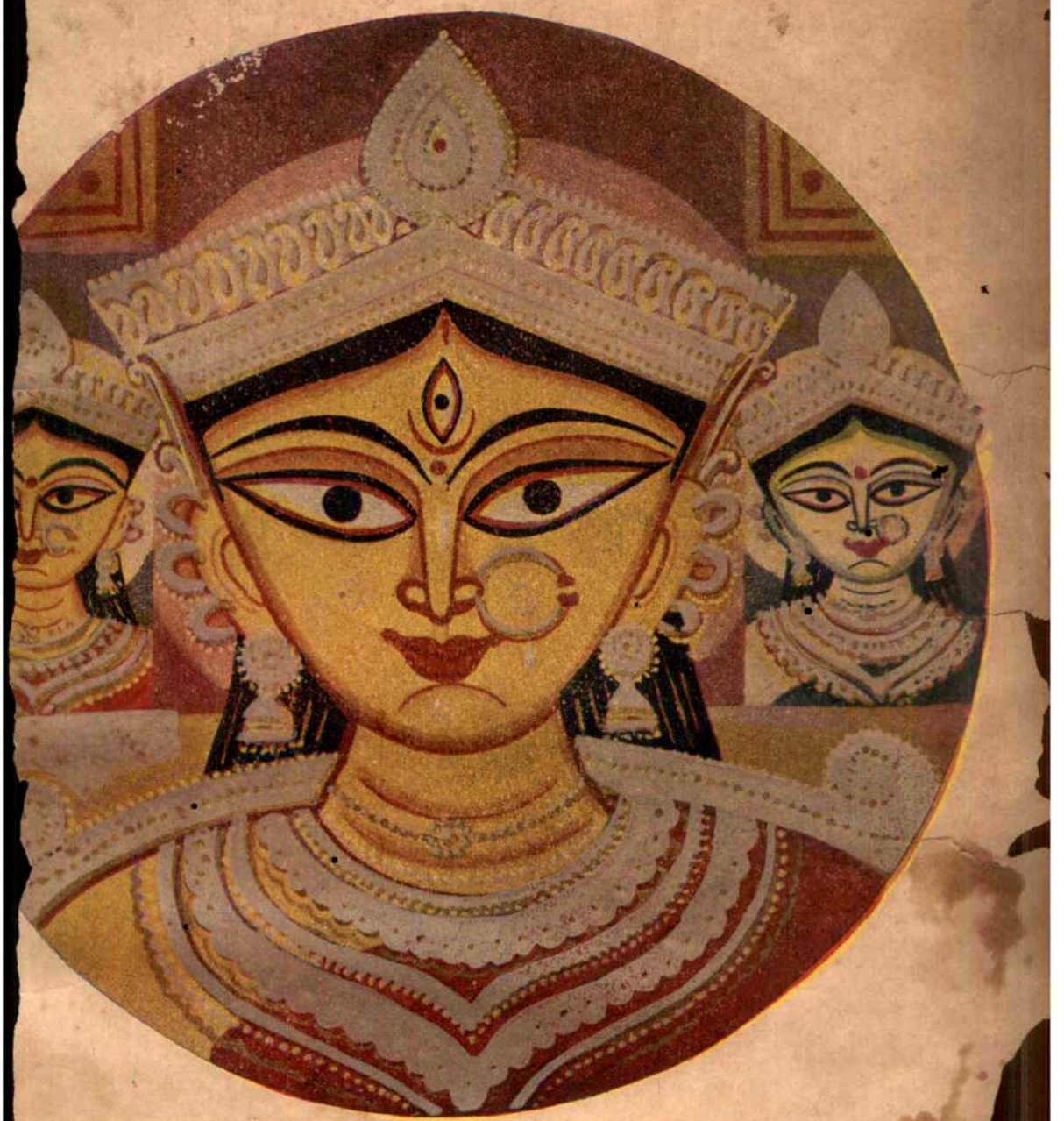

শ্রীশ্রীদুর্গা

—শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস

বসুমতী

১৩৭২

Better selection in purchase

is

the need of the day.

For

Durability & Quality

in

Hessian & Bags

ALWAYS RELY ON
PREMCHAND PRODUCTS

Manufacturers :

KANORIA COMPANY LIMITED

9-Brabourne Road,
CALCUTTA-1

Phone : 22-9121 / 26 (6 lines.)

আমাদের সাদর অভিনন্দন গ্রহণ করুন—

হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটে

ম্যানেজিং এজেন্টস ঃ

তালুকদার ল' এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

কলিকাতা-১৩

ওয়ার্কস ঃ ঃ আসানসোল

CALCUTTA UNIVERSITY

॥ সূচীপত্র ॥

	লেখক		পৃষ্ঠা
		...	৫
পী	নবেন্দ্রনাথ মিত্র	...	১৬
	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	...	২১
	সুশীল রায়	...	৩৮
	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	...	৪২
	জরাসন্ধ	...	৪৯
	মনোজ বসু	...	৫৬
র্থনা	সুভাষ সমাজদার	...	৬৫
	ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়	...	৭৬
	সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ	...	৮৪
া	আশাদেবী	...	৯০
লপাতালের জন্ম ও মৃত্যু	রমাপদ চৌধুরী	...	৯৩
প্রেস	দেবেশ দাশ	...	৯৮
	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	...	১২২
	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৩০
	শক্তিপদ রাজগুরু	...	১৩৫
ও এক সন্ন্যাসীর উপাখ্যান	গৌরকিশোর ঘোষ	...	১৫০
লাম	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৭৪
	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	...	১৮৪
	মানবেন্দ্র পাল	...	১৯১
ও হাসপাতাল	পরিমল গোস্বামী	...	৩৩
র খেলা	উশীনর	...	৫৮
দিনের মন	আশাপূর্ণা দেবী	..	৭০
র বিলাপ	'ইন্দ্রজিৎ'	...	৯
গর কাহিনী			
অগ্নিদিগন্তে	অনন্ত সিংহ	..	১৫৭
ধীরেন	ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়	...	১৬৯

বস্ত্রশিল্পে অগ্রগতি

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলসের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। গত ৫০ বছরেরও উপর বঙ্গলক্ষ্মীর ধুতি শাড়ী আর নানারকম বস্ত্রসম্ভার লক্ষ লক্ষ গৃহের শুধু চাহিদা মেটাইনি সেইসঙ্গে আনন্দও বিতরণ করেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি আর প্রয়োজনও বদলেছে আর সেইমত বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস ও নিজেকে সম্প্রসারিত করেছে। সম্প্রতি নানারকম নূতন যন্ত্রপাতি আমদানী করে দেশের ক্রমবর্দ্ধন চাহিদা মেটাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

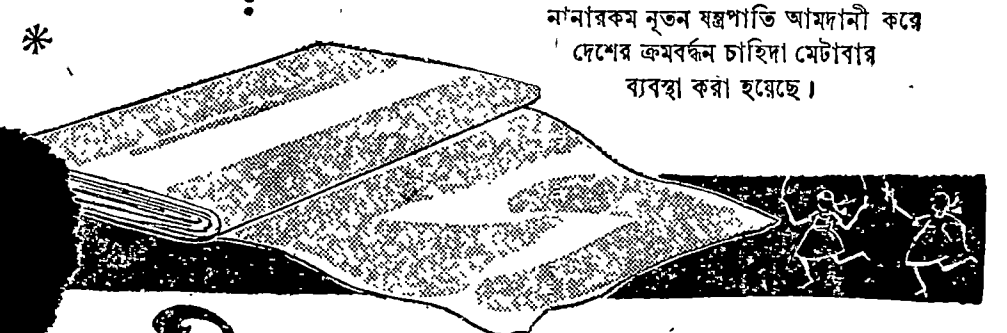

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিমিটেড্

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয়		লেখক	
কবিতা			
নদীর নিকটে	...	প্রেমেন্দ্র মিত্র	...
মনে ছিল	...	অজিত দত্ত	...
আগুন তাদের প্রাণ	...	মনীশ ঘটক	...
অন্তত একবার	...	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	...
জ্বরগায়ে	...	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...
দেবদূত	...	জগন্নাথ চক্রবর্তী	...
খণ্ডিত বসন্ত	...	বাণী রায়	...
অতিদেশ	...	গোপাল ভৌমিক	...
চতুর্দিকে ভীষণ সময়	...	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	...
সতকড়ি দত্ত	...	উৎপল দত্ত	...
বাছা কতটুকু জানে	...	বিষ্ণু দে	...
কবি লেখেন	...	দিনেশ দাস	...
রিপোর্টাজ			
যেদিকে দুচোখ যায়	...	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	...
শহর কলকাতা			
দুর্গোৎসব (সেকাল ও একাল)	...	প্রাণতোষ ঘটক	...
বঙ্গদর্শন		রণজিৎকুমার সেন	...
ভারতদর্শন			
সাধনা ও সমন্বয়	...	বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	...
প্রবন্ধ			
'ক' অক্ষরের লড়াই	...	অন্নদাশঙ্কর রায়	...
সাহিত্যিক কলহ	...	চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	...
দেয়াল	...	হরপ্রসাদ মিত্র	...
সংস্কৃতির সংকট	...	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	...
আশা ও প্রেমের কবি দান্তে	...	ভবানী মুখোপাধ্যায়	...
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ			
কালের ধর্ম সম্পর্কে নতুন তত্ত্ব	...	তরুণ চট্টোপাধ্যায়	...
রঙ্গজগৎ			
আজকের দিনের নাটক	...	অশোক সেন	...
একালের চলচ্চিত্র চিন্তা	...	কল্পতরু সেনগুপ্ত	...
আমাদের নাটকের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মূল্যায়ন	...	শোভা সেন	...
চলচ্চিত্রে পরিবেশ পরিবেশনা	...	পার্থপ্রতিম চৌধুরী	...
বাঙলা ছবির বর্তমান গতি—প্রগতি, না অধোগতি?	...	পঙ্কজ দত্ত	...

অলংকরণেঃ বেবতীভূষণ ঘোষ, আশিস সেনগুপ্ত, মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, অরুণাভ চক্রবর্তী

MEN'S WEAR
BOYS' WEAR
GIRLS' WEAR
&
BOMBAY DYEING
MATERIALS
at
MILL RATES
at

A·B·C Emporium

159-1B, Rash Behari Avenue
Hindustan Mart No. I
CALCUTTA-29

শারদোৎসবে দৃঢ় শপথ

শারদোৎসব সমাগত। বছরের অন্যান্য ঋতুতে আমরা এই উৎসবের জন্য প্রতীক্ষা করে থাকি। বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য-শোভা যখন আমাদের অন্তর্জগতে প্রতিবিম্বিত হয়, তখনই আমরা উৎসব-প্রাঙ্গণে হাজির হই। আমরা বিতরণ করি আমাদের অপূর্ব পুলকে আবেগ-উচ্ছল আনন্দ।

কিন্তু সেই আনন্দের দিন আজ নয়। বহিঃপ্রকৃতি শত্রুর ধূম্র-উদ্গীরণে ম্লান, আমাদের মনোজগৎ শক্তি অর্জন-প্রত্যাশী। তাই নতুন বসন-ভূষণের আশা আজ আমরা করি না। আমরা এখন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। দেশ-আক্রমণকারী শত্রুই আমাদের সে পরীক্ষার সুযোগ দিয়েছে। আমাদের সার্বভৌম অধিকার, স্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে বিপন্ন করার জন্যে শত্রুর যে আসুরিক শক্তি যুদ্ধরত, আজ তা পর্যুদস্ত করার জন্যই আমাদের কৃচ্ছ্রসাধন-সর্বশক্তি নিয়োগ করবো। আর আমাদের এই জাতীয় উৎসবে অসুরশক্তিকে বিনাশ করার জন্য গ্রহণ করবো দৃঢ় শপথ এবং প্রতি শারদোৎসবেই সর্বজনসম্মিলনে সে শপথ যেন সুন্দর হয়ে ওঠে—এই আমাদের প্রার্থনা।

শারদোৎসবকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টিশীল মন নতুন সুর আলাপন করে। এই সময় বাংলা সাহিত্যেও যেন দিগ্‌বদল ঘটে। সেই সাহিত্যের ফসল যখন ঘরে ওঠে, তখন দেখা যায়—তা চিরকালের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠালাভের যোগ্য। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, সেই ফসল ঘরে তোলার আগেই শত্রু দেশ আক্রমণ করেছে; সেই কারণে এই সংকলনটিকে আশানুরূপ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করার শুভ ইচ্ছাও বাধা পেয়েছে। এমন কি, অবসরহীন মুদ্রণযন্ত্রকেও ইচ্ছানুযায়ী কাজে লাগানো ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাই রচনাসমূহের যথাযথ বিন্যস্তীকরণ সম্ভবপর হয় নি। এই ত্রুটি অনিচ্ছাকৃত, আশা করি মার্জনীয়।

এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশের জন্য লেখক, শিল্পী, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, অনুরাগী ও আমাদের কর্মীদের কাছ থেকে যে আশাতীত সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছি, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

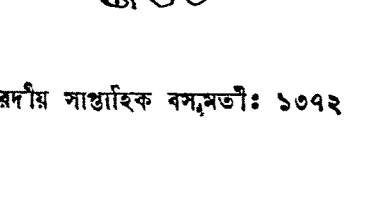

'ক' অক্ষরের লড়াই

অন্নদাশঙ্কর রায়

কী নিয়ে লড়াই?

'ক' নিয়ে লড়াই।

পুরাণে লিখেছে পাঠশালায় গিয়ে প্রহ্লাদ 'ক' দেখে অজ্ঞান। তার মনে পড়ে 'ক' থেকে 'কৃষ্ণ' নাম। সে কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে। চোখের জল ফেলে। ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়। তার পড়াশুনা আর এগোয় না। ক অক্ষরের পর খ অক্ষর আছে, গ অক্ষর আছে, ঘ অক্ষর আছে, কিন্তু ওকথা ওকে বোঝাবে কে? ক অক্ষর হচ্ছে কৃষ্ণ নামের আদ্য অক্ষর। কৃষ্ণ নামের পর আর কী শেখবার আছে? কৃষ্ণই মানবজ্ঞানের শেষ কথা।

ছেলেবেলায় আমরা ওয়ার্ড মেকিং খেলা খেলতুম। অক্ষর জুড়ে জুড়ে শব্দ বানাতুম। কিন্তু সেসব শব্দ ইংরেজী অভিধানের শব্দ। মনগড়া শব্দ নয়। কিন্তু একটু বেশী বয়সে এক পাঞ্জাবী ছাত্র একটি মনগড়া শব্দ বানিয়ে ফেললেন। 'পাকিস্তান'। ইংরেজী বর্ণমালার যেসব শব্দ জুড়ে জুড়ে এই কাল্পনিক শব্দটি হলো তার তৃতীয়টি হচ্ছে 'কে' অর্থাৎ 'ক'। কাশ্মীরের আদ্য অক্ষর। সেই থেকে পাকিস্তান নামক কল্পনার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ হলো কাশ্মীর। কাশ্মীরকে বাদ দিলে পাকিস্তান হয়ে যায় 'পাইস্তান'। তা হলে পাকিস্তানের অধিবাসীরা আর নিজেদের 'পাক' অর্থাৎ পবিত্র বলে দাবী করতে হকদার হয় না। তারা হয়ে যায় 'পাই'। দুর্বোধ্য শব্দ।

সত্যি সত্যি যে একদিন পাকিস্তান বলে একটি রাষ্ট্র ভূমিষ্ঠ হবে এটা ইতিহাসের বিস্ময়। কিন্তু ইতিহাস যে কেবল বিস্ময় জোগায় তাই নয়, কৌতুকও জোগায়। মানুষকে নিয়ে কৌতুক তো ইতিহাসদেবতার সর্বদিনের খেলা। পাকিস্তান মঞ্জুর হলো, অথচ কাশ্মীর তার সামিল হলো না। হলো কিনা বঙ্গের একাঙ্গ।

কিন্তু ওই যে ছাত্রটি ওয়ার্ড মেকিং খেলায় 'ক' অক্ষর ব্যবহার করেছেন, ওটা তো আর ভোলা যায় না। বঙ্গের একাঙ্গ থাক আর নাই থাক, কাশ্মীর চাইই চাই। ওটা একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গ। কাশ্মীর বাদ গেলে পাকিস্তানের কেবল অঙ্গহানি নয়, ভাবহানি হয়। পাকিস্তানের পেছনে একটা ইডিওলজি আছে। তাতে বলে হিন্দু ও মুসলমান এক নেশন নয়। দুই নেশন। দুই নেশনের দুই বাসভূমি। পাকিস্তান আর হিন্দুস্তান। কাশ্মীরের অধিকাংশ লোক যখন মুসলমান তখন কাশ্মীর কেমন করে হিন্দুস্তানে পড়বে? কাশ্মীর পড়বে পাকিস্তানে।

এখন এই ধরনের যুক্তি যদি সত্য হতো তা হলে নেশন তৈরি করা কত সহজ হয়ে যেত। নেপাল এসে যেতো ভারতে, যেহেতু সে হিন্দুপ্রধান। ভুটান চলে যেতো তিব্বতে, যেহেতু সে বৌদ্ধপ্রধান। আফগানিস্তান মিশে যেতো পাকিস্তানে, যেহেতু সে মুসলমানপ্রধান। পাকিস্তান যোগ দিত ইরান ইরাক, তুরস্কের সঙ্গে, যেহেতু সে মুসলমানপ্রধান। এ যুক্তির সার্থকতা আমরা কোথাও দেখছিনে। দুই মুসলমানপ্রধান দেশ ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া এখন পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধরত। ইন্দোনেশিয়া নাকি পরমাণু বোমা নির্মাণ করছে সিঙ্গাপুর আর কুয়ালালামপুরের উপর ফেলবার জন্যে। তার মানে স্বধর্মী নিধনের জন্যে।

খ্রীস্টান দেশগুলির গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস আমরা সকলেই জানি। খ্রীস্টান জার্মানীর পরম মিত্র হলো বৌদ্ধ জাপান, আর পরম শত্রু খ্রীস্টান ফ্রান্স, খ্রীস্টান ব্রিটেন। ওদিকে বৌদ্ধ জাপানের পরম শত্রু হলো বৌদ্ধ চীন, আর পরম মিত্র হলো খ্রীস্টান জার্মানী। এই বিচিত্র জগতে ধর্মের যুক্তিই একমাত্র যুক্তি নয়। ইউরোপের ইতিহাসের পাতা ওলটাতে গিয়ে দেখেছি ভিয়েনা যখন তুর্কদের আক্রমণের মুখে বিপন্ন, ভিয়েনা গেলে পশ্চিম ইউরোপ যায় যায়, সেরকম দিনেও তুর্কদের সঙ্গে তলে তলে হাত মিলিয়েছেন ফ্রান্সের রাজা। পরম ধার্মিক খ্রীস্টান। অস্ট্রিয়ার রাজশক্তি তাঁর চক্ষুশূল।

কাশ্মীর যে মুসলমানপ্রধান এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সিনকিয়াংও তো মুসলমানপ্রধান। পাকিস্তান কেন চীনের কাছে সিনকিয়াং দাবী করে না? পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব-পাকিস্তান যতদূর সিনকিয়াং ততদূর নয়। আকাশপথে রাওলপিণ্ডি থেকে ঢাকা যেতে যত সময় লাগে কাশগড় যেতে তত সময় লাগে না। চট্টগ্রাম থেকে কুয়ালালামপুরও তো এমন কিছু বেশী দূর নয়। পাকিস্তান কেন মালয় দাবী করে না? পামীরের ওপারেই সোভিয়েট শাসিত বাদাকশান। ওটা দাবী করলে তো ইসলামী সংহতি আরো জোর পেতো।

আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন একটা উপাদেয় প্রশ্ন। কিন্তু কই, পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে তো আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে গণভোট নেওয়া হয়নি। গণভোট নিলে বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমান মিশ্র নির্বাচন পদ্ধতিতেই দিত,

স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতিতে নয়। মুসলিম লীগের বাইরে বহু মুসলমান ছিল, তারা পাকিস্তান চায়নি। পাকিস্তান হলে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হবে, একথা পরিষ্কার জানা থাকলে মুসলিম লীগের ভিতরে যারা ছিল তারাও দ্বিমত হতো। ইংরেজ রাজত্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে, চারদিকে অরাজকতার লক্ষণ, গৃহযুদ্ধের চেয়ে পার্টিশন ভালো, এই চিন্তার থেকে যে সিদ্ধান্তের উদ্ভব সেটার পেছনে ছিল ইংরেজ নামক একটি তৃতীয় পক্ষ, যে এতকাল শান্তিরক্ষা করছিল, যার উপরে ভরসা দিয়ে লোকে নিশ্চিন্ত ছিল। তৃতীয় পক্ষকে বাদ দিলে বাকী থাকে প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ। সেই দুই পক্ষে একতা ছিল না বলেই এক এক পক্ষকে এক এক ভাগ দিয়ে শান্তির ব্যবস্থা করতে হলো।

কিন্তু ইংরেজ বিদায়ের পর তো আর সে পরিস্থিতি নেই। কাশ্মীরের উপর যদি পাকিস্তানের দাবী থাকে তো ভারতেরও দাবী আছে। ভারত একাকালে সৈন্য পাঠিয়ে তাকে রক্ষা করেছে। এখনো করছে। কাশ্মীর মুসলমানপ্রধান বলে ভারতের দাবী অন্যায় বা অযৌক্তিক হয়ে যায় না। ভারত যদি হিন্দু রাষ্ট্র হতো তা হলে অবশ্য কথা উঠত যে কাশ্মীরী মুসলমানদের উপর ভারতের কোনো নৈতিক দাবী নেই। কিন্তু ভারত একটি সেকুলার স্টেট। সকলের উপরই এর নৈতিক দাবী আছে। যেমন খ্রীস্টান-প্রধান নাগাল্যান্ডের উপরে তেমনি বৌদ্ধপ্রধান নেফার উপরে, সিকিমের উপরে। পাকিস্তানীদের এ তত্ত্ব বোঝানো মুস্কিল। কারণ তাদের ঐতিহ্যে সেকুলার স্টেট বলে কিছু নেই। তারা ভাবতেই পারে না কোনো একটা রাষ্ট্র সত্যি সত্যি সেকুলার হতে পারে। তাদের বিশ্বাস ভারতের ওটা একটা চাল। ভারত আসলে একটা হিন্দু রাষ্ট্র। সেকুলার বলে মিথ্যা পরিচয় দিচ্ছে। তাই যদি হতো তবে ওই ছলনাটার ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মদিন থেকে আরম্ভ। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিউম, দাদাভাই, ডব্লিউ সি ব্যানার্জি এঁরাও সেই ছলনার নাটের গুরু। ব্রিটিশ লেবার পার্টির অধিকাংশ সদস্য খ্রীস্টান বলে ওটা ওর সেকুলার চরিত্র হারায় কি? লেবার শাসিত ইংলন্ডও রাজনৈতিক ব্যাপারে তার সেকুলার প্রকৃতি থেকে ভ্রষ্ট হয় কি?

এই বিবাদের মূলে সত্যিকারের যুক্তি বলে একটিই আছে। সেটি কাশ্মীরের অ্যাকসেসনের সময় নেহরুর প্রতিশ্রুতি যে কাশ্মীরের অধিবাসীদের গণভোট নিয়ে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হবে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে একটি অলিখিত শর্ত ছিল। কাশ্মীরীরা ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেকুলার গণনার দ্বারা পরিচালিত হবে। অর্থাৎ মুসলমান বলেই পাকিস্তানে যাবে, এমন নয়। রাজনৈতিক হিতাহিত অর্থনৈতিক সুবিধা অসুবিধা বিচার করবে। কাশ্মীরী মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই সেন্টো সীআটো প্রভৃতি শক্তি জোটে যোগ দেওয়া পছন্দ করে না। কেন তারা বহিঃশক্তির ক্রীড়নক হবে? অনেকে চীনের উপর প্রসন্ন নয়। কেন তারা পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতিতে সায় দেবে? অনেকে গণতন্ত্র চায়, প্রত্যক্ষ নির্বাচন চায়, মিশ্র নির্বাচন চায়। কেন তারা পাকিস্তানের অগণতান্ত্রিক সংবিধান মেনে নেবে? সব দিক বিবেচনা করার মতো বিদ্যাবুদ্ধি যদি নাগরিকমাত্রেরই থাকত তা হলে গণভোট অনুষ্ঠিত হলে ওরা সেকুলার রাষ্ট্রের পক্ষেই ভোট দিত। কিন্তু এমনভাবে ওদের ধর্মান্ধতা জাগিয়ে তোলা হবে যে ওরা চোখ বুজে ইসলামের পক্ষেই ভোট দেবে ও গণভোটের প্রকৃত উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করবে। আয়ুব খান্ বলেন যে, পাকিস্তানীরা গণতন্ত্রের উপযুক্ত হয়নি, যখন হবে তখন গণতন্ত্র পাবে। তাই যদি হয় তবে কাশ্মীরীরা পাকিস্তানে যোগ দিলে গণতন্ত্র হারাবে। তা সত্ত্বেও যদি পাকিস্তানে যোগ দিতে চায় তবে বুঝতে হবে যে ওরা গণভোটের উপযুক্ত হয়নি। নেহরুর প্রতিশ্রুতির অলিখিত শর্ত পালন করবার সময় আসেনি। তার আগে পাকিস্তান গণতন্ত্রের উপযুক্ত হোক, বহিঃশক্তির শিবির থেকে বেরিয়ে আসুক, সেকুলার হোক।

গণভোট হলে কাশ্মীর যে পাকিস্তানের 'ক' হতে চাইবেই এটা পাকিস্তান ছাড়া আর কে ধরে নিচ্ছে? শেখ আবদুল্লা বরঞ্চ ভারত পাকিস্তান উভয়ের বাইরে এক স্বাধীন কাশ্মীর রাষ্ট্র পত্তন করতে পারলেই তুষ্ট হন। তাই যদি হবে থাকে তবে গণভোটের দ্বিতীয় এক শর্ত লঙ্ঘিত হয়। সেটি এই যে কাশ্মীরকে হয় ভারতে নয় পাকিস্তানে যোগ দিতে হবে। সে তৃতীয় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হতে পারবে না। এটা ১৯৪৭ সালে ইংরেজ বিদায়ের পূর্বেই স্থির হয়ে যায়। কাশ্মীরের জননায়করাও সে সময় স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব চাননি। এসব পরবর্তীকালের ভাবনা। দুর্বল একটি রাজ্য হঠাৎ স্বাধীন এক রাষ্ট্র হয়ে উঠলে তাকে তার শত্রুদের হাত থেকে বাঁচাবে কে? ভারত না বাঁচালে পাকিস্তান গ্রাস করবে।

কাশ্মীরের একখণ্ড এখনো পাকিস্তানের অধিকারে রয়েছে। সুতরাং পাকিস্তান যে 'ক' অঞ্চলের নিশ্চিৎ পাষনি তা নয়। সবটার জন্যে লড়তে গেলে সবটা হারাতেও পারে। যুদ্ধে কে জিতবে কে হারবে তা আগে থেকে জোর করে বলা যায় না। হিটলারকেও তো গোড়ার দিকে জিততে দেখা গেল। কিন্তু জার্মানরা এমন হারা হারল যে স্ট্যালিনগ্রাড থেকে হটতে হটতে বার্লিনে। এখনো তারা সেখানে রয়েছে। লাভের মধ্যে জার্মানীই ভাগ হয়ে গেছে। তেমনি পাকিস্তান যে যুদ্ধে জয়লাভ করবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। শ্রীনগর থেকে হটতে হটতে ভারতীয়দের হয়তো ডেকে নিয়ে যাবে ঘরে। যদি না কোনো এক তৃতীয় পক্ষ এসে তাকে রক্ষা করে। কবা সম্ভবপর। পশ্চিমা শক্তিদের সঙ্গে এখনো তার মিত্রভেদ হয়নি। ওদিকে চীনের সঙ্গেও তার সীমান্তচুক্তি হয়েছে তাতেও কী যেন একটা গুপ্ত ধারা আছে। অন্যান্য শক্তিরা যদি পাকিস্তানের রক্ষক হবার জন্যে এগিয়ে আসে তবে ভারতকে ঢের বেশী সাবধান হতে হবে।

আমরা পাকিস্তানের ক্ষয় ক্ষতি

চাইনে। কাশ্মীরের খানিকটে সে বারো বছরের উপর বেআইনীভাবে দখল করে আছে। বলতে গেলে ওটা এখন ওরই হয়ে গেছে। ইচ্ছা করলে ওখানে একটা গণভোটের অনুষ্ঠান করে ওটাকে ও পাকাপাকিভাবে নিজের অঙ্গীভূত করতে পারে। কিন্তু ওর আকাঙ্ক্ষা ওইখানেই সীমাবদ্ধ নয় সংঘাত অনিবার্য। শুধু যে ভারতের সঙ্গে তাই নয় কাশ্মীরের নির্বাচক মণ্ডলীর অধিকাংশের ভোটে প্রতিষ্ঠিত কাশ্মীর সরকারের সঙ্গেও। পাকিস্তান স্বয়ং গণতন্ত্র মানে না, যেটুকু ছিল সেটুকুকে ধ্বংস করেছে। সুতরাং সে তো কাশ্মীর সরকারের গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে হেসে উড়িয়ে দেবেই। সম্প্রতি কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ যারা করেছে তাদের হয়ে পাকিস্তান প্রচার করছে যে তারা কাশ্মীরী বিপ্লববাদী। বিপ্লব যারা ঘটায় তারা পরের স্বার্থে ঘটায় না, তারা পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রকে কাশ্মীর নামক একটি ভূখণ্ড পাইয়ে দেবার জন্যে তাদের আপনার শক্তি নিয়োগ করতে যায় না। আর বিপ্লবীদের ধর্ম ইসলাম নয়, বিপ্লবীদের ধর্ম আজকাল কমিউনিজম। কাশ্মীরে যদি যথার্থই একটা বিপ্লব ঘটে তবে কাশ্মীর ঝুঁকবে চীনের দিকে। পাকিস্তানের দিকে নয়। এটা হচ্ছে বিপ্লব শব্দটাকে নিয়ে আরেক রকম ওয়ার্ড মেকিং খেলা। বিপ্লব যাকে বলা হচ্ছে সেটা ঘোরতর রক্ষণশীল একটি রাষ্ট্রের বেনামী অনুপ্রবেশ ও আক্রমণ।

এ খেলা ভারতও খেলতে পারত, কিন্তু খেলবে না, খেলা উচিত নয়। পাকিস্তান যদি সরাসরি যুদ্ধে নামতে সাহসী না হয় তবে এই অভিযাত্রীদের দম ফুরিয়ে যাবে। এরা ধরা পড়বে, মার খাবে, পালাবে। বহু শতাব্দী পরে এ এক বর্গীর হাঙ্গামা। একে বিপ্লব বললে সত্যের অপলাপ হয়। আর যুদ্ধ বললে বাড়িয়ে বলা হয়। তবে এটা যুদ্ধের ভূমিকা হতে পারে। এই অভিযান ব্যর্থ হলে পাকিস্তানের কর্তাদের প্রেস্টিজ খাটো হবে, সেটা তাঁদের বিরোধীপক্ষের গণতান্ত্রিক দাবীকে জোরদার করবে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরেই এমন এক গণ আন্দোলন আরম্ভ হবে যে কর্তাদের আসন টলবে। সেসব এড়াবার ক্লাসিকাল উপায় হচ্ছে যুদ্ধের পথে পা বাড়ানো। আয়ুব খান কি তাই করবেন, না মিটমাটের জন্যে হাত বাড়িয়ে দেবেন? আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে অক্ষম। তবে আমার মনে হয় পাকিস্তানের যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা মার্কিনদের নেই, ইংরেজদের নেই। যাতে জড়িয়ে পড়তে না হয় সেইজন্যে ওরাই পাকিস্তানকে নিবৃত্ত করতে তৎপর হবে। তার মানে যুদ্ধ না করে সন্ধি করতে পরামর্শ দেবে।

মিটমাটের সম্ভাবনা অনেকদিন আগেই ছিল হতে যাচ্ছে এমন সময় পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য করে আইজেনহাওয়ার তার দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়িয়ে দেন। সে পিস্তল দেখিয়ে কাশ্মীর আদায় করবে এই ব্ল্যাকমেল নেহরু বেকে বসেন। কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়। কথাবার্তা যখন অবশেষে শুরু হয় তখন পাকিস্তানে শাসক বদল হয়েছে। নতুন শাসকদের পলিসি চীনের সঙ্গে দহরম মহরম। কতকটা মার্কিনদের সমঝিয়ে দিতে যে তাঁরা মার্কিনদের হাতের পুতুল নন। কতকটা ভারতকে সমঝিয়ে দিতে যে তাঁদের আরেক মুরুব্বি আছেন, দরকার হলে তিনি ভারতকে শিক্ষা দেবেন। কথাবার্তা ফেঁসে যায়। ইতিমধ্যে আরো একদফা চেষ্টা হয়েছে, এগোয়নি। না হবার কারণ ভারত কাশ্মীরকে পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি অঙ্গরাজ্যে পরিণত করে প্রকারান্তরে জানিয়ে দিয়েছে যে কাশ্মীর নিয়ে আর কথাবার্তার অবকাশ নেই। এটা বিজ্ঞতা কি অবিজ্ঞতা এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে।

অনেকের মতে কাশ্মীর সংক্রান্ত কথাবার্তার দরজা একেবারে বন্ধ করা উচিত নয়। যদিও আমাদের প্রহ্লাদ 'ক' অক্ষরেই আটকে থাকবে, খ অক্ষরে যাবে না, গ অক্ষরে যাবে না তবু আমাদের বর্ণমালায় খ অক্ষর আছে, গ অক্ষর আছে, ঘ অক্ষর আছে। তার মানে ভারত পাকিস্তানের মাঝখানে একশোটা মামলা আছে। সব ক'টা মামলা একে একে মেটাতে হবে। এটা উভয় রাষ্ট্রের স্বার্থ। উভয় রাষ্ট্রের উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ। কাশ্মীর 'ক' অক্ষর না হতে পারে, কিন্তু 'ক্ষ' অক্ষর তো বটেই। ভারত পাকিস্তানের মামলার তালিকার গোড়ার দিকে না হোক শেষের দিকে তো কাশ্মীরের মামলা থাকবেই। মামলার তালিকার থেকে ওটার নাম খারিজ করা যায় কি? বরঞ্চ বলতে পারা যায় সব মামলার শেষে কাশ্মীরের মামলা উঠবে। তখন আমরা দু'ভাই কাশ্মীর নিয়েও আপোসে পৌঁছব।

সুতরাং পাকিস্তানকে হিংসার থেকে নিবৃত্ত হতে বলার সঙ্গে সঙ্গে ভারতকেও বলতে হয় চরম সিদ্ধান্তের থেকে নিরস্ত হতে। দরজা খোলা রাখাই সুবুদ্ধি।

আমাদের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে কমন মার্কেট, কমন ডিফেন্স, কমন ফরেন অ্যাফেয়ার্স। পাকিস্তান আপাতত এতে রাজী নয়। এতে তার সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক অবস্থার চাপে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির মতো ভারত পাকিস্তান নেপাল সিংহলকেও কমন মার্কেট, কমন ডিফেন্স ইত্যাদির প্রস্তাবে রাজী হতে হবে। কবে, কতদিন পরে সেটা আমার কল্পনার বাইরে। কিন্তু এটা আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে জনগণের বাঁচবার পথ পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয় পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। দশ বিশ বছরের মধ্যে যদি আমরা সবাই মিলে একজোট না হই তবে কমিউনিজম প্রবল হবে। চীনের সঙ্গে দহরম মহরম করে তাকে ভারতের গায়ে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে বুদ্ধিভ্রংশ। পাকিস্তানের বর্তমান শাসকদের পলিসি ভুল।

যা বলছিলুম, অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে কমন মার্কেট, ইকনমিক কমিউনিটি, কমন ডিফেন্স, ডিফেন্স কমিউনিটি ইত্যাদি। এর জন্যে ভারতকেও কিছু কিছু ত্যাগস্বীকার করতে হবে। ভারত তার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দিয়ে আর সবাইকে কোণঠাসা করবে এটা কাম্য নয়। আবার পাকিস্তান তার সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবকে ব্ল্যাকমেল দিয়ে পূরণ করবে এটাও অন্যায়। কাকে কতখানি ছাড়তে হবে, মেনে নিতে হবে, এসব এই মুহূর্তে আমার মানসে নেই। কিন্তু আমি বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে একদিন না একদিন ভারত পাকিস্তান নেপাল সিংহলকে একজোট হয়ে তাদের সব সমস্যার সমাধান করতে হবে।

সেই অন্তিম লক্ষ্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলে আমরা এমন কোনো ভুল করব না যার ফলে সেই লক্ষ্য আরো বেশীদূর পেছিয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই পেছিয়ে গেছে। ভারত পাকিস্তানের সৈনিকরা কোনো কালে পরস্পরের উপর গুলী ছোঁড়েনি। বরাবরই তারা কমরেড। কিন্তু দেশবিভাজনের পর কাশ্মীরকে উপলক্ষ করে মাঝে মাঝে তারা জ্ঞাতিবধ করেছে। এখন পর্যন্ত এটা অল্পক্ষেত্রেই ঘটেছে। এখন থেকেই একে সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে হবে। যাকে রাখ সেই রাখে। ভারত-পাকিস্তানের সত্যিকার সম্পর্ক পরস্পরকে রক্ষা করা। আঠারো বছরে এ সম্পর্ক রদ হয়নি। কিন্তু বড়োরকম একটা যুদ্ধ যদি বেধে যায়, হাজার হাজার সৈনিক যদি মরে তবে ওরা পরস্পরের এমন শত্রু হয়ে উঠবে যে উভয়ের সাধারণ শত্রুর সঙ্গে কোনোদিন একজোট হয়ে লড়বে না। বরং শত্রুর হয়ে লড়বে। তেমন যদি হয় তবে ভবিষ্যৎ ভয়াবহ।

এ আগুনে অবিলম্বে নিবিয়ে ফেলা কর্তব্য।

প্রবন্ধকারের বিলাপ

শ্রীজিৎ

সেদিন ভদ্রলোক যখন পরিচয় প্রসঙ্গে আমাকে একজন প্রবন্ধকার বলে উল্লেখ করলেন তখন সত্যি বলতে কি, আমি মনে মনে একটু ক্ষুব্ধই বোধ করেছিলাম। আপনারা কি ভাবেন জানি না, আমি কিন্তু নিজেকে একজন সাহিত্যিক বলেই মনে করি। বেশ বুঝতে পারছি আপনারা এক্ষুণি বলবেন, কেন, সাহিত্যিককে কি প্রবন্ধকার হতে নেই? কেন হবেন ? খাঁটি সাহিত্যিক সবই হতে পারেন। তিনি গল্প উপন্যাস কবিতা লিখলেও সাহিত্যিক, প্রবন্ধ লিখলেও সাহিত্যিক। এমন কি কিছু যদি নাও লেখেন, শুধু কথা বলেন—তাঁর সেই মুখের কথায়ও সাহিত্যের প্রসাদগুণ থাকা স্বাভাবিক। নিছক প্রবন্ধকার সম্পর্কে এই কথাটি বলা চলে কিনা সন্দেহ। বরং ভারতচন্দ্র যে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন—না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল—এঁদের রচনায় সে দুর্দৈবের সম্ভাবনাটাই বেশি থেকে যায়। প্রবন্ধরচয়িতা যদি কাব্য রচনা করতে বসেন তো সে কাব্যও অনায়াসে প্রবন্ধে পরিণত হতে পারে।

সাহিত্যিক এবং প্রবন্ধকার—এ দুই-এর কাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। সাহিত্যিক রসসৃষ্টি করেন আর প্রবন্ধ-রচয়িতা রসের আলোচনা করেন। সে আলোচনা প্রায়ই রসালো হয় না। তারও কারণ আছে—কবি, সাহিত্যিকরা নিজের চোখ দিয়ে অপরকে দেখেন আর প্রবন্ধকাররা অপরের চোখ দিয়ে নিজেকে তো বটেই, সব কিছুকেই পরের চোখ দিয়ে দেখেন। অপরের মুখে ঝাল খান বলে এঁদের স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা খুব নির্ভরযোগ্য নয়। কবি, সাহিত্যিক মাত্রই প্রেমিক আর প্রবন্ধকার বিচারক। বিচারক মানুষ প্রেমিক হয় না। সাহিত্যের রসটি বাস্তবিকপক্ষে পরকীয়া রস কারণ পরকে নিয়েই সাহিত্যের মাথাব্যথা। অপরের প্রতি তার অপরিসীম আগ্রহ, অশেষ কৌতূহল। ভাল-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত সকলের প্রতি সাহিত্যিকের সমান আগ্রহ। কোন কিছুই তাঁর চোখে তুচ্ছ নয়, তিনি সহৃদয় দর্শক। যিনি অনন্যমনা দর্শক, যিনি প্রেমের দৃষ্টিতে দেখেন জীবন-দর্শন তাঁর চোখে আপনি এসে ধরা দেয়। প্রবন্ধকার দর্শক নন, তিনি পাঠক। দর্শকের কাছে যে সত্য উদ্ঘাটিত হবে জীবনের তাজা তপ্ত খোলা থেকে পাঠক তাকে গ্রহণ করবেন ছাপার অক্ষরে মিইয়ে-যাওয়া পুঁথির পাতা থেকে,—ইংরেজিতে যাকে বলে cold print. এইজন্যে সাহিত্যিকের উক্তি স্বতঃস্ফূর্ত আর প্রাবন্ধিকের উক্তি পুঁথি-পড়া বুলির মত।

এখন বুঝতেই পারছেন কেন প্রবন্ধকার আখ্যা লাভ করে আমি মনে মনে খুশি হইনি। আমার ক্ষোভ এই কারণে যে আমি যা নই আমাকে তাই বলা হয়েছে। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে এককালে এক ধরনের প্রবন্ধ আমি লিখেছি। কিন্তু তাকে ঠিক নির্জলা প্রবন্ধ বলা চলে না। তত্ত্বকথাও বলিনি, তথ্যের জঞ্জালও ঘাঁটিনি। আবার সব সময়ে জল মিশিয়ে জিনিসটাকে অতিরিক্ত তরল করে দিয়েছি এমনও নয়। পড়তে গেলে মাথা ঘামাতে হয় নি কিন্তু মনটাকে দোলা দিয়েছে। জল মেশাতে হয় না যদি একটু মাদকদ্রব্য মেশাতে পারেন। মাদকতা সাহিত্যের প্রধান গুণ।

আমি যে জিনিস লিখেছি তাকে আপনারা আজকাল নাম দিয়েছেন রম্য-রচনা। আমি বলতাম খোশগল্প। সে জিনিস দশ রকম কাজের ফাঁকে এক কানে শুনে নেওয়া যায়, সবটুকু না শুনলেও ক্ষতি নেই। খুব বেশি একটা মনোযোগ দাবি করে না। বাস্তবিক পক্ষে সাহিত্যের স্বভাবটাই ঐ। গল্প লোকে শোনে, পড়ে না। অবন ঠাকুর মশায় কোন কালে খবরের কাগজ পড়তেন না। বলতেন, খবর তো লোকে শোনে, পড়বে কেন? কউকে ডেকে রোজকার খবর তিনি শুনে নিতেন। কবিতাও শোনবার জন্যেই। এককালে সব কবিতাই গেয়ে শোনানো হত। হিন্দী উর্দু কবিতায় এখনও ঐ রীতিটি প্রচলিত আছে। পশ্চিম দেশেও মিনস্ট্রেলরা তাঁদের কাব্য গেয়ে শোনাতেন। নাটক তো শোনবার জন্যেই লেখা। 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—এ কেবল শ্রীরাধার কথা নয়, এটি রসিক ব্যক্তি মাত্রেরই কথা, সকল সাহিত্য সম্পর্কে সকল পাঠকের মনের কথা। সেই গল্পকেই আমরা খাঁটি গল্প বলি —ছাপার অক্ষরের পঠন ক্রিয়াটাকে যে ভুলিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ পড়তে পড়তে মনে হবে কেউ যেন খুব রসিয়ে একটি গল্প বলে যাচ্ছেন আর আমি দিব্যি আরামকেদারায় শরীরটি এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে শুনে যাচ্ছি। শুনতে ভারি আরাম লাগছে। কবিতা পাঠের অনুভূতিটাও ঠিক এই জাতীয়। কিন্তু প্রবন্ধের বেলায় সেটি হবার জো নেই। সে গুরুমশায়ী গলায় বলবে, উঁ হুঁ, ওটি চলবে না। আগে মেরুদণ্ডটি সোজা করে দিব্যি টান হয়ে বোসো তো। অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা বলতে যাচ্ছি—অবধানপূর্বক শ্রবণ কর। হাতের কাছে বিশ্বকোষ, পার তো শব্দ-কল্প-দ্রুম নিয়ে বোসো, ক্ষণে ক্ষণে প্রয়োজন হতে পারে। প্রবন্ধ জিনিসটা শোনবার বস্তু নয়, ওটা অধ্যয়নের বস্তু। ওর প্রবেশ কানের ভিতর দিয়ে ততখানি নয় যতখানি রেফারেন্স লাইব্রেরীর কন্টকাকীর্ণ পথ বেয়ে।

ইদানীং মতিভ্রমবশত আমি আমার অভ্যস্ত লিখনরীতি ত্যাগ করে সাহিত্য-বিষয়ক কয়েকটি—আপনারা যাকে বলেন 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ' প্রবন্ধ—তাই লিখবার চেষ্টা করেছিলাম। বোধ করি সেই কারণেই প্রবন্ধকার নামে আমার পরিচয় হয়েছে। এককালে আমি মনোহারী

কথা লিখবার চেষ্টা করেছি তখন কেউ আমাকে প্রবন্ধকার আখ্যা দেয় নি। কিন্তু যেই না বোকার মত হিতকথা (প্রবন্ধ শেষ পর্যন্ত হিতোপদেশে গিয়েই দাঁড়ায়) বলতে গিয়েছি অমনি প্রবন্ধকার বদনামটি জুটে গিয়েছে। পশ্চিমী পণ্ডিতেরা বলেছেন, অক্ষম কবিরাই পরে সাহিত্যসমালোচক হয়ে বসেন। আমি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য কোন পণ্ডিতের সঙ্গেই একমত নই, কাজেই এঁদের কথাকে বেদবাক্য বলে গ্রহণ করি না। কারণ আমি মনে করি যিনি কাব্য রচনায় অক্ষম তিনি কাব্যালোচনায়ও অক্ষম; আর যিনি সাহিত্য সৃষ্টিতে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তিনি সাহিত্য-প্রবন্ধ রচনায়ও কৃতিত্ব লাভ করবেন। রসসৃষ্টি যাঁর সাধ্যায়ত্ত, রসালোচনায় তাঁরই অধিকার। ড্রাইডেন কবি ছিলেন, আপন অধিকারেই কাব্য এবং নাটক সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে ড্রাইডেন বলেছেন— Poets themselves are the most proper, though not the only critics. কাব্য সম্বন্ধে কবির কথাই গ্রাহ্য। কবি ছাড়া অন্য যাঁরা কাব্যালোচনা করেন তাঁদের কথা না শুনলেও চলে কারণ তাঁরা অধিকন্তু, আমার মতে তাঁরা অবান্তর। যিনি কোন কালে দুটি ভালো কবিতা লেখেন নি কিম্বা দুটি ভাল গল্প লেখেন নি কোন প্রকারের রসসৃষ্টি তিনি করেন নি তাঁর কাছে কাব্য কিম্বা রসতত্ত্বের আলোচনা শুনতে আমি কোনমতেই রাজী নই। অবশ্য আপনারা বলতে পারেন বাপুহে, তাই যদি হয় তোমার কথাই বা আমরা শুনতে যাব কেন? তুমিই কি দুটো ভালো কবিতা লিখেছ কিম্বা দুটো একটা ভালো গল্প উপন্যাস? ঠিক বলেছেন, অনাধিকারীর রসালোচনার অপচেষ্টাকেই বলে সাহিত্য-প্রবন্ধ। মতিচ্ছন্নবশত সে জাতীয় প্রবন্ধ দু-একটা লিখেছিলাম। ভবিষ্যতে আর লিখব না স্থির করেছি যদি না রসসৃষ্টি করে অধিকার প্রতিপন্ন করতে পারি।

শুধু আমি নয় অধিকাংশ পাঠকই প্রবন্ধকে সাহিত্যের পংক্তিতে স্থান দেন না। সাহিত্য সংসারের কুলীন চতুষ্টয় হলেন—কাব্য নাটক গল্প উপন্যাস। এদের মধ্যে আবার কাব্য আর নাটক না-কি নৈকষ্য কুলীন। কেন যে এদের এই উচ্চাসন সে আমি জানি নে। এক কালের কুলীনরা সব আজকের সমাজে পতিত। কাব্য-নাটকেরও বলতে গেলে আজ সেই দশা। আমার কাছে অন্তত তেমন আমল পায় নি। কবিতা, নাটক আমি কোন কালে লিখবার চেষ্টা করি নি। এককালে গল্প-উপন্যাসে এক-আধটু হাত মক্স করেছিলাম তাও নিতান্ত প্রথম সংস্করণে না হলেও দ্বিতীয় সংস্করণেই তাদের কৈবল্যপ্রাপ্তি ঘটেছে। এ ছাড়া আর যা লিখেছি সে আমার খুশির বেসাতি। আপন খুশিমত যখন যা মনে হয়েছে তাই লিখেছি। সে জিনিসকে আর যাই বলুন প্রবন্ধ বললে তার প্রতি অবিচার করা হয় কারণ এর মধ্যে ভাববার কথা যদি বা কিছু থাকে জানবার কথা কিছুই নেই। প্রবন্ধ বলতে এই কারণে আপত্তি যে আমাদের দেশে জানা জিনিসের জাবর কাটার নামই প্রবন্ধ। এ ছাড়া প্রবন্ধ নামধেয় রচনার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল ওখানে অত্যন্ত সংযত হয়ে একটি নির্লিপ্ত নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ মন্তব্য করতে হয়। আমার স্বভাবটাই এমনি যে আমি কোন বিষয়েই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকতে পারিনে। আমার কাছে কোন জিনিস হয় ভাল লাগবে নয় তো লাগবে না। কোন ব্যাপারেই নির্বিকার থাকা আমার স্বভাবে কুলোয় না। খানিকটা ব্যক্তিত্বহীন নির্বিকার স্বভাবের মানুষ না হলে খাঁটি প্রবন্ধ লেখা সম্ভব বলে আমি মনে করি না। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে ঐ জাতীয় প্রবন্ধ রচনার কোন গুণই আমার নেই। অতএব আমাকে প্রবন্ধকার আখ্যা দেওয়া সত্যের অপলাপ ছাড়া কিছু নয়। আর এদিকে আমার ট্র্যাজেডির কথাটিও ভেবে দেখুন। আমি যে প্রবন্ধকার নই সেই কথাটি প্রমাণ করবার জন্যেই আমাকে আবার এই প্রবন্ধটি লিখতে হল। অর্থাৎ আমার অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে আমাদের ঐ কাদম্বিনীর মতো—যাকে মরে প্রমাণ করতে হয়েছিল, সে মরে নাই।

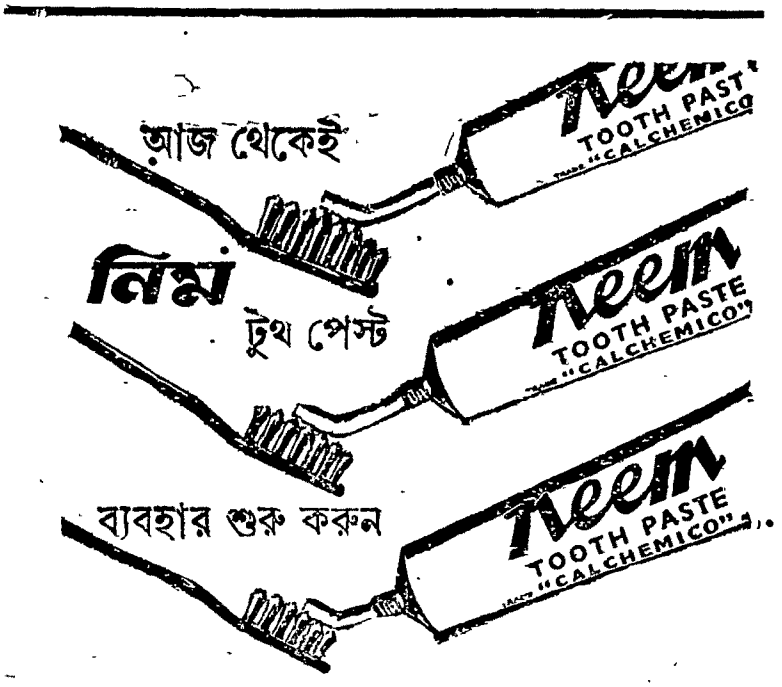

এই একমাত্র টুথ পেস্ট যাতে হিতকর নিমসার এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ভেষজ যথা 'ফ্লুরোরাইড' প্রভৃতির সার্থক সংমিশ্রণ হয়েছে

নিম টুথ পেস্ট আপনার মুখ পবিচ্ছন্ন স্নিগ্ধতায় ভরে দেবে, মাড়িকে শক্ত ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল করে তুলবে এবং আপনার দাঁতগুলিতে ঝকঝকে সাদা দীপ্তি এনে দেবে। এটি দাঁতের গোড়ায় ময়লা জমতে দেয় না এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধের কারণগুলিকে দূর করে।

নিম টুথ পেস্ট

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

ENC-IA BEN

যেদিকে দুচোখ যায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আসল নাম বলব না। ডাক নাম এই ধরুন বাচ্চু।

বাচ্চু চিঠি লিখেছিল জলপাইগুড়ি যেতে। আমি কোনো উত্তর দেব না জেনেও লিখেছিল। উত্তর দেব না বলাটা ঠিক হল না। আসলে আমাকে চিঠি লেখাটা যেন দেয়ালের সঙ্গে কথা বলা।

চিঠি লেখা ব্যাপারটাই আমার ঠিক আসে না। হয়ত লেখার স্বভাবসুলভ কুড়েমিও এর কারণ হতে পারে। কাউকে আমার দরকার হলে ট্রাম-বাসের ভিড় ঠেলে কিংবা দু-চার মাইল হেঁটেও আমি সাক্ষাতে হাজির হতে পারি। কিন্তু চিঠি কেন, টেলিফোনেও আমার হাত ওঠে না।

যার সঙ্গে কথা বলব তার মুখ দেখতে না পারলে আমার বেজায় অস্বস্তি হয়।

সেই কারণেই বাচ্চু দশটা চিঠি দিলে আমি কোনরকমে কেমন আছ ভাল আছি গোছের উত্তর দিই। বাচ্চু আমার সেই মুষ্টিমেয় পত্রদাতাদের মধ্যে একজন, যারা উত্তর না পেলেও মাঝে মাঝে চিঠি দিতে ভোলে না। আর আমি এমনই নির্লজ্জ যে, রোজ দুবেলা চিঠির বাক্সের কাছে গিয়ে ছোঁক ছোঁক করি। চিঠি না পেলে কী মন খারাপ যে হয়।

বলাই ছিল হঠাৎ একদিন গিয়ে অবাক করে দেব।

সময়ের অভাবে যে আমার কোথাও যাওয়া হয় না তা নয়। আসলে যেহেতু পাথেয় আর সেই সঙ্গে সংসারযাত্রা নির্বাহের কথাটাও ভাবতে হয়, সেই-জন্যে সময়ের সঙ্গে সুযোগের মণি-কাঞ্চন যোগ না হলে ইচ্ছে থাকলেও কোথাও যেতে পারি না।

আমি বক্তৃতা দিতে পারি না, সবাই জানে। সবাই জানে ব'লেই মফস্বলে যাবার সুযোগ কালে-ভদ্রে ঘটে।

হঠাৎ সুযোগ এসে গেল বালুর-ঘাট যাবার। মফস্বল ব'লে মফস্বল। যেতে আসতেই পাকা দুদিন ধরে রেখে দিতে পারেন। আমার মত কাপ্তেন ছাড়া এতটা রাস্তা ঠেঙিয়ে কেই বা আর এতখানি সময় নষ্ট করতে পারবে?

বালুরঘাট মানেই পশ্চিম দিনাজ-পুর। তার মানে উত্তরবঙ্গ। অর্থাৎ, বালুরঘাট থেকে জলপাইগুড়ি না যাওয়ার কোনো মানেই হয় না।

যাচ্ছি তিনপাহাড় হয়ে সাবেকী রাস্তায়। যে রাস্তায় আগে একবার মালদায় গিয়েছি।

ট্রেনে উঠলে কত যে পুরনো সব কথা মনে পড়ে যায়।

দিনাজপুর বললেই চিত্ত কাকা, চূণীকাকাদের বাড়িতে তাঁদের হিলির ধনকলের সুন্দর গন্ধওয়ালা চাল। জলপাইগুড়ি বলতেই একটা ফুটবল টিম আর তার ম্যানেজার আমাদের দূর সম্পর্কের বেহেড মাতাল এক আত্মীয়। আর মালদা বললেই প্রত্নতাত্ত্বিক আমাদের যোগেনকাকার 'রমেশ, চা কর' হাঁক। এসব ছেলেবেলার স্মৃতিতে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে কিছুতেই আর আলাদা করা যায় না।

তিনপাহাড়ে যখন নামলাম, সারা ট্রেনে লোকে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সেখান থেকে শাটল ট্রেনে রাজমহল।

সকালের আলো ফুটল রাস্তায়।

স্টেশন থেকে স্টিমার ঘাট। রাজ-মহলে আমার এই হল দৌড়। দৌড় বলতে সত্যিই কিন্তু দৌড়। নইলে জায়গা না পাবার ভয়। দৌড়ে এসে দেখি—ও হরি, স্টিমার আসতে এখনও বহুৎ দূর। দুবার এসেছি, দুবারই তাই।

রাজমহল দেখে মনে হয়েছে বন্দর যেমন হয়। সরকারী হিসেবে কিন্তু রাজমহল বন্দরের চেয়েও বড়। ছোট-খাট সদর।

দু-পাশে লাইনবন্দী দোকানঘর। ঘাট থেকে উঁচু ডাঙা বরাবর উঠে গেছে। দোকানের ঝাঁপগুলো তখনও খোলে নি। ঘাটের দিকে মুখ ক'রে দাঁড়ালে দোকান-পসার দালান-কোঠা ডান দিকে। বাঁ দিকে ছোট ছোট সব্জী খেত।

স্টিমারঘাটায় টিকিট ঘরের সামনে সাতসকালে ব'সে গেছে আনাজপাতির বাজার। যাত্রীরাই কিনবে। একজন যাত্রী দেখলাম কোথা থেকে গস্ত করেছে বেশ চকচকে ইলিশ। দেখেই গোয়া-লন্দঘাটের কথা মনে পড়ে গেল। গোয়া-লন্দের স্টিমারঘাট আর কি কখনও দেখব?

স্টিমার তো এল। ওঠো এবার হুড়মুড়িয়ে। আগে উঠে এমন জায়গা নেওয়া, যাতে আগেভাগে নামা যায়। কেন না ওপারে গিয়ে বাসেও তো বসতে পাওয়া চাই। গন্তব্যে না পেঁছুনো পর্যন্ত উদ্বেগের অন্ত নেই। সারা রাস্তা সুখসোয়াস্তি হারাবার ভয়ে সারাক্ষণ কাঁটা হয়ে থাকা।

অথচ পেছনে তাকালেই কিন্তু দেখা যায় দূর দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে তিনপাহাড়। স্টিমারের ছাদে সকালের কী মিষ্টি রোদ। শীতের মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ হাওয়া। মধ্যে মধ্যে চড়া। জল সাদা ক'রে আছে রাজহাঁস। জলের গায়ে ভাসছে স্টিমারের আর লঞ্চের তেল। তেলের গায়ে রোদ পড়ে সূর্যের সাত রং ঝলমল ঝলমল করছে।

পাড়ের গায়ে দেখা যায় পাহাড়ের গুহাগুম্ফার মতন গর্ত। গাং পাখিদের বাসা।

নদী বলতে গঙ্গা। এবার-ওপার চওড়া বড় কম নয়। কিন্তু চড়ায় চড়ায় ধূলে পরিমাণ। তারই ভেতর দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে পাশ কাটিয়ে স্টিমার এসে লাগল মানিকচকের ঘাটে।

পাশে ফেরী নৌকোয় লরী পার হচ্ছে। ঘাটের ওপর মাল ঘড়ে করে দাঁড়িয়ে আরও কিছু লরী। গায়ে লেখা আসাম রোড লিঙ্ক। আর কাতারে কাতারে বাস। কোনোটা যাবে মালদা ইংলিশ বাজার। কোনটা বালুরঘাট কিংবা রায়গঞ্জ। কোনোটা আরও দূর পাল্লায় কুচবিহার।

অনেক কষ্টে বালুরঘাটের বাসে একটা জায়গা মিলল। তা-ও সোজা আঙুলে নয়। যে লোকটা তার বন্ধুর জন্যে জায়গা রেখেছিল তাকে মেজাজ দেখিয়ে।

এই এখন রেওয়াজ। একচুল জায়গার জন্যেও ঠেলাঠেলি, চিৎকার করতে হবে। যদি তাতে পিছপা হন, পেছনে পড়ে রইলেন। যেতেও হবে অনেকখানি রাস্তা। এই ভিড়ে দাঁড়িয়ে যেতেও মন চায় না। সুতরাং অতএবটাই বলবৎ থাকে।

আমার সঙ্গে নির্মাল্য। বসবার বন্দোবস্ত ওই সব করে দিল। তাকিয়ে দেখলাম কাঁধে ঝোলানো বি-ও-এ-সি কে-এল-এম লেখা ব্যাগে বাস প্রায় ভরে গেছে।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল আমাদেরই চোখের ওপর। লড়াই শেষ হয়ে দেশ তখন স্বাধীন হয়েছে কি হয় নি। ধুম পড়ে গেল বিদেশ যাওয়ার। শুধু পড়তে নয়, বেড়াতে। শুধু বেড়াতেও নয়, সভা করতে। জাহাজের চেয়েও কৌলিন্য বেশী উড়োজাহাজের। আকাশচারীর কাঁধে ঝোলানো এয়ার ব্যাগ হয়ে দাঁড়াল আভিজাত্যের পৈতে। ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা অশিক্ষিত হাতের নকল সেই আভিজাত্যকে আজ ঠাস ঠাস করে যেন গালে চড় মারছে।

বাস চলতে লাগল নতুন রাস্তায়। রাস্তার বদল এসব জায়গায় প্রায় হামেশাই হয়। গঙ্গার পাড় ভঙার অন্ত নেই। সেই সঙ্গে এ জায়গার ঘালি উড়ে উড়ে ও জায়গায় যাচ্ছে। ফলে তার ভেতর দিয়ে অনবরত নতুন রাস্তা খুঁজতে হয়। বালিও তেমনি বালি। চাকা চলতে চায় না।

বেশ খানিকটা গিয়ে তারপর পাকা রাস্তা মিলল। মথুরাপুর উজিয়ে মানিকচক, শোভানগর, মিলকি গ্রাম। তারপর মহানদী।

মহানদী পেরিয়ে এসে বাঁদিকে লরী ড্রাইভারদের একটা আস্তানা চোখে পড়ল। খড়ো চাল, মাটির দেয়াল, সামনে একটু উঠোন। উঠোনের দাওয়ায় ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটা চারপাই। তাতে বসে পাগড়ি মাথায় দেওয়া জনকয়েক সর্দারজী। নিশ্চয় সর্দারজীদের চটি। কাঁচের গেলাসে দূর থেকে চা বলেই মনে হল।

মাঝে মাঝে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে আসাম রোড লিঙ্কের কনভয়।

মোশু পেরিয়ে পাণ্ডুয়া। আদিনা মসজিদ এবারও দেখা হল না। শুধু আদিনা কেন, মালদায় এক শহরটুকু ছাড়া কিছুই আমার দেখা হয় নি। না গৌড়, না পাণ্ডুয়া। গঙ্গার ধারের নতুন পলির ওপর দিয়ে গিয়েছি, এসেছি, দিয়ারার মাটি কখনও হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখা হয় নি। যাই নি বারিন্দের পথহীন ছায়াহীন বিরলবসতি রুক্ষ মালভূমিতে। মাল মানে উঁচু। উঁচু উঁচু প্রান্তরের ঢালের গায়ে যেখানে লালহলুদ কাঁকর ছাপিয়ে আদিগন্ত দেখা দেয় সবুজ শরৎ।

গাজোল পেরিয়ে বুনিয়াদপুর। উত্তরে ঘুরে গেল রায়গঞ্জের রাস্তা। বাঁদিকে চমৎকার বাংলো। রাস্তার দুপাশে সারি সারি চায়ের দোকান।

বুনিয়াদপুর থেকে এখনও যেতে হবে তেত্রিশ মাইল। তবে পৌঁছুব বালুরঘাট। রাস্তা ফুরোতে চায় না। বংশীহারির ধানকল পেরিয়ে টাঙ্গন নদী গোয়ালফালনীর পর পুনর্ভবার পুল।

শুগারামপুরে রাস্তার ধারের মাঠে তাঁবু ফেলেছে গ্রেট স্টার সার্কাস। দড়ির খাটিয়ায় বসে দুটি মেয়ে। নিশ্চয় ট্র্যাপিজের খেলা দেখায়। খালি গায়ে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নাপিতের কাছে যে লোকটা কামাচ্ছে, সে বোধ হয় রিং মাস্টার। আশ্চর্য, আশেপাশে ভিড় করে কেউ দেখবার নেই। বাইরে ছবির রংগুলো এমন ফিকে হয়ে এসেছে যে, মুখগুলো আসলে নকলে মিলিয়ে নেওয়া গেল না। কাপড়গুলো এমন জ্যালজেলে হয়ে এসেছে যে, ভেতরে আলো জ্বললে, বাইরে থেকে বোধ হয় বিলকুল দেখা যাবে।

ভুলবাড়ী পেরিয়ে বাউল। তারপর খোল্লা। ক্ষেতের মধ্যে এখানে-সেখানে জলটুঙি। আব্রাই বর্ধিষ্ণু গ্রাম পতিরাম।

হঠাৎ ড্রাইভারের একটা মন্তব্য কানে এল। রাস্তায় যে লোকটা বোঁটায় চুনসুদ্ধ পান এগিয়ে দিচ্ছিল, ড্রাইভার তাকে বলল, 'আমাদের কাছেই যত নাকে কাঁদুনি—বাড়িতে যাও সব বি সরকার।' গিন্নি হাউস। সোনার গয়না। বি সরকার তা হলে এখন কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাগলিগঞ্জের আগে আদল এগ্রিকালচরাল ফার্ম।

কথাটা হঠাৎ মনে হল। বাংলাদেশের ভূগোল কিভাবে বদলাচ্ছে। বাংলাদেশ ভাগ হওয়ার কথা নয়। যেখানে আগে ঘাস জন্মাত না, সেখানে বন অর্থ যেখানে আবাদ হত না সেখানে রকমারি ফসলের ফার্ম আমার নিজের চোখে দেখা। ভূগোল বদলাচ্ছে না তো কী! মানুষের হাতের কাজ প্রকৃতির অঙ্গ হয়ে গিয়ে খোদার ওপর খোদকারি করছে।

বালুরঘাটে এই আমার প্রথম আসা। বালুরঘাট ঠিক রংপুর বা দিনাজপুর শহরের মত তো নয়। অনেক বেশী স্থিতু।

পরে ভেবে দেখেছি, তা নয়। আসলে উত্তরবঙ্গের স্বভাব বদলাচ্ছে। পাকা দালান-কোঠার চেয়ে টিনের চালের বাড়িরই ছিল এক সময়ে প্রাধান্য, তা ছাড়া প্রায় গোটা উত্তরবঙ্গেই ভদ্রলোকেরা অধিকাংশই হয় পূর্ববঙ্গ, নয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন। চা, তামাক, কাঠলকড়ি, ধান, ধানকল, পাট, পাটের আড়ৎ—একদিকে এইসব কারবার, আরেক দিকে ওকালতি, মোক্তারি, জমিদারি। পাকা দালানে পত্তন হয়ে বসা, এ অঞ্চলের যারা বরাবরকার বাসিন্দা, তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা—এসব হয়েছে পরে। পূর্ব বা পশ্চিমবঙ্গের মত উত্তরবঙ্গ তার নিজস্ব দেশাচারে, লোকাচারে কখনই আমাদের চোখে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে নি। যা আছে তা তলায়। ওপরে নয়। ওপর নীচে চালাচালি না হওয়া পর্যন্ত চোখে পড়বে না।

বাজারে ঘুরতে ঘুরতে কয়েকটা সাইনবোর্ড দেখে চমকে উঠলাম। নামের আগে 'নওগাঁ' লেখা—যে নওগাঁয় আমার ছেলেবেলা কেটেছে। তার মানে, নওগাঁর লোক দেশভাগের পর এখানে এসেছে। দোকানগুলো তখনও খোলে নি। নইলে আলাপ করে পুরনো স্মৃতিগুলো ঝালিয়ে নেওয়া যেত।

কলেজে পড়ে একটি মেয়ে। সে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। তার বাবা আমাদের সময়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ত। সে যে মেসে থাকত আমি মাঝে মাঝে সেখানে যেতাম। অনেক গল্প হল। পুরনো লোকেরা কি রকম বদলে গেছে তার গল্প। বাপের খুব ইচ্ছে ছিল লেখক হওয়ার। বিষয়-সম্পত্তি ঘর-সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়ে গেল যে। তাই আর হয় নি। সেই সাধ এখন মেয়েকে দিয়ে পূরণ করার ইচ্ছে। কিন্তু কলকাতা থেকে দূরে থাকার মুস্কিলও কম নয়। গোয়ালে গরু, গোলায় ধান, পুকুরে মাছ থেকেও মনের মধ্যে একটা অভাব থেকেই যায়। বিশ্বসংসারের নতুন নতুন যে ঢেউ, সে শুধু কলকাতাতেই লাগে। এতদূর আর এসে পৌঁছোয় না। বই, কাগজ, কিম্বা সিনেমা রেডিওতে আর কতটা হয়। সাধে কি আর রাজ্যসুদ্ধ লোক এত কলকাতা কলকাতা করে!

সন্ধ্যায় সভার আগে গেলাম হাট দেখতে। শহরের হাট সপ্তাহে একদিন। শনিবার। আশপাশের গ্রাম ভেঙে লোক এসেছে হাটে। দু-তিন বছর আগের কথা বছরের শেষ। কালো পাটের দর সেবার ষোল-সতেরো, সাদা

পাট ছাব্বিশ-সাতাশ। পাট তখন সবে উঠেছে। এক পাশে ডাঁই হয়ে কলাই। গোরুর জন্যে খোল। পশ্চিমবঙ্গে গোরু-মোষ সবচেয়ে বেশী এই পশ্চিম দিনাজপুরে। হাট আলো করে মুলো আর অন্ধকার করে বেগুন। নতুন আলু। রাঙা আলু। শুকনো লঙ্কা। খুদে খুদে পেঁয়াজ। এখানে সব পাকির হিসেব। পাকির হিসেবে হয় পঁয়ত্রিশ সেরে মণ। শুকনো লঙ্কার পাশে সুপুরি। কারো কাছে তামাক আর চুন। কার্সিয়াঙের কমলা উঠেছে। ছ আনা হালা। হালা বলতে চারটে। কাতলা মাছ ন সিকে। আছে বোয়াল, তেলাপিয়া, পাবদা, পোনা আর চুনো-চানা। কেউ বেচছে নিজের বরজের পান। একদিকে মাটির ছোট-বড় হাঁড়ি-পাতিল, আর পিদিম। তার পাশে কামাররা বসেছে লোহার দা-বঁটি, ছুরি, কাঁচি আর কাস্তে নিয়ে।

লাইন দিয়ে বসেছে ভাঙা-ফুটো লণ্ঠনবাতি সারানেওয়ালা। এক জায়গায় পুরনো লোহার টুকিটাকি যন্ত্রপাতি। ছেলে-বুড়োয় হাটের মধ্যে সার সার বসে গেছে চুলদাড়ি বানিয়ে নিতে। আট-দশজন খলিফা পা-কল নিয়ে বসে সমানে লুঙি সেলাই করে চলেছে। সাঁওতাল মাঝি-মেঝেনদের ভিড় রংদার কাপড়ের পট্টিতে। রং-বেরঙের ফ্রক, শাড়ি, ছিটের ব্লাউজ, কামিজ, গামছা, লুঙির কাপড় লোকে তুলে বেছে দেখছে। এক পাশে বিক্রি হচ্ছে মাদুর আর শফ। হাটে দেখি কাছিমের খুব আদর। শুয়োর, খাসি, কাছিম—ঢালাও এক দর। আড়াই টাকা। হাটের এক প্রান্তে একগাদা টাট্টু ঘোড়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে পা বদলাচ্ছে।

সারা উত্তরবঙ্গই হল হাটমেলার দেশ। উত্তরবঙ্গের মেলা সেভাবে কখনও দেখি নি। যতটুকু দেখেছি ট্রেনে যেতে যেতে। বক্সা থেকে ছাড়া পেয়ে যেবার ফিরছিলাম, সেইবার। নিশান উড়িয়ে চলেছে গোরুর গাড়ির মিছিল। রঙে রঙে মাত হয়ে আছে মেলার জায়গা। দূর থেকে দেখেছিলাম।

কলেজে সভা হল, সেও এক মেলা। কুপী জ্বালিয়ে বসে গেছে, পান-সিগারেট, চানা-মটর, বাদামভাজা। গান হল অনেক রাত অবধি। গান শেষ করে আর্টিস্টরা সেই রাত্তিরেই ছুটলেন গাড়ি নিয়ে। রাত কাটাবার উপায় নেই। শান্তিপুরে বায়না নেওয়া আছে।

আমার অবশ্য বায়না নেওয়া ছিল না। তা হলেও বলে-কয়ে সাত-সকালেই রায়গঞ্জের বাসে রওনা হলাম। শিলিগুড়ি হয়ে বাসে বাসেই যাব জলপাইগুড়ি। বালুরঘাট থেকে জলপাইগুড়ি বাস রাস্তায় পাকা দু-শো মাইল।

তেত্রিশ মাইল পেরিয়ে এসে আবার সেই বুনিয়াদপুর। নেমে একটু হাত-পা টান করে গরম গরম চা খেয়ে নেওয়া গেল।

বাস এবার ডানদিকে মোড় ঘুরে ন্যাশনাল হাইওয়ে বরাবর ছুটল। খানিকটা যেতেই ট্রাক-লরীর একটা লম্বা কনভয়। মানিকচকে গঙ্গা পার হবে। ত্রিপলে ঢাকা থাকায় কী জিনিস বোঝা গেল না। শব্দ শুনে মনে হল চায়ের পেটি। আসাম থেকে আসছে। অমনি একটা কনভয়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ার আমার অনেক দিনের শখ। সুযোগ পেলেই একবার ভিড়ে পড়তে হবে।

বাস চলেছে। কালিকামোড়া, বুড়ি-পুকুর, লক্ষ্মীপুর হয়ে কুশমুণ্ডি। ছোট বন্দর মত জায়গা। তারপর আবার দু-পাশে একটানা ধান জমি সর্ষে ক্ষেতে বাসন্তী রঙের ফুল। কোনো কোনো মাঠে এখনও খড় সব কাটা হয় নি। রোদ পড়ে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। কোথাও আছে রবিবারের হাট। গোরুর গাড়িতে করে সওদা চলেছে।

হরিহরপুর, কালিয়াগঞ্জ, চিরাইল, কেহতান, মহিপুর, দুধণ্ডা চলে গেল একের পর এক। রায়গঞ্জ আর বারো মাইল। তারপর কাকড়াসিং, কাশিমপুর। পরের নামগুলো ভাল পড়া গেল না। চলন্ত বাসে জায়গার নাম জানার এই এক মুস্কিল। কোথাও কোথাও ডান-দিকে, বাঁ-দিকে, সামনে, পেছনে, জায়গার নাম লেখা থাকে না। কিংবা বাস এমন হুশ করে চলে গেল যে, ভাল করে নজরেই এল না। সেক্ষেত্রে খুবই মুস্কিল হয়। যাত্রীদের জিজ্ঞেস করেও সবসময় জানা যায় না। তবু তো ভাল আজকাল এইসব নাম লেখার ব্যবস্থা হয়েছে। আগেকার দিনে কোথাও কোনো দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা থাকলে তবেই জানা যেত।

দুধণ্ডার পর ব্যারাকবাড়ি? তারপর সোনাবাড়ি? তারপর? রাস্তার ধারে একটা বাচ্চা গ্রামের মেয়ে। পরণে তার পুজোয় কেনা নাইলনের ফ্রক।

তারপর কোগ্রাম পেরিয়ে রায়গঞ্জ। রেল লাইন পেরিয়ে শহরের এক প্রান্তে বাসের স্টেশন। বাস খালি করে নেমে যেতে হল। এখানে বাসের অবস্থাগতিক বুঝে নিয়ে তারপর ছাড়া হবে।

চেয়ে দেখলাম মস্ত ঘাঁটি। হবেক জায়গার বাস এসে দাঁড়িয়েছে। পরীক্ষা শেষ হলে তবে যাবে। বাস স্টেশনে ভাত খাওয়ার হোটেল। দূরের যাত্রীরা সবাই দুপুরে এখানেই খায়।

খাওয়া-দাওয়া সেরে রওনা হতে লাগল এক ঘণ্টারও ওপর।

বারদুয়ারি হাট পেরিয়ে দূরে বনরেখা। রাস্তার দু-ধারে আদিগন্ত ক্ষেত। রাস্তার পাশে নয়ানজুলির জল ছেঁকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মাছ ধরছে। পোস্টের মাথায় ছবি আঁকা চিহ্ন দেখে বোঝা গেল ধারে-কাছে কোথাও ইস্কুল আছে। তাতে বাসের স্পীড কিছু কমল বলে মনে হল না।

থেকে থেকে সবুজের অভাব। পোড়া রুক্ষ প্রান্তর। মাঠের পর মাঠ শুধু শুকনো খড়। তারপরই কোথাও বাসন্তী রঙের সর্ষে ক্ষেত। আম, তাল, কলা, বাঁশ, অশথের গাছ। রোগা হার-জিরজিরে গোরু। কোথাও লাল, কোথাও খয়েরি রং জাগিয়ে রয়েছে মেস্তা পাট। দেখে মনে হল এদিককার লোক এবার ধান কেটেছে দেরিতে।

গান্ধার নদীর সাঁকো। তার গায়ে বসেছে হাট। নাগর নদীর সাঁকোর পর হাটতলা। আলতাপুর, বিহীনগর, জুঝারপুর, সাধনপুরের পর টুনি-ভিটা। ক্ষেত্রবাড়ি, ধলপাড়া, মহেশ-বাথনা ছাড়িয়ে রোদ ক্রমে পড়তে শুরু করেছে। কর্ণদীঘি, মোনেপুর, পিছলা পেরিয়ে গায়ে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে। রাস্তা জায়গায় জায়গায় বেশ খারাপ। কোথাও কোথাও খোয়া ফেলে রাস্তা ঠিক করছে। ঘরের চালে কিংবা মাচায় শুকোচ্ছে পাট। চৌনগরায় মাদ্রাসা।

রাস্তার ধারে ঘরবাড়ির চেহারা-গুলো যেন কেমন কেমন। ধাঁচটা ঠিক বাংলার নয়। রাণীগঞ্জের কাছে দেখলাম প্রকাণ্ড একটা গাছ কাত হয়ে গোরুর গাড়িতে করে চলেছে। আলিপুর, হরিপুর, মহম্মদ-পুর, মালিকপুর পেরিয়ে ডালখোলা বন্দরে দেখি রাস্তায় বেশ লোকের ভিড়। নেমে চা খেয়ে নিলাম। ঝলমলে সাজানো দোকানপাট। বিড়ির দোকানে রেডিও।

সূর্যকমলের আগে পরে সারানো হচ্ছে রাস্তা। পাহাড়ী কুলীকামিনদের ভিড়। দেওগাঁর পর কানকি বড়সড় গ্রাম। হাটোয়ার পেরিয়ে কিষণগঞ্জ। সবকিছুতেই বিহারী ছাপ। বিহার যে কোথায় কখন ছাড়িয়ে আবার বাংলা-দেশে পা দিলাম, ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না।

কিষণগঞ্জ থেকেই রেললাইন গেছে বাস রাস্তার পাশ বরাবর। হাসমুণ্ড-নলা আর ইকরছানা পেরিয়ে মনে হল প্রকৃতির চেহারা বদলে গেছে। চার-দিকে অফুরন্ত গাছ। বাঁশঝাড়ের পর বাঁশঝাড়। আমবাগান। শালবন। আদি-গন্ত চাষের মাঠ। কয়েক মাইল যাবার

...ন মাঠ শেষ হয়ে ঘন জঙ্গল। উঁচু উঁচু শাল, সেগুন।

ইসলামপুর পেরিয়ে বাস সুদ্ধু লোক জানলার কাছে ভেঙে পড়ল। ট্রাকে করে কলকাতায় চলেছে দু-দুটো হাতির বাচ্চা। একজন ঠাট্টা করে বলল, ওদের কপালে সমুদ্রযাত্রা ছিল।

আগরা গ্রামে কিসের যেন মেলা বসেছে। রংচঙে মিঠাই। তালপাতার ভেঁপু। গরম গরম পাঁপড় ভাজার গন্ধ। তারপর কোথায় যেন রেললাইন, ফারলংপোস্ট সব হারিয়ে গেল। এখানে সেখানে আদিবাসীদের বসতি। চোপরা পেরিয়ে নদী। নদী পেরিয়ে কাঠগোলা। কালগঞ্জের পর উঁচু আলবাঁধা ঢেউ-খেলা জমি। পাহাড়ী-নদীতে নতুন ব্রিজের ওপর দিয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন রাস্তা। বাসকে তাই ঘুরে নেমে যেতে হল। খানিকদূরে গিয়ে আবার ফারলঙের ফলক।

খড়ের গায়ে পড়ন্ত রোদে জ্বল জ্বল করছে আশ্চর্য সুন্দর সোনারঙের মাঠ। বাঁশবনের মাথা থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে মধুর রুণুঝুনু শব্দ। নলবাড়ির পর মহানন্দার ব্রিজ। মহানন্দাই মহানন্দা। শুরু হল চা-বাগান।

উত্তর-পুবে দিগন্তে বনরেখার মত পর্বতমালা।

বাগডোগরার পর গোঁসাইপুর। তার মানে, শিলিগুড়ি এসে গেল।

শিলিগুড়ি এলে জলপাইগুড়ি আসতে আর কতক্ষণ?

আসতে আসতেই নজরে পড়ল শিলিগুড়ি এ ক'বছরে বেশ বদ্‌লে গেছে। আগে যেখানে ছিল ফাঁকা মাঠ এখন সেখানে হালফ্যাশানের বাড়ি। দোকানপাট হোটেল চা-খানায় শিলিগুড়ি আগের চেয়েও জমজমাট।

বাস থেকে নামতে গিয়ে দেখি হাতে পায়ে খিল ধরে গেছে।

আসবার কথা কাউকে কিছু জানাই নি। নামবার সময় খেয়াল হল কারো ঠিকানাই সঙ্গে ক'রে আনি নি।

ঠিকানার অভাবে কাউকে খুঁজে না পাওয়া এ আমার একবারই ঘটেছে। খুব হালে বোম্বাই শহরে।

কলকাতায় আমাদের এক বন্ধু ছিল। তার নাম গৌর। বোম্বাইতে গিয়ে মনে পড়ল গৌর আজ বছর আট-দশ বোম্বাইতে আছে। গৌর মানুষটা এমন, যেখানে পুঁতবেন গাছ হবে; আড্ডা জমাতে ওস্তাদ; ভাল জহুরী, অর্থাৎ স্টোন-সেটর; এবং বাঙালী। সুতরাং ঠিকানা না জানলেও খুঁজে বার করাটা সহজসাধ্য হওয়াই উচিত।

দুর্গাপুজোর চাঁদা দেবার লিস্টে গৌরের নাম পাব না, এ আমি আগে থেকেই ধরে রেখেছিলাম। বাংলা বইয়ের নিয়মিত ক্রেতাদের মধ্যে গৌরের নাম না পেয়েও অবাক হলাম না। কেন না গৌর বরাবরই ইংরেজী বইয়ের পোকা। সুতরাং টেলিফোন ডাইরেক্টরি খুঁজে পায়ধুনি এলাকায় বাঙালী সমিতির ঠিকানাটা বার করলাম।

আমি কলকাতার ছেলে। কে আমাকে কি বোম্বাই চেনাবে? সুতরাং কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করার ধার দিয়েও গেলাম না।

বোম্বাইয়ের দোষ এই যে শহরটা বেজায় ঘোরালো। যে অঞ্চলটা যেখানে থাকা উচিত সেখানে নয়। ফলে, আমাকে অনর্থক ঘুরতে হল। দুপুর থেকে ঘুরে ঘুরে শেষকালে সন্ধ্যে নাগাদ হায়রান হয়ে যখন একটা বাসে উঠে পড়েছি, তখন অঞ্চলটা চোখে পড়ল।

কাজেই পরদিন প্রায় চোখ বুজে পায়ধুনিতে চলে গেলাম। সোনাপট্টিতে ঢুকে তো রীতিমত ভয় ঢুকে গেল। গলিটা লোকে লোকারণ্য। হাতের মুঠোয় তাড়া তাড়া সব একশো টাকার নোট। ঠেলেঠুলে যেতে গিয়ে কেবলই ভয় হচ্ছে আমাকে না পকেটমার ঠাউরে বসে।

সমিতির ঠিকানা তো কোনরকমে বার করলাম। একেবারে উপরোনো বড়বাজারের গদি। অন্ধকার সরু সরু আখাম্বা সিঁড়ি। ওপরে উঠে দেখি পাশাপাশি সব ঘরে কুপি জ্বালিয়ে চোখে ঠুলি প'রে কাজ হচ্ছে। এই রকমেরই একটা বড় কারখানার এক-পাশে দেখলাম বাংলা ইস্কুল হচ্ছে। মাস্টারমশাই এগিয়ে আসতে যা জিজ্ঞাসাবাদ করবার আমি করলাম।

তাঁর কথা শুনে বুঝলাম সমিতির খবর তিনি বড় একটা রাখেন না। বললেন—মাত্র মাস কয়েক হল তিনি এখানে এসেছেন চাকরির খোঁজে। চাকরিটা না পাওয়া পর্যন্ত আর ব'সে থাকেন কেন, তাই ইস্কুলে পড়াচ্ছেন। আশেপাশে আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা বললেন, কই, অমন নাম কেউ শুনেছেন ব'লে তো বোধ হচ্ছে না।

মাস্টারমশাই বললেন, চলুন, বরং আপনাকে অমুকবাবুর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

গেলাম। ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে ব'সে থাকলেও গদির চেহারা দেখে ভাবিই নি ঘণ্টাখানেক পরে নির্ভুল বাংলা বুলি তাঁরই মুখ থেকে বার হবে। ঘণ্টা-খানেক লাগল এইজন্যে যে, তার আগে ভদ্রলোক আমার দিকে চোখ তুলে তাকাবার ফুরসৎই পান নি। কচ্ছী, সিন্ধী, গুজরাটী, বড় বড় মক্কেল ব'সে। লাখ-বেলাখের কাজ-কারবার হচ্ছে।

আমার সমস্যাটা শুনে উনি বললেন, আপনার ঠিকানাটা আগে— তাহলেই খুঁজে বার করে দেব। আচ্ছা বলে উঠে চলে এলাম। তখনও হাল ছাড়ি নি। ঘণ্টা তিনেক সেকরাপাড়ায় ঘুরে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও গৌরকে যখন পেলাম না—তখন বাধ্য হয়ে আমাকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হল যে, হয় গৌরের বোম্বাইতে আসার খবরটাই ভুল, নয় গৌর আর এখন সে গৌর নেই।

কিন্তু শহর তো জলপাইগুড়ি। রিক্সায় যেতে যেতে চেনা লোক রাস্তাতেই পেয়ে গেলাম। কাজেই প্রায় চোখ বুজে শিশুদের বাড়ি খুঁজে বার করলাম। মাসিমা আর শিশুর বৌ অর্চনা দুজনেই তখন থাকায় জামাই আদরের অভাব হল না।

জলপাইগুড়িতে দু' রাত্তির বরাদ্দ করা ছিল। তারই মধ্যে দিনে দিনে কাছাকাছি চা বাগানটা দেখে নেওয়া গেল।

সন্ধ্যেবেলা বাচ্চু আর দেবেশকে এ প্রস্তাবে সহজেই রাজী করানো গেল যে, পরদিন সকালেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু কোথায় যে ঠিক যাব এটা ঠিক করা গেল না। শুধু ঠিক হয়ে থাকল যেদিকে দুচোখ যায়।

মাঝখানে একটু দম নিয়ে নেওয়া হল শিলিগুড়ির কাছেই এক চা-বাগানে। খাওয়াদাওয়া হল বেদম। সেই বাসাতেই দেখলাম কাঠের গুঁড়োয় রান্না করবার এক ধরনের উনুন। রাঁচীর ওদিকে আদিবাসীদের মধ্যে এর চলন। আঁচ কমানো বাড়ানো নেভানো জ্বালানোর চমৎকার ব্যবস্থা।

সকালে উঠে বাসের ঘাঁটিতে পৌঁছুবার আগেই দেখা গেল আমাদের প্রত্যেকেরই দুচোখ একই দিকে যাচ্ছে। যেদিকে আছে দেবেশের দাদা দিনেশ। যেদিকে ধবলাঝোড়া।

রাস্তার অনেকটাই আমার বিলক্ষণ জানা। একবার জেনেছি বক্সায় যেতে, আরেকবার মালে যেতে।

রাত্তিরটুকু দল ছুট হয়ে আমাকে থাকতে হল শিলিগুড়িতে। যার বাড়িতে থাকলাম তাকে, আমি ছোট্ট থেকে চিনি। জেল গুলী লাঠি—কোনোদিন কিছুর পরোয়া করে নি। ভাল চাকরি, মনের মত বউ মেয়ে, সব থেকেও আজ মনের মধ্যে খচ খচ করে। সারাদিন একটানা কাজ করবার পরও তার মনে হয় আসল কাজ কিছু করা হল না।

তার চেয়েও মুস্কিলে পড়েছে তার বউ। কম বয়স থেকে বরাবর সে আপিসে চাকরি করেছে। স্বামী বদলী হয়ে আসায় স্ত্রীকে বাধ্য হয়ে চাকরি

ছাড়তে হয়েছে। এখন সে সময় নিয়ে কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। মেয়ে ছোট থাকলেও কথা ছিল। সারাক্ষণ সংসার নিয়ে থাকবে, আঁচলে চাবি ফেলে এ-ঘর ও-ঘর করবে, দুপুরে ঘুমুবে কিংবা পাড়া বেড়িয়ে শাড়ি-গয়নার গল্প করবে —সেভাবে তো নিজেকে তৈরিই করে নি।

বাড়িটা সুন্দর। পরিষ্কার ছিমছাম রাস্তা। ক' বছর আগে এসব জায়গায় ফাঁকা মাঠ দেখে গিয়েছি।

বড় রাস্তায় এমন সাজানো দোকানপাট, এমন ঝকঝকে চশমের দোকান আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

সকালে থাকলে আরও একজনের সঙ্গে দেখা করতম। ছোটবেলায় আমরা একই শহরে থাকতাম। আমার চেয়ে বয়সে বড়।

বছর কয়েক আগে শিলিগুড়িতে এক বইয়ের দোকানে হঠাৎ দেখা। দার্জিলিং দেখি নি শুনে নিজেই টিকিট কেটে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ভাগ্যিস্! তা নইলে আজও দার্জিলিং অদেখা থেকে যেত। মোট দু' ঘন্টার জন্যে হলেও শেষ অবধি দার্জিলিং দেখা তো হল।

আরও একবার দেখা হতে পারত। হতে হতে হয় নি। বড় হয়ে গিয়েছি সেই ছেলেবেলার পুরনো শহরে এক সভায়। ডাকবাংলোয় চিঠি এল সকলে চায়ের নেমন্তন্ন। আনুষ্ঠানিক চিঠি। সভাপতি আর প্রধান অতিথিকে। চিঠিতে নাম দেখেই চিনলাম। শহরের কর্তাব্যক্তি। লড়াইতে লাল। বাস, লরী, ব্যাঙ্ক নিয়ে ফুলাও কারবার। বাস্তবে ফিরে দেখি চায়ের নেমন্তন্ন। আমার ডাকনামটা কেউ বোধহয় তাঁর কানে তুলেছিল।

তার কারণ আছে।

বাবা ছিলেন সংসারত্যাগী সাধু। বহু বছর পর শহরের এক আশ্রমে দিন কয়েকের জন্যে এসে যখন দর্শন দিয়েছিলেন, ছেলেবেলায় আমরা দল বেঁধে দেখতে গিয়েছিলাম। বউ ছেলেমেয়েদের দিকে এমন উদাসীনভাবে তাকিয়েছিলেন যে, দেখে আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছিল।

সেই ছেলে হল শহরের ডানপিটেদের পাণ্ডা। চুরি করা পাঁঠায় ভোজই শুধু নয়, মড়া পোড়ানো, রুগীর শিয়রে বসে রাত জাগা। তারপর পিকেটিং। তারপর লুকিয়ে পিস্তল ছোড়া।

কাগজে ছবি বার হল পাইলট হয়ে। বাঙালী পাইলট তখন আঙুলে গোণা যায়। কিন্তু পুলিশ রিপোর্টে শেষ পর্যন্ত সে গুড়ে বালি।

ছেলেবেলায় আমি তাঁকে শেষ দেখেছি হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজতে। লড়াই এসে তাঁকে ঠেলে তুলে দিল।

খালি হাতে কেঁচে গণ্ডুষ করেই আবার তাঁর ধুলোমুঠো সোনামুঠো হয়েছে। কিন্তু এবার অনেকটা শান্ত, প্রকৃতিস্থ। কেন না ঐশ্বর্যের পরিণামও তাঁর দেখা।

সেবক ব্রিজের দিকে যেতে যেতে দেখলম ডাইনে বাঁয় শহর ক্রমশ এগোচ্ছে। কত নতুন নতুন বাড়ি। কত নতুন নতুন লোকালয়। আর রাস্তা দিয়ে অবিরাম বেসামরিক আর জঙ্গী লরীর চলাচল।

সেবক ব্রিজের কাছে সরু রাস্তায় দুটো গাড়ি পাশাপাশি যেতে আসতে দেখলে অতি বড় সাহসীরও ভয় হবে। সামান্য একটু এদিক ওদিক হলে আর দেখতে হবে না। নীচে হাঁ করে আছে প্রকাণ্ড গহ্বর। কী ভয়ঙ্কর কিন্তু কী সুন্দর সেই দৃশ্য। খাড়া গা বেয়ে বেয়ে ঘন সবুজ গাছ। বড় বড় পাথর মুখে করে নিয়ে চলেছে সগর্জন জলধারা।

ব্রিজ পেরিয়ে নেমে চলল বাস। সমতল নয়, পাহাড়তলীর রাস্তা। বাঘবাকোট কয়লাখনি পেরিয়ে ওয়াশাবাড়ি। ওছলাবাড়ি ছাড়িয়ে চেল নদীর সাঁকো। বাঁদিকে চলে গেল ডামডিম। একটার পর একটা চা-বাগান।

তিনজনে সমানে গল্প করতে করতে চলেছি। আমি আর দেবেশ বাচ্চুর পেছনে লাগছি। পাজামা পরা ও দুচক্ষে পছন্দ করে না। সাবা রাস্তা তাই নিয়ে চলল তর্ক। মাঝে মাঝে বাস থামলে আমরা নেমে নেমে চা খেয়ে আসছি।

বাস মালবাজারে এসে গেল। এখানে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে খাওয়া-দাওয়ার ছুটি। মালবাজারে এই আমি প্রথম আসছি না।

শিলিগুড়ি থেকে মালবাজার মাইল চৌত্রিশ। বেলের স্টেশন আছে। চারদিকের চা-বাগানের একটা বড় কেন্দ্র।

মালবাজারের বরাবরই নামডাক। কিন্তু আটচল্লিশ সালের শেষাশেষি অবধি এত গমগমে ছিল না। এখানে তখন স্টেশন ছাড়া ছিল একটামাত্র রেস্টুরেন্ট। ডুয়ার্স ব্যাঙ্কের ওষুধপত্র, লোহালক্কড়, চুনগুদাম, মেশিনপার্টস, ইউরোপীয়ান ক্লাব, বার, নাচঘর —শুধু এই।

মালবাজার বদলাতে লাগল উনপঞ্চাশ থেকে। দলে দলে রিফিউজিরা এসে পড়ে ত্রিপল টাঙিয়ে খুলতে লাগল মুদিখানা, কাপড়ের দোকান, মনোহারি দোকান আরও কত কী। স্টেশনের পাশে জমি পড়ে ছিল। সেখানে বসে গেল রিফিউজি কলোনি। চা-বাগানের অনেক বাবুও সেই সুযোগে কলোনিতে বাড়ি তুলে মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই করে নিলেন।

আটচল্লিশের আগে রেলস্টাফ আদিবাসী ইত্যাদি নিয়ে মালবাজারে লোক ছিল শ' দুই আড়াই। জ্বর-জ্বারিও ছিল খুব। ম্যালেরিয়া, পিলে লিভারের রোগ—এ তো ছিলই। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক ছিল কালাজ্বরের দাপট। প্রকাণ্ড একটা গাছ ছিল— লোকে তার ছাল জ্বাল দিয়ে নিজেরাই রস বানিয়ে খেত। কালাজ্বরের সেই ছিল একমাত্র ওষুধ। ডাক্তারখানা বলে কিছু ছিল না। জেলা বোর্ডের ছিল একটা দাতব্য চিকিৎসালয়। বাকি যা তা সবই চা-বাগান আর সাহেবসুবোদের জন্যে।

রিফিউজিরা এসে বছর পনেরোর মধ্যে মালবাজারের চেহারা দিল পাল্টে। দু' দুটো ডাক্তারখানা হল। পাঁচ পাঁচজন ডাক্তার। তার ওপর হোমিও-প্যাথ, কবিরাজ। লোকে এখানে সেই প্রথম দেখল চুলকাটার সেলুন। এখন তো স্টেশন রোডেই কমপক্ষে সাতটা সেলুন। বই বিক্রির কয়েকটা স্টল হয়েছে। তাছাড়া হাটেও এখন বই পাওয়া যায়।

আটচল্লিশের আগে ছিল মাত্র একটি রেডিমেড কাপড়ের দোকান। আর সেই সঙ্গে কিছু সেকেন্ডহ্যান্ড জামা-কাপড়ের ব্যাপারী। পনেরো বছরের মধ্যে কাপড়ের দোকান দাঁড়িয়ে গেল কমপক্ষে তিরিশটি। তার তিন ভগ্নের এক ভাগই বড় দোকান।

বাজারের এক কাপড়ের দোকানে বসে যাঁর মুখ থেকে এই সব গল্প শুনেছিলাম, তাঁর বাড়ি ছিল মাণিকগঞ্জে। শখ ছিল গানবাজনার। লক্ষ্ণৌয়ের মিউজিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে না পেরে ডুয়ার্সের চা-বাগানে এসে চাকরি নিলেন। চাকরি বলতে বালাবাড়ি বাগানে পড়ানোর কাজ। মাস্টারের মাইনে বাগানের সাহেবরা দিত না, দিত বাগানের বাবুরা— নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে। মালবাজারে যখন রিফিউজিরা এসে ভিড় করল তখন পড়ানোর কাজ ছেড়ে দিয়ে দাদার সঙ্গে মালজংশনে দুই ভাইতে ব্যবসা শুরু করে দিলেন। প্রথমে রেস্টুরেন্ট, পরে হোটেল। তার রোজগারের টাকায় সাত আট বছর পরে খুলে বসেছেন এই কাপড়ের দোকান।

তিনিই আমাকে বাজারের রাস্তায় দূর থেকে এক ছোকরাকে দেখতে

(শেষাংশ ১৭৩ পৃষ্ঠায়)

লোকশিল্পী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

লিখতে বসেছিলাম।

গোপন করব না—তাগিদে পড়ে লেখা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি গল্প লিখে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাগজের সম্পাদককে পৌঁছে দিতে হবে। অবশ্য লিখে লিখে এক ধরণের অভ্যস্ততা আসে। কিন্তু সেই অভ্যাসের ওপর সব সময় নির্ভর করা যায় না। অভ্যাস মাঝে মাঝে দারুণ বিদ্রোহ করে। কলম ধরে বসে মনে হয় কখনো কোনকালে কলম ধরি নি। তাছাড়া পাঠকরা লেখকের অভ্যস্ত লেখা পড়তে চান না। লেখকেরও ইচ্ছা থাকে নতুন পথে বিচরণের। কিন্তু তাগিদ তাঁকে সব সময় বাঁধা পথে ঠেলে দেয়। সমান্তরালভাবে কত পথ চলে গেছে, কত পথ এখনো অনাবিষ্কৃত কিন্তু একজন নির্দিষ্ট লেখকের জন্য দুটি-একটির বেশি নির্দিষ্ট পথ নেই।

লিখছিলাম না। কলম বন্ধ করে এই লেখার কথাই ভাবছিলাম।

হঠাৎ দরজার কড়া নড়ে উঠল।

কাছাকাছি কেউ ছিল না। আমি নিজেই কলম হাতে দোরের কাছে গেলাম। শক্তহাতে আমি তখন কলম ধরেছি, কলম তখন আমার কাছে হাতিয়ার।

গিয়ে দেখি দরজার খানিকটা খোলাই আছে।

আমি ভ্রু কুঁচকে ঈষৎ রুঢ়কণ্ঠে বললাম, 'দোর তো খোলাই রয়েছে।'

ন যযৌ ন তস্থৌ আগন্তুকের এক পা সিঁড়িতে, এক পা মাটিতে। চোখে-মুখে অপ্রতিভতা।

তিনি সবিনয়ে একটু হাসলেন, 'আজ্ঞে, শোলা ছিল তা দেখেছি। তবু বিনা অনুমতিতে তো ঢুকতে পারি নে।'

আগন্তুকের পরণে আধ-ময়লা পাঞ্জাবি, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, মাঝখান দিয়ে সিঁথি। দেখলে প্রাকৃতজন বলে সহজেই চেনা যায়।

আমি বিরক্তি গোপন না করে বললাম, 'আসুন, আমি এখন খুব ব্যস্ত।'

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'আজ্ঞে, আজ আমার সকালে আসবার কথা ছিল। আমি ফোন করেছিলাম—'

নিশ্চয়ই ইনিও কোন কাগজের পক্ষ থেকে এসেছেন। মনে করতে চেষ্টা করলাম কাকে কথা দিয়েছিলাম।

মুখে অমায়িক হাসি এনে বললাম, 'আপনি কোন্ কাগজ থেকে যেন এসেছেন—'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'আমি কোন কাগজের পক্ষ থেকে আসি নি। নিজের দরকারেই এসেছি। আপনার বন্ধু অতুলবাবু একটা চিঠিও দিয়েছেন। আমার নাম গৌরগোপাল চক্রবর্তী।'

ও। এবার আমার মনে পড়ল। আমি তাঁর হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে তাতে তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে গেলাম। গৌরগোপাল লোকসংগীতের গায়ক। কীর্তন জানেন, ভাটিয়ালী জানেন, প্রাচীন বাংলা সংগীতেরও চর্চা করেছেন। এখন কোথাও কোন সুবিধা করতে পারছেন না। এই দুর্মূল্যের বাজারে ভদ্রলোক ভারি বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। আমার তো অনেক জানাশোনা, আমি যদি কারো সঙ্গে ওঁর আলাপ-পরিচয় করে দিই, কোন যোগাযোগ ঘটিয়ে দিই—

আমি চুপ করে রইলাম। আমার পরিচয়ের গণ্ডী কত সীমাবদ্ধ তা তো আমার সহকর্মী বন্ধু জানেন না। কি জানলেও বিশ্বাস করেন না, শুনতে চান না। আমার আলাপ শুধু গুটিকতক প্রকাশক আর কাগজের সম্পাদক-সম্পাদিকার সঙ্গে। তাঁদের আমি গল্প দেব বলে কথা দিই, কখনো রাখতে পারি, কখনো পারি না। তাঁদের মধ্যবর্তিতায় আমি পাঠকদের গল্প শুনিয়ে মন যোগাব বলে কথা দিই, কখনো পারি, কখনো পারি না।

আমি গৌরগোপালকে তাঁদের কার কাছে পাঠাব?

যে চেয়ারে বসে আমি লিখি সেই চেয়ার ছেড়ে অতিথির সঙ্গে আমি একাসনে বসেছি। তবু গৌরবাবু আমার ঠিক পাশে বসেও যেন পাশে বসেন নি। কেমন যেন সংকুচিত হয়ে আছেন। ছোঁয়া বাঁচিয়ে সরে বসেছেন। তিনি সাগ্রহে আমার মুখের দিকে

তাকিয়ে ছিলেন। এবার আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

ভদ্রলোকের বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে। শামলা রং গায়ের। টানা টানা নাক চোখ। বেশ লম্বা চেহারা। বসবার ভঙ্গিতে একটু কুঁজো দেখাচ্ছে। হতেও পারে এটুকু শুধু বিনয়নম্রতা।

গৌরবাবু বললেন, 'পড়লেন সব?'

বললাম, 'পড়লাম।'

'এবার আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন। অনেক আশা নিয়ে এসেছি।'

আমি আস্তে আস্তে বললাম, 'দেখুন, ব্যবস্থা করবার ভার তো আমার হাতে নেই। তবে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।'

গৌরগোপাল বললেন, 'আপনি চেষ্টা করলেই হবে।'

আমার ওপর গৌরবাবুর যে অগাধ বিশ্বাসের কথা শুনলাম তার ছিটে-ফোঁটাও যদি আমার থাকত তাহলে আমার আর কথা ছিল না। চেষ্টা করলেই সব পারা যায় না। এতদিনের অভ্যস্ত কলমে একটি পাঠ্য গল্প লেখা কী দুরূহ হয়ে ওঠে তা আমি জানি। যেন ইচ্ছা করলেই আমরা চেষ্টা করতে পারি! যেন ইচ্ছা করলেই আমরা প্রবল-ভাবে ইচ্ছা করতে পারি! অনিচ্ছা, আলস্য, জড়তার সঙ্গে ক্ষীণ-দুর্বল ইচ্ছাশক্তির যে নিষ্ফল সংগ্রাম তা যেন প্রতি মুহূর্তে আমরা টের পাই না!

একটু হেসে বললাম, 'চেষ্টা করলেই কি সব সময় হয়? তাছাড়া জানেন তো, আমাদের চেষ্টা করবার সাধ্যও সীমা-বদ্ধ। তাছাড়া আপনার ফিল্ড আলাদা, আমার ফিল্ড আলাদা। আপনার সুর নিয়ে কারবার, আমি শুধু কথার ব্যাপারী।'

গৌরগোপাল আমার মুখের দিকে তাকালেন। মনে হল একটু যেন আহত হয়েছেন। আশাহত। একটু চুপ করে রইলেন। তারপর হেসে বললেন, 'এ কি কথা? আপনার কথার মধ্যে কি সুর নেই? যার গলা আছে তারই সুর আছে। কেউ গায়, কেউ গায় না। কেউ পারে, কেউ পারে না। চায় কিন্তু সবাই।'

তাঁর তত্ত্বকথায় আমি অসহিষ্ণু হয়ে পড়তে পারি এই আশংকায় তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফের তাঁর দরকারের কথাটা পাড়লেন, 'অতুলবাবু বলছিলেন আপনার তো অনেক ফিল্ম ডিরেক্টরের সঙ্গে জানাশোনা। তাঁদের কাউকে যদি চিঠি দিয়ে পাঠান। তাঁদের সব ছবিতে গান-বাজনাও থাকে। অনেক রকম লোক-জনের দরকার হয়।' গৌরবাবু এবার আমার চেষ্টার পথ বাৎলাতে শুরু করেছেন।

আমি ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললাম, 'দেখুন, চিঠি দিয়ে কি সবাইর কাছে সবাইকে পাঠানো যায়? যাঁরা হাজার হাজার লোককে এন্টারটেন করবার ভার নেন, অনেক সময় ব্যক্তি বিশেষের কথা ভাবলে তাঁদের চলে না। তাঁরা ভাবতে পারেন না।'

আমি যত সাধু আর সংস্কৃত শব্দই ব্যবহার করি না, গৌরগোপালবাবু

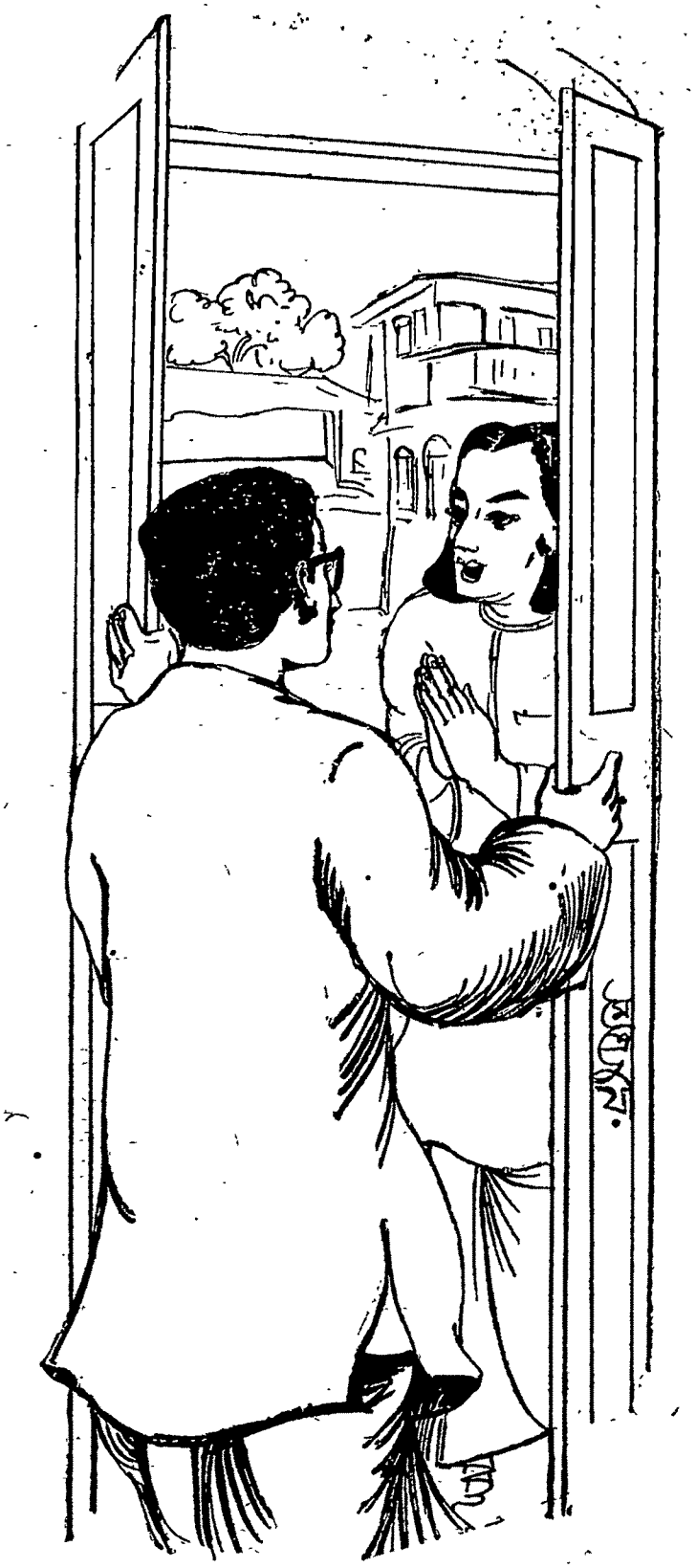

আসুন, আমি এখন খুব ব্যস্ত

আমার বক্তব্য ঠিকই বুঝতে পারলেন। তাঁর মুখখানা গম্ভীর দেখাল। ঈষৎ বসে যাওয়া গাল দুটি তামাটে। ঘরে পাখা চলছিল, এমন কিছু গরমও ছিল না। তবু তিনি কপালের ওপর দিয়ে একবার হাত বুলিয়ে নিলেন। মনে হল ঘাম মুছলেন। কল্পিত ঘামই অবশ্য।

গৌরবাবু এবার খানিকটা বল সঞ্চয় করে নিয়ে বললেন, 'আমাকে অবশ্য তাঁরা বাজিয়েই নেবেন। আমার গান-টান শুনে তবেই—। আমার কিছু সার্টিফিকেটও আছে। আজ আনি নি। যদি বলেন আরেকদিন নিয়ে আসব। আমি বিশ বছর ধরে আছি এ লাইনে। মানিকগঞ্জের অনেক বড় বড় আসরে গেয়েছি—।'

মনে মনে ভাবলাম এই বণিকগঞ্জ তার চেয়েও ঢের কঠিন জায়গা।

'তাঁদের আমি গান শোনাব। আর আমার বড় বাসনা আপনিও আমার দু-একখানা গান শোনেন!'

'এখন?' আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। ওঁর কীর্তন আরম্ভ হলে আমার কীর্তনের দফারফা।

ভদ্রলোক লজ্জিত হয়ে বললেন, 'না না, এখন না। এখন তো আপনি খুব ব্যস্ত। পরে আর এক সময়—'

প্রাণ আমার শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন আমি আমার গলা স্বচ্ছন্দে নাগরিক সৌজন্যে ভিজিয়ে নিলাম। হেসে বললাম, 'সে তো আমার সৌভাগ্য।'

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন। এক কাপ চা খাওয়ানো উচিত। আমার নিজের তৃষ্ণাও ছিল।

কিন্তু চায়ের জন্য হাঁকডাক করতে গিয়ে হঠাৎ আমি থেমে গেলাম। সকালে সেকেন্ড রাউন্ড চায়ের সময় স্ত্রী নোটিশ দিয়ে গেছেন চিনি বাড়ন্ত। আমি আর যাই চাই না কেন চা যেন চাই না।

অতিথিকে নিয়ে বাইরে বেরোলাম। রাস্তায় দু-একটি চায়ের দোকান আছে। তার একটিতে বসব। আজ লেখা যা হবার তা হয়ে গেছে।

কিন্তু আশ্চর্য যে চায়ের দোকানটির ভরসায় বেরিয়েছিলাম বেলা এগারটা না বাজতেই সেটি বন্ধ হয়ে গেছে। নাকি খোলেই নি কে জানে।

মোড়ে একটি মিষ্টির দোকান আছে। গৌরগোপালকে নিয়ে সেখানে ঢুকলাম। বললাম, 'একটু কিছু খান।'

গৌরবাবু লজ্জিতভাবে বললেন, 'এসব আবার কেন?'

তাঁর আপত্তি নেই বোঝা গেল।

দোকানের ছোকরা আমার ফরমায়েস মত এক প্লেট সিঙ্গাড়া, রসগোল্লা গৌরবাবুর সামনে রাখল। তিনি গ্লাসের জলে হাত ধুয়ে বসলেন, 'শুধু আমি একাই খাব?'

হেসে বললাম, 'খান না। তাতে কি? এক পক্ষ খায়, এক পাখি দেখে। এক পাখি গায়, এক পাখি লেখে।'

গৌরগোপাল এবার বেশ অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, 'কিন্তু আমি আর আপনি তো এক জাতের পাখি নয়। আমি চড়ুই, আপনি পক্ষীরাজ।'

বললাম, 'কিছু না কিছু না। আমরা সবাই শালিখ আর চড়ুই। আমাদের পাখাও ছোট, আকাশও ছোট। শুধু অহঙ্কারটা বড়। ক্বচিৎ কখনো আকাঙ্ক্ষাটা। যাক গে। কে কে আছে আপনার?'

এই ব্যক্তিগত প্রশ্নে ভদ্রলোক খুশি হলেন। যেন আত্মীয়তা বোধ করলেন এতক্ষণে। বললেন, 'আছে অনেক। সেই তো হয়েছে জ্বালা।'

বললাম, 'কেন!'

গৌরবাবু বললেন, 'রোজগার-পাতির অবস্থা তো এই। মাসের পর মাস যায় কোন বায়না আসে না। এদিকে পোষ্য—'

গৌরগোপাল খেতে খেতে এঁটো হাতের পাঁচটি আঙুল আমার দিকে তুলে ধরলেন।

বললাম, 'পাঁচজন?'

'হ্যাঁ। নিজেকে বাদ দিয়ে। কিন্তু নিজেকেও তো পুষতে হয়।'

বললাম, 'তা তো বটে।'

'গান গাই। গলার তোয়াজ না করলে চলে না। কিন্তু খালি পেটে তো গলার তোয়াজ হয় না।'

'তা তো বটেই। পাঁচজন কে কে? ছেলে-মেয়ে—'

গৌরগোপাল একটু হেসে বললেন, 'বিয়ে করি নি এখনো।'

একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, 'বাবা-মা—'

'তাঁরা আমার শিশু বয়সে চলে গেছেন। সেই ছেলেবেলা থেকে বড় মাসীমার কাছে মানুষ। মেসোমশাইর নিজের সন্তানাদি ছিল না। খুব আদর-যত্ন করতেন। তারপর মাসীমা মারা গেলেন। মেসোমশাই আর আমি এক-সঙ্গে থাকি। বহুকাল পরে প্রায় বুড়ো বয়সে তিনি ফের বিয়ে করলেন। আশ্চর্য, এবার ছেলেমেয়ে হতে লাগল। তারা তিনটি। মেসোমশাইর নাতি-নাতনীর বয়সী। হবেই তো। মেয়ের বয়সী স্ত্রী।'

খাওয়া শেষ করে জল খেলেন গৌর-গোপালবাবু। তারপর বাকিটুকু বলতে লাগলেন 'এখন মেসোমশাই খুব দুঃখ করেন। বলেন কী অপকর্মই করেছি!'

'তিনি কিছু করেন না?'

'কী আর করবেন? আশীর কাছা-কাছি বয়েস। দেহ জরাজীর্ণ। ওই একটু যজমানি-টজমানি করেন। তাতে কী আর হয় বলুন?'

'একসঙ্গেই আছেন?'

'উপায় কি? মায়ার বন্ধন কাটানো তো সোজা নয়। তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছেন। এখন ওঁর এই বুড়ো বয়সে যদি না দেখি—। ধর্মাধর্মও তো আছে।'

বললাম, 'তা তো বটেই।'

'তাছাড়া কি নতুন মাসীমা কি ছেলেমেয়েগুলি সবাই আমার খুব যত্ন করে। ওদের তো আমি পেটভরে খাওয়াতে পারি নে। কিন্তু ওরা আমাকে প্রাণভরে আদর করে।'

দোকানীর প্রাপ্য মিটিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। সামনেই বাস স্টপ। বেলা দুপুর। কিন্তু আকাশে রোদ নেই। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। গৌর-গোপাল তাঁর পুরোনো ছাতাটা মেলে আমার মাথায় ধরলেন। তারপর একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'আপনার কত-গুলি পয়সা গেল।'

বললাম, 'তাতে আর কী হয়েছে?'

'মিষ্টিগুলি করেছে কিন্তু বেশ।'

আকাশে মেঘ বেশ ঘন হয়ে জমেছে। বৃষ্টি বোধ হয় আরো চেপে আসবে। বাস কখন আসবে কে জানে?

হঠাৎ বললাম, 'পাঁচজনের কথা তো বললেন। আর কোন আপনজন নেই?'

'আর আবার কে থাকবে?'

'আর কেউ নেই জানাশোনা?'

গৌরগোপাল পরম লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন। তারপর বললেন, 'বুঝেছি। কিন্তু আপনি বয়সে বড় গুরুজন। বলতে সঙ্কোচ হয়।'

'সঙ্কোচ কিসের? বলুন।'

'আছে একজন।'

'কে?'

'আমার কাছেই গান শেখে। চেহারা তেমন কিছু নয়। গলাটি ভারি মিষ্টি। আপনাকে শোনাব একদিন। বায়না-টায়না পেলে সঙ্গে করে নিয়ে যাই। বাপ-মা ছাড়ে। আপত্তি করে না। তারাও গরীব। আমার সঙ্গে সঙ্গে গায়।'

হেসে বললাম, 'ড্রয়েট?'

গৌরগোপাল লজ্জিত হয়ে অন্য দিকে তাকালেন।

মেঘের ছায়ায় গাছপালার রঙ আরো সবুজ হয়ে উঠেছে।

ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশ লাগছে বৃষ্টিটা।

বললাম, 'বিয়ে করেন না কেন?'

গৌরবাবু আমার দিকে তাকালেন, 'খাওয়াব কী? রাখব কোথায়? ওই

(শেষাংশ ১৭২ পৃষ্ঠায়)

সাহিত্যিক বিবাদ

চিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

অখ্যাতনামা ব্যক্তিরা বিখ্যাত লেখকদের শিল্পকর্ম সম্বন্ধে প্রায়ই বিরূপ মন্তব্য করেন সমালোচকের দাবি নিয়ে। সে মন্তব্য অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তিসহ হয় না। কিন্তু বিশেষ অধিকারের সুযোগ পেয়ে সমালোচকরা কখনো কখনো মাত্রা লঙ্ঘন করেন। লেখকদের অভিযোগ, এটা তাঁদের ঈর্ষা, নিজেরা সৃষ্টিধর্মী রচনা লিখতে পারেন না বলে। ডিজরায়েলি তাই বলেছেন, যারা লেখক হবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় তাদেরই সমালোচক হিসাবে আবির্ভাব ঘটে।

সমালোচকদের অকারণ বিরূপ মন্তব্যে লেখকদের ক্ষুব্ধ হবার যথেষ্ট কারণ থাকতে পারে। কিন্তু এক লেখক যখন অন্য লেখকের বিরুদ্ধে অহেতুক মন্তব্য করেন তখন তো ব্যর্থতা-সঞ্জাত ঈর্ষার কৈফিয়ৎ দেওয়া চলে না! লেখকদের সমালোচনার কঠোরতা সমালোচকদেরও হার মানিয়ে দেয়। প্রত্যেক লেখকের মধ্যেই সমালোচক প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে বলে মনে হয়। তাই লেখক লেখকের বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে দ্বিধা বোধ করেন না।

এর প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় গ্রীক সাহিত্যে। অ্যারিস্টোফেনিসের কমেডি 'দি ফ্রগস্'-এ গ্রীক ট্র্যাজিক নাট্যকারদের — বিশেষ করে ইউরিপিডিসের — ক্যারিকেচার করা হয়েছে। ইউরিপিডিসের লেখার স্টাইল ও বিষয়বস্তুকে অ্যারিস্টোফেনিস ব্যঙ্গ করেছেন দীর্ঘকাল।

শেক্সপীয়রের ভাগ্যেও লেখকদের কাছ থেকে কম বিরূপ সমালোচনা জোটে নি। শেক্সপীয়রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে দুই বন্ধু এবং সহ-অভিনেতা — জন হেমিং ও হেনরি কণ্ডেল — তাঁর নাটকের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে রচনাসংগ্রহ প্রকাশের আয়োজন করেন। তাঁরা শেক্সপীয়রের পাণ্ডুলিপি দেখে বিস্মিত হন। লেখা পরিচ্ছন্ন, কোথাও কাটাকুটি নেই। মনে হয়, একবার যা কলমের মুখে এসেছে তা-ই শেষ কথা। পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করেন নি।

হেমিং ও কণ্ডেল শেক্সপীয়রের রচনার এই বৈশিষ্ট্য সমকালীন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বেন জনসনের নিকট উল্লেখ করেন। জনসন শুনে বললেন, কাটাকুটি নেই? হাজার হাজার কাটাকুটি থাকলে আমি সুখী হতাম!

অর্থাৎ, জনসনের মতে শেক্সপীয়রের রচনার অনেক অংশই তৃতীয় শ্রেণীর এবং তা অনায়াসেই কেটে বাদ দেওয়া যায়।

আর একজন এলিজাবেথান নাট্যকার রবার্ট গ্রীন শেক্সপীয়র সম্বন্ধে বলেছেন, ও তো ভুঁইফোড় কাক, আমাদের কাছ থেকে পালক ধার করে নিজে সেজেছে।

জন ড্রাইডেন

শেক্সপীয়র অন্যের কাহিনীর কাঠামোটি নিয়ে নাটক রচনা করতেন। গ্রীনের একটি নাটকের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে 'উইণ্টার্স টেল' রচিত। কাহিনীর মৌলিকত্ব না থাকা সত্ত্বেও শেক্সপীয়র এত খ্যাতিলাভ করায় গ্রীন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

ভলতেয়ারের বিচারে 'হ্যামলেট' অমার্জিত ও বর্বরোচিত নাটক। সুতরাং ফ্রান্স ও ইতালীর মতো সভ্য দেশের মার্জিতরুচি পাঠকদের নিকট এ নাটক গ্রহণযোগ্য নয়। নাটকটি যে এরকম হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? কারণ ভলতেয়ারের মতে শেক্সপীয়র নিজে ছিলেন মাতাল ও বর্বর। এর চেয়ে ভালো নাটক তাঁর কাছ থেকে আশা করব কি করে?

ড্রাইডেন ছিলেন শেক্সপীয়রের কঠোর সমালোচক। শেক্সপীয়রের ভাষার ত্রুটি এবং কাহিনীর দুর্বলতা ছিল তাঁর কাছে পীড়াদায়ক। বেন জনসনের মতো ড্রাইডেনের বিশ্বাস ছিল শেক্সপীয়রের রচনার এক বৃহৎ অংশ বাতিল করে দেওয়া যেতে পারে। হয়ত ড্রাইডেন অ্যাণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার কাহিনী নিয়ে নাটক লিখেছিলেন শেক্সপীয়রের চেয়ে ভালো লেখার দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যই। কিন্তু তুলনায় শেক্সপীয়রের খ্যাতি বরং উজ্জ্বল হয়েছে।

স্কটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম শেক্সপীয়রের নাটকে প্রকৃত শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচয় পান নি। কারণ স্পষ্ট। নাট্যকারের নিজের উপযুক্ত শিক্ষার অভাব ছিল। সামুয়েল পেপিস 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট'কে নিকৃষ্ট নাটক বলে মন্তব্য করেছেন। তলস্তয়ও এই নাটকটি এবং 'কিং লীয়র'কে উচ্চ শ্রেণীর রচনা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে পারেন নি। প্রথম জীবনে এলিয়ট বলেছিলেন, 'হ্যামলেট' শিল্পকর্ম হিসাবে ব্যর্থ। পরে তাঁর মতের কিছু পরিবর্তন হয়েছিল।

মানবকল্যাণের আদর্শ নিয়ে যে গ্রন্থ রচিত নয় তলস্তয়ের বিচারে তা ব্যর্থ। তাই হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি'র মধ্যে তিনি ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতার রূপায়ণ ছাড়া কিছু দেখতে পান নি। সপ্তদশ শতকের ফরাসী নাট্যকার রাসিনের রচনা তলস্তয়ের নিকট মূল্যহীন, কেন না, অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্য লিখতেন তিনি।

সপ্তদশ শতকের ইংরেজ কবি এডমাণ্ড ওয়ালার মিলটনের 'প্যারা

ডাইজ লস্ট' সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে, একমাত্র দৈর্ঘ্য ছাড়া এ কাব্যের আর কোনো গুণ নেই।

স্যার রিচার্ড স্টীল ও তাঁর সহযোগী জোসেফ অ্যাডিসন 'স্পেক্টেটর' ও 'ট্যাটলার' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। এই প্রবন্ধ পড়ে জোনাথান সুইফ্‌ট মন্তব্য করেছিলেন যে, স্টীল ভালো প্রবন্ধকার হতে পারেন যদি তিনি ব্যাকরণের নিয়ম সম্বন্ধে, শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে এবং আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আর একটু অবহিত হন।

টমাস কার্লাইল কারো সম্বন্ধে নিষ্ঠুর মন্তব্য করতে দ্বিধা করতেন না। সুইনবার্নের সঙ্গে তিনি আলাপ করতে পর্যন্ত সম্মত হন নি। কারণ, তাঁর মতে সুইনবার্নের লেখা নোংরামির চূড়ান্ত। কার্লাইল বলতেন, সুইনবার্ন তো নর্দমায় বসে আছে এবং বাজে লেখা লিখে আবর্জনার পরিমাণ বৃদ্ধি করছে।

স্যামুয়েল টেলর কলরিজ

এমার্সনকে কার্লাইল বলেছেন ঠোঁটকাটা লোক। অর্থাৎ, যা মনে আসে তা-ই এমার্সন লেখেন। বিচার-বিবেচনা না থাকায় অনেক বাজে লেখা ছাপা হয়। বিখ্যাত দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসারকেও কার্লাইল রেহাই দেন নি। তাঁকে বলেছেন, "the most unending ass in Christendom." নির্বিরোধী চার্লস ল্যামকেও তিনি বাদ দেন নি। কার্লাইল ল্যামের লেখার মধ্যে দেখেছেন অজ্ঞতা ও গভীরতার অভাব। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মতে ল্যামের সকল লেখাতেই তরল পাগলামির ছায়া পড়েছে।

লর্ড চেস্টারফিল্ডের 'লেটারস্ টু হিজ্ সন' আমাদেরও পাঠ্যপুস্তকে পড়তে হয়েছে। চেস্টারফিল্ড চিঠিতে নাম উল্লেখ না করেও ডঃ স্যামুয়েল জনসনের আচার-ব্যবহারের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। ডঃ জনসন তার প্রত্যুত্তরে বললেন, চেস্টারফিল্ডের চিঠি ছেলেকে বেশ্যার নীতি ছাড়া আর কিছু শিক্ষা দেয় না।

ডঃ জনসনের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব সমসাময়িক অনেককে ঈর্ষান্বিত করেছিল। অবশ্য এর জন্য তাঁর স্পষ্ট ভাষণও দায়ী ছিল অনেকখানি। চার্লস চার্চিল নামে একজন ছোট কবি ছিলেন। তিনি 'দি গোস্ট' নামে একটি কবিতায় ডঃ জনসনকে আক্রমণ করেন। কবিতায় ডঃ জনসনের নাম দেওয়া হয় 'হামবড়া'। চার্চিল তাঁকে লক্ষ্য করে লিখলেন ঃ

...insolent and loud,
Vain idol of a scribbling crowd,

* * *

Who, cursing flattery,
is the tool
Of every fawning,
flattering fool;

ইত্যাদি।

চার্চিল ডঃ জনসনের কুরূপ চেহারার প্রতি ইঙ্গিত করতেও দ্বিধা করেন নি। এমন ভীষণদর্শন ডঃ জনসন যে, তাঁকে দেখে স্বয়ং শয়তান পর্যন্ত ছুটে পালায়।

আলেকজান্ডার পোপ ও কোলি সিবারের মধ্যে প্রচণ্ড কলহের কাহিনী ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসের অনেকগুলি পাতা জুড়ে আছে। সিবার অক্ষম কবি; তথাপি তাঁকে পোয়েট-লরিয়েট করা হয়েছিল। এই নিয়ে সাহিত্যিকদের মধ্যে ক্ষোভের শেষ ছিল না। পোপ তাঁকে আক্রমণ করে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখেছেন; উত্তরে সিবার নিষ্ঠুর ব্যক্তিগত আক্রমণ করে পোপের বিরুদ্ধে লিখেছেন পুস্তিকা।

দস্তয়েভস্কি তুর্গেনিভের উপন্যাস 'স্মোক' সহ্য করতে পারেন নি। রাশিয়ানদের এই উপন্যাসে অপমানিত করা হয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। তাই তুর্গেনিভের মুখের ওপরেই দস্তয়েভস্কি বলেছিলেন, এ বই প্রকাশ্যে পোড়ানো উচিত।

দস্তয়েভস্কি এতেই ক্ষান্ত হন নি। 'দি পাসেস্‌ড' উপন্যাসে কারমাজিনোভ চরিত্রে তিনি তুর্গেনিভের ক্যারিকেচার করেছেন। অথচ তুর্গেনিভের কাছ থেকে দস্তয়েভস্কি সহায়তা পেয়েছেন নানাভাবে।

অস্কার ওয়াইল্ডের 'অ্যান আইডিয়েল হাজব্যান্ড'র অভিনয় দেখে ঔপন্যাসিক হেনরি জেমস মন্তব্য করেছিলেন, '...so helpless, so crude, so bad, so clumsy, feeble and vulgar.'

নাট্যকার হেনরি আর্থার জোনসের সঙ্গে বার্নার্ড শ'র প্রথমে বেশ হৃদ্যতা ছিল। শ' তাঁর কাছ থেকে শিক্ষার্থী হিসাবে উপদেশ গ্রহণ করতেন। কিন্তু রক্ষণশীল জোনস শ'র মতামতের নতুনত্ব ও অদ্ভুতত্ব দেখে চটে গেলেন। শ'কে উদ্দেশ্য করে তিনি লিখলেন, 'The Nag sedition was your mother, and Perversity begot you; Mischief was your midwife, and misrule your nurse, and Unreason brought you up at her feet—no other ancestry and rearing had you.' অন্যত্র

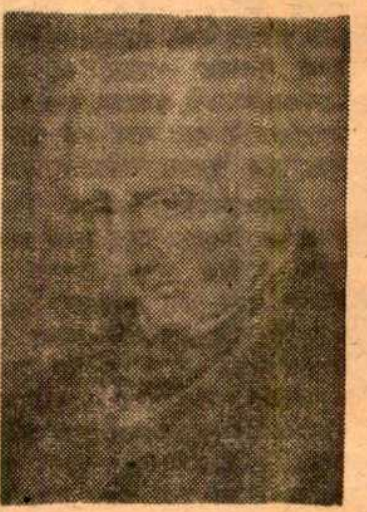

উইলিয়ম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ

বলেছেন, শ' হলেন 'a freakish homunculus germinated outside lawful procreation.'

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভক্তরা বলতেন, তাঁর পার্থিব জগতের প্রতি কোনো মোহ নেই, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের পূজারী তিনি। ওয়াল্টার স্যাভেজ ল্যান্ডর তা বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলতেন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের এক চোখ ড্যাফোডিলসের ওপর, আর এক চোখ সুয়েজ ক্যানেলের শেয়ারের দামের ওপর। বায়রন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বিখ্যাত কবিতা 'এক্সকারশন'কে অসংলগ্ন বলে মনে করতেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভালো লাগত না ভলতেয়ারের 'কাঁদিদ', কীটসের 'এনডাইমিয়ন', শেলির 'অ্যালাস্টর' এবং কোলরিজের 'এনশেণ্ট মেরিনার'।

(শেষাংশ ১৭৩ পৃষ্ঠায়)

শিকারী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বর্ষার পুকুর একেবারে টই-টম্বুর।

জল বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে পাড়ের ঘাসের ওপর বসেই তার ঠাণ্ডা জলে পায়ের পাতা ডুবিয়ে দেওয়া যায়। এখন ঘোলা জলের ওপর মাথা তুলে আছে চোরকাঁটার শীষ, ফড়িঙের ডানার ভরও তারা সইতে পারছে না, গোড়ায় মাটি আলগা হয়ে গেছে তাদের। কলমীর বন বেড়ে গেছে অনেকখানি, ঘন সবুজ হয়েছে তাদের রঙ, তির তির করে কাঁপছে পাতাগুলো—যেন আকাশটার দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করছেঃ 'বৃষ্টি দাও, আরো বৃষ্টি দাও।' জলের ভেতরে, কুচকুচে কালো, অজস্র বিচির মতো একদল পোকা পিছলে পিছলে যাচ্ছে সমানে—যেন সারাদিনে তাদের কপাটি খেলা আর শেষই হচ্ছে না। পুকুরের পশ্চিম দিকে ভরা বর্ষার সমস্ত পরিতৃপ্তি নিয়ে একটা সাদা রঙের গাই নরম ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে—দুজন চাষী বলাবলি করতে করতে যাচ্ছেঃ 'খুব ভালো হবে এবারের পাটের ফলন।' নতুন মাটির গন্ধভরা জলে, ডাঙা থেকে অনেক খাবার এসেছে দেখে, থেকে থেকে খুশিতে উলসে উঠছে রুই-মৃগেল-কালবোসের পোনা। আর সেই মাছের আশায় জলে ছিপ ফেলে সকাল থেকে বসে আছে কার্তিকপুর বাজারের মহাজন শ্রীনাথচন্দ্র পাল। উত্তরে বাঁশ, দক্ষিণে নিম, পশ্চিমে রাস্তা, আর পুবে এই পুকুর রেখে যে টিনের চাল দেওয়া পাকাবাড়ী, তিনটে মরাই-ভর্তি যার ধান, যে বাড়ীর সামনে চারটে যমদূতের মতো ষোষ মুখে ফেনা গড়িয়ে জাবর কাটছে—শ্রীনাথচন্দ্র পাল সেই বাড়ী-খানার মালিক ; আর বলা অনাবশ্যক—এই পুকুরটারও।

বাড়ীর কাঠ ফেলা ঘাটলা যেখানে অতলে ডুব দিয়েছে আপাততঃ এবং যার নীচে এখন কুচো-চিংড়িরা বাসা বেঁধেছে আর যেখানে লাল কাঁকড়াদের বরাবরের মৌরসীপাট্টা, তারই ওপরে চার ক'রে বসলে শ্রীনাথচন্দ্র যে শিকার সম্বন্ধে অনেক নিশ্চিন্ত হতে পারত, সেটা একেবারে খাঁটি কথা। কিন্তু খাঁটি কথা আরো একটা আছে। তা হলে ওভাবে বসলে ভক্তবল্লভ—সংক্ষেপে বলু ঘোষের মেয়ে রাধাকে এত ভালো করে দেখা যেত না। কারণ পুবে মুখ করে বসে বার বার উত্তরের দিকে ঘাড় ফেরালে লোকে মন্দ বলবে—তা ছাড়া বলু ঘোষ লোকটাও যাকে বলে কঠগোঁয়ার। তার চেয়ে পুকুর যখন অমার নিজের, আমি ইচ্ছে করলে যখন যে-কোনো পাড়ে বসে মাছ ধরতে পারি—তখন দক্ষিণের পাড়ে বসলে কা'র কী বলবার আছে!

ঠিক কথা, কারোই কিছু বলবার নেই। দই-ক্ষীরের বাঁক কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দু-একবার আড়চোখে চেয়ে গেছে বলু ঘোষ, কিন্তু শ্রীনাথচন্দ্রের তাতে কিছু আসে যায় না। পুকুরটি তার। যদিও ভক্তবল্লভ ঘোষ তার প্রজা নয়, এমন কি খাতকও নয়, তবু বলতে গেলে আশ্রিত ছাড়া কী আর! পুকুরের দক্ষিণে বলু ঘোষের ভিটে, তার বাড়ীর মেয়েরা এই পুকুরের ঘাটেই চান করে, বাসন মাজে। সরকারী টিউবওয়েল বসবার আগে পর্যন্ত খাবার জলও নিত। আজ যদি শ্রীনাথ তার পুকুর ব্যবহার করতে না দেয়, তা হলে বলু ঘোষের বাড়ীর কাজকর্ম সব বন্ধ। এ নিয়ে শ্রীনাথ-চন্দ্র পাল কোনো ছোটলোকোমি করতে চায় না, এমন কি বলুর বারো-তেরো বছরের ছেলেটা যে ছিপ নিয়ে যখন-তখন ট্যাংরা-পুঁটি ধরে—তা-ও সে সয়ে যায়। পরের জন্যে এটুকু ত্যাগ-স্বীকারই যদি না করা গেল, তবে আর কিসের প্রতিবেশী!

P 36,196

লোকে অবশ্য শ্রীনাথচন্দ্র পালকে ঠিক প্রাণ খুলে প্রশংসা করতে চায় না।

'চামার, জোঁক, রক্তশোষ'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

হবেই, বিশুদ্ধ ঈর্ষ্যার ব্যাপার এসব। একজনের যদি অবস্থা একটু ভালো হয়, লক্ষ্মীঠাকরুণ দয়া করে যদি তার ঘরে একটু পা রাখেন, তা হলে কা-র বা প্রাণে সহ্য হয় সেটা! ভাগ্যবানের নিন্দে না করতে পারলে অভাগাদের পেটের ভাতই হজম হতে চায় না। আর তা ছাড়া মহাজনী করে কে-ই বা কবে আর যশ পেয়েছে! দরকারের সময় হাত পাততে সবাই রাজী, কিন্তু টাকাটা শোধ দিতে হলেই যেন একেবারে আকাশ থেকে আছড়ে পড়ে।

'লোকটা চামার।'

বটেই তো—অসময়ে উপকার করেছিল কিনা।

আরো অপবাদ আছে তার নামে। শ্রীনাথচন্দ্র পাল নাকি চরিত্রহীন।

এই কথাটা শুনলে আরো বেশি করে হাসি পায় শ্রীনাথচন্দ্রের। চরিত্র গ্রামশুদ্ধ সব একেবারে সচ্চরিত্রের ধ্বজ উঁড়িয়ে বসে আছে। অথচ, কারে হাঁড়ির খবর জানতে তার তো অন্তত বাকী নেই। ঘরে ঘরে কত কেচ্ছাই যে চলছে, গ্রামের শেষে বুনো পাড়ার কোন্ কোন্ মহাত্মা যে সন্ধ্যের পর আনাগোনা করেন, অন্তত শ্রীনাথচন্দ্র পালের সেসব কিছুই জানতে বাকি নেই।

আর হলই বা তার স্বভাব-চরিত্তির কী বলে একটু 'ইয়ে'—সে তো আর দেবতা নয়, তাই বলে বাড়ীতে স্ত্রী-ছেলেমেয়ে কাউকে এতটুকুও অযত্ন করেছে কোনোদিন, একথা কেউ বলতে পারবে! এখনই না হয় সোনা কন্ট্রোল হয়েছে, কিন্তু সেদিনও বৌ না চাইতে নতুন নেক্‌লেস্ বানিয়ে দেয় নি তাকে? বিয়ের দু' বছর পরে মেয়ে এসে আবদার করে নতুন রুলী নিয়ে গেছে ক'জন বাপ দেয় এসব? সকলের সখ মেটাবে শ্রীনাথচন্দ্র পাল, আর তার একটা সখ-টখ থাকবে না?

সখ তার আছে, সেটা অল্পবয়েসী মেয়েদের সম্পর্কে। না—শ্রীনাথচন্দ্র পাল বেশিদিন কাউকে আগলে রাখতে চায় না, খালি হাতেও বিদেয় করে না দুজনের তো বিয়েব খরচও দিয়েছে নিন্দুকে বলে, বিয়ে না দিয়ে নাকি উপায় ছিল না তার। কিন্তু লোকের কথায় কান দেবার কোনো মানেই হয় না। নিজের সখটুকুর জন্যে শ্রীনাথচন্দ্র পালের লজ্জা নেই।

আকাশে জলভরা মেঘ পূর্ণ কলসী-বয়ে-চলা গাঁয়ের মেয়েদের মতো যাওয়া-আসা করছে। দিনটা ছায়া-ছায়া। কেমন এলোমেলো হাওয়া দিয়েছে, যে-কোনো সময় বাদলা নামলেই হল। পুবুরের টই-টম্বুর জলের গন্ধ, ঘাসের গন্ধ, ভিজে মাটির গন্ধ; ডুবো চোর-কাঁটা আর ঘাসের শীষে ফড়িং কাঁপছে। জলে নামে-লাগা ফাৎনার দিকে আড়-চোখে চেয়ে চেয়ে শ্রীনাথচন্দ্রেরও চোখ কাঁপছিল ঘন ঘন। দক্ষিণের ঘাটে চাল ধুতে এসেছে রাধা। টিয়াবঙের লালপেড়ে শাড়ীটি তার বাতাসে আলুথালু।

শ্রীনাথচন্দ্রের চোখের দৃষ্টি যেন কয়েকটা দাঁত হয়ে পুকুরের ওপারে ছুটে গেল। কত বয়েস হয়েছে রাধার? ষোলো কিংবা সতেরো। শ্রীনাথচন্দ্রের চোখের সামনেই তো ধাঁ-ধাঁ করে বেড়ে উঠল মেয়েটা। এই তো সেদিনও তার বাড়ীতে নারকোলী কুল আর কাম-রাঙার লোভে উঁকিঝুঁকি দিত, আর, 'এই—পালা, পালা শিগ্‌গীর'—বলে তাকে তাড়া করত শ্রীনাথচন্দ্র। সেই মেয়েটা কী দারুণ দেখতে হয়েছে এখন! যেন গুটি কেটে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে প্রজাপতি। আজ তাকে কুল-কামরাঙা কেন, দরকার হলে হৃৎপিণ্ডের আধখানাও কেটে দেওয়া চলে।

কেটে তো দেওয়া চলে, কিন্তু নিচ্ছে কে?

'উঁহু-হু—খক্-খক্—'

চমকে উঠল শ্রীনাথচন্দ্র, ঠিক তার পেছনে এসে কে যেন খাঁকারি দিলে গলায়।

'কর্তা!'

'কর্তা' শুনেই শ্রীনাথচন্দ্র পালের চোখ গরম হয়ে উঠল। প্রথমটা কেমন ঘাবড়েই গিয়েছিল, এবার পেছন ফিরে, চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

লোকটা অবশ্য খুব গুরুতর কেউ নয়। তারই কর্মচারী নলিন। ছোকরার বয়েস অল্প, চালাক আর চটপটে। বাহাল হয়েছে মাস কয়েক হল, কিন্তু আদায়-তশীলের কাজে খুব পাকা। লেখাপড়ায় মাথা ছিল, কিন্তু বাপ হঠাৎ মারা যাওয়ায় স্কুলের শেষ পরীক্ষাটা আর দিতে পারে নি। এতদিন এদিকে-ওদিকে কি সব করে বেড়াত, তারপর শ্রীনাথচন্দ্রের কাছে কাজ করতে এসেছে।

বলতে গেলে, তাকে ডেকে এনেছে শ্রীনাথ নিজেই। ছোকরার হাতের লেখাটি খাসা, হিসেবের মাথাও বেশ পরিষ্কার—বাইবে থেকে এসব কারণগুলোই যথেষ্ট। কিন্তু এরই জন্যে প্রায় অকারণেই একটা উটকো লোককে ডেকে চাকরী দেবে, চল্লিশ টাকা আর দশ টাকা বাড়তি ভাতা (আসলে মাইনে পঞ্চাশ টাকাই, 'বাড়তি ভাতা' কথাটা আজকালকার ফ্যাশান) গুণবে মানে মানে, শ্রীনাথচন্দ্র পাল এত কাঁচা লোক নয়, তাব পয়সাও এমন খোলামকুচি নয়। ব্যাপারটার মূল আরো গভীরে।

শ্রীনাথচন্দ্র জানে, বলু ঘোষ সম্পর্কে কি রকম দূব-সম্পর্কের একটা মামা-টামা হয় নলিন মণ্ডলের। দেখেছে, নলিনেব ও বাড়ীতে নিয়মিত হাওয়া-আসা আছে, রাধার সঙ্গে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে হাসি-গল্পও তার চোখ এড়ায় নি। অতএব—

অতএব একটু একটু করে নলিনের কাছে মন খুলতে হয়েছে। হাওয়া বুঝেই।

'দ্যাখো, সত্যি কথা বলতে কি, আমার এমন কিছু বয়েস হয় নি। চল্লিশ কি আর একটা বয়েস?'

বছর বারো কমাতে হল, কিন্তু এসব অবস্থায় এ রকম এক-আধটু করতেই হয়।

নলিন শুনে সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটেছে।

'আজ্ঞে না—না, সেকথা কে বলে! কলকাতায় তো শুনেছি চল্লিশ বছরে মেয়েরাই বিয়ে করে আজকাল।'

নলিনের জ্ঞান দেখে খুশি হয়েছে শ্রীনাথচন্দ্র।

'আমি দেখতে শুনতেও কী বলে—'

'আজ্ঞে সামনে আর কী প্রশংসা করব আপনার!'—শ্রীনাথচন্দ্রের তামাটে রঙের নেয়াপাতি চেহারা, লালসায় কর্দমাক্ত কুৎকুতে চোখ আর কখনো বন্ধ-না-হওয়া ঠোঁট দুটো—যাদের দেখলে মনে হয় এখুনি লালা গড়াতে থাকবে—এগুলোর দিকে তাকিয়ে একবারের জন্যে গা গুলিয়ে উঠেছে নলিনের। কিন্তু পরক্ষণেই সিদ্ধবাক চাটুকারের মতো বলে গেছেঃ 'আপনি তো বললেন বয়েস চল্লিশ হয়েছে, কিন্তু দেখলে তো মনে হয় পঁচিশ পেরোন নি। আর চেহারাব কথা যদি বলেন, তা হলে আমিও বলতে পারি, আপনি কলকাতায থাকলে চাই কি—ওই যে কী নাম—মানে ফিলিমেব হিরো-টিরোও হয়ে যেতে পারতেন।'

মুহূর্তের জন্যে সন্দিগ্ধ হয়েছে শ্রীনাথচন্দ্র, কিন্তু ঠাট্টার আভাসমাত্রও নেই নলিনের চোখেমুখে। একটু লজ্জা পেয়ে বলেছে, 'তা তোমরা গিয়ে আমাকে ভালোবাসো বলে একটু বাড়িয়ে বলছ—আমি কী বলে—দেখতে কি আর অত ভালো?'

'আজ্ঞে নিজেব চেহারা কি কেউ আর নিজের চোখে দেখতে পায়? আর পুরুষমানুষকে তো সত্যি করে দেখতে পায় মেয়েরা। রাধা আপনার সম্পর্কে কী বলে যদি নিজের কানে শোনেন—'

'কী বলে? কী বলে?'—শ্রীনাথ-

চন্দ্রের হৃৎপিণ্ড গোটাসাতেক লাফ দিয়েছে পর পর।

রাধা যা বলে—অন্তত রাধার পক্ষ থেকে নলিন যা বলে, তার ফল ফলতে আরম্ভ করেছে সঙ্গে সঙ্গেই। স্নো-সাবান-গন্ধতেল তো গেছেই—শাড়ী-ট্যাড়ীও যেতে শুরু করেছে। এমন কি দু-একখানা গয়নাও যেতে পারে. এই সোনা কণ্ট্রোলের দিনেও যেতে পারে, যদি রাধার কাছ থেকে একটু স্পষ্ট করে—

কিন্তু এখনো সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অথচ কাজের ক্ষতি হচ্ছে, ছিপ ফেলে বসে থাকতে থাকতে বাত ধরে যাচ্ছে কোমরে। হচ্ছে করলে কি আর দশ-বিশটা পোনা এর মধ্যে—আজই ধরে ফেলতে পারত না শ্রীনাথ-চন্দ্র? কিন্তু বলু ঘোষের বাড়ীর ঘাটলার দিকেই যদি চোখ লেপটে থাকে, তা হলে ফাৎনার দিকে আর তাকানো চলে কী করে! আর তাকাবার দরকারটাই বা কী!

অনেকক্ষণ হা-পিত্যেশ করে বসে থাকার পর রাধা যদি ঘাটে এল আর পুবের দামাল বাতাস যদি সুযোগ বুঝে তার লালপাড় টিয়ারঙের শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে নিলে, তখনই কিনা পেছন থেকে নলিন! হয়তো ভালো খবরই কি এনেছে, কিন্তু এখন না এনে অন্য যে-কোনো সময়ে আনলেই ভালো লাগত শ্রীনাথচন্দ্র পালের।

দৃষ্টির ভেতরে যে দাঁতগুলো বেরিয়ে এসেছিল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঢাকতে হল তাদের। রাধার দিক থেকে চোখ সরিয়ে তাকাতে হল নলিনের দিকে, মনে মনে বলতে ইচ্ছে করলঃ 'উজবুক!'

নলিন আবার গলা খাঁকারি দিলেঃ 'উঁ-হুঁ-হুঁ—খক্। একটা কথা ছিল কর্তা।'

পুবের হাওয়ায় আকাশে মেঘের

আমিও বলতে পারি. আপনি কলকাতায় থাকলে.....যেতে পারতেন।

পর মেঘ উড়ে যেতে লাগল, ঢেউ উঠতে লাগল ভরা পুকুরের ঘোলা জলে; চোরকাঁটার শীষ দুলিয়ে— ফড়িঙকে দোলা দিয়ে সেই জল এসে ঘাসের বুকে কলধ্বনি তুললো—যেন হাসির আওয়াজ দূর থেকে ভেসে এল রাধার। শ্রীনাথচন্দ্রের ফাৎনার ঠিক পাশেই একটা অল্পবয়সী মাছ খুশিতে উলাস দিলে, জলের উপর বুদ্‌বুদ্‌ তোলার ধরণ দেখেই বোঝা গেল, ওটা কাতলা। এও ঠিক রাধার মতোই আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চারের গন্ধ পাচ্ছে, কিন্তু এখনো টোপ গিলছে না। শ্রীনাথচন্দ্র হতাশ হয়ে দেখতে পেলো, রাধা এরই মধ্যে কলসী ভরে উঠে পড়েছে।

অন্য সময় হ'লে হয়তো বা গেয়েই উঠতঃ 'আর যাব না জল আনিতে, কদমতলায় দাঁড়িয়ে কালা'. কিন্তু সেটা নলিনের সামনে আর কী করে সম্ভব। তাই ভুরু কুঁচকে, বিশ্রী বিরক্তিভরা গলাতে জিজ্ঞেস করতে হল, 'কী হয়েছে, কী কথা আবার নিয়ে এলে তুমি?'

নলিন উবু হয়ে বসে পড়ল শ্রীনাথের পাশে। স্বর নামালো চক্রান্তকারীর মতো।

'আজ্ঞে টলমল করছে।'

'কে?'.

'রাধার মন।'—বলতে গিয়ে চকচক করে উঠল নলিনের চোখ। শ্রীনাথচন্দ্র পালের দৃষ্টির সামনে তখনো যদি টিয়ারঙ শাড়ীর জাদু না থাকত, তা হলে নলিনের চোখে চাকুর ডগা দেখতে পেতো সে।

এবার আর পুকুরে নয়, শ্রীনাথচন্দ্রের হৃৎপিণ্ডে যেন উজনখানেক ঘুই-কাতলা ঘাই মারল।

'সত্যি বলছ নলিন?'—নলিনের একখানা হাত চেপে ধরে শ্রীনাথচন্দ্র বলে ফেললঃ 'আমি তোমাকে তা হলে দু'শো—', কিন্তু এইখানেই থমল সে, কারণ ঝপ করে এখনই কথা দিয়ে ফেলাটা কোনো কাজের কথাই নয়। আগে দেখা যাক, কত দূর পর্যন্ত গড়ায়

স্নানের জলের ভেতরে আতার বিচির মতো কালো কালো, ভেলভেটের মতো চকচকে পোকরা নিজেদের আনন্দে স্নানে পিছলে পিছলে কপাটি খেলে চলেছে। কলমীর পাতাগুলো আকাশের দিকে চেয়ে সবুজ শিখার মতো কাঁপছে। বাবলার কাঁটায় ভরা রুক্ষ শরীর বৃষ্টিধোয়া নতুন নতুন পাতায় হলদে-সবুজ। আকাশ-মাটি-জল সব যেন ভরে উঠেছে আজ, টলমল করছে, ছলছল করছে, কানায় কানায় উপচে পড়ছে। ঠিক রাধার প্রথম যৌবনের মতো। এই তো মন টলমল করবার মতো দিন।

'সত্যি—সত্যি বলছ নলিন?'

'আজ্ঞে আপনি অন্নদাতা, মিথ্যে বলতে পারি আপনার কাছে?

শ্রীনাথচন্দ্র চুপ করে রইল কিছুক্ষণ, বুকের ভেতরে উথলে-ওঠা তুফানটাকে সামলে নিতে চাইল একটু। তারপর ধরা-ধরা গলায় বললে, 'কী বলছে?'

'আজ্ঞে ছেলেমানুষ তো। ভয় পাচ্ছে।'

'ভয়ের কী আছে? আমার বৈঠকখানা ঘরটা'—শ্রীনাথচন্দ্র একটু দম নিয়ে বললে, 'জানোই তো—একেবারে বাইরের দিকে আমি তো মানে—কাজকর্ম একটু বেশি থাকলে—রাতের বেলা বৈঠকখানা ঘরেই শুই। তুমি—মানে'—

এতদিনের অভ্যস্ত শিকারী শ্রীনাথচন্দ্রের গলা তবু আরো একবার ধরে এলোঃ 'ওকে—ধরো রাত বারোটা নাগাদ স্বচ্ছন্দেই—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, পৌঁছে দিতে পারি। পারি বই কি। আজ রাতেই আনতে পারি তবে—'

'তবে আবার কী?'—শ্রীনাথচন্দ্র পাল সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখল বলু ঘোষের বাড়ীটার দিকে। দুটো আমগাছের জন্যে প্রায় কিছুই দেখা যায় না। কেউ ঘাটে না আসা পর্যন্ত কোনো ভরসাই নেই।

'তবে আবার কিসের?'—আর একবার প্রশ্ন করল নলিনকে।

'ওই যে বললুম, ভয় পাচ্ছে। তা ছাড়া ওর বাপ যে-রকম লোক—'

হুঁ, বাপ যে সুবিধের নয়, শ্রীনাথচন্দ্রের সেটা ভালো করেই জানা আছে। একটু আগেই বাঁক কাঁধে নিয়ে যাবার সময় যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে গেছে বলু ঘোষ, কারোই মন ভরসায় ভরে ওঠে না তা দেখে। আঃ, সুন্দরী মেয়েদের বাপগুলো কেন যে এ-রকম বেরসিক হয়!

'বাপ জানবে কী করে? একটু সাবধানে উঠে আসবে, ভোরের আগেই চলে যাবে। আর আমাকেই বা ভয়ের কী আছে? আমি তো আর বাঘ-ভালুক নই।'

নলিন প্রায় বলে ফেলছিল, 'আজ্ঞে না—ঘেয়ো কুকুর'—কিন্তু কোন্ জাদুমন্ত্রের বলে কথাটা যে তার গলার কাছ থেকে আবার ফিরে গেল পেটের ভেতর, তা সে নিজেও টের পেলো না। বরং বেশ খানিকটা বিগলিত হাসি হেসে বললে, 'সে কি কথা, বাঘ-ভালুক হবেন কেন। আপনি যে দয়া করে ওর ওপর নেক-নজর দিয়েছেন সে তো ওর চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি।'

'কী জানো—' ক্ষুণ্ণ মনে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেললে শ্রীনাথচন্দ্র পালঃ 'আগেকার দিন হলে কি আর কথা ছিল। আমারই তো স্বজাতি, ঘরে—আমি ওকে বিয়ে করে ফেলতুম, ভরা সংসারের গিন্নী করে দিয়ে পাট-রাণী করে রাখতুম। এ পক্ষের ইনি, তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে গাঁইগুঁই করলে বলতুম, না পোষায়—চলে যাও আমার বাড়ী থেকে। কিন্তু সে-সব দিন তো আর নেই। কী তোমাদের সমস্ত নতুন নতুন আইন বেরিয়েছে, একটা বৌ থাকতে আবার বিয়ে করলে নাকি জেল খাটতে হবে! সেই জন্যেইতো সাধ থাকলেও কিছু করতে পারি না—' শ্রীনাথচন্দ্র দম নিলে একবারঃ 'তা আমি—কী বলে—ওকে ছোট বোয়ের মতোই দেখব। মানে, বাইরে কিছু না হোক—মনে মনে—'

নলিনের দাঁতে দাঁতে অদ্ভুত একটা শব্দ হল, অন্যমনস্কভাবে ঘষা লাগল বোধ হয়। ভরা পুকুরটার টই-টম্বুর জলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সে বললে, 'আজ্ঞে—গান্ধর্ব বিবাহ।'

'ঠিক বলেছ, গান্ধর্ব-বিবাহ।'—শ্রীনাথচন্দ্র আনন্দে হে-হে করে উঠলঃ 'তোমার মাথা বেশ পরিষ্কার, সব চমৎকার বুঝতে পারো। যদি আজ

ঋত্বিকের

নারী (কাব্যগ্রন্থ) ... দুই টাকা। চুম্বন (ঐ) ... তিন টাকা।

নূতন প্রকাশিত গ্রন্থ

ঐক্যের আস্বাদ (ঐ) ... ... তিন টাকা।

। ছোটদের জন্য লেখা ।

নানান দেশের মজার গল্প দেড় টাকা। যখন তাঁরা বালক ছিলেন দুই টাকা

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

ছন্দমালা (কবিতার) বই। কথা ও ছবি

প্রাপ্তিস্থান :—সমকালীন পরিবেশক।। ১বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

ত্রিবেণী প্রকাশন ১২২/১বি, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

hgec মেঘদূত!

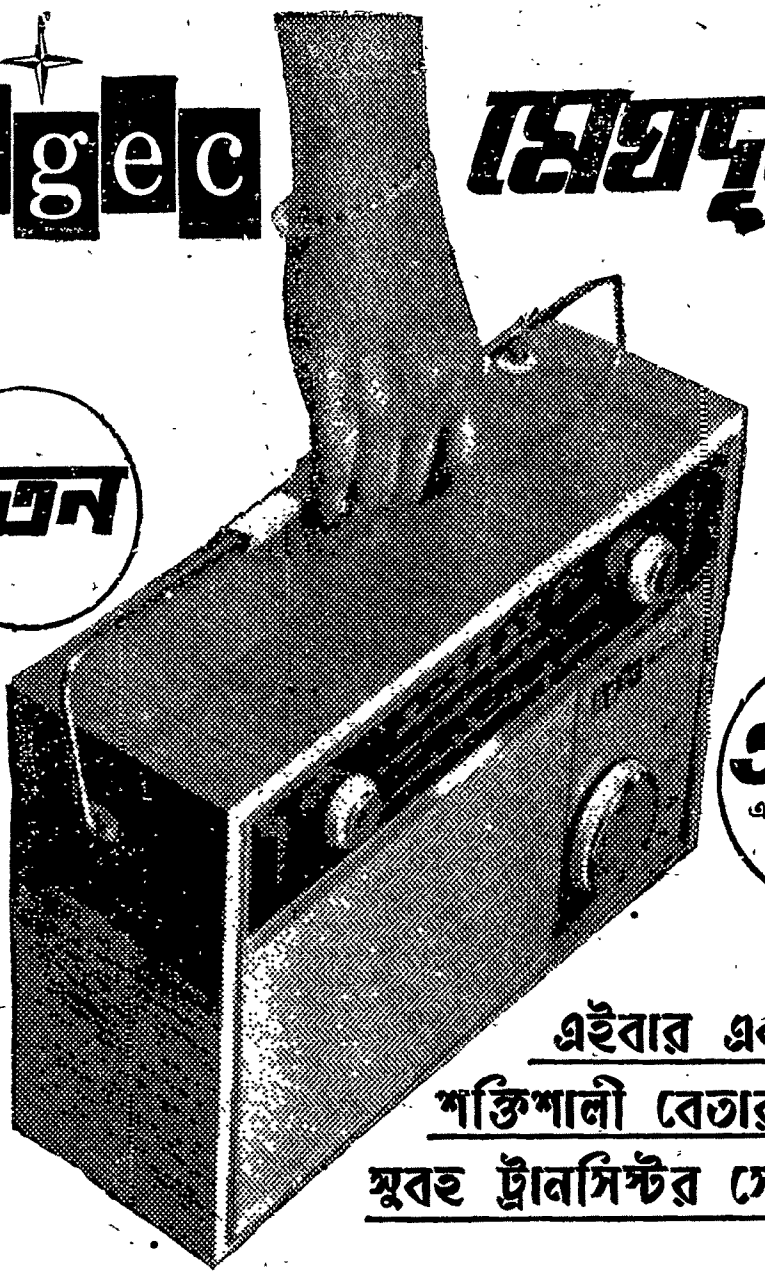

নূতন

মূল্য ঃ
৩৩৫.
এক্সাইজ ডিউটি ও
কর অতিরিক্ত

এইবার একটি শক্তিশালী বেতারগ্রাহক সুবহ ট্রানসিস্টর সেট!

এর সম্বন্ধে আরও অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পড়ে দেখুন ঃ দেখুন এটির সাথে কত কিছু পাওয়া যায়....অথচ দাম কত কম * ৮টি অত্যন্ত সুগ্রাহী ট্রানসিস্টর ও ডাইওড * একটি বিশেষ শক্তিসম্পন্ন পি. এম. লাউডস্পীকার * টেলিস্কোপিক আকাশতার * তিনটি ওয়েভ ব্যাণ্ডে বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠান শ্রবণ * সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিগোচর ডায়াল * বাইরে আকাশতার টাঙাবার বন্দোবস্ত। সমস্ত কলকব্জা সুদৃশ্য অভঙ্গুর সান্‌মাইকা কেবিনেটে সাজানো।

এই মেঘদূত এইচ. জি. ই. সি.-দ্বারা নির্ম্মিত.....যাঁরা আপনাদের গ্রানাডা নামক বিখ্যাত টেবিল মডেল ট্রানসিস্টর দিয়েছিলেন।

আজই আপনার নিকটবর্ত্তী এইচ.জি.ই.সি বিক্রেতার সাথে সাক্ষাৎ করুন এবং মেঘদূত ট্রানসিস্টরটিকে দেখুন।

প্রস্তুতকারক ঃ

হিন্দুস্থান জেনারেল ইলেকট্রিকাল কর্পোরেশন লিমিটেড

থাপর হাউস, ২৫, ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-১
ব্রাঞ্চসমূহ : ১৫৪/১৫৫, ব্রডওয়ে, মাদ্রাজ-১
থাপর হাউস, ১২৪, জনপথ, নিউ দিল্লী-১
৩৩/৩৫, নিউ কুইন্‌স্ রোড, বোম্বাই-৪.

রাতেই আনতে পারো ওকে তা হলে তোমাকে দুশো—' বলেই আবার থমকে গেল। আগে থেকেই কেন কথা দেওয়া? কে বলতে পারে, একশো টাকাতেই হয়তো নলিন মণ্ডল কৃতার্থ হয়ে যাবে।

'তোমাকে খুশি করে দেব'—শ্রীনাথচন্দ্র এতক্ষণে যেন একটা সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে বলে মনে করল। তার পরে নলিনের একেবারে কানের কাছে ঝুঁকিয়ে দিলে মুখখানা ঃ 'তা হলে আজই?'

'আজই। দেরী করে আর কী লাভ?'

হাঁ, দেরী করে আর কী লাভ? নলিন আস্তে আস্তে বলছিল আর চেয়ে দেখছিল চারদিকে। মেঘলা দিন ছায়ায় ছায়ায় জড়ানো, জলে ভেজা ঠাণ্ডা বাতাস, পুকুরের সেই কালো-কালো পোকারা সমানে খেলে বেড়াচ্ছে, তবু এখন দুপুর। সূর্য মেঘের ভেতরে ডুবে আছে মাঝ আকাশে। পুকুরের পশ্চিম পড়ে বলু ঘোষের সেই শাদা গাইটা ছাড়া আর কেউ এদিকে তাকিয়ে নেই। শ্রীনাথচন্দ্র পালের টিনের বাড়ী, ধানের মরাই, সব নিঝুম। যে তিনটে মোষ একটু আগেও গালের পাশে ফেনা গড়িয়ে গড়িয়ে জাবর কাটছিল, তারা পর্যন্ত গলা নামিয়ে যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। শ্রীনাথের ছেলে গদীতে, মেয়ে-বৌ ঘুমিয়ে, এই বাদলার দুপুরে এখন মাঝ রাত।

শ্রীনাথচন্দ্র বললে, 'ও যদি আসে—' বলতে বলতে আনন্দে গলার ভেতরটা বুজে আসতে চাইল ঃ 'মানে রাধা যদি আজ রাতে অমাবস্যে পা দেয়, তা হলে আমি ওকে কিছু উপহার—'

বলাটা শেষ হল না। তার আগেই চাপা ত্রস্ত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল নলিন।

'কর্তা—সাপ—সাপ! আপনার পায়ের কাছেই কেউটে সাপ একটা!'

'কেউটে সাপ!'

শ্রীনাথচন্দ্র পাল চমকে একটা মস্ত লাফ মারল, আর নলিন যেন অপেক্ষা করছিল ঠিক এই সুযোগের জন্যেই। অদ্ভুত কৌশলে নিজের একটা হাঁটু বাড়িয়ে ধরল শ্রীনাথের পেটের দিকে, যেন বজ্রাঘাতের যন্ত্রণায় বোবা হয়ে গেল শ্রীনাথ, তারপর ঝপাং করে ঝরে পড়ল পুকুরের থই থই জলের ভেতরে। তুফান উঠল জলে-ডোবা চোরকাঁটার শীষে, ছিটকে উঠল কয়েকটা চারের গন্ধে আকৃষ্ট পোনা; কলমীলতাগুলো যেন শিউরে সরে গেল, বিশৃঙ্খল হয়ে উড়ে গেল ফড়িঙের দল, কপাটি-খেলা পোকারা চারদিকে ছুটে পালালো; বাকলা গাছের হলদে-সবুজ নতুন পাতায় হাওয়া যেন কপট নিঃশ্বাস ফেলল—বলু ঘোষের নধর শাদা গাভীটা আয়ত দুই চোখে যেন কিশোরী মেয়ের সরল ভয় নিয়ে চেয়ে রইল এদিকে।

'শালা হারামী!'—সজোরে একবার থুথু ফেলে নলিন বললে, 'শালা জানে-না, রাধাকে আমি বিয়ে করব। আমার যে বৌ হবে, তার কোনো ইজ্জৎ নেই—না? টাকার জোরেই সব হয়? যা—এবারে জলের তলায় মৌজ কর বসে বসে।'

ধীরে ধীরে পুকুরের জল স্থির হল, কলমীলতার পাতায় সবুজ শিখা দুলতে লাগল, ফড়িং ফিরল চোরকাঁটার শীষে, থেমে-যাওয়া কপাটি খেলাটা শুরু হল আবার। তবু আট-দশ মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল নলিন, তারপর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে—সাঁতরে মাঝপুকুর পর্যন্ত চলে যেতে যেতে, চিৎকার করে বলতে লাগল ঃ 'শিগ্‌গীর এসো, শিগ্‌গীর এসো সবাই। কর্তা হঠাৎ পা পিছলে পুকুরের ভেতরে পড়ে গেলেন—আমি তাঁকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না!'

পুকুরের দিকে চোখ রাখবার মুশকিলই এই। পাড়ের দিকে নজর থাকে না।

থাকলে অনেক আগেই দেখতে পেতো শ্রীনাথচন্দ্র পাল।

দেখতে পেতো, শিকারীর চোখের আগুন ধিকি ধিকি করছিল নলিনের দৃষ্টিতে।

Estd 1926.

Phones { 34—1093 / 21—2181

S. C. ACHARYYA & Co.

Authorised

PHILIPS MAIN LIGHT DEALER.

Authorised dealers of

GILLANDERS ARBUTHNOT & Co. Ltd., VOLTAS Ltd., A.E.I. (India) Pvt. Ltd., BIRD & Co. Ltd.

Suppliers to :

TRAMWAYS, JUTE MILLS, COLLIERIES & TEA GARDENS,

দেয়াল

হরপ্রসাদ মিত্র

এক-এক সময়ে নিশ্ছিদ্র দেয়াল হয়ে ওঠে সমস্ত মন। সমস্তই দুর্ভেদ্য বাধা মনে হয় তখন। না, না, শুধু ভয় নয়,—কেবল বিরক্তি বা ভয়ের কথা নয়। ভয় তবু যা হোক এক শারীরিক-মানসিক উত্তেজনার অবস্থা। ভয় নয়, রাগও নয়,—দুশ্চিন্তা আর অবসাদই বোধ হয় কতকটা সে-অবস্থার কাছাকাছি বলে কল্পনা করা যায়।

সে-অবস্থায় মন নিষ্ক্রিয় হবে পড়ে। সেটা আর যাই হোক, সাহিত্যসৃষ্টির অবস্থা নয়। সাহিত্যের জন্ম সম্ভব হয় মনের যে-অবস্থায়, সে-মেজাজ অন্য রকম। অথচ, সাহিত্যে রোগ-শোক-অবসাদের বর্ণনা সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' গল্পের দক্ষিণাবাবুর নিজের এবং তাঁর পত্নীর রোগাক্রান্ত দিনগুলির চেহারা বড়োই করুণ। 'রাসমণির ছেলে'র কালীপদ-র জ্বর-বিকারও ভোলবার নয়। শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকারাও অনেক রকম অসুখে ভুগেছেন। 'দত্তা'র বিজয়ার সেই জ্বরের দৃশ্য চিরস্মরণীয়,—যখন—

> 'তাহার হাতখানা বিজয়া একেবারে বুকের উপর টানিয়া লইয়া একান্ত-করুণ সুরে কহিল, কিন্তু আমি ভাল না হওয়া পর্যন্ত তুমি কোথাও যাবে না বল—তুমি চলে গেলে আমি হয়ত বাঁচব না।
>
> জবাব দিতে গিয়াই নরেন মুখ তুলিতেই দুই জোড়া ভীষণ চক্ষুর সহিত তাহার চোখাচোখি হইয়া গেল। দেখিল, একান্ত সন্নিকটবর্তী নিঃশঙ্কচিত্ত শিকারের ওপর লাফাইয়া পড়িবার পূর্বাহ্নে ক্ষুধিত ব্যাঘ্র যেমন করিয়া চাহে, ঠিক তেমনি দুই প্রদীপ্ত চক্ষু মেলিয়া বিলাসবিহারী তাহার প্রতি চাহিয়া আছে।'

বিজয়ার জ্বর হয়েছিল বটে, কিন্তু তার সে-অবস্থাটা মোটেই দুর্ভেদ্য কোনো দেয়ালের সঙ্গে তুলনীয় নয়। নরেন্দ্র নিজে ডাক্তার। তার সেদিন বুঝতে অসুবিধা হয় নি যে,—'প্রবল জ্বর উগ্র মদের নেশার মত অনেক আশ্চর্য কথা মানুষের ভিতর হইতে টানিয়া আনে, কিন্তু সুস্থ অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব, না মুখে না অন্তরে কোথাও হয়ত থাকে না।' অন্য দিকে, ঈর্ষায় জ্বলে উঠেছিল বিলাসবিহারী। বিজয়াকে নবেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট দেখে, বাড়ির পরিচারক কালীপদকে সে চীৎকার করে বলেছিল—'এই শূয়ারকা বাচ্চা, একঠো কুরসী লাও'!

'অরক্ষণীয়া'য় জ্ঞানদাকেও রোগ-শোক-দুশ্চিন্তার চিরস্থায়ী ছাঁব করে গেছেন শরৎচন্দ্র। পল্লীবাংলার এক দরিদ্র পরিবারের রূপহীনা সেই অবিবাহিতা মেয়েটির লাঞ্ছনার ছাঁবতে অবসাদ কতকটা দেয়ালের মতন কঠিন এবং অনড় হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু সেও ঠিক দেয়াল নয়। অতুলের উপস্থিতিতে যখন তার চোখ দিয়ে জল পড়েছে, তখন তো নয়ই,—বরং তার পরের একটি দৃশ্যেই জ্ঞানদার মন একেবারে নিশ্চল বলে মনে হতে পারে—

> তখনও ভোর হয় নাই, অনাথ ডাকিতে আসিলেন — মেজবৌকে দাহ করিতে হইবে।
>
> "চলুন যাই," বলিয়া অতুল বাহির হইয়া পড়িল। গিয়া দেখিল, দেড় বৎসর পূর্বে তুলসীমূলে মৃত পিতার পা দুটি কোলে করিয়া যেমন বসিয়াছিল, আজও তেমনি নিঃশব্দে মায়ের পা দুটি কোলে লইয়া জ্ঞানদা বসিয়া আছে। শুধু একটিবার ছাড়া জীবনে কেহ কখনও তাহাকে চঞ্চল হইতে দেখে নাই — সেই যখন সে অতুলেরই পায়ের উপর পড়িয়া মাথা খুঁড়িয়াছিল। সুতরাং তাহার এই নিবিড় নীরবতায় কেহ কিছুই মনে করিল না। সেদিকে কাহারও দৃষ্টিই ছিল না, সৎকারের উদ্যোগ-আয়োজনেই পাড়ার লোক ব্যস্ত।'

এই ধরনের রোগ, শোক, অবসাদের বর্ণনা সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রেই চোখে পড়ে। বিভূতি-ভূষণের 'দৃষ্টিপ্রদীপ' কিংবা 'পথের পাঁচালী' থেকেও সেরকম স্মরণীয় ছবি তুলে দেখানো যেতে পারে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক গল্পে-উপন্যাসে এই রকম অনেক দৃশ্য দেখা গেছে। কিন্তু সাহিত্যিক মনের যথার্থ অবসাদের উদাহরণ নয় সে-সব। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে যেমন, আমাদের প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সাহিত্যেও তেমনি দুঃখ-দৈন্য-দুর্দশার ছবি অনেক আছে। কিন্তু গভীর বিরক্তি বা শ্রান্তির ফল নয় সে-সবও। সাহিত্যে বিরক্তির বর্ণনা, আর সাহিত্যিকের নিজের বিরক্তি, দুটি মোটেই এক জিনিস নয়। ভারতচন্দ্র ব্যাসের সঙ্গে জরতী-অন্নদার যেখানে কথোপকথন ঘটিয়েছিলেন, সেখানে দেবীর ছলনার গুণে ব্যাসের বিরক্তি উৎপাদনের দৃশ্য দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। ব্যাসের তপস্যার আহ্বানে বার-বার সাড়া দিতে হয়েছে দেবীকে। বার-বার তাঁর কাছে ফিরে এসে, একই কথা জিগেস করেছিলেন অন্নদা। ফলে, ব্যাস স্বভাবতই রেগে গিয়েছিলেন—

> এইরূপে দেবী বার পাঁচ ছয় সাত।
> ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত॥
> দৈবদোষে ব্যাসদেবে উপজিল ক্রোধ।
> বিরক্ত করিল মাগী কিছু নাহি বোধ॥
> একে বুড়ী আরো কালা চক্ষে নাহি সুঝে।
> বারে বারে ধ্যান ভাঙে কহিলে না বুঝে॥

সেই অবস্থায়—

> ডাকিয়া কহিল ক্রোধে কানের কুহরে
> গর্দভ হইবে বুড়ি, এখানে যে মরে॥

ব্যাসের মন সেদিন রাগে, বিরক্তিতে দুর্ভেদ্য এক দেয়াল হয়ে উঠেছিল। সে-কথা অনুভব করতে বাধা নেই এবং তা বলতেও আপত্তি নেই; কিন্তু একথা সন্দেহাতীত যে, ভারতচন্দ্র নিজে ঠিক ছিলেন। আবার, দাশু রায় 'নারদ'-চরিত্রের কথা বলতে গিয়ে ঋষি কশ্যপকে দিয়ে অনেক কুকথা বলিয়েছেন বটে, কিন্তু নিজে অস্থির বা আত্মহারা হন নি। তাঁর মনে সত্যিই ফূর্তি ছিল। 'নারদ' নামটির প্রত্যেকটি বর্ণ ধরে তাই তিনি বেশ কয়েকটি রূঢ় নিন্দার কথা শোনাতে পেরেছিলেন, যেমন—'নারদ'-এর 'না'-এর কয়েকটি মানে লিখেছিলেন—

> নাঙ্গনা, নাফানাফি, নানানেঠা নাকরা
> নাজেহাল, নাগানাগি, নাঠানাঠি, নরাধম
> ইত্যাদি।

আবার, 'নারদ'-এর 'র' বর্ণটির মানে—

> রোদন, রণ, রোকারুকি, রোগ, রক্তপাত
> রগটানা, রগড়ারগড়ি ইত্যাদি।

এবং—'দ' অর্থাৎ 'নারদ' নামের শেষ বর্ণটির উল্লেখ করে তিনি এইসব দোষ বা অবস্থার তালিকা দেন—

> দলাদলি, দ্বন্দ্ব, দৌরাত্ম্য, দরবার, দস্যুবৃত্তি,
> দয়াহীন, দ্বন্দ্ব করা, দলবর্তী, দরিদ্র, দস্যু,
> দশাহীন, দরদ, দৈন্য।

মানুষের মনে অবসাদ এবং বিরক্তি যখন

ব্যানার্জী এণ্ড কোং

কোয়ালিটি প্রিণ্টার্স এবং ষ্টেশনার্স

৬/২-বি বলরাম বোস ফার্ষ্ট লেন, কলি-২০ * ফোন : ৪৭৪৪০২

একযোগে দেখা দেয়, সাহিত্যের সৃষ্টি-বিভাগে তখন খুবই অভাবের সময় দেখা দিয়েছে বলতে হবে। কোনো কিছুই মনে ফুটে উঠছে না, কিছুই ভালো লাগছে না, কোনো ভ্রমণের সম্ভাবনা নেই, কোনো বিস্ময়ের আকাঙ্ক্ষা নেই,—এরকম নৈরাশ্য এবং নির্জীবতার অবস্থা ব্যাপকভাবে কখনো কোনো দেশে এসেছে কী না, সে-বিষয়ে নির্ভুল খবর খুঁজে বেড়ানো নিষ্প্রয়োজন। সেরকম দুর্ঘটনা এখনো ঘটে নি,—মানব-জীবনে এইটুকুই এখনকার মতন সান্ত্বনা।

জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল ফুরিয়ে যাওয়াটাই বোধ হয় সেই চূড়ান্ত দেয়াল,—যার ওপারে আর কোনো পথ নেই। বঙ্কিম-চন্দ্রের 'কমলাকান্ত' মনের সেই দুর্গতির দুশ্চিন্তায় বড়োই কাতর হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে অনুভব করেও বঙ্কিমচন্দ্র নিজের কলম ছাড়েন নি। বরং, সেই মানসিক শূন্যতা-বোধের বাইরে যাবার পথ দেখিয়ে গেছেন তিনি। বলেছেন যে, বাহ্য, ব্যবহারিক জগতের ওপর বেশি মনোযোগী থাকাটা ভালো নয়। কমলাকান্ত দেখেছিলেন—'মন! মন আবার কি? টাকা ছাড়া মন কি? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই; টাঁকশালে আমাদের মন ভাঙে গড়ে। টাকাই বাহ্য সম্পদ। হর হর বম্ বম্!'

এসব হয়তো মামুলি কথা। হয়তো টাকার ওপর বেশি রাগ প্রকাশ করা টাকার আকাঙ্ক্ষারই ভাষান্তর মাত্র। শরীরের ভার তারই তো বেশি লাগে, যার শরীর অসুস্থ। কমলাকান্ত কিন্তু সেভাবে বলেন নি। তিনি লিখেছিলেন—

'তোমাদের কথা আমি বুঝি। উদর নামে বৃহৎ গহ্বর, ইহা প্রত্যহ বুজান চাই; নহিলে নয়। তোমরা বল যে, এই গর্ত যাহাতে সকলেরই ভাল করিয়া বুজে, আমরা সেই চেষ্টায় আছি। আমি বলি, সে মঙ্গলের কথা বটে, কিন্তু উহার অত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই গর্ত বুজাইতে তোমরা এমনই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছ যে, আর সকল কথা ভুলিয়া গেলে।'

সেই আর সকল কথা কী কী? কমলাকান্ত সংক্ষেপে লিখেছিলেন—'মনের সুখ'। মনের সুখ, মানে, মনের সেই প্রসন্ন অবস্থা বা সেই চাঞ্চল্য, উত্তেজনা ব উদ্দীপনার ভাব, যার ফলে অবসাদ তার কাছে ঘেঁষতে পারে না। স্রেফ-অবস্থায় অস্তিত্ববোধ-কে আর দেয়াল বলে মনে হয় না। মনকে সেই ফাঁকটুকু দেওয়া দরকার।

সেই ফাঁক কি মাথার ওপর অসীম আকাশে? সে কি সমুদ্রে, অরণ্যে, নিথর নির্জনতর দিগন্তে? 'কমলাকান্ত' জানিয়ে-ছিলেন—'পরের বোঝা কেন ঘাড়ে করিব, এই ভাবিয়া সংসারী হই নাই। তাহার ফল এই যে, কিছুতেই আমার মন নাই।' তাই তিনি তাঁর গভীর যন্ত্রণাময় কৌতুকবশে জানান—'তোমরা কেহ কমলাকান্তের একটি বিবাহ দিতে পার?'

তাঁর বিবাহের প্রস্তাবটি পরিহাস বটে, কিন্তু তারই আড়ালে তাঁর গম্ভীর মুখভঙ্গি ছিল। কমলাকান্ত বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির জন্যে নয়, প্রীতি-শিক্ষার জন্যেই এই সংসারের বন্ধন দরকার।

অর্থাৎ কেবলমাত্র বিনোদনের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করলে চলবে না,—চাই দুঃখস্বীকৃতি, চাই কর্মযোগ!

এসব গভীর কল্যাণবাণী যদিচ বুদ্ধির দ্বারা কতকটা স্বীকৃত, তবু ভেতরে ভেতরে বিনোদনস্পৃহা কিছুতেই মরে না। ব্যক্তিবোধের মূল থেকে যায় সুখের মাটি কামড়ে। দেয়ালের অবরোধ থেকে মুক্তি পাবার শ্রেষ্ঠ উপায় যে দেয়াল ভেঙে ফেলা,—একথা কে না জানেন? সেই জ্ঞানের তাড়নাতেই কান্তকবির রচনা দেখা দিতে পারে মনে—

তোর ভারি পক্ক মাথা
বিজ্ঞানের মস্ত খাতা
চন্দ্রলোকে যাবার রাস্তা
করেছিস প্রশস্ত
(তুই) নাম করেছিস্ ভারি জবর
ক'টা তাবার রাখিস্ খবর?
কবে, কোথায়, কোন্‌টায় উদয়?
কোন্‌টা কোথায় যাচ্ছে অস্ত?

কিন্তু এই আত্মধিক্কৃতি অল্পজ্ঞানী সাধারণ মানুষের মুখে মানায় না। কান্তকবি ভাবের বশে খাঁটি কথাই লিখেছিলেন বটে। অহংকার দূর করতে বলে গেছেন তিনি। কটাক্ষ করে লিখে গেছেন—

দু'দিনের জলের বিম্ব
বুঝিস্ তো অশ্ব-ডিম্ব
তুই আবার ভারি পণ্ডিত
খেতাব দীর্ঘ প্রস্থ
কান্ত বলে, মুদে আঁখি
ভাব্‌তো বিশ্ব-ব্যাপারটা কি!
অহংকার চূর্ণ হবে,
সকল তর্ক হবে নিরস্ত!
(অবাক হবি)

অহংকার চূর্ণ হলেই মানুষ নির্বাক হবে,—এতে কোনো মতদ্বৈধের অবকাশ নেই। কিন্তু চিরচঞ্চল এই মর্তের ইন্দ্রিয়লোকে চোখ কান নাক মুখের সুখ-দুঃখই সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষ সংযোগভূমি। তার ওপারে,—এইসব ইন্দ্রিয়-সংযোগ উপেক্ষা ক'রে দেয়াল-ভেদ করবার উদ্দীপনা পরিদৃশ্যমান এই বিশ্ব-ব্যাপারের কোন্ গুহায় নিহিত? সে কি সাহিত্যের পথ? সে কি ভাষার অধিগম্য?

এ সবই মনকে চাবুক মেরে বিনোদনের দিক থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা। এ চেষ্টাও মানসিক, সন্দেহ নেই। এবং এ চেষ্টা জেগে ওঠা তখনই সম্ভব, যখন মনের অবসাদ দূর হয়ে যায়। নিজের মনের অবসাদ না কাটলে নায়ক-নায়িকার অবসাদ কি আদৌ দেখা যায়? রবীন্দ্রনাথ অবসাদমুক্ত ছিলেন বলেই কালী-পদকে বা দক্ষিণাবাবুকে দেখতে পেয়েছিলেন—দেখাতেও পেরেছিলেন। শরৎচন্দ্রের মনে কোনো দুর্ভেদ্য দেয়াল ওঠে নি বলেই নানা জীবনের নানা দেয়াল তিনি দেখতে পেরে-ছিলেন। এদেশে ভারতচন্দ্র, দাশু রায়,—এবং তাঁদের আগের আরো সব সাহিত্যিক-মন এইভাবেই নিজের নিজের অহংকার জাগ্রত রেখে সুখী হয়েছিলেন।

সাহিত্যের পথ বৈরাগ্যের নয়, সুখেরই। ভয় নয়, বিরক্তি নয়, অবসাদ নয়,—পথের আনন্দের জন্যেই এ পথ তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে।

for ELECTROPLATING

●●● CHEMICALS ●●●
●●● POLISHING MATERIALS & its
●●● ALLIED MACHINERIES ETC.

B. C. Maity
& COMPANY

Office: 3, RADHAMOHAN PAUL LANE, CAL-12. Phone: 34-4846
Show Room: 94, PREMCHAND BORAL STREET, CAL-12. Phone: 34-3173

নদীর নিকটে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

নদীর নিকটে থাকব,
নদী যদি ভ্রষ্টা হয়, তবু।

পণ্য নিয়ে পারাপার,
চলুক না বাঁধাঘাটে লাভের বেসাতি,
তবু ছল ছল জল
তীক্ষ্ণ সব তারাদের দ্যুতির নিক্কণে মোহাবেশে
কখনো নিঃসঙ্গ রাতে
হৃদয়ের কূলে বাজবে নাকি।

পৃথিবীতে বহু আগে
আমাদের শৈশবের ভোরে
কোনো এক সন্ধ্যাভাষা নিয়ে বুঝি
বয়েছে নদীরা।
পিতৃপুরুষেরা সব সেই ভাষা শিখেই মোহিত
গাঢ় মৌন প্রত্নপলি বুকে টেনে নিয়েছে বিদায়।

উচ্চারণ শেষ হ'লে
সময়ের স্রোত থেকে ইচ্ছাসুখে সরে যেতে হয়
নদীদের দীক্ষা শুধু তাই।

আমার এ নগরের গভীর হৃদয়ে
আজও সেই সর্বনাশা নদীর মন্ত্রণা
শুনব বলে কান পেতে থাকি।

যাদের বনেদ পাকা,
বাঁধ বেঁধে পাড় গেঁথে গেঁথে
ভাবে তারা নদী বুঝি
চিরকাল থাকবে নালা হয়ে।

তারা 'ত জানে না
সব নগরের সাধ আপনাকে নদীতে হারানো,
সিন্ধি তাই!

মনে ছিল*

অমিত দত্ত

মনে ছিল, বর্ষার মেঘের মতো আমি
ঢেকে দেব তোমার নীলিমা।
যদিও তোমার মন, তোমার হৃদয়,
সব সীমা
অতিক্রম করে আছে,—
তবু মনে হয়েছিল, যদি আর
না-ই পাই কাছে,
তবে নির্বাসন দেব চির-বিস্মৃতির
পরপারে
আমার মনের রাজ্য থেকে
সেই সুবর্ণ সীতারে।

তবু সেই রূপ
আমার সংকল্প টুটে বারবার আমারই
করেছে বিদ্রূপ।
কারণ, যায় না ঢাকা আলো-কে
জলের ছায়া দিয়ে,
শরতের নীলাভার মতন
যা রয়েছে ছড়িয়ে
দৃষ্টির সম্মুখে আর চেতনার
প্রত্যক্ষ সীমায়
যায় না ঢাকা দু' চোখের
পল্লবের ছায়।

তোমার সমস্ত রূপ একেবারে
মুছে দিতে চাই
আমার পল্লবে; বলো, এত বাষ্প
কোথা থেকে পাই?

আগুন তাদের প্রাণ

মনীশ ঘটক

কী রোদ্দুর, কী রোদ্দুর, আগুনের সমুদ্দুর যেন॥

চীড় খাওয়া শুক্‌নো মাঠ আগুনের হলকায় হাঁকে
আগুনের ঢেউ লাগে আকাশে বাতাসে মুখে চোখে.
তেষ্টায় ফটিকজল পাখ্‌না পুড়ে মাটিতে গড়ায়,
পাঁকে মোষ নাক তোলে, সাধ্যি কার, একটু নড়ায়!
রক্ত ঝরে পলাশের রিক্ত ডালে ঝর ঝর ঝর
আগুন পারে না শুধু শুষে নিতে সে রক্তনিঝর।
আগুন পারে না নিতে কেড়ে ভালো ছেলেটার বাঁশি,
আগুন পারে না দিতে মুছে কালো মেয়েটার হাসি।
মহুয়া ফুলের গন্ধ দিকে দিকে আগুন ছড়ায়,
মহুয়া ফুলের মদ রক্তে রক্তে অজান্তে ধরায়।
কালো ছেলে মেয়ে দুটো সাধ করে সে আগুনে পোড়ে,
খলখল হেসে খায় লুটোপুটি গলাগলি করে।

আগুন তাদের প্রাণ, সে আগুন নেভে নি এখনো॥

ঘর পায়ে

শীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঘৃষ্টিতে ভেজা কাকটা ঐ-যে
মাথার ওপর আড়াল খুঁজছে,
ওকে জিজ্ঞাসা করঃ
কেন ঘর ছেড়ে এসেছে এমন বর্ষা মাথায়
কেবল কাঁপছে! কী জন্য ওর এই
পাগলামো!

তোর মতোই কি ভয়ানক জ্বর গায়ে
শীতলতা ভেবে ঘর ছেড়ে এলো পাখী
দশদিক কালোকরা কান্নায়?.....
একা!

আরও একবার

রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্তী

অন্তত একবার বেশ স্পষ্ট করে
জেগে উঠতে চাই।
বিছান্যর ষড়যন্ত্র ভেঙে ফেলে দিয়ে—
রাত্রি, আমি অন্তত একবার
আজকেই দাঁড়াতে চাই তোমার
জানালায়।।
আমার চারদিকে তুমি কী চক্রান্ত
এঁটেছ মশারি?
খাটের বাজুতে মাথা, কী তুমি ভাবছ
বসে নারী?
সমস্ত ভাবনার জাল ছিঁড়ে ফেলে
অন্তত একবার
বেঁচে উঠতে চাই।

মৃত্যু কি ঘরের মত ঘিরে থাকে?
মনে হয়েছিল,
একটাও জানালা নেই ঘরে।
নিদ্রা কি নদীর মত বয়ে যায়?
মনে হয়েছিল,
ভেসে উঠব নদীর উপরে।
অথচ ঘরের মধ্যে, জলতলে,
টাঙালে মশারি;
অথচ কান্নার মত দাঁড়িয়ে রইলে
তুমি নারী।
আমি যে সমস্ত কান্না মুছে ফেলে
অন্তত একবার
হেসে উঠতে চাই।

দেবদূত

জগন্নাথ চক্রবর্তী

দেবদূতেরা আজো তোমার বহুরূপী
চমকে দিতে মর্তে নামেন চুপিচুপি
দেবদূতেরা আজো আছেন স্পষ্ট জানি,
আজো আছে হঠাৎ-শ্রুত দৈববাণী।

দেবদূতেরা মনোলোভন হঠাৎ আসেন
ভালোবাসার আগেই তাঁরা ভালোবাসেন
হাতের তুলি কাড়েন তাঁরা ছড়ান মোহ
কণ্ঠে বোলান মুগ্ধ সুরের সমারোহ।

ঝর্ণা করে কবিতাপাঠ, এরোপ্লেনে
শব্দ বাজে মহাকাশের, রাতের ট্রেনে
সহস্রাক্ষ-সহস্রপাৎ দেবদূতেরা
স্বপ্ন হয়ে স্বপ্নে করেন চলাফেরা।

রক্তে নামেন, রাত্রে ডাকেন নতুন নামে
পত্র লেখেন সাংকেতিকে নতুন খামে;
গল্পে এসে বসেন তাঁরা, সমস্তক্ষণ
আদায় করেন সমস্ত সুখ সমস্ত মন।

কে বলে নেই দৈববাণী আকাশে আর,
কে বলে নেই? কেরলবাগে শকুন্তলার
বুকের মধ্যে রথের চাকা কে বলে নেই?
আকাশ এবং আকাশবাণী রয়েছে সেই।

যখন চোখে জ্বলে কোমল মোমের বাতি
বৃষ্টি-কাজল মেঘের নীচে কাজল রাতি,
মনকে টানে দূরের আকাশ, তখন তাঁরা
আবহমান সৃষ্টি করেন তোলেন সাড়া।

রীজে কিংবা ওভাররীজে, কিংবা লেকে
ঘূর্ণি ওঠে ঝরাপাতার কাল বোশেখে;
রক্তে নামেন, তীক্ষ্ণ আলোয় দৃষ্টি
ঢাকেন
দেবদূতেরা বুকের কাছে স্পর্শ রাখেন।

দেবদূতেরা হঠাৎ আসেন, যখন দুয়ার
ঝড়কে ঠেলে দুহাত দিয়ে অসংখ্যবার
যখন দেহ বুনো গোলাপ শ্রাবণ-নদী
তখন তাঁরা দেহের মধ্যে নিরবধি।

নিথর রাতে নিদ্রাবিহীন জ্বলে নিয়ন
স্বপ্নাতুরার বুকে গভীর একর্ডিয়ন
আপনি বাজে, তখন দূরের দেবদূতেরা
গানের মধ্যে প্রাণের মধ্যে বাঁধেন ডেরা।

আমাদের এই স্নায়ুর মধ্যে চোখের
দেখায়
মর্মরে বা চিত্রপটে কিংবা লেখায়
দেবদূতেরা আছেন বলেই কাছাকাছি
স্বপ্ন আছে, সত্য আছে, আমরা আছি।

খণ্ডিত বসন্ত

রানী রায়

এখন বসন্ত তুমি গিয়েছ কোথায়?
দ্রবীভূত শিলাস্তূপ
শেওলার স্বেদধরা,
কালো ব্যাঙছাতার বিলাস;
অনেক বিভ্রান্ত বর্ষ দুর্দম প্রকাশ;
জীর্ণ-শীর্ণ জরাগ্রস্ত যযাতির নাও,
এখন নাবিক, কেন নাও না ভিড়াও
বন্দরের শ্বেতসৌধে
বিশ্রান্ত মাধব
বৈশাখের রৌদ্ররসে হিজলতলায়
আলস্যের পত্রদলে নির্বাক ঘুমায়।
হিজল-বার্চ ও শাল-জটিল সিকতা,
রুক্ষ-দগ্ধ, পায়ে পায়ে কাঁটার ব্যগ্রতা;
এমন পর্বতভূমে বিচূর্ণ বালির
কখনও পিণ্ডের রূপ, কভু পিরামিড;
পদপর্যটনে পন্থী, একই শেষ দেখি,—
—নৈরাশ্যের বালুবেলা।
সরে গেল দূরে
অনেক মাধব শেষে একখণ্ড ভূমি
বসন্তের চিরশোভা,
সাজানো সেখানে;
(সময়ের স্রোত থেকে ছিনিয়ে নিবেছে;
আপন মনের রংএ সে তো সাজিয়েছে;
যেখানে সোনালী যত, পদ্মরাগ-রং,
যেখানে সুনীল আর বাসন্তীর ঢং)
—সেখানে কম্পিত-পায়ে
পদক্ষেপ চাই।
একখণ্ড সেই জমি!
বসন্ত, বসন্ত, তুমি নির্দয় আগুন,
দাহ আনো, জ্বালা আনো,
আনো না ফাল্গুন॥

চতুর্দিকে ভীষণ সময়

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

চতুর্দিকে ভীষণ সময়। মগ্নতায়
আমি কিছু সুরভিত ফুলের সন্ধানে
লুপ্ত হতে চাই। রক্ত, ক্লেদ, স্বেদ
রোজ ঝরছে দিনান্তের নাভিমূল হ'তে
বিনিদ্র ঋতুর মুখেচোখে,
বিবর্ণ অধরে।

ফুলের সন্ধানে একবার
কোথাও বৃক্ষের নীচে অগম্য নির্জনে
ফিরে যেতে, ঘ্রাণ ফিরে পেতে
সাধ হয়। অথবা সমুদ্রকন্যার মতো কেউ
যদি উঠে আসে শান্ত পায়ে
দ্বীপের নির্জনে স্বচ্ছ বালুকা সৈকতে
সমস্ত ভ্রান্তির চিহ্ন মুছে দেবে বলে'
হাতের ছোঁয়ায়।

সব দৃশ্য সজ্জিত হলেও সারাক্ষণ
সন্ত্রাসমন্থিত; যেন সুন্দরী নারীর
লাবণ্যে ঢল সারা দেহে,
এখন পীড়িত হবে তীব্র অপ্রেমের;
হিংস্র বাহুপাশে। চতুর্দিকে
ক্ষুধিত দিনের থাবা অস্তমিত আকাঙ্ক্ষার
বিমর্ষ চোয়ালে।

যদি তবু আবার কখনো
নিঃশব্দ গাছের শীর্ণ ডালপালা সব
সবুজের বর্ণ ফিরে পায়,
নদীবক্ষে ছলছল জলের জোয়ার
ফিরে আসে; আমি সেই মগ্ন প্রতীক্ষায়
স্থির হতে চাই। চতুর্দিকে কণ্ঠরোধ
করে যেন
ভীষণ সময়॥

অতিদেশ

গোপাল ভৌমিক

ও মুখে চরিত্র নেই,
ও আকাশে ঝড় নেই জেনে
কি করে সহজে নেব
এক সাথে দুটিকেই মেনে
ভেবে তার পাই না ঠিকানা।
অথচ সামনে দেখি
সে হদিস কারও কারও জানা
এবং তাদেরই দেখি জয়জয়কার।

কার চোখ ঠিক কে তা জানে!
চশমার পাওয়ার কত
কে কোথায় খোঁজে কোন মানে
সে কথা জানলে পরে
হয়তো বা পেতাম কিনারা।
আপাত-চালসে চোখে
বর্তমানে আমি দিশাহারা
দেখি বড় দলে ভারী তারা।

নিজেকে বিশ্বাস করে
তবু একা একা পথ চলি?
বহু মত বহু পথ
পার হয়ে কত অলিগলি
সেই স্থির লক্ষ্যে চাই যেতে!
যারা ভাবে ভ্রান্ত আমি
তারা সব ছিল, আছে
এবং আনন্দে থাক মেতে।

সাতকড়ি দত্ত

উৎপল দত্ত

ঘেঁটে অনেক পুরাতত্ত্ব
হাস্যকর ইতিবৃত্ত
খুঁজে পেয়েছি এক নাম
সাতকড়ি দত্ত।

লোকটা ছিল অভিনেতা
মুখে মাখত রং
জবরজং,
বাঁদরের ল্যাজের মতন ঝুলিয়ে তলোয়ার
পরণে রঙিণ সালোয়ার,
মাথায় পরচুলে ঢাকা টাক,
তার উপর শিরোপা এগারো পাক,
হেসে কেঁদে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে
মিনার্ভা কাঁপিয়ে
ভরেছে অনেক সন্ধ্যে।
ইয়ারিক-এর খুলির মতন সাতকড়ির নাম,
হাড়ের উপর স্তরে স্তরে পেলাম
বহু আবেগের ছাপ।
কন্যাশোকাতুর শাজাহানের অভিশাপ,
দারার চোখের জল
আলমগীরের ছল।
পাঁজরার হাড়ে হাড়ে আরো পেলাম
হাততালির প্রতিধ্বনি,
যা বেজেছে ওর বুকে প্রতিদিনই
সহস্র মানুষের সরব পুজো।
যবনিকার উপর রাতের পর রাত
সাতকড়ি শুনেছে অনুনয়ের করাঘাত,
দেখা দাও হে সুন্দর, হে দীপ্যমান
সাতকড়ি দত্ত ওরফে শাজাহান।

সাতকড়ির কংকালে অনেক ইতিহাস
হাড়ের খাঁজে খাঁজে অনেক উচ্ছ্বাস।
পেলভিসের কাছ ঘেঁষে পেলাম আর এক তত্ত্ব ঃ
সাতকড়ি দত্তর,
যেখানে থাকত লাল কোমরবন্ধের পলস্তারা
তার উপর বাঁকা ছোরা,
ঠিক তার নীচে হাড়ের ফাঁকে
এক শূন্যতা।
বাড়ীর পথ ধরত বিজয়ে উন্মত্ত
সাতকড়ি দত্ত
নিজের ব্যাপ্তিতে নিজেই আশ্চর্য
অমরত্বের আসন ধার্য
উত্তরকালে,
টগবগিয়ে চলে
মোগল যুগের এক টুকরো
সতু মিস্ত্রি লেনের দিকে।
সহস্রের প্রশংসা কণ্ঠ পেয়েছে পথচলায়
সেই হর্ষের প্রতিধ্বনি পথের ধুলায়,
তাই বুক ফুলিয়ে হাঁটেন শাহেনশাহ
চোখে মুখে এসে লাগে ভক্তের ছুঁড়ে দেয়া
এক এক স্তবক রাত্রি।
সেই সংগে আরেক কাহিনী পেলাম
মাথার ঘাম ফেলে পায়ে
লোকটা মরেছিল না খেতে পেয়ে।

হানিমুন ও হাসপাতাল

পরিমল গোস্বামী

॥ এক ॥

আদ্যানাথের মেজাজটা আজ ভয়ানক রকমের চড়া। তিনি সকাল থেকেই যেভাবে গরম হয়ে উঠেছেন, তাতে তাঁর কাছে এগোনোর সাহস ছিল না কারো।

সকালে যাদের দেখা করতে আসবার কথা ছিল, তাদেব প্রত্যেককে তাড়া করে বাড়ি থেকে বার কবে দিযেছেন। সমস্ত রাত ঘুম হয় নি। সমস্ত দোষ গিয়ে পড়েছে স্ত্রী সুকুমারীর উপর। কেন তুমি ঐ ছোকরাকে এতদিন প্রশ্রয় দিয়েছ? কেন তুমি তাকে রোজ চা খাইযেছ? কেন তুমি তাকে চন্দ্রার সংগে মিশতে দিয়েছ? কেন তুমি নানা অনুষ্ঠানে দু-জনকে একত্র গান গাইতে দিয়েছ? কেন তুমি ওদেব একসংগে হিন্দি-বিরোধী আন্দোলন চালাতে দিয়েছ?—ছি ছি, এমন কলঙ্ক চোদ্দ পুরুষে ঘটেনি আমাদের পরিবারে। আব, কি সাহস ছোকরার! আমার কাছে এসে বলে কি না আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই! এ কি বিলেত পেয়েছ? এ কি মগেব মুল্লুক? আমরা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, আমাদের চিবদিন বারেন্দ্রর ঘরে বিয়ে হয়েছে। আর ঐ ছোকরা, কোথাকাব কোন্ বিপুল বাঁড়ুজ্জে আমাদের পরিবারের আইন ভাঙতে চায—ওর এত বড় স্পর্ধা।

আদ্যনাথ লাহিড়ী এইভাবে তাঁর কন্যা চন্দ্রার সহপাঠী বন্ধু এবং তাব পাণিপ্রার্থী বিপুল বাঁড়ুজ্জের আদ্যশ্রাদ্ধ সমাপন করলেন সকালবেলা উঠেই।

সম্মুখে নীববে দাঁড়িয়ে সুকুমারী। তাঁর কোনো কথারই উত্তর দেবার প্রবৃত্তি হয় নি এতক্ষণ। তা ছাড়া এতগুলি 'কেন'র উত্তর তিনি দেবেনই বা কি করে?

আদ্যানাথের কণ্ঠ নিস্তেজ হতে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় লাগল, এবং সুকুমারী যখন বুঝলেন এর পর উত্তেজনা বাড়লেও তিনি আর বেশি চেঁচাতে পারবেন না, তখন খুব সংকোচের সংগে এতগুলি প্রশ্নের সামান্য একটুখানি উত্তর দিলেন। আজকাল তো বিয়েতে কেউ জাতই মানছে না, এ তো তবু এক জাতের মধ্যেই আছে।

আদ্যানাথ এর উত্তরে আরও সংক্ষেপে বললেন, বারেন্দ্র আর রাঢ়ী এক জাত হল? হুঁ, বুঝতে পেরেছি সবই—বলে তিনি তাঁর কাঁচাপাকা ঘন দাড়ির মধ্যে ডান হাতের সমস্তগুলি আঙুল চালিয়ে দিয়ে দাড়িগুলি মুঠো করে টেনে ধরলেন। এটি তাঁর ক্রোধের চরম অবস্থা। এবং এ দাড়িও উদ্দেশ্যহীন নয়, দাড়ি তাঁর বংশের প্রতীক, বংশের বারো আনা মর্যাদা ঐ দাড়ির মধ্যে বহু পুরুষ ধরে সংরক্ষিত হয়ে আসছে।

॥ দুই ॥

সেইদিনই সন্ধ্যায় চৌরংগী অঞ্চলে কোনো চায়ের দোকানের ক্যাবিনে বসে বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায় আর চন্দ্রা লাহিড়ী তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে জরুরী আলোচনা করছিল। সামনে পরিবেশিত নানা খাদ্য, চপ-কাটলেট ইত্যাদি, প্লেট ও মুখের মধ্যে দ্রুত সম্পর্ক রক্ষা করে চলছিল—আলোচনার সংগে সমান তাল রেখে।

ভাল কবে ভেবে দেখ, পারবে?—চায়ে চুমুক দিয়ে বিপুল পুনরায় বহু জিজ্ঞাসিত প্রশ্নটি আরও একবার জিজ্ঞাসা করল।

বাবার ভয় করবে না?

না।

পিত্রালয় হয় তো চিরদিনের জন্য ছাড়তে হবে।

সেটুকু ভেবেছি। তা ছাড়া এ ভিন্ন তো আর গতি নেই এখন।

অনুতাপ হচ্ছে না তো?

মাস কয়েক পরে বোঝা যাবে সেটা।

কত সংগে আনতে পারবে?

আমার তো মাত্র হাজারখানেক টাকা আছে। সবই আনবো। সংগে আর কিছুই থাকবে না। শুধু একটি ব্যাগ।

আর আমার সংগে থাকবে প্রায় আড়াই হাজার। তিন-চর মাসের জন্য নিশ্চিন্ত। তারপর ভাবা যাবে তার পরের ধাপ কি।

তোমারও কি অনুতাপ হবে তখন?

তাপের সময়টা চলে যাক আগে। কিন্তু আসল সমস্যাটা তা নয়। আসল সমস্যা হচ্ছে তোমার রাত বারোটায় বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা। সংগের ব্যাগটি কত বড় হবে?

খুব বড় নয়, অথচ দিনেরবেলা সেটি নিয়ে বেরোলে পালিয়ে যাওয়াটা স্পষ্ট বোঝা যেত। এইবার আন্দাজ কর, কত বড়।

মনে, কেউ দেখে ফেললে আটকাবে?

অত রাত্রে দেখবার কেউ থাকবে না। ঝিয়ের সংগে সব ব্যবস্থা পাকা করেছি।

কিন্তু এ কথা শেষ হতে না হতে চন্দ্রা সচকিত হয়ে উঠল। পাশের ক্যাবিনে তার বাবার কণ্ঠ! দ্বিতীয় আরও একটি কণ্ঠ—সেটিও অতি পরিচিত। সেটি আদ্যানাথের উপদেষ্টা ও বন্ধু জগদীশের। ওরা দু-জন সভয়ে চুপ করল। পার্টিশন খুব উঁচু ছিল না। আদ্যানাথের গলা শোনা গেল—শুধু দু'-পেয়ালা চা।

তারপর বললেন, তোমাকে পথে হঠাৎ দেখতে পেয়ে ভাল হল, আর সেজন্য এখানে বসে দু-চার মিনিট আমার কয়েকটি জরুরি কথা তোমাকে বলবাব সুযোগ পেয়ে গেলাম। তুমি কি শুনেছ চন্দ্রা বিগড়ে গেছে?

না, শুনিনি তো। তোমার মেয়ে হয়ে বিগড়ে গেছে, এ কথা কে বিশ্বাস করবে? তোমার তো কড়া শাসন। কি হয়েছে বলতো?

সে আমাদের পারিবারিক প্রথা উল্টে দিয়ে এক রাঢ়ীকে বিয়ে করতে চায়। মুখে শাসন করে বোধহয় কিছু করা যাবে না। একসংগে

পড়ে। একসঙ্গে সভা করে। হিন্দি-বিরোধী আন্দোলন চালায়। ছোকরা বোধহয় ওকে ভুলিয়েছে।

তা কিন্তু জোর করে বলা যায় না। উল্টোটাও তো হতে পারে। এ বিষয়ে তোমার বিচার নিরপেক্ষ হবে কি?—জগদীশ একটু হাসলেন, কথাটি বলে।

কিন্তু এ তো মহা জ্বালাতন! এ কি রকম যুগ এলো? এখন কি হবে আমার? যা হোক একটা কিছু বল, ভাই।

ভাবছি।

বিপুল ও চন্দ্রা পাশের ক্যাবিনে ভীষণ মজা অনুভব করছিল এ সব কথায়। দুজনেরই মুখ এখন কৌতুকে উজ্জ্বল। বিপুল তার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল পাশের পার্টিশনের দিকে লক্ষ্য করে ঘোরাতে লাগল। অর্থাৎ আপনাদের এ সব ভাবতে হবে না কিছু, ভেবে লাভও নেই, কারণ আজই আমাদের রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয়ে গেছে।

জগদীশচন্দ্রের কণ্ঠ শোনা গেল। তিনি বললেন, কিছুই করা যায় না ভাই। কলেজে পড়ে, নিজের ভালমন্দ এখন ওকেই ভাবতে দাও। তুমি বরং এ সব বিষয়ে চোখ বুজে থাক।

চন্দ্রা চাপা সুরে বিপুলকে বলল, জগদীশকাকা বিজ্ঞ মানুষ।

আদ্যানাথের কণ্ঠঃ—সে পথ তো পড়েই আছে, তোমাকে তবে ডেকে আনলাম কেন এই চায়ের দোকানে?—কিন্তু যাই বল, আমি ওকে বাধা দেব।

বিপুল আরও একবার পার্টিশনের দিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন করল।

॥ তিন ॥

রাত্রি সাড়ে এগারোটা। শীতকালের রাত্রি, অনেক বাড়িতেই আলো নিবে গেছে। পথে অবশ্য গাড়ি চলা থামেনি। লোকও কিছু কিছু। কিন্তু নিতান্তই দায়ে পড়ে, অথবা শৌখিন সিনেমা-ফেরত তারা।

আদ্যানাথের বাড়িতে তখন রাত দুপুর। দমস্ত দিন খুব রাগারাগি করে মনের গ্লানি অনেকখানি দূর হয়েছে, অর্থাৎ প্রাচীন ভাষায় যাকে বলে ক্যাথারসিস। তারই অন্তে ক্লান্ত মন ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রমদা কি নিচে তার ঘরে জেগে বসে মশার সঙ্গে লড়াই করছে।

ঘড়িতে বারোটা বাজতে আর দশ মিনিট। বাড়ির দরজায় একখানি বড় গাড়ি এসে থামল খুব ধীরে ধীরে। বিপুল অনেক ঝুঁকি নিয়েছে এ জন্য। গাড়িখানা তার বন্ধুর, বন্ধুই চালিয়ে নিয়ে এসেছে।

চন্দ্রা এই গাড়ির জন্য উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করছিল। এবার তার চরম পরীক্ষা। পা কাঁপলে চলবে না। ব্যাগটি হাতে শক্ত করে ধরতে হবে। নামছে, চন্দ্রা নামছে সিঁড়ি দিয়ে। চিরকালের বাড়ি ছেড়ে সে চলেছে। কিন্তু কোথায়?

মট্ করে শব্দ হল না?

নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ল সিঁড়ির মাঝপথে।

না, ভয়ের কিছু না। প্রমদা পা টিপে টিপে উপরে উঠে আসছে। সে এসে তার ব্যাগেজ বোঝাটা নিজ হাতে টেনে নিল।

আবার অবতরণ। না, অধোগমন? এক পা এক পা। কিন্তু পা কাঁপছে, বুক দুরু দুরু। এমন অপরাধের কাজে প্রথম। এবং সে মেয়ে। কিন্তু সে বিবাহিত। এ কথা স্মরণ হতেই মন থেকে অপরাধবোধ দূর হয়ে গেল। শুধু মায়ের জন্য বেদনা। পরে চিঠি লিখে জানাবে সব। এইটুকু মাত্র সান্ত্বনা, এইটুকু মাত্র মনের জোর এখন যদি হঠাৎ ধরা পড়ে তখন কোনো লজ্জাই থাকবে না। তখন সে চেঁচিয়ে দশজনকে শুনিয়ে বলবে, সে তার স্বামীর সঙ্গে চলেছে। সেজন্য সে তৈরী হয়ে আছে।

তবু তবু পলায়ন। চিরদিনের ঘর ছেড়ে পলায়ন।

পা কাঁপছে, বুক দুরু দুরু। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে।

কি দরজা খুলে দিল।

এর পরদিন যখন প্রমদাকে জেরা করা হবে তখন সে সত্যি যা ঘটেছে তাই বলবে। অবশ্য আধা সত্যি। বলবে দিদিমণি তাকে জাগিয়ে দরজা খুলে দিতে বলল, সে খুলে

বিপুল আরও একবার পার্টিশনের দিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন করল।

দিয়েছে। কোথায় যাচ্ছে তা সে জিজ্ঞাসা করে নি। তার একটা জিনিস মোটেই বলবে না। সে চন্দ্রার কাছ থেকে এজন্য অনেক টাকা পেয়েছে। তার দু-তিন মাসের খরচ চলে যেতে পারে এত টাকা।

॥ চার ॥

গড়িতে ওঠা পর্যন্ত কোনো বাধা হল না। যাত্রা শুভ। সবই শুভ। ভিতরে বিপুল। চন্দ্রা তার পাশে গিয়ে বসল। স্টিয়ারিং-এ বিপুলের বন্ধু।

চন্দ্রা চলল। কোথায়, জানে না। এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে কাউকে কোনো কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। চেনা মুখ যেখানে নেই। আপাততঃ তার এটাই সব চেয়ে বেশি দরকার।

বিপুল ঠিক করেছিল মোটরে প্রথমে ওরা কাশী পর্যন্ত যাবে। বন্ধুকে সেখান থেকে বিদায় দিয়ে তারপর তার পরের ধাপ ঠিক করবে। কিন্তু কাশীতে এসে ওদের মনে পড়ল এখানে থাকা নিরাপদ নয়। বহু পরিচিত লোকের দেখা মিলবে পথে বেরুলেই। তাই মাত্র দুদিন এখানে থেকেই ওরা বম্বে যাওয়া ঠিক করল। অন্ততঃ একমাত্র উপদ্রবহীন শান্তি চাই। তার জন্য খরচ বেশি হলেও চাই।

বম্বেতে কেউ পরিচিত আছে কি না মনে পড়ল না। অতএব সে দিক থেকে কাল্পনিক কোনো ভয়ের কারণ ঘটল না। দুজনেরই মনে এক অদ্ভুত দুঃসাহসিক অভিযানের পুলক, কোনো দুঃখকেই আর দুঃখ বলে মনে হচ্ছে না। বিপুল তার হিন্দি-বিরোধী সমিতির কথাও এখন প্রায় ভুলে গেছে। তাদের জীবন থেকে যেন অতীতটা অস্পষ্ট হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। এখন শুধু বর্তমান। এমন কি ভবিষ্যৎও কিছুমাত্র চিন্তার কারণ ঘটছে না।

ওরা রেল গাড়ির মধ্যে ভবিষ্যতের আলোচনা এক মিনিটেই শেষ করেছে। বুঝতে পেরেছে মাসখানেক বাইরে থাকলেই বাড়ির আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে আসবে, তখন ফিরলেই হবে। ইতিমধ্যে কাগজে হয় তো বিজ্ঞাপনও বেরুবে, চন্দ্রা ফিরে এসো, তোমাকে ক্ষমা করা হয়েছে। কিন্তু কে আর সে বিজ্ঞাপন দেখতে যাচ্ছে?

চন্দ্রা কাশী থেকেই সব জানিয়ে তার মাকে চিঠি লিখে দিয়েছে। সমস্ত খুলে লিখেছে, শুধু প্রমদাকে বাঁচিয়ে।

ট্রেনে ছুটে চলতে ভয়ানক ভাল লাগছে। এত দীর্ঘ পথ চন্দ্রা কখনো ট্রেনে যায় নি। মন এখন খুবই হাল্কা। একবার হেসে বিপুলকে বলেছিল, সবটাই ছেলেমি মনে হচ্ছে মাঝে মাঝে। ছোটরা যেমন পথ হারিয়ে ফেলে, আমরাও যেন তেমনি করে পথ হারিয়ে ফেলেছি।

বিপুল সংক্ষেপে বলেছিল, পথ হারাইনি, আমরাই হারিয়ে গিয়েছি।

অনুতাপ না কি?

না। এখন কি আর অনুতাপের সময় আছে? সে ভবিষ্যতে দেখা যাবে, কি বল?

সে তো ঠিকই। যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু তা ভেবে আজকের এই রোমাঞ্চ নষ্ট করি কেন?

তুমি ভাবছ, দুদিনে ফুরিয়ে যাবে এই রোমাঞ্চ?

কিছুই ভাবছি না। গেলেও রোমান্স ফুরোবে না।

বোধহয় প্রথম প্রথম ঐরকম মনে হয়।

দেখো, শেষেও ঐরকম মনে হবে।

তুমি একটি অপরাধী, নারীহরণের মামলায় ফেলব তোমাকে। একটি নিরপরাধ মেয়েকে ফুসলিয়ে ঘর থেকে বার করেছ।

তা পারবে না। উল্টে তুমিই ছেলেধরার মামলায় বছর পাঁচেক জেল খাটবে।

মোটেই না। বিচারক সব শুনলেই বলবে, ও! বিয়ে হয়েছে? তা হলে তো যাবজ্জীবন জেল হয়ে গেছে। এর উপরে আর কথা নেই। ছেলেধরার অপরাধে তিন বছর, ও বিয়ের দরুণ যাবজ্জীবন, জেল। দুটোই একসঙ্গে চলবে—both the sentences will run concurrently. এখন বুঝে দেখ, এখন তুমি কি করবে?

আমি এখন চা খাব।

ও সব চালাকি চলবে না। তা হলে তোমার শাস্তি হবে আরও বেশি। কারণ আমার কথা সব উল্টে দিয়ে আমার বয়স বলব ষোল বছর। 'এ মাইনর গার্ল'। তখন কি হবে?

আদালত সে কথা বিশ্বাস করবে না। সবাই জানে মেয়েদের ষোল মানে ছাব্বিশ। ওরা বয়স দশ বছর কমিয়ে বলে।

চন্দ্রার চোখে আগুন খেলে গেল। উনিশকে ছাব্বিশ বললে কোন্ মেয়ে স্থির থাকতে পারে? অভিমানে সে অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

কিন্তু কতক্ষণ? মধ্যপ্রদেশের শীতে অভিমানেও কাঁপতে থাকে। অতএব চা খেতেই হল—এবং দুজনকেই।

ওরা ভবিষ্যৎ চিন্তা সম্পূর্ণ হিমভাণ্ডারে চালান করে দিয়ে শুধু বর্তমানের ছুটে চলাকে নানাভাবে উপভোগ করতে লাগল। তার মধ্যে কৃত্রিম মান অভিমানের অংশ কম ছিল না। সমস্যা দুজনেরই ছিল, কিন্তু তা নিয়ে কে আর মাথা ঘামায় এখন? চন্দ্রাও অনেকটা বিপুলের চিন্তার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছিল, আজ তো জীবনকেই জড়িয়ে ফেলেছে।

এক সময়ে বিপুল বললো, আমরা কি ভয়ে পালাচ্ছি?

চন্দ্রা চমকে উঠে বলল, ভয়ে!—না না ভয়ে পালাব কেন? পালাবার সময় একটু ভয় হয়েছিল, কিন্তু ভয়ে পালাইনি। আর কে বলেছে এটা পালানো? আমি অনেকক্ষণ এ কথাটা ভেবেছি। তুমি কি মনে কর আমাদের এটা দরকার ছিল না? আমি তো মনে করি এটা আমাদের হানিমুন। এইভাবে বেরিয়ে না এলে আমাদের প্রথম বিয়ের জীবনের মধ্যে হিন্দি ঢুকে কি সর্বনাশটাই না করত। তোমার ঐ হিন্দি-বিরোধী সমিতিকে কয়েকটা দিন ভুলে থাকা দরকার ছিল।—এখন ভাবতে থাক বম্বে থেকে আমাদের অজন্তা এলোরার দিকে রওনা হতে হবে, নইলে জীবন বৃথা।

কিন্তু মানুষ যা ভাবে, তা কি সব সময় ঘটে? মানুষের একটি বড় বৈশিষ্ট, সে সব সময় নিজের সঙ্গে একটি প্রচণ্ড অনিশ্চয়তা বয়ে বেড়ায়। এবং এই সর্বজনপরিচিত ঘটনাকে এখানে আমি উল্লেখ করছি একটি বিশেষ কারণে। আমি বলতে চাই যে কিছুক্ষণের মধ্যেই এই দুই কল্পনাস্বর্গগামী নববিবাহিত দম্পতির জীবনে এমন একটি বিপর্যয় ঘটতে যাচ্ছে, যার জন্য তাদের চেয়েও পাঠকদের কিছু পূর্বপ্রস্তুতি থাকা দরকার।

ট্রেনটি সবে কল্যাণ স্টেশন ছেড়েছে। এখান থেকে বম্বে মাত্র ঘণ্টাখানেকের পথ। ওরা দুজন নামবার জন্য তৈরি হবার আগে একবার কি রকম হোটেলে উঠবে আলোচনা করে নিচ্ছে, যাত্রীদের কাছেও জিজ্ঞাসা করছে কোন্‌টায় থাকা সুবিধাজনক, এমন সময় প্রথমে চন্দ্রা, ও পরে বিপুল, হঠাৎ আলোচনার মাঝখানে কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল। তাদের দুজনেরই চোখে-মুখে একটা অস্বাভাবিক ভাব ফুটে উঠল। তারপর প্রথমে চন্দ্রা, ও তারপর বিপুল গলা ছেড়ে গাইতে আরম্ভ করল। দুজনে দুটি বিভিন্ন গান, এবং দুটিই হিন্দি গান!

যাত্রীরা সবাই স্তম্ভিত। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী তাঁরা। এ রকম দুজন দীর্ঘপথযাত্রী যারা সমস্ত পথ ভদ্রভাবে সব রকম শালীনতা বজায় রেখে চলছিল, যাদের কথার মধ্যে এতটুকু অস্বাভাবিক কিছু ছিল না, তারা এখন হঠাৎ এ রকম অস্বাভাবিক ব্যবহার করছে কেন, এ তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না। সৌভাগ্যের বিষয় এঁদের সহযাত্রী ছিলেন একজন তরুণ মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসক। তিনি উপরের একটি বাঙ্কে শুয়ে ছিলেন। তিনি এদের কাণ্ড দেখে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে নিচে নেমে এলেন। কিন্তু তিনি ওদের কাছে আসতেই, তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ওদের পরবর্তী ব্যবহারে। চন্দ্রা এবং বিপুল, ডাক্তারকে ঘিরে লুকোচুরি খেলার ভঙ্গিতে নাচতে লাগল এবং দুজনে মিলিত কণ্ঠে গান গাইতে লাগল।

ডাক্তার বিপুলকে বললেন, আপনি আমাকে বলুন তো এর অর্থ কি? বলতে পারবেন?—বসুন এইখানে আগে।

ডাক্তারের কড়া আদেশে ওরা দুজনেই অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এলো। বিপুল আসনে বসে বলল, এর অর্থ কি আমরা কি করে বলব। আমরা দুজনেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছি বলে মনে হচ্ছে।

আগে কখনো এমন হয়েছে?

না।

ডাক্তার চন্দ্রার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার?

চন্দ্রা ও ঐ একই উত্তর দিল।

চন্দ্রা ও বিপুল দুজনেরই ইংরেজীতে কথা বলা মোটামুটি অভ্যাস ছিল, কাজেই ডাক্তারের প্রশ্নের জবাব দিতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল না।

কিন্তু আবার কথার মাঝখানে চন্দ্রা গান গেয়ে উঠল, এবং ঐ সঙ্গে বিপুলও। এবারেও দুজনেরই কণ্ঠে হিন্দি গান!

ডাক্তার—ডাক্তারের নাম পেরেরা—খুব বড়া সুরে ধমকে উঠলেন। বললেন, আমার কথার উত্তর দিন আগে, তারপর যত ইচ্ছা গান গাইবেন।

এবারেও ডাক্তার পেরেরার কথায় কাজ হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কোন্ রাজ্যের লোক?

বাংলা রাজ্যের।

এখন কোথায় চলেছেন?

বিয়ের পর আমরা হানিমুন করতে বম্বে চলেছি।

হিন্দি গান খুব পছন্দ করেন?

না। আমরা বরং হিন্দির ঘোর বিরোধী।

তবে হিন্দি গান গাইছেন কেন?

জানি না।—বলেই বিপুল গান ধরে দিল। চন্দ্রাও নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। তারপর দুজনে নাচতে লাগল।

ডাক্তার পেরেরা ভাবতে লাগলেন, স্কিজোফ্রেনিয়ার কিছু লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে। স্কিজোফ্রেনিয়া—স্কিজোফ্রেনিয়া—কিন্তু কোন্ জাতীয়? ভ্রূ-কুঁচকে মনে মনে ডাক্তার পেরেরা ভাবতে লাগলেন। তারপর মনে হল, এটা কি হিবিফ্রেনিক টাইপ?—কিন্তু সব লক্ষণ তো মেলে না। ছেলেমিভাবের দিক দিয়ে অনেকটা মেলে, কিন্তু কথায় তো কোনো এলোমেলো ভাব নেই। পারিপার্শ্বিককে কিছু মাত্র গ্রাহ্য না করে নিজেদের মনের খুশি মতন যা ইচ্ছে বলা বা করার দিক দিয়ে সামান্য কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু—ডাক্তার পেরেরা ভাবলেন—একই সঙ্গে দুজনের ঠিক একই লক্ষণ কি করে সম্ভব? এমন কোনো দৃষ্টান্ত তাঁর জানা নেই।

এদিকে ওদের গানের সঙ্গে নাচ চলছে অবিরাম। অন্য যাত্রীরা প্রথমে যেটুকু মজা অনুভব করছিলেন, এখন তার বদলে দেখা দিয়েছে বিরক্তি। তাঁদের এখন নামবার সময় হয়েছে, সব গুছিয়ে তৈরি হতে হবে। এদিকে ডাক্তার পেরেরার কৌতূহলও অসহ্য হয়ে উঠেছে। অতএব তিনি পুনরায় ওদের উপর নিজের ব্যক্তিত্ব প্রয়োগ করে ওদের কিছু শান্ত করলেন। বললেন, এখন নামতে হবে। কিন্তু এ অবস্থায় আপনাদের আমি ছেড়ে দিতে পারি না। আপনাদের আমি আমার ক্লিনিকে নিয়ে যাব। সেখানে যেতে হবে আপনাদের।

কড়া সুরের গম্ভীর আদেশ। কাজ হল। ট্রেন থামলে ডাক্তার পেরেরা ওদের নিয়ে তুললেন তাঁর ক্লিনিকে। তাঁর উৎসাহ ও কৌতূহল যে-কোনো বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভের মতন। নিজের কাছে পরাজয় স্বীকারে তাঁর বড়ই আপত্তি। রিসোর্টা ভাল করে শেখার জন্য তাই তিনি ছোট্ট একটি প্রাইভেট হাসপাতাল গড়ে নিয়েছেন। কঠিন মানসিক রোগী সেজন্য সেখানে দু-চার জন প্রায় সবসময়েই থাকে। মেয়েদেরও পৃথক ব্যবস্থা আছে।

চন্দ্রা ও বিপুল এই ক্লিনিকে এলো হানিমুন করতে। ওরা স্বামীস্ত্রী হওয়াতে পৃথক একটি ঘর সহজেই ওদের জন্য ব্যবস্থা করা গেল। ওরা দুজন এই নতুন পরিবেশে এসেও কিন্তু কিছুমাত্র বদলাল না। রাত্রে সেজন্য কড়া সেডেটিভ দিয়ে ওদের ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হল। একজন পৃথক নার্স রইল এদের তত্ত্বাবধান করতে।

কিন্তু ডাক্তার পেরেরার মাথায় ঐ যে

স্কিজোফ্রেনিয়া ঢুকেছে, তা থেকে তিনি মুক্তও পাচ্ছেন না, আবার এদের লক্ষণের সঙ্গে তা মেলাতেও পারছেন না। তিনি মনে মনে শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলেন, যদি স্কিজোফ্রেনিয়ার সঙ্গে অধিকাংশ লক্ষণও মিলে যেত, তবু শেষ প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, দুজন ব্যক্তির একসঙ্গে এরকম মাথা খারাপ হবে কেন?

অতএব তাঁর নবাগত রোগীদ্বয় ঘুমোলেও তাঁর সমস্ত রাত ঘুম হল না। মানসিক ব্যাধির যত রকম আধুনিক বই আছে, মোটা-মুটি সবই একবার উল্টে গেলেন, কিন্তু সব বৃথা। নিজের বুদ্ধির সঙ্গে লড়াই করে তিনি শেষ পর্যন্ত নিজের কাছে হার স্বীকার করলেন। রুগীর বেড-এ বসেও রোগের বেড-কে পৌঁছতে পারলেন না।

এদিকে সেডেটিভের ক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর দুজনে পরদিন জেগে উঠেই নাচগান আরম্ভ করে দিল এবং ক্লিনিকে যে তিনচারজন উদ্দাম রুগী ছিল তারাও উৎসাহিত হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে হল্লা করতে লাগল। বদ্ধ পাগলদের সঙ্গে দুজন মুক্ত পাগল জুটে ক্লিনিককে প্রকৃত পাগলা গারদে পরিণত করল। ডাক্তার পেরেরা আর স্থির থাকতে পারলেন না, তিনি তাঁর শিক্ষকগুরু প্রবীণ সাইকোয়াট্রিস্ট ডাক্তার চন্দ্রশেখরকে কল্ দিলেন। তিনি এসেই প্রথমে ডাক্তার পেরেরার দিকে চেয়ে থেকে নিশ্চিন্ত হলেন। এটি তাঁর বিলেতের শিক্ষা। তাঁরও যিনি শিক্ষাগুরু তিনি ডাক্তার চন্দ্রশেখরকে শিখিয়েছিলেন—দুজন সাইকায়াট্রিস্টের দেখা হলে পরস্পর 'তুমি কেমন আছ' জিজ্ঞাসা না করে বলতে হবে 'তুমি ভাল আছ, আমি কেমন আছি?' কারণ এটি একটি অত্যন্ত পরিচিত ঘটনা যে, সাইকায়াট্রিস্ট বা মানসিক ব্যাধির চিকিৎসকেরা অন্যে কেমন আছে বলতে পারেন, নিজে কেমন আছেন বলতে পারেন না। সেটা আর একজনকে বলতে হয়।

ডাক্তার চন্দ্রশেখর বুঝতে পারলেন পেরেরা ভাল আছেন, অতএব কল্টা পেরেরার নিজের অসুখের জন্য নয়, তাই নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি অতঃপর পেরেরার কাছে বসে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে নিলেন আগে। পেরেরা ডায়ারিতে লিখেও রেখেছিলেন সব কথা।

পেরেরা, তোমার কি মনে হয়?

আমার বুদ্ধির অতীত, ডাক্তার চন্দ্রশেখর। স্কিজোফ্রেনিয়া বলে প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু লক্ষণ সব মেলাতে পারি নি। আর পারলেও, দুজন একই সঙ্গে একই লক্ষণ প্রকাশ করবে কেন, তার উত্তর নেই।

মাল্টিপল পারসোন্যালিটির কথা ভেবেছিলে? একই লোকের মধ্যে অনেকগুলো ব্যক্তি বাস করে? এক একজন এক এক সময় প্রবল হয় অন্যগুলোকে ঢেকে রাখে? কিন্তু এসব তো তুমি ভালই জান। এখন কথা হচ্ছে, দুজনের একসঙ্গে একই অসুখ হয় কি করে? একই পিতামাতার সন্তান হলে এবং পূর্ববর্তী কোনো অব্যবহিত কারণটা ধরতে পারলে একটা ব্যাখ্যা হয়তো দেওয়া যেত। কিন্তু তুমি বলছ ওরা স্বামীস্ত্রী। তা হলে আমার না জানা অন্তত এমন কোনো অব্যবহিত কারণ থাকতে পারে না যাতে বিভিন্ন পিতামাতার দুই সন্তান একই সময়—বলা যায় প্রায় ঘাড় ধরে এই সময় একই মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে। তুমি বলছ, ওরা কল্যাণ স্টেশনের পর থেকে নাচ-গান আরম্ভ করেছে এবং এখনও করছে?

হাঁ, ঐ যে এখনও শুনতে পাচ্ছেন।

ওখানে ওদের কোনো খাদ্য বা পানীয় খেতে দেখেছ?

না।

ওরা হিন্দি গান গাইছে এবং তুমি বলছ হিন্দি-বিরোধী সমিতির পরিচালক ওরা?—দাঁড়াও, দাঁড়াও, একটা কথা ভাবছি।

প্রায় দশ সেকেন্ড পরে ডাক্তার চন্দ্রশেখর বললেন, আচ্ছা, ওদের থামাবার ব্যবস্থা কর, ধমকে হোক, যেমন করে হোক। আমি ওদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

॥ পাঁচ ॥

দুঘণ্টা পরে চন্দ্রশেখর ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল। পেরেরাও তা দেখে খুশি হয়ে উঠলেন। তিনি পেরেরার কাছে এসে বললেন, রাত্রে তোমাকে খুব সম্ভব এর প্রতিকার বলতে পারব। তার আগে আমাকে কিছু চিন্তা করতে হবে।

আপনি কি নিশ্চিত কিছু পেয়েছেন?—

মনে হচ্ছে পেয়েছি। কিন্তু আমার পাওয়া তথ্যগুলি আগে পর পর সাজিয়ে আরও একবার ভেবে দেখি, তারপর আসবে পরীক্ষার পালা। তুমি সন্ধ্যার পর—সাতটা থেকে আটটার মধ্যে, আমার চেম্বারে দেখা করবে।...

চন্দ্রশেখর চলে গেলেন।

সন্ধ্যার পর চন্দ্রশেখরের কাছে পেরেরার পৌঁছতে সাড়ে সাতটা বাজল। চন্দ্রশেখর তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু দেখা হবামাত্র চন্দ্রশেখর বললেন, আমি একটি অনুমান খাড়া করেছি। এর পক্ষে এবং বিপক্ষে যত রকম ভাবা যায় তা ভেবেছি। এবং এ ছাড়া অন্য কিছু ভাবা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাই আমার মনে হচ্ছে, হয়তো বা সত্য অনুমানই করেছি। ওদের সঙ্গে আলাপ করবার পর থেকেই চকিতে আমার মনের মধ্যে যে সত্যটি জ্বলে উঠেছিল, সেটাই আমার এখন একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু সেটা কি, তা প্রকাশ করার আগে একটি বড় রকমের পরীক্ষা করতে হবে এবং সে পরীক্ষায় তোমার সাহায্য দরকার।

বলুন, আমি আপনার আদেশ পালন করতে সর্বদা প্রস্তুত।

তোমাকে শুধু ওদের দেশে ফিরিয়ে দিতে

বদ্ধ পাগলদের সঙ্গে দুজন মুক্ত পাগল জুটে ক্লিনিককে প্রকৃত পাগলা গারদে পরিণত করল।

হবে। তুমি যেমন করে পার ওদের কল-কাতার টিকিট কিনে গাড়িতে তুলে দেবে এবং তুমি কিছুদূর পর্যন্ত ওদের সঙ্গে থাকবে। অন্তত নাসিক পর্যন্ত। তারপর, বলব সব।

পেরেরা বললেন, যথাদেশ।

টিকিট ও রিজার্ভেশন পাওয়া গেল তিন-দিন পরের। সেও দৈবাৎ। অন্য দুজনের রিজার্ভেশন বাতিল হওয়াতে পাওয়া গেল। কিন্তু এই তিনদিন পেরেরার ক্লিনিক নরক-তুল্য হয়ে উঠেছিল। শুধু নতুন অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালাভের অদম্য ইচ্ছা থেকে ডাক্তার পেরেরা সবই সহ্য করলেন।

ট্রেনে উঠে কল্যাণ জংশন পর্যন্ত অন্য সব যাত্রীর কৌতুক ও বিরক্তি উৎপাদন করে ওরা দুজনেই হঠাৎ নীরব হয়ে গেল। এবং কল্যাণের পর থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ। চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করল, আমরা কি আপনাদের খুবই কষ্ট দিয়েছি?

স্তম্ভিত ডাক্তার পেরেরা বললেন, না। তাঁর মুখে আর কথা নেই। এ কি ব্যাপার? হঠাৎ এরা ভাল হয়ে গেল কি করে?

বিপুল জিজ্ঞাসা করল, আমাদের কি কলকাতা ফিরে যাবার ব্যবস্থা করেছেন? সব জেনেও?

বিপুলের প্রত্যেকটি কথার মধ্যে একটা বিষম ক্লান্তি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু সে জন্যই হোক বা নিতান্ত অন্যমনস্কতার জন্যই হোক, পেরেরার মর্মে প্রবেশ করছিল না কথাগুলি। শুধু নিজের কাছে নয়, ডাক্তার চন্দ্রশেখরের কাছেও তাঁর পরাজয় ঘটল, সেজন্য নিজেকে বড্ড ছোট মনে হচ্ছিল তাঁর। মনস্তত্ত্বের সকল জ্ঞান পার হয়ে গিয়ে তিনি কি অতীন্দ্রিয় কোনো জ্ঞানলাভ করেছেন?

কিন্তু বিপুল তার প্রশ্নটি পেরেরাকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করাতে তিনি চমকে উঠে বললেন, হাঁ, সেই ব্যবস্থাই করেছি, এ ছাড়া আপনাদের বাঁচাবার আর কোনো উপায় ছিল না।

চন্দ্রা ও বিপুল দুজনেই গম্ভীর হয়ে গেল একথা শুনে। বোধ হয় মনের মধ্যে ডুব মেরে তারা বহু আত্মপ্রশ্নের উত্তর খুঁজছিল।

গাড়ি দীর্ঘপথ পার হয়ে নাসিকে এসে পৌঁছল। এতক্ষণ সবাই প্রায় চুপচাপ কাটিয়েছে। মাঝে মাঝে দু-একটিমাত্র কথা। পেরেরার কৌতূহল এতই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, তিনি কল্যাণ থেকেই ফিরে যাবেন ভেবেও, পারলেন না। শেষ পর্যন্ত চন্দ্রশেখরের আদেশই অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। এই অতিরিক্ত পথটিতে তিনি আরও পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেলেন, যদিও তাতে কিছু লাভ হল না। বম্বে ফিরে এসেই তাঁকে ছুটে যেতে হল ডাক্তার চন্দ্রশেখরের কাছে।

চন্দ্রশেখর বললেন, আমরা সবটাই শুধু মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করতে গিয়ে প্রথমে ভুল করেছি।

পেরেরা বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন চন্দ্রশেখরের দিকে। চন্দ্রশেখর বলতে লাগলেন, দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নজাতের ঘটনা ওদের মধ্যে একসঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। একটি মগজের সঙ্গে জড়িয়েছে, একটি মনের ও দেহের সঙ্গে। তুমি জান, ওরা দুজনেই গোঁড়া হিন্দি-বিরোধী এবং সেজন্য কখনো হিন্দি সিনেমা পর্যন্ত দেখেনি, বরং হিন্দির বিরুদ্ধে প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি প্রবল দল গড়ে তুলেছে। অবশ্য এ সবই আমি ওদের সঙ্গে তোমার ক্লিনিকে দেখা করবার সময় জেনে নিয়েছি। যাই হোক, হিন্দি-বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও ওরা ক্রমাগত হিন্দি গান গাইল কি করে। অথচ আমি নিশ্চিত জেনে নিয়েছি ওদের একটাও হিন্দি গান জানা নেই।

এই দিকটি মগজের দিক থেকে বিচার করতে হবে। স্মৃতি কি বস্তু তা আমরা আজও সম্পূর্ণ জানি না। বলা হয়ে থাকে মগজের কোষে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ যে কথাটা কানে গেল, তা মগজে গিয়ে কোষে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়। তাতে বোঝা গেল কথাটি মগজে জমা হয়ে রইল। এ রকম কত ঘটনা কত কথা কত বর্ণগন্ধের স্মৃতি মগজে জমা হয়ে থাকে। এই রকম হাজার স্মৃতির মধ্যে কেউ বা নিচে পড়ে যায়, কেউ বা উপরে ভেসে থাকে। আবার উপরের-গুলো নিচে যায়। নিচেরগুলো হঠাৎ উপরে চলে আসে। কেন আসে, তা কেউ জানে না। স্মৃতি রসায়নের ক্রিয়া না বিদ্যুতের ক্রিয়া, না দুইয়েরই ক্রিয়া, তাও কেউ জানে না। শুধু অনুমান, শুধু থিওরি। এমন তো তোমরা পড়েছ, একজন ইংরেজ বালক কোনো দিন যে চীনা ভাষা জানে না, সে একদিন অসুস্থ অবস্থায় বিকারের ঘোরে দুজন চীনার ঝগড়া নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করেছিল। সে কোনো দিন ওটা শুনেছিল মাত্র। কিন্তু কি কৌশলে সমস্ত কথা তার মগজে ছাপ রেখে গিয়েছিল এবং কি কৌশলে তার চেতনার নিচে থেকে তা অকস্মাৎ বেরিয়ে এলো, তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি। অথচ জান, কোষমাত্রেই মরছে এবং নতুন জন্মাচ্ছে।

তোমার দুই রুগীর ক্ষেত্রেও এই রকম একটি ঘটনা ঘটেছে। গ্রামোফোন রেকর্ডে লাউড স্পীকারে চিৎকার করা সস্তা হিন্দি ফিল্মের গান এইভাবে ওদের মগজে একের পর এক ছাপ রেখে গেছে ওদের অজ্ঞাতসারে। বহু মানুষেরই হয়তো এই রকম হয়, শুধু তা 'প্লে-ব্যাক'এর সুযোগ পায় না বলে বেরিয়ে আসে না।

কিন্তু ডাক্তার চন্দ্রশেখর, এখানেও তো সেই দুজনের একসঙ্গে কি করে এটা ঘটল, সেই প্রশ্ন।

বলছি একে একে। আগেই তো বলেছি দুটি পৃথক ব্যাপার এক সঙ্গে মেলাতে ঐ নবদম্পতি তোমার রুগী হবার সুযোগ পেয়েছে। প্রথমটি মোটামুটি শুনলে। এইবার দ্বিতীয়টি বলি।

আমরা ইমিউনিটি বা প্রতিরোধ ক্ষমতা শুধু ব্যাধি সম্বন্ধেই বেশি চিন্তা করি বলে এর ব্যাপক অর্থটি সব সময় মনে পড়ে না। কিন্তু জীবনের বহুদিকে এই ক্ষমতা গড়ে ওঠে, সেজন্য বহু রকম প্রভাব থেকে আমরা মুক্ত থাকি। অথচ কেন থাকি, তা কোনো দিন ভেবে দেখি না, এবং জীবনে তা ভেবে দেখার দরকারও হয় না।

তুমি একটি কথা ভেবে দেখনি, এবং সম্ভবত ওদের সে বিষয়ে প্রশ্নও কর নি। কিন্তু আমি করেছি। জানতে পেরেছি ওরা কখনো হিন্দি ফিল্ম দেখেনি। একটু আগেই একথা তোমাকে বলেছি।

এখন একটুখানি চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে, হিন্দি ফিল্মের বিরুদ্ধে ওদের দেহে মনে কোনো রকম প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠার সুযোগই পায় নি সে জন্য। আর ঠিক এই কারণে বম্বের খুব কাছে আসা মাত্র ওদের সকল দেহে মনে বম্বে মার্কা বীভৎস সব হিন্দি ফিল্মের প্রভাব ফুটে উঠেছে। হাস্যকর প্লট, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও গান সম্বলিত প্রায় সব হিন্দি ছবিই বম্বেতে তৈরী। তাই এখানকার আকাশে বাতাসে তার বিষবায়ু ছড়িয়ে আছে। প্রতিরোধ ক্ষমতা না গড়ে তুলে এখানে কেউ এলে তার দেহে মনের উপর এর আক্রমণ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এ রকম ফিল্মের ব্রীডিং গ্রাউন্ড হচ্ছে বম্বে। তাই বম্বের কাছা-কাছি আসামাত্র তারা হিন্দি ফিল্মের গান গেয়েছে, তাই তারা যেখানে সেখানে নেচেছে। অথচ জানে না—তারা এমন অস্বাভাবিক আচরণ করছে কেন। এবং আমার থিওরি যে নির্ভুল তা তুমি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করবে বলেই তোমাকে ওদের সঙ্গে নাসিক পর্যন্ত যেতে বলেছিলাম। তুমি দেখেছ, কল্যাণ-জংশন ছাড়বার পরেই ওরা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে।

ডাক্তার পেরেরা সব শুনে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন।

॥ ছয় ॥

এর পরের অধ্যায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। আদ্যানাথ লাহিড়ী কয়েক দিনের মধ্যেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। কিন্তু তা পড়ে আর সবাই তাদের নিরুদ্দেশের কথা জানতে পারলেও যাদের উদ্দেশে বিজ্ঞাপন, তারা সে সময় ন গানে ব্যস্ত ছিল।

ওরা কলকাতা পৌঁছনো মাত্র হৈ হৈ পড়ে গেল আত্মীয়-বন্ধু মহলে। আদ্যানাথ কি করবেন বুঝতে না পেরে অতি আনন্দে কাছা-কাছি একটি ক্ষৌরকার্যালয়ে ছুটে গিয়ে এক দিনের দাড়ি নির্মূল করে ফিরে এলেন। কিন্তু এ কার্যটি যে তিনি কেন করলেন তা তিনিও বুঝতে পারলেন না। বোধহয় অব-চেতন মনে তাঁর ক্রোধের সঙ্গে দাড়ির একটি নিবিড় সম্বন্ধ বিষয়ে একটা অপরাধবোধ সুপ্ত হয়ে ছিল। অতি আনন্দে সেটি জেগে উঠেছিল হঠাৎ।

এবং এই ঘটনা তাঁর বংশের ধারা বদলেরও একটি সুস্পষ্ট চিহ্নরূপে সবাই অনুমান করতে লাগল।

দীর্ঘাঙ্গী

সময় যেমন চলে তালে-তালে, বয়সও তেমনি বেড়ে চলে পলে-পলে। একে ঠেকানো দায়, একে রোখা কষ্ট। সকলেই চায় বড় হতে। সকলেই মনে মনে পোষণ করে আশা। আশা জিনিষটা, আবার লতার মতন। তর্ তর্ করে এটা বেড়ে চলে; একটা অবলম্বনও চায়। আর, অবলম্বন পাওয়া মাত্র তাকে জাপ্‌টে জড়িয়ে ধ'রে উঠতে চায় উপর দিকে।

উচ্চ আশা ব'লে একটা কথা আছে। কিন্তু আশার আগে ঐ বিশেষণটা না বসালেও হয়তো চলে, কেন না, আশা জিনিসটার সঙ্গেই উচ্চ কথাটা মেশানো আছে। সকলেই যা আশা করে তা উচ্চ হবার আশা, বড় হবার আশা।

কিন্তু, আমাদের এই আখ্যায়িকার যে নায়িকা তার আশা কিন্তু একটু আলাদা রকমের। সে চায় ছোট হতে।

আমাদের নায়িকার নাম সোহাগা।

সোহাগার বয়স বেশি না—বড়জোর ষোলো। কিন্তু এই বয়সেই ভীষণ বড় হয়ে গিয়েছে সে, নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও এখনো ক্রমশই সে বড় হয়ে চলেছে।

খিড়কির দরজায় আগে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত; কিন্তু আর সে তেমন সহজে সেখানে দাঁড়াতে পারে না।

তার যারা সমবয়সী তাদের দেখে হিংসে হয় সোহাগার। তারা কী সুন্দর ছোট হয়ে আছে। নিজের কথা ভেবে দুঃখ হয়, গ্লানি হয়। কী কুৎসিতভাবে বড় হয়ে যাচ্ছে সে।

এর শেষ কোথায়?

শেষ যে কোথায় তা কেউ জানে না। এর শেষ একান্তই আছে কি-না, সে কথা বলাও কঠিন।

কিন্তু আরম্ভ যার থাকে শেষও তার না-কি থাকেই। এ নিয়ম জানা। অথচ এই নিয়মটা মানা সোহাগার সাধ্যের মধ্যেই না।

সুশীল রায়

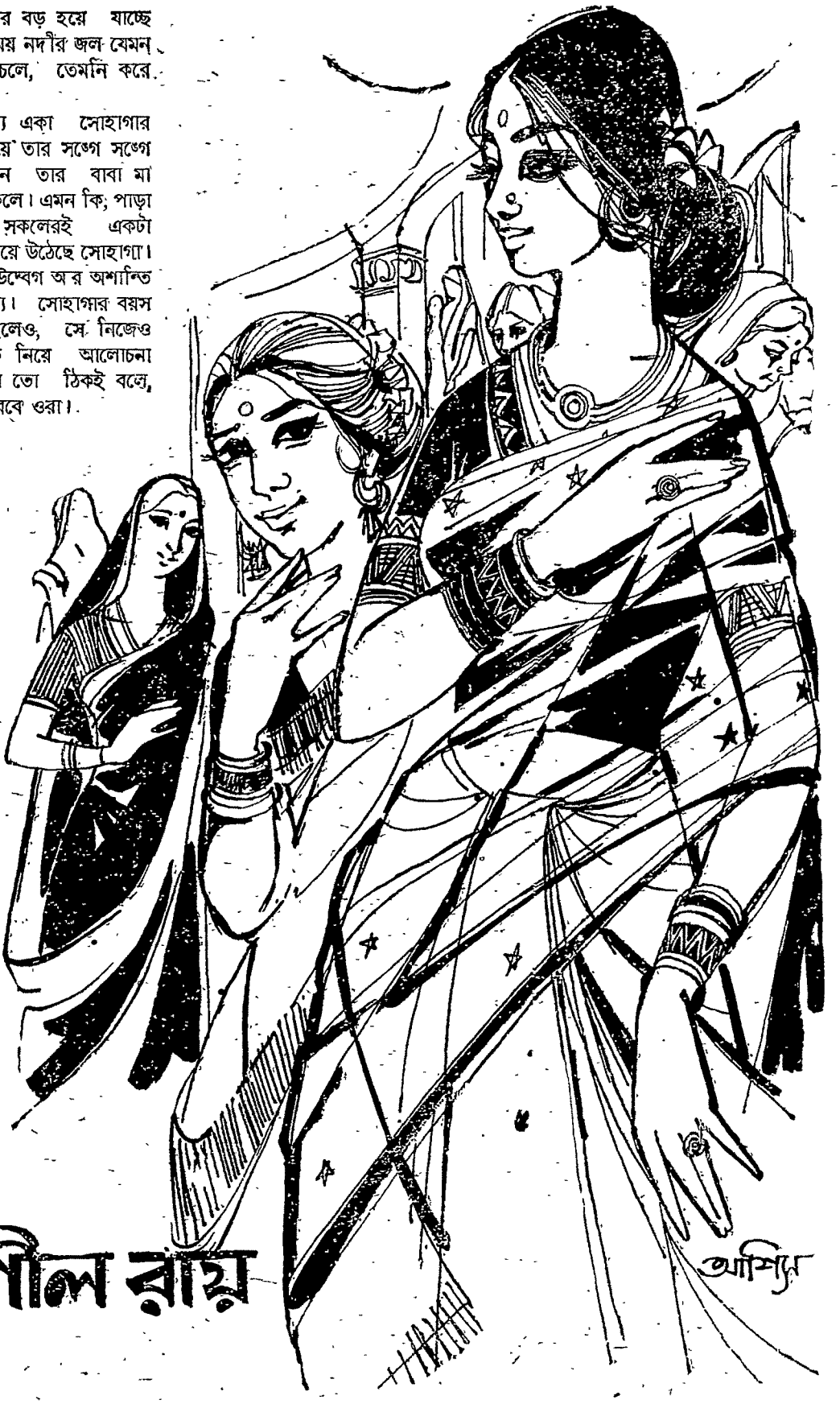

হাঁপ ইঁপ ক'রে বড় হয়ে যাচ্ছে সোহাগা। বন্যার সময় নদীর জল যেমন হু-হু করে বেড়ে চলে, তেমনি করে বেড়ে যাচ্ছে সে।

ভাবনাটা অবশ্য একা সোহাগার নয়, এ ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করে চলেছেন তার বাবা মা আত্মীয়-স্বজন—সকলে। এমন কি; পাড়া প্রতিবেশীরাও। সকলেরই একটা আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে সোহাগা। সকলেই নানারকম উদ্বেগ আর অশান্তি বোধ করে তার জন্য। সোহাগার বয়স তেমন বেশি না হলেও, সে নিজেও মনে মনে নিজেকে নিয়ে আলোচনা করে। সত্যিই, ওরা তো ঠিকই বলে, তাকে নিয়ে কী করবে ওরা।

আমি আর বড় হব না; আমি আর বড় হব না। —এই রকম বিপরীত উচ্চাশা নিয়ে ভিতরে ভিতরে পুড়তে থাকে রায়বাগানের খোষালদের মেয়ে সোহাগা।

বয়স তার সবে ষোলো, কিন্তু লম্বায় সে এখন ছয় ফুট। ফুটফুটে মেয়ে ছিল সে এককালে, যখন তার বয়স ছিল ছয়, বয়স ছিল দশ, বয়স

ছিল বারো। কিন্তু তার পর থেকেই কী-যে একটা ব্যাপার হল, ক্রমশ বড় হতে লাগল সে।

রায়বাগান জায়গাটা খুব বড় না। কিন্তু বসতি খুব ঘন। কোনো-এক কালে হয়তো কোনো এক রায় মহাশয় এখানে মস্ত বাগানবাড়ি করেছিলেন, আজ তাঁদের সব স্মৃতি মুছে গিয়েছে —কিন্তু পড়ে আছে মাত্র নামটি। এমনি করে সব স্মৃতিই বুঝি মুছে যায়, এই-ভাবে সব চিহ্ন লুপ্ত হয়ে যায়।

যে অশান্তি আর উদ্বেগ এখন আচ্ছন্ন করে আছে এই রায়বাগানের ঘন বসতিটা একদা তার কোনো চিহ্নই নিশ্চয় থাকবে না। অথচ, এখন মনে হচ্ছে—এ চিহ্ন বুঝি মুছবার নয়, এ অশান্তি বুঝি যাবার নয়।

কিন্তু এ অশান্তি তো পুষে রাখা যায় না। একে দূরে সরাতে হবে। নইলে শান্তি নেই এই পল্লীটির। অথচ কোথায় একে সরাবে, তা ভেবেই পায় না কেউ। আর সরানোও যদি হয় তবেই কি সমস্যার শেষ হল? এক জায়গার আবর্জনা ঝাঁট দিয়ে অন্য জায়গায় ফেলা হল মাত্র।

সোহাগা সব বোঝে। সে যে এক-জন মস্ত অপরাধী, সে বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ থাকে না। কিন্তু, একথা সকলে যেন জেনে রাখে যে, শখ করে এ অপরাধ সে করেনি; এ অপরাধ ক'রে সুখ সে আদপেই পাচ্ছে না।

চলাফেরা করতে খুব অসুবিধে বোধ করে সে, খুবই অস্বস্তি তার হয়। চলাফেরা করতে হলেই তার পূর্ণ দীর্ঘতায় দাঁড়াতে হবে তাকে, সে যে এক মস্ত দৃষ্টিকটু ব্যাপার। সোহাগা তাই বসে থাকা পছন্দ করে। বসে থাকলে তাকে অমন অদ্ভুত লম্বা দেখায় না ব'লেই তার ধারণা।

তার কানে এসেছে কথাটা। কিন্তু শুনেও যেন সে শোনেনি, এমনি ভাণ করেই সে আছে, ওঁকে এখন অনেকেই আর সোহাগা বলছে না, ওকে বলছে—তালগাছ।

আছে বটে তালগাছ এই এলাকায়। ঐ গাছের দিকে সে চেয়ে থাকে। বুঝতে চেষ্টা করে—সত্যিই ঐ গাছগুলো দেখতে বিশ্রী কিনা। কিন্তু বিশ্রী তো লাগে না তার চোখে। বেশ দেখায়, বেশ দেখায়, বেশ দেখায়।

বেশ তবে। তাই বেশ। সে না-হয় হল ঐ গাছেদেরই আর একজন।

পাশের বাড়ির মালতী ওর সমান ও সমবয়সী ছিল আগে। সমবয়সী এখনো অবশ্য আছে, কিন্তু সমান আর নেই—অনেক ছোট হয়ে গিয়েছে সে।

মালতী এসে তার পাশে বসে বেশ ছোট হয়েই, প্রায় কানে-কানে বলার মত ক'রে বলে, "জানিস, আমার বিয়ে প্রায় ঠিক। বাবা বর পছন্দ ক'রে এসেছে, বরের পিসে আমাকে পছন্দ করে গিয়েছে।"

সোহাগা হাসল, বলল, "জানিস, আমার বিয়ে হবে না। আমার বর কারো পছন্দ হচ্ছে না।"

মালতী বুঝি বুঝল না, বলল, "তাই বুঝি?"

"হাই।"

মালতী মেয়েটা একটু সরল প্রকৃতির। সব কথা খুলে বলতে তাই সহজেই পারে সে। মালতী বসে বসে তার বিয়ের গল্প করতে লাগল।

মালতীর বর নাকি খুব বড়লোক। অনেক নাকি টাকাপয়সা আছে তাদের। অনেক বাড়ি আছে বড় বড়। বরের নাকি বাপ নেই, বরই নাকি সব বাড়িঘর-দোরের মালিক। বর-কর্তা হয়েছে তাই বরের পিসে।

রায়বাগানের এই ছোট পল্লী ছেড়ে যেতে বেশ কষ্ট হচ্ছে নাকি মালতীর। তার নাকি ভাবতেই কেমন বিশ্রী লাগছে যে, যে-পল্লীতে ছোট থেকে ধীরে ধীরে সে বড় হল, সেই পল্লীটা একেবারে ছেড়ে যেতে হবে। অত বড় ঘর বাড়ি ফেলে আবার কবে আসা হবে এই রায়-বাগানে, সে কথা কি বলা যায়? কিন্তু রায়বাগানের জন্যে প্রাণ যে তার পুড়বে, এ-কথা বললে বিশ্বাস করবে কে?

"তুই বিশ্বাস করবি, সোহাগা?"

সোহাগা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। মালতীর ভবিষ্যৎ জীবনের কথা কিংবা নিজেরই বর্তমান জীবনের কথা হয়তো ভাবছিল সোহাগা। মালতীর কথার উত্তর তাই চট করে দিতে পারল না।

উত্তর না পেয়ে মালতী তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, "এই পোড় মুখী, উত্তর দিচ্ছিস নে যে বড়!"

ম্লান হেসে সোহাগা বলল, "কি বলব, বল্।"

"কি বলবি?" মালতী বলল, "তাও বুঝি শিখিয়ে দিতে হবে আমাকে? বলবি—বিশ্বাস করব।"

সোহাগা আবার হাসল সেইভাবেই।

"বুঝেছি!" একটু বাঁকা হয়ে বসল মালতী বলল, "বুঝেছি। আমার সুখ তোর সইছে না। আমি যে বড়লোক হয়ে যাব—এটা বুঝি ভালো লাগছে না তোর? আমি তোর বন্ধু নারে, সোহাগা? বন্ধুর সুখ কি নিজের সুখ না? তুই একটু হেসে কথা বল্। বল্ না—"

সোহাগা এবার বেশ প্রাণ ভরে হাসল। মালতীর কথা শুনে সত্যিই তার বেশ হাসি পেল। নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভেবে ভীষণ খুশি হয়ে উঠেছে মালতী, তার খুশির সঙ্গে অন্তত যোগ দিক সোহাগা। সোহাগা যে যোগ দিল তা তার এই প্রাণ খুলে হাসি দেখেই যেন প্রমাণ পেয়ে গেল মালতী।

মালতীর আনন্দ হল খুব। সোহাগার কানে কানে বলল, "বুঝলি, তোর জন্যে একটা বর পছন্দ ক'রে দেব আমি। তোর সঙ্গে মানায় এমনি, একটা বর।"

মালতীর কথা তো? ওর কথা বলার ধরণই এমনি। সোহাগা একথার কী উত্তর দেবে? কোনো উত্তর না দিয়ে সে চুপ করে বসে রইল।

উত্তর সে দিল না বটে; মালতীর কথা তো, তার কথা বলার ধরণই এমনি —এ কথা মনে ক'রে কথাটা সে উড়িয়ে দেবার চেষ্টাও করল বটে, অথচ তার শরীরের মধ্যে কি রকম একটা শিহরণও যেন জেগে উঠল হঠাৎ। হঠাৎই তার চোখ দুটো ছলছল ক'রে উঠল।

সেটা গোপন করার চেষ্টা করেছিল সোহাগা। কিন্তু সরল প্রকৃতির মালতীর চোখে পড়ে গেল সোহাগার চোখের তরল পদার্থটি।

মালতী বলল, "তোর হল কি আবার?"

"কিছু না। ভাবছি, তোরা সব চলে যাবি একে একে, আর আমি একা পড়ে থাকব এখানে— এই রায়বাগানে। কী ক'রে যে থাকব, তা জানেন কেবল ইয়ে—ভগবান।"

খিলখিল ক'রে হেসে উঠল মালতী। হঠাৎ এ কথায় তার এমন হাসি পেল কেন, ধরতে না পেরে সোহাগা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

দম নিয়ে মালতী বলল, "ঠিক বলেছিস। আমার বরের নাম ঐ। এখনো তো বিয়ে হয় নি, এখনো তাঁর নাম উচ্চারণ করা যায়। আমার বরের নাম ভগবান। ঠিক বলেছিস, তিনিই জানবেন সব। আমি তাঁকে জানাব।"

ভগবান! ভগবান!! ভগবান!!!

অকারণেই সোহাগা মনে মনে উচ্চারণ করল ঐ নাম। নিজের অদৃষ্টকেই বুঝি পরিহাস করল সে।

নিজেকে নিয়ে সে বিব্রত, বিপন্ন। সারা রায়বাগানে তার নাম প্রায় সকলের মুখে মুখে। তাকে নিয়ে সে বুঝি একাই না, তাকে নিয়ে বিব্রত সারা রায়বাগানই।

সোহাগার বাবা-মাও এতে আরও বেশি বিপন্নবোধ করেন। কিন্তু তাঁরা আজকাল সোহাগা সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। নিজেদের মেয়ের মুখের দিকে চেয়েই বুঝি নীরব হয়ে গিয়েছেন তাঁরা। মুখ

জানিস, আমার বিয়ে প্রায় ঠিক

দিয়ে কোনো কথা অবশ্য তাঁরা বলছেন না, কিন্তু তাঁদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁদের বুক দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে।

গরীবকে নিয়ে ভগবানের এ কী ধরণের তামাসা—এইটেই বুঝি ভেবে পান না তাঁরা। আর কেউ এ রকম অসুবিধেয় পড়ুক, এমন অবশ্য তাঁদের অভিপ্রেত নয়; কিন্তু ঐশ্বর্য যাঁদের আছে, যাঁদের ধনবল আছে তাঁরা এমন অসুবিধেকে অর্থ দিয়ে সিধে করে নিতে হয়তো পারেন। কিন্তু সোহাগার বাবা-মা'র তেমন সংগতি নেই, সাধ্যও তাই নেই।

মালতীর বিবাহ উপলক্ষ্য করে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে রায়বাগান। ভালো ঘর পাচ্ছে মেয়েটা, ভালো বর পচ্ছে। মেয়েটার ভাগ্যই বলতে হবে। দেখতে এমন-কিছু রূপসী না, গুণের দিক থেকেও চেঁচিয়ে বলার মত বুঝি কিছু না। একটা গুণ অবশ্য আছে। মেয়েটা সরল। কিন্তু যেসব মানুষ সরল না, তারা মালতীর এই গুণটাকেও গুণ বলে স্বীকার করে না, বলে—মেয়েটা বোকা।

এ কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে তো মালতী আরও বেশি ভাগ্যবতী বলতে হবে।

দিনকয়েকের মধ্যে উচ্চ একটা রংদার মঞ্চে বেজে উঠল বাঁশি। মালতীর বিয়ের নহবৎ। একেবারে পাশের বাড়িতে যখন উৎসবের এই উল্লাস বেজে উঠেছে সকরুণ আওয়াজে, সোহাগা তখন তাদের বাড়ির রকের উপরে পা ঝুলিয়ে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দূরের ঐ গাছটার দিকে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল দিয়ে হাওয়ায় একটু একটু দোল খাচ্ছে ঐ লম্বা গাছটা। আম, জাম, লীচু, কত গাছ চারদিকে। তারা সবাই নীচু হয়ে আছে ঐ গাছটার কাছে।

সোহাগা নড়ে বসল। না, সে নীচু না। কিছুতে নীচু না সে। সংকোচ নয়, জড়তা নয়। অন্যে যা বলার তা বলুক; যা ভাবার তা ভাবুক। সে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে সকলের মধ্যে।

আগে ভেবেছিল—যাবে না। কিন্তু কেন? নিশ্চয় যাবে সে। সে যাবে মালতীর বিয়েতে। ঐ বিয়ের আসরে অজস্র লোক আসবে? আসুক। তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবে সে। সবার উপরে মাথা তুলে দাঁড়াবে সোহাগা।

আলোকিত উৎসববাড়ি। সেই আলোর দিকে চেয়ে সোহাগা নিজের মন আরও প্রস্তুত করে নেবার জন্যেই যেন আরও প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল।

অনেক লোক এসে গিয়েছে। অনেক কলরব-কোলাহল।

সোহাগার যেটুকু সম্বল ছিল, তাই দিয়ে নিজেকে সে সাজিয়ে নিল। মেজে নিল নিজের মুখ।

বিবাহের আসরে যখন সে ঢুকল তখন সকলে বুঝি একটু চমকেই উঠল। তখন সকলে নিজেদের মধ্যের আলোচনা একটু বন্ধ রেখে মুখ ফিরিয়ে তাকাতে লাগল সোহাগার মুখের দিকে। কেমন একটু অবাক লাগল তাদের। মেয়েটা সত্যিই ভীষণ লম্বা কিন্তু আজ তাকে তো বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। সাজের মধ্যে জাঁক-জমক নেই। সহজে কোনো ঘটাই নেই তার। অথচ—

কিন্তু সোহাগার লক্ষ্য নেই কারও দিকে। কাউকে লক্ষ্য করতে সে এখানে আসেনি। সে এসেছে মালতীর বিয়েতে। বিয়ে দেখে সে চলে যাবে।

চলে যাবে? চলে যাবে কথাটার মানে কি হল? কোথায় চলে যাবে সে? রায়বাগানের মায়া ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবার কথা চিন্তা করে ফেলেছে নাকি সোহাগা? সোহাগার মুখের উপর কেনো সংকল্পের ছাপ পড়েনি, অথচ তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে—কিছু একটা সংকল্প সে যেন করে ফেলেছে।

তাকে নিয়ে এত আলোচনা, তাকে নিয়ে সকলের এত উদ্বেগ আর অশান্তি—এসব আর ভালোও লাগছে না, এসব আর বুঝি সহ্যও তার হচ্ছে না। চলে সে যাবেই, এবং এখনই, এই গভীর রাতেই।

(শেষাংশ ৯৭ পৃষ্ঠায়)

লোকবল

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

অফিস ভাঙবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাঁকের মুখে হাঁপাতে হাঁপাতে সবগুলো বাস এসে পড়ল। হাড়ে হাড়ে ঝনঝনে দু'নম্বর স্পেশাল, নাক-থ্যাবড়া-ডবলডেকার, ছাই রঙের একতলা, লাল রঙের লেডীজ স্পেশাল। পড়ীব ত পড় শেষের বাসখানাই গড়িয়ে পড়ল পাশের খানায়!

সঙ্গে সঙ্গে যা হয়, পেছনের বাস প্রত্যেকটাই বেরিয়ে যেতে পারত, প্রত্যেকটাই দাঁড়িয়ে গেল। পিল পিল ক'রে শুধু বাস, গাড়ী, ট্যাক্স থেকেই নয়, আশপাশের বাড়ী থেকেও লোক বেরিয়ে এল। যাদের বাড়ী কাছাকাছি তবা স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলে যেতে পারত, কিন্তু যদি ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টরকে মারতে হয়, তাহলে কাজ মিটিয়ে চলে যাওয়াই ভাল। মারতে হবে কি না জানবার জন্যে তারা ছাতা বগলে মুখ উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কে আগে মারবে, আগে মেয়েদের বের করা হবে, না ওদের মারা হবে, বাসে আগুন দিতেই বা কত দেরী, এই নিয়ে জোর কথা চলতে লাগল। সামনের বাড়ীর দোতলার বারান্দা থেকে কাপড় ঝুলছিল। গিন্নীরা তাড়াতাড়ি শুকনো কাপড় তুলে নিলেন, এ হিড়িকে কাপড় চুরি হয়ে যেতে পারে, আবার বাসে আগুন দিলে আগুন উঠেও আসতে পারে। উল্টো দিকের বাসে বসে বসে প্রমথ দেখছিল কতক্ষণে ভীড় কমে। কানের কাছে কণ্ডাক্টর মাঝে মাঝে শুধু জিভে-তালুতে লাগিয়ে টক জিনিষ খাবার মত শব্দ করছিল আর বসছিল

আ হা হা' দুশো চব্বিশ এবার গেল। ঐ লাইনে একটা লোকই ছিল যে এতদিনেও মার খায় নি।

প্রমথর বাসের ড্রাইভার কিছুই না বলে চেয়ে দেখছিল কতক্ষণে ভীড় সরবে, কতক্ষণে বাস বেরুবে। কাত হয়ে পড়া স্পেশাল থেকে মেয়েরা একে একে বেরিয়ে এল। ভীড়টা কোন কোন জায়গায় জমাট বাঁধল। যাঁদের নেহাৎ তাড়া আছে তাঁরাই বওনা হলেন। অন্যরা অপরাধীদের শাস্তি দেবার জন্যে আস্তিন গুটোতে লাগল। প্রমথ মোটেই মারধোর দেখতে পারে না। দেখলেই তার পেটের মধ্যে অস্বস্তি হয়, ঘন ঘন ঢেকুর পায়, অনেকক্ষণ অবধি মেজাজ খারাপ হয়ে থাকে।

সে ভাবছিল চোখ বুজবে অথবা ফিরিয়ে নেবে, কিন্তু হঠাৎ, সমস্ত ঘটনাটাই নাটকীয় ভাবে মোড় ফিরিয়ে দিলেন এক বৃদ্ধ।

বয়সে বৃদ্ধ, শরীরে কুস্তিগীর। এই চওড়া কাঁধের পেশী, বুক, ঘনকৃষ্ণ গায়ের রঙ, মাথা এবং ভুরু শাদা, গায়ে গরদের জামা জ্বলজ্বল করছে। পায়ে ফিতে বাঁধা স্যু জুতো, কুলপীতে, কানে, হাতের আঙুলের গাঁটে গোছা গোছা চুল। গাড়ী থেকে ড্রাইভারকে ধমক দিয়ে তিনি তড়াক করে নেমে পড়লেন।

'মশায়, লোকবলই বল, এখন আমরা সবাই একসঙ্গে, এখন আমরা কি করব?'

মাথার উপর ছাতা তুলে বোঁ বোঁ করে দুবার ঘুরিয়ে নিলেন তিনি। দেখে প্রমথর মনে হঠাৎ নাড়া পড়ল। কার কথা মনে পড়ছে?

এই যে হতভাগ্য কণ্ডাক্টর, আর এই যে বাস চালক, এদের প্রাণ এখন আমাদের হাতে। আমরা এদের মারতে পারি, রাখতে পারি।

শেষের কথাটা শুনে সবাই চমকে গেল। প্রমথর পাশের ভদ্রলোক বললেন 'এটা ঠিক হচ্ছে না। চিরদিনই ওদের মারা হয়। কোন-দিনই, আমি কোথাও শুনিনি, ওদের ছেড়ে দেওয়া হয়। আমি ত আটচল্লিশ সাল থেকে তাই করছি।'

আর একজন বৃদ্ধ, এতক্ষণ তিনি উঁচুতে মুখ তুলে, হাঁপানীর নিশ্বাসের মত শব্দ করে মুখ খুলে বাতাস খাচ্ছিলেন, গলায় কণ্ঠি, শরীর অতি জীর্ণ। তিনিও সায় দিয়ে হেসে বললেন 'একুশ সনে, কল-কাতায় পড়তে এসে শেয়ালদহতে নেমেই আমরা গাড়োয়ানদের মেরেছিলুম।'

এদিক-ওদিক চেয়ে বললেন 'আজও মারি।'

কিন্তু গাড়ীর আরোহী বৃদ্ধ ভদ্রলোক অকুতোভয়। তিনি চেঁচাতে লাগলেন 'এদের মারাই কর্তব্য। আমিও বলতাম এদের মারুন। যদি টাইমটা দুপুরে দুপুরে হত। কিন্তু এখন অফিস টাইম, রাস্তা আটক করে রাখা অনুচিত। বিশেষতঃ মা লক্ষ্মীরা সব বাড়ী যাবেন বলে ব্যস্ত। তাই মশায়রা, আমি বৃদ্ধ মানুষ, আমি বলি লোকবলই বল, আসুন আমরা বাসটা ঠেলা মেরে তুলে দিই। আমি এগোলাম, আপনারা আসুন, তোমরাও ঠেল, বাস-চালক, কণ্ডাক্টর, তোমরাও এস।'

প্রমথর চোখের সামনে ম্যাজিক হয়ে গেল। এই উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে, কল-কাতার রাস্তায়, পথের মানুষরা বাসটা ঠেলে তুলে দিলে, ড্রাইভারদের মারলে না। একে একে সব বাসই বেরিয়ে গেল, ছাতা বন্ধ করে ভদ্রলোক যখন গাড়ীতে উঠতে যাবেন, ঠিক তখনই প্রমথ চেঁচিয়ে উঠল 'আপনি গৌর-দাদু না?'

তার চিনতে সময় লেগেছিল, ওঁর লাগল না।

'এস, প্রমথ এস,' তিনি গাড়ীর দরজা খুলে ধরলেন, যদিও শোনবার কেউ ছিল না, তবু চেঁচিয়ে বললেন, 'চুল দেখেই বুঝেছি এ আমাদের প্রমথ!'

প্রমথ যাচ্ছিল উত্তরে, কিন্তু এতদিন পরে গৌর দাদুকে আবিষ্কার করবার বিস্ময়ে প্রায় মন্ত্রচালিতের মতই গাড়ীতে উঠে বসল।

'কি করে?'

প্রমথ প্রথম প্রশ্নেই ওঁর হাত চেপে ধরল। ওর বলা উচিত ছিল 'কোথায়!' অর্থাৎ সাফল্যের চাবিকাঠি কোথায়, গৌর দাদু কেমন করে তার খোঁজ পেলেন।

গৌরদাদু হাসতে লাগলেন। বললেন 'কেন, শুনলি না, ঐ যে বললাম লোকবলই বল। আমি ঘন ঘন স্লোগান পালটাই না প্রমথ। ফার্টিতে যা শুনেছ, পঁয়ষট্টিতেও তাই শুনেছ। আবার তোমার মা-রা যখন ছোট ছিল, সেই টুয়েন্টিতেও আমি এক কথাই বলতাম। লোকবলই আসল বল।'

প্রমথকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

বাড়ী বললেও হয়, গ্রাম বললেও হয়। সারি সারি ঘরের পর ঘর, উঠোনের পর উঠোন। গৌরদাদু বললেন হ্যাঁ, আমরা, বকচরের লোকরা ঐ পঁচিশ বিঘা জমিই নিয়েছিলাম। এই যা দেখছ—!'

পুবে পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে আঙুল দেখিয়ে বললেন 'এরা সবাই আমার আপন লোক। ধর না কেন, বাবারা দশ ভাই-বোন, মায়ের দিকে ছ'জন। প্রত্যেকের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী, আহা সবাইকে একজায়গায় ঠাঁই দিতে গেলে ত মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্টটাই লেগে যেত। অন্ন দিতে গেলে গোটা দুয়েক প্রজেক্ট করতে হত। এখানে আছি আমরা মাত্র দুই কাকার ছেলেমেয়ে আর আমার পরিবার। তা ধর না কেন আমার ছেলেমেয়েই পনেরোটি। তোমার হাবুমাসী লাবুমাসীকে মনে আছে ত?'

হাবুমাসীকে মনে পড়ল না। লাবুমাসী বলতে জলপাইগুড়ির ভীষণ গরমে, বিয়ের জন্য শ্রাবুমাসীর 'গানের সুরের আসনখানি' হাঁ করে গাওয়া মনে পড়ল। গৌরদাদুর আর এক ছেলে লাবুমাসীর সেজদা বদন তাড়া-তাড়ি সেই আসনে বসবার যোগ্য পাত্রকে খুঁজে পেতে বলতে গেলে মতলব করে ট্রেন থেকে ভুল স্টেশনে নামিয়ে নিয়ে সোজা ধরে নিয়ে না গেলে সে গান আরো কতদিন চলত কে জানে।

গৌরদাদু বললেন 'ঐটে হাবুদের ঘর, ওদিকেরটা লাবুদের, ওদের সব কাছেই রেখেছি। জানই ত, আমার কথা হচ্ছে লোক-বলই বল।'

'কিন্তু...'

অবস্থা ফেরালেন কি করে সে-কথাটা খোলাখুলি বলতে বাধল এবার। তবু মনের ভেতরটা খচ্ খচ্ করতে লাগল প্রমথর। শেষ যখন ওঁর খবর পায়, তখন ওঁর বৃহৎ পরিবার নিয়ে কলকাতায় আসবার আগে উনি প্রত্যেকটি আত্মীয় পরিজনকে তার করেছিলেন 'আর ইভিং অ্যাট লাস্ট!' কেউ ওঁদের আনতে স্টেশনে গিয়েছিল বলে প্রমথ জানে না।

'কেমন করে কি করলাম তাই জানতে চাও ত? আমার সাফল্যের মূলমন্ত্র প্রমথ, তোমাদের দিদিমা ঐ যে হাতের কাজে অমর করে রেখে গিয়েছে।'

দেওয়ালের দুপাশে দুটি ফ্রেমে চটের ওপর লাল সুতোর লেখা 'বাঁচভোগ্যা বসু-ন্ধরা' আর 'লোকবলই বল।'

প্রমথর মনে পড়ল তাদের ঐ গ্রাম সম্পর্কের দিদিমাটি টুকটুকে সুন্দরী ছিলেন। গৌরদাদুর আদর্শকে রূপ দিতে গিয়ে শেষের দিকে তাঁর মাথার গোলমাল দেখা দেয়। উনি না-কি পুরনো-নতুন সব কাপড়ই ছিঁড়ে ফেলে পাড় থেকে সুতো তুলতেন আর যখন যা মনে আসত সেই কথাই চটের ওপর লিখে ফেলতেন।

গুঁর তৈরী এক একখানা ফ্রেম বাঁধাই চট বগলে নিয়ে গৌরদাদু সগৌরবে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে আসতেন আত্মীয়বাড়ী। প্রমথর এক দিদির বিয়েতে আর কোন কথা না পেয়ে 'সব লাল হো যায় গা', লিখে দিয়েছিলেন।

আপনারের তাহলে এখানে এসে তেমন অসুবিধে হয়নি দেখছি।'

কিছু না, কিছু না, লোকবল থাকলে

— শারদীয় অভিনন্দন —

প্রিয়নাথ ঘোষ এণ্ড কোং

লৌহ ও হার্ডওয়ার ব্যবসায়ী ● অর্ডার সরবরাহক ● রেজিস্টার্ড টাটা-ইস্কো- এবং হিন্দুস্থান স্টীল ডিলার্স

১৮, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

ফোন : ৩৩৩৩৭

মাবার তা বুঝিবে কি। দেখলে না একটা হা-ঘরে কিরকম ঠেকিয়ে দিলাম? হাল্লামা বাধাতে পারে সবাই, ঠেকাতে পারে কজন?'

গৌরদাদু বুকে চাপড় মারলেন, চেঁচিয়ে বললেন, 'বাইরের ঘরে চা-খাবার দিয়ে যা!'

প্রমথকে বললেন, 'অবশ্য আমারও স্বার্থ ছিল। ড্রাইভার তোমার ভজনমামার শালীর ছেলে, আমাদের আত্মীয়ের মধ্যে।'

এখন প্রমথর মনে হল পথে বেরোলে যাকে দেখবে প্রতিটি লোকই গৌরদাদুর আত্মীয়, এবং তাবও। অনেকদিন ধরে সে জানত সে এ সংসারে একা, এক দিদি ভগ্নীপতি আর শ্বশুরবাড়ীর লোকজন ছাড়া তার কেউ নেই। এখন হঠাৎ চার-পাঁচশো জন লোকের ঘনিষ্ঠতা সে চাইলেই পেতে পারে মনে করতেই ভয় হল।

এরা পাঁচশো জন। এখন তাই মনে হচ্ছে। সে একা, একেবারেই একা। রেজগার সামান্য বলেই হয়ত সে হিসেবী একটু বেশী। শত শত বিয়ে, পইতে, অন্নপ্রাসন, শ্রাদ্ধ, জন্মদিন, লৌকিকতার রেলগাড়ী যেন এখনই তার ওপর দিয়ে চলতে সুরু করেছে। তা ছাড়া তার বউ লতা একটু খুঁতখুঁতে, সন্দেহপ্রবণ। এতদিন ধরে শ্বশুরকুল এমন ন্যাড়া বলে যেমন দুঃখ জানিয়েছে, হঠাৎ অতি আপনার শ' পাঁচেক লোক পেলে সে নিশ্চয়ই সুখী হবে না।

কিন্তু গৌরদাদুর এ অবস্থা পরিবর্তনের রহস্যটা কি? গৌরদাদু তাই বলতেই চাইছিলেন।

'জলপাইগুড়ির কথা তোমার মনে পড়ে?'

'আসা আসা।'

প্রমথ কিছুতেই বলতে পারল না জলপাইগুড়িতে তার বাবা যে কদিন ছিলেন সে কদিনেই গৌরদাদু আর তাঁর ছেলেমেয়েদের ধন ধন যাওয়া আসাতে তিনি বিরক্ত হয়ে ওঠেন।

সবচেয়ে অসুবিধে ঘটাত গৌরদাদুর ছেলেমেয়েরা। প্রত্যেকের চেহারা একরকম ছিল, প্রমথর বাবা ছিলেন ওদের ভগ্নীপতি, চাট্টার সম্পর্ক। যাকে ভজন বলে ডাকতেন সে পুজন। যাকে সাধন বলতেন সে বদন, আর একই মুখ, একই মুচকি হাসি দেখে সাধু বলে ডাকলে 'আমি হাবু' বলে শালীরা চিমটি কাটত। ওদের জন্যেই উনি তাড়াতাড়ি চেষ্টাচরিত্র করে ট্রান্সফার নেন, কিন্তু এখন কি সে-কথা বলা যায়?

'আমাকে, বুঝলে প্রমথ, চিরদিন সাধাই ভুল বুঝে গেল। এই দেখ না, আমার নিজের দাদা অবধি কাজ করি না, বসে বসে দুধ-মাছ খাই বলে কত কথা শোনাতেন, অথচ দেখ, সময়ই প্রমাণ করে দিল কার আদর্শ বেশী খাঁটি ছিল।'

যৌবনে গৌরদাদুর বুকে ঘন লোম ছিল, এবং শোনা যায় একবার, মাত্র একবার, ওঁর ষষ্ঠ সন্তানের জন্মের পর ওঁর দাদা দেশের জমিজমার আয়ের কৃশ চেহারা দেখে একশো এক টাকা ঘুষ দিয়ে গৌরদাদুকে খাজুরীতে জমিদারী কাছারীর নায়েবের চাকরী করে দিয়েছিলেন।

গৌরদাদু বললেন, 'বেতন পাঁচ টাকা, মাইন্ড ইউ।'

তা তখন মাইনেপত্তর সে-রকমই হত। জমিদার নিজে পাবনার বাড়ীতে বসে 'খাজুরী সমাচার' কাগজ ছাপতেন আর ফাঁকে ফাঁকে কলকাতায় গিয়ে মোজার উপর পাম্প সু এবং ডবলব্রেস্ট শার্ট পরে থিয়েটার দেখতেন। বুদ্ধিমান যে কোন নায়েবই ঐ মাইনে থেকেই জমিজমা, ঘরদোর, গরু-বাছুর, ইত্যাদি ক'রে ফেলতেন।

মঘা না অশ্লেষা, সকালে কাক কোন দিক থেকে ডেকেছিল, ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ বিচার করে, গৌরদাদুর ভাষায় 'আন্ডার মোস্ট অস্পিশাস স্টারস' তিনি খাজুরী রওনা হলেন। যাবার সময়ে সঙ্গে গুড়ের হাঁড়ি, বাসি হলে খাবার জন্যে তালমিছরী, নায়েবী কাজে মাথাগরম হলে মাখবার রাহ্মী-তেল এবং মন প্রফুল্ল রাখবার জন্যে তাসের প্যাকেট, হারমোনিয়াম সবই ছিল।

ঠিক যেমন ভাবে গিয়েছিলেন, তেমনি সাজানো বয়েস নিয়েই তিনি চারদিন বাদে ফিরে এলেন। নৌকো ঘাটে লাগিয়ে ছাতা ঘুরিয়ে গ্রামকে জানালেন তিনি ফিরে এসেছেন। দাদাকে বললেন, 'খাজুরীর জল বড়ই কষা, বায়ু কুপিত হয়।' বউকে কিছুই বললেন না। বুড়ো মা তার প্রত্যাবর্তন দেখে বড়ছেলে ও বউয়ের রাগের কথা ভেবে ভয় পেয়েছিলেন। সহসা, বীরবিক্রমে মা-কে জাপটে ধরে গৌরদাদু 'বল মা বল, তুমি টাকা চাও না ছেলে চাও। তুমি না বললে আমি ছাড়ব না, আজ এইখানে শুয়ে উপোস করে মরব।'

একদিনের উপোসে গৌরদাদু মারা যাবেন সে ভয় তাঁর মা-র ছিল না। কিন্তু ছেলের জাপটানিতে দমবন্ধ হয়ে নিজে মারা যাবেন এই ভয়েই তিনি 'না বাবা তোমায় চাই' বলে তবে ছাড় পেলেন।

এই প্রথম এবং শেষ। তারপর আর কোনদিন গৌরদাদুকে কেউ কাজ করতে বলেনি।

'পর পর পনেরোটি ছেলেমেয়ে যখন হল, তখন দাদা আমায় বকতেন বটে, বলতেন, যে কাজ পাও তাই কর কিন্তু আমি সেদিনও বলতাম লোকবলই বল।'

স্মিত হেসে বললেন, 'খেয়ে খেয়েই দেশের জমিজমা সব ফতুর করে দিয়েছিলাম। ছেলে-মেয়েরা ছিল বলেই তো! নইলে দেশ ছেড়ে আসবার সময়ে যদি সম্পত্তিও ছেড়ে আসতে হত, তা হলে দাদার মনে ব্যথা লাগত না।'

তাঁর অকাট্য যুক্তির সামনে প্রমথ হতভম্ব হয়ে বসে রইল।

আর দেখ, দেশে জমিজমা যতদিন ছিল, ততদিন আমার ছেলেরাই তো সামলিয়েছে। কেউ বাদীদের ধান কেটে আনত, কেউ ফৌজদারী লড়তে যেত এদিকে দাদা হায় হায় করছেন। এদিকে ইক্কিল দারোগা বসে আছে তার জন্যে সাধন খাসি কাটছে, ওদিকে রায়দের পুকুরে বদন মদন জাল ফেলেছে, তার বাঁস নিয়ে তাড়া করেছে, নিজে কাজ না করলে কি হয় প্রমথ, কর্মময় জীবন ছিল, কর্মময় জীবন, এখনো যে নিজেকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তার মূলে কি আছে জান তো?'

হাত শূন্যে তুলে বললেন, 'এই বাহুর বল, আর বুকে শক্তি। অসাধারণ একটা আত্মবিশ্বাস ছিল। জানতাম, যে যাই বলুক একদিন আমার শক্তির প্রয়োজন হবে। তাই কারো কথা না শুনে খেয়ে চলতাম। দেখে অশান্তি? চলে গেলাম ঢাকা, বউদির বাপের বাড়ী, নয় তো জলপাইগুড়ি। তুমিই বল প্রমথ, নইলে কি আর পনেরোটিকে নিয়ে এখানে এসে অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারতাম?'

'আজ্ঞে না।' প্রমথ এবার তাঁর দর্শনে ভঙ্গে যাচ্ছে। দুর্বল চরিত্র হলে যা হয়।

'এখানে এসে, বুঝলে হে? ছেলেদের বললাম বাবা, লোকবলই বল। এখন তোমরা যা পার কর। সত্যি কথা, তোমাদের লেখা-পড়া শেখাতে পারিনি। কিন্তু লেখাপড়া জেনে কোন লোক করতে পারে! আসলে দরকার শক্তি।'

শক্তি ও'র ছেলেদের প্রভূত ছিল। বহু ফৌজদারী, গৌরদাদুর ভাষায় 'ফোজদুরী' লড়ে লড়ে বুদ্ধিও কম পাকেনি। তা ছাড়া এ-সব ক্ষেত্রে যা হয়, বাবাকে তারা মহা-পুরুষ মনে করত, তাই দিকে দিকেই ছড়িয়ে পড়ল

'কেউ হল কন্ট্রাক্টর, কেউ গেল ছোট ব্যবসা করতে টাকা ধার নিয়ে, কারখানায় গোটা দুইকে লাগিয়ে দিলাম, ছোটগুলোকে দিয়ে, বুঝলে প্রমথ, চানাচুর বিক্রির ব্যবসা স্টার্ট করে দিলাম। এমন ভাগ্য আমার, যে সোনা ফলতে লাগল। এ জেলার লোন নিয়ে ছেলেরা ও জেলায় পালায়। সাধন যখন বাঁকুড়ার মুরগী পোষে, ভজন তখন ত্রিবেণীতে প্রেস খুলে ফেলেছে। বদন, বিষিং রিলিজিয়াস, লোনের টাকা নিয়ে 'বদন স্পেশাল' খুলে ফেলল।

বুড়োবুড়ীদের নিয়ে ট্রেনে চড়িয়ে তীর্থ দেখানো, এখন ত' ধর্মতলায় অফিস খুলেছে। কাজের দরকার হলে ওর কাছে যেও প্রমথ, ওর অফিসে হরদম লোক নেওয়া হয়। সকাল-সন্ধ্যে আমি ওখানে বসে হাতটাও দেখি।'

'আর কিছু করেন না?'

'জমি কিনি, লোক বসাই, এই তো আমার আদর্শ ছিল প্রমথ। বীর সন্তানদের এনে বসুন্ধরা ভরে ফেলব।'

'আপনার দাদা আছেন?'

'দাদা? নিশ্চয়। কাছাকাছিই কোথায় যেন থাকেন। মা-কে নিয়ে।'

'আপনার মা এখনো আছেন?'

'হ্যাঁ প্রমথ। শ'খানেক হ'ল বোধহয় বয়স। ওঁদের যে-কপাল, অর্থাৎ আমাদের বড়

(শেষাংশ ৯৭ পৃষ্ঠায়)

শহর কলকাতা : দুর্গোৎসব

(সেকাল ও একাল)

প্রাণতোষ ঘটক

কলকাতার নামে যাঁরা দুর্নাম দিয়ে থাকেন, এখানে কেবল চোর, ডাকাত, বাটপাড়, পকেটমারের আড্ডা, আমি তেনাদের দলে নেই। যুগ যুগ ধরে প্রবাদ আর অপবাদে নাগরী কলকাতাকে কলঙ্কিনী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। জনরব এতই প্রবল যে, অনেকে কলকাতার নাম শুনলে সভয়ে আঁৎকে ওঠেন। এবং কলকাতাকে দূর থেকে নমস্কার করেন। স্বভাব-নিন্দুকের দল হয়তো জানেন না যে, এই কুখ্যাত শহরে যত জ্ঞানীগুণীর বসবাস, ভারতবর্ষের কুত্রাপি তত নেই। শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, বিজ্ঞানী, গায়ক, বাদ্যকর, টেকনিকাল এক্সপার্ট কলকাতার অলিতে-গলিতে বহাল তবিয়তে বাস করছেন। কলকাতা থেকে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বিচক্ষণ বিদগ্ধ বিশেষজ্ঞদের সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে। অজ্ঞাতকুলশীল গুণীজনদের বসতি কলকাতায় কম নয়। নেহাৎ পাবলিসিটির অভাবে তাঁরা অচেনা রয়ে গেছেন। তাঁদের পক্ষ থেকে কেউ সিটি বাজায় না, ঢক্কানিনাদ করে না। এই ধরণের জনৈক জ্ঞানবৃদ্ধকে আমরা জানি —যাঁর নাম কেউ কখনও শুনতে পাবেন না। ভদ্রলোকের নাম তীর্থপতি ভট্টাচার্য। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মাণিকতলা অঞ্চলের এক বস্তীমহলের মাঠকোটায় তীর্থপতি থাকেন সপরিবারে। বিদ্যালয়ে, কলেজে কখনও তিনি প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন নি। বর্তমানে একটি স্কুলে তিনি হেড-পণ্ডিতের কাজ করছেন। মাহিনা নগণ্য ও যৎসামান্য, কিন্তু তীর্থপতির নিষ্ঠা অতুলনীয়। ফাঁকি কাকে বলে জানেন না। প্রলোভন এড়িয়ে চলেন। ঘৃণা করেন আত্মপ্রচার। সংস্কৃত, ফার্সী, ইংরাজী ও বাঙলায় সমান দখল তাঁর। পৃথিবীর তাবৎ বিষয়ে বিলক্ষণ দু'চার কথা বলতে পাবেন। আমাদের যখন যা কিছু রেফারেন্সের প্রয়োজন হয়, আমরা তীর্থপতিকে স্মরণ করি। আমরা তাঁর নাম দিয়েছি মুভিং এনসাইক্লোপিডিয়া। অর্থাৎ চলন্ত বিশ্বকোষ।

সকাল সন্ধ্যায় তীর্থপতির মাঠকোটার অপরিসর ঘরে দস্তুরমত আড্ডা জমে। মাঝে মাঝে আমরা গিয়ে হাজির হই। অন্তরাল থেকে বৌদি গরম চা সরবরাহ করেন। চায়ের সঙ্গে আসে লবণাক্ত মুড়ি। যেদিন মুড়ি অপ্রাপ্য হয়, সেদিন পাঠিয়ে দেন চীনে বাদাম।

সেদিন সকালে সবে আমরা চায়ের পেয়ালা মুখে তুলেছি, এমন সময়ে তীর্থপতির দুয়োরের কড়া থেমে থেমে নেচে উঠলো। কলকাতার বাসিন্দা মাত্রই এই স্বদেশী কলিং বেলের বেসুরো আওয়াজ নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন। তীর্থপতি তখন নেদারল্যাণ্ড থেকে প্রকাশিত একখানি ইতিহাস থেকে কিছু কিছু পাঠ করে শুনিয়ে চলেছেন। বইখানির লেখক জনৈক বাঙালী। বইটির বিষয়বস্তু বাংলা দেশের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা। বইটিতে নানা অজ্ঞাত তথ্য অতি যত্নসহকারে সংগৃহীত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭০। এমন সমৃদ্ধ গবেষণা-গ্রন্থ বড় একটা চোখে পড়ে না।

খট্ খট্ খট্ খট্—

থেমে থেমে কড়া নেচে চলেছে। তীর্থপতি বললেন,—মাসের শেষ এখন, হয়তো কোন পাওনাদার এসছে।

দরজা খুলতেই দেখতে পাওয়া যায়, এক দল ছেলে। রুখু রুখু চুল, মলিন বেশ, মুখে মুখে ব্যাকুল আবেদনের করুণ ছায়া। যেন দায় উদ্ধারে বেরিয়েছে পিতৃহারার দল। ওদের হাতে ছাপানো বিল বই আর ঝর্ণাকলম।

তীর্থপতি সহাস্যে বললেন,—যা বলেছি ঠিক তাই। পাওনাদারই বটে। আসল পাওনাদার বেহাই দেয় মধ্যে মধ্যে। ওরা কিন্তু নাছোড়বান্দা।

—আপনার চাঁদাটা দেবেন আজকে? ওদের দলপতি বললে মুচকি হেসে।

বৌদি আড়াল থেকে বললেন,—গত পুজোয় পুজোর প্রসাদ ভোগ কিছুই পাওয়া গেল না। চাঁদার বেলায় ঠিক আসবে, কিন্তু ভোগের বেলায় অষ্টরম্ভা!

তীর্থপতি অন্দরবাসিনীর কথায় কর্ণপাত করলেন না। ওদের বললেন,—মহাপুজার অনেক দেরী এখনও। এরই মধ্যে চাঁদা দিতে হবে? এখন মাসের শেষ—

দলপতি আবার মুখ খোলে।—প্রতিমার অর্ডার দিতে হবে। প্যাণ্ডেলের জন্যে অ্যাড-ভান্স চাই। ব্যাণ্ড পার্টিকে বুক করতে হবে। ইলেকট্রিকের দোকানে—

—সামনেব মাসের প্রথম সপ্তাহে এসো। আমরা তো এক আধ টাকা দিই। যাঁরা বেশী দেন তাঁদের কাছ থেকে আগে আদায় করতে পারো। কথার শেষে তীর্থপতি আবার বইয়ের পৃষ্ঠায় চোখ দিলেন।

—বিন্দু বিন্দু থেকেই স্যর সিন্ধু হয়। লিট্‌ল ড্রপস অফ্ ওয়াটার—

—তা হোক। বললেন তীর্থপতি। বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে বললেন,—আপাততঃ অক্ষম। হাতে পয়সা নেই। আসছে মাসের গোড়ার দিকে—

—ঠিক আছে। তাই আসবো। এবার কিন্তু এক টাকা নেওয়া হবে না। ডবল চাই। বাজার দর চড়চড়িয়ে উঠে গেছে।

—তথাস্তু। চেষ্টা করবো। এখন এসো।

তীর্থপতির মুখে যেন ঈষৎ বিরক্তি দেখা দেয়। ছেলেরা অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বললেন,—ওরাই এখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ওদের খুশী করতে না পারলেই এ্যাসিড বাল্ব্, হাতবোমা!

দরজা বন্ধ হ'তেই প্রশ্ন করলাম,—আমাদের দেশে বারোয়ারী পূজা কত দিন চালু হয়েছে?

তীর্থপতি বইয়ের শেলফে চোখ ফেরালেন। বললেন,—দাও, ঐ বইখানা দাও। বলে দিচ্ছি কবে থেকে।

খবরের কাগজের কাটিং সংগ্রহের বাতিক আছে তীর্থপতির। কাটিং বই খুলে দেখালেন। বললেন,—শ্রীরামপুরের মাসিক

সেকালের দুর্গোৎসবে ইংরাজ সম্প্রদায়

ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়ার ১৮২০ সালের মে মাসে লিখেছে—

"....a new species of Pooja which has been introduced into Bengal within the last thirty years, called Barowaree,... About thirty years ago, at Goopti Para near Santipoora, a town celebrated in Bengal for its numerous Colleges, a number of brahmans formed an association for the celebration of a pooja independently of the rules of the Sastras. They elected twelve men as a committee, from which circumstance it takes its name, and solicited subscriptions in all the surrounding villages."

মনে মনে হিসাব কষতে শুরু করি। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলা দেশে প্রথম বারোয়ারী পূজার পত্তন হয়।

তীর্থপতি আরও বললেন,—হুতোম প্যাঁচার নক্সায় কি লিখেছে তাই শোন। হুতোম বলছেন—

"দুর্গোৎসব বাঙলা দেশের পরব। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এর নামগন্ধও নাই। বোধহয়, রাজা কৃষ্ণচন্দরের আমল হ'তেই বাঙ্গলায় দুর্গোৎসবের প্রাদুর্ভাব বাড়ে। পূর্বে রাজা-রাজড়া ও বনেদী বড়-মানুষদের বাড়ীতেই কেবল দুর্গোৎসব হতো, কিন্তু আজকাল অনেক—"

থাম্‌কি থেমে আবার তীর্থপতি পড়তে থাকেন হাস্যে। সেযুগের সমাজ চিত্র পড়ছেন, তাই মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তীর্থপতি পড়তে শুরু করলেন, হুতোমের লেখা—

"কলাইবাবু বারোইয়ারী বই নিয়ে না খেয়ে বেলা দু'টো অবধি নানাস্থানে ঘুরলেন। কোথাও কিছু পেলেন, কোথাও মন্ত টাকা সই মাত্র হলো; (আদায় হয়ে না, তার ভয় নাই), কোথাও গলাধাক্কা, তামাসা ও ঠোনাটা-ঠানাটাও সইতে হলো। বিশ বছর পূর্বে কলকাতার বারোইয়ারী চাঁদা-সাধার প্রায় দ্বিতীয় অষ্টমের পেয়াদা ছিলেন—ব্রহ্মোত্তর জমির খাজনা-সাধার মত লেকের উনোনে পা দিয়ে টাকা আদায় কত্তেন। অনেক চোটের কথা কয়, বড়মানুষেদের তুষ্ট ক'রে টাকা আদায় কত্তেন।"

পড়া শেষে তীর্থপতী বললেন,—যারা আজ এসেছিল তারা যে কানাইবাবুদের অকৃত্রিম বংশধর নয় কে বলবে!

অলক্ষ্যে থেকে বৌদি সাবধানী সুরে বললেন,—ক'টা বেজেছে, খেয়াল আছে? আজ কি স্কুল নেই?

অন্য এক গ্রহ থেকে পৃথিবীতে ফিরে এলেন তীর্থপতি। ঘরের কোণে টাইম-পিস। ন'টা বেজে গেছে কখন! অনিচ্ছার দৃষ্টিতে ঘড়ি দেখলেন। বললেন,—ছেলেটা গেল কোথায়? তোমার কাশীপতি? আজ যে বড় পড়তে এলো না?

বৌদি বললেন,—আমি তাকে পাঁড়িয়ে দিয়েছি। তোমার ভরসায় থাকলে আর দেখতে হবে না। আড্ডায় বসলে তুমি আবার দুনিয়া ভুলে যাও।

আমাদের মধ্যে থেকে কে একজন ক্ষোভের কণ্ঠে বললে,—কলকাতার এত দুর্নাম, তবুও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চ'লেছে ক্রমেই। কলকাতার কি এত আকর্ষণ? লোকে বলে কলকাতা শুধু চোর আর বাটপাড়ের লীলা-ক্ষেত্র।

তীর্থপতি বললেন,—ক্যালকাটা সিটিজেন্স ক্লাবের সাম্প্রতিক হিসাবে প্রকাশ, কলকাতায় এখন সর্বসাকুল্যে ত্রিশ লক্ষ লোকের বসবাস। চোর আর বাটপাড়ের সঙ্গে আর একটা শব্দ সংযোজন করতে হবে, সেটি হ'ল কালো-বাজারী।

কেউ কেউ হেসে উঠলো। কেউ হাসি চাপলো। কে একজন বললে,—আগে এখানে কত লোকের বাস ছিল?

এক টিপ নস্যি নাকের কাছে ধরলেন তীর্থপতি। বললেন,—মুখের মত প্রশ্ন যদি তোমরাও ক'রতে থাকো, তা হ'লে আমি নাচার। কত আগে তাই বল। প্রি-ওয়ার টাইমে? না পঞ্চাশ বছর আগে? না হয়তো বল' একশো বছর আগে। যা হয় একটা সীমা-নির্দেশ হওয়া চাই।

কেউ বললে,—একশো বছর আগে?

আর একজন বললে,—দুশো বছর আগে?

বইয়ের শেলফ্ থেকে কি একখানি বই টেনে নিলেন তীর্থপতি। পৃষ্ঠা খুলে ধরলেন আমাদের চোখের সম্মুখে। বললেন,—তোমরা

সে যুগের দুর্গামূর্তি — শিল্পী—শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস

দেখে নাও। আমি স্নানাহার সেরে নিই। ফার্স্ট আওয়াবেই ক্লাশ আছে আজ।

আমাদেব সামনে কলকাতার লোকসংখ্যার ক্রমিক ফিরিস্তি। আমরা দেখতে দেখতে পরস্পরে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকি। বিশ্বাস হয় না আপন আপন চক্ষুকে। তাই বার বার নজর দিই নির্দিষ্ট পাতার ছাপার অক্ষরে—

১৯০১ খৃষ্টাব্দে সর্বসমেত জনসংখ্যা ছিল ৫৭৭১৫৬। পুরা ছয় লক্ষ ধরলেও গত ৬৪ বছরে আরও ২৪ লক্ষ লোক বৃদ্ধি পেয়েছে। কলকাতা কি তবে সর্বগ্রাসী? কে জানে, হয়তো তাই হবে। সেযুগের সংগে এযুগের তুলনায় কলকাতাব পটপরিবর্তন হয়েছে কতটা? ঘর-বাড়ী আর রাস্তার সংখ্যা বর্ধিত হয়েছে। কলকাতার সমাজ-জীবন যেমনকার তেমনি আছে। কালের উপযোগী কিছু কিছু ফ্যাশন আর স্টাইলের প্রবর্তন হযেছে। নতুন বোতলে সেই পুরাতন সুরা যাকে বলে। বারোইয়ারীর বদলে 'সার্বজনীন' শব্দটা চালু হয়েছে। আসল কথাটি যদিও 'সর্বজনীন'।

* * *

বাঙলা দেশে জমিদারী প্রথা লুপ্ত হওয়ার সংগে সংগে সখ আর সৌখীনতা বিদায় গ্রহণ করেছে। জমিদারশ্রেণী শোষক ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা যে অনেক কিছুব পোষক ছিলেন, অস্বীকারের উপায় নেই। সাহিত্য, শিল্পকলা, যাত্রা, কবির লড়াই জমিদারবাবুদের বড়ই প্রিয় ছিল। অধুনা জমিদারেব স্থান দখল করেছে এক দল কালোবাজারী। এদের হাতে টাকা আছে সুপ্রচুর, হাতিয়ার আছে যথেষ্ট—দুঃখের বিষয় নেই কোন রুচি। স্বদেশীয়ানার প্রতি রক্তের টান নেই। তাই বারোয়ারীর প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে দেখতে

ধর্মাবলম্বী	১৭১০ খ্রীঃঅব্দ	১৭৫২ খ্রীঃঅব্দ	১৮২১ খ্রীঃঅব্দ	১৮৯১ খ্রীঃঅব্দ	১৯০১ খ্রীঃঅব্দ
হিন্দু	৮০০০	৭৫৬৯৬	১১৮২০৩	৩৩১২৬৬	৩৮৬৫০২
মুসলমান	২১৫০	৩৭৮৭৮	৪৮১৬২	১৪০৯৭২	১৫২২০০
খৃষ্টান	১৮৫০	৩৮০০	১৩১৩৮	২৩৭৭৩	৩০৩৪৪
বাণ্মিজ	”	”	”	৬৭৪	১৩২৬
চীনা	”	”	৪১৪	৭৭১	১৪৬৬
পারসী	”	”	”	১৪৩	২৭৪
ইউদী	”	”	”	১৩৭৪	১৮০৮
অন্য ধর্মাবলম্বী	”	”	”	১৯১৯	৩২৩৬

পাওয়া যায় টুইস্ট নাচের বহর, মাইকে শুনতে পাওয়া যায় ছায়াছবির গান। ইদানীং মাকে দেখলে আনন্দমঠের মহামাতৃকার রূপ ভুলে যেতে হয়। মা আজ যেন টালিগঞ্জের তারকা। নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে এসেছেন। পরিবার পরিকল্পনার বিজ্ঞাপনের বহর দেখে মা যেন সলজ্জায় পুত্রকন্যাদের পরিহার করেছেন। গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী দূরে দূরে থাকেন, ছাড়াছাড়ি অবস্থায়। আজকের দুর্গা পূজায় আড়ম্বর যথেষ্ট আছে, অভাব আছে আন্তরিকতার। মায়ের যে এমন হাল হবে জেনেই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা জনৈক কবি বহুকাল পূর্বে খেদের সঙ্গে লিখেছেন—

"হিঁদুদের দুর্গোপুজো
উপরে চিকন চাকন ভিতরে খড়ের বুজো!"

ছড়াটি তীর্থপতির কাছেই শুনলাম।

সেদিন ছিল রবিবার। ছুটির দিন। অফুরন্ত অবসর। আমাদের প্রায় সকলেই তীর্থপতির মাঠকোটায় উপস্থিত। একথা সেকথার পরে আমাদের দলের কে একজন বললেন,—মা দুর্গার পূজা কে প্রথম চালু করলে?

নস্যির কৌটা খুলে হাতের তালুতে প্রায় এক গ্রাম ঢেলে ফেললেন তীর্থপতি। নস্যি নাসিকাসেবনের আগে খানিক তাকিয়ে থাকলেন শূন্য দৃষ্টিতে। প্রশ্নটা শুনে তিনি যেন বিভ্রান্ত, ভাণ করলেন।

—রামচন্দ্র।

কে একজন বললে। উত্তরদাতা হিসাবে প্রথম স্থানের অধিকারী হওয়ার লোভে।

—উঁহুঁ। না।

আনুনাসিক সুরে বললেন তীর্থপতি। নস্যির টিপ নাকে তুলে ধরলেন।

—রাবণ?

আর একজন বললে প্রথম স্থানলাভের বাসনায়।

এপাশে ওপাশে মাথা দোলালেন তীর্থপতি। তাঁর মাথার পিছনে গেরোবাঁধা শিখা নেচে নেচে উঠলো। বললেন,—না না।

তীর্থপতির মুখে ডবল না শুনে আমাদের যেন নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে হ'ল। আমরা যে স্রেফ অজ্ঞ অর্বাচীন, কিসে আর প্রমাণ পাওয়া যাবে? সুতরাং আমরা নির্বাক হ'য়ে মৌন অবলম্বন করতে বাধ্য হ'লাম।

—তবে কে মহারাজা কেষ্টচন্দর?

আমাদের মধ্যে থেকে কে একজন ক্ষীণ কণ্ঠে শুধোয়।

হেসে ফেললেন তীর্থপতি। বললেন,—না তাও নয়। একটু সবুর কর'। ছেলেটাকে ডাকি। সেই উত্তর দিক। এ ধরনের প্রশ্ন আমার কাছে জানবার আগে কাশীপতির কাছে জেনে নিও। খানিক থেমে কণ্ঠ উচ্চগ্রামে তুলে ডাকলেন,—কাশী! কাশীপতি।

—কি বলছো আমাকেই হুকুম করতে পারো। কাশী এখন আঁক কষছে।

ভেতর থেকে মিহি সুরে বৌদি বললেন। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে কথা বললেন।

—একবার তাকে চাই দু' মিনিটের জন্যে।

তীর্থপতি বললেন। যেন কোন অজুহাত তিনি শুনতে চান না।

অগত্যা কাশীপতি এসে হাজির হয়। তার মুখে বিরক্তি। হাতে কলম।

—আচ্ছা কাশী, বলতে পারো দুর্গা পূজো কে প্রথম করেছিলেন?

ছেলেকে শুধোলেন তীর্থপতি। তিনি যেন নিশ্চিন্ত, ছেলে সঠিক উত্তর দেবে।

কাশীপতি বললে,—দেবী পুরাণে আছে, স্মরণমাত্র ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে দুর্গম শত্রু-সঙ্কট থেকে উদ্ধার করেছিলেন তাই নাম হয়েছিল দুর্গা।

তীর্থপতি।—দেবীপুরাণের শ্লোকটি শুনিয়ে দাও।

কাশীপতি গড়গড়িয়ে আওড়াতে থাকে—
"স্মরণাদভক্তে দুর্গে তারিতা বিপৎসঙ্কটে
দেবাঃ শক্রাদয়া যস্মাত্তেন দুর্গা প্রকীর্তিতা।"

তীর্থপতি বললেন,—এবার বল' কে প্রথম পূজা করেছিলেন।

কাশীপতি বললে,—সত্য যুগে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য দুর্গার মূর্তি তৈরী ক'রে ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর দুর্গার পূজার্চনা করেছিলেন। ত্রেতাযুগে রাবণ চৈত্রমাসে বসন্তকালে দুর্গা পূজা করতেন। তাই এই পূজার নাম বাসন্তী পূজা। রামচন্দ্র অকাল বোধন ক'রে রাবণবধের জন্য দুর্গা পূজা করেন।

—একশোর মধ্যে একশো দিলাম তোমাকে। তুমি এখন যেতে পারো।

পণ্ডিত মানুষ তীর্থপতি। শিক্ষকতা করেন। সেজন্য কথায় কথায় নম্বর দেন তিনি। পরীক্ষার দৃষ্টিকোণে বিচার করেন সকল কিছুর। ছেলের অনুপস্থিতিতে বললেন,—তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।

আমরা সত্যিই লজ্জায় অধোবদন হই। মুখে আর কথা জোগায় না। আমাদের জ্ঞানের পরিধি কত যে সঙ্কীর্ণ, উপলব্ধি করতে থাকি।

হঠাৎ শুনতে পাওয়া যায় দরজার কাছে পিরিচ পেয়ালার শব্দ। বৌদি বসিয়ে দিয়ে গেলেন, ডিমেকটা পেয়ালা আর চায়ের একটা নাতিবৃহৎ কেৎলী। একটা বড় বেকাবীতে পাঁপরভাজা। যাক, ঘরের আবহাওয়া এবার খানিক হাল্কা হবে। আমরা মনে মনে দুর্গানাম স্মরণ করি। তীর্থপতির লজ্জাকর মন্তব্য আর না শুনতে হয়।

রেকাবী থেকে একটা পাঁপর তুলে সশব্দে কামড় দিলেন তীর্থপতি। তাঁর চর্বনপর্ব আমাদের কানের ভিতর দিয়ে মরমে গিয়ে পশে। তীর্থপতি বললেন,—লজ্জার বালাই শিকেয় তুলে রেখে এখন পাঁপরে মনঃসংযোগ করলে বেশকার ভাল হয়। ঠাণ্ডা পাঁপর আর মিয়ানো মুড়ি খাদ্য হিসাবে একেবারেই অচল, অখাদ্য।

—সেকালের কলকাতায় দুর্গাপূজা সম্পর্কে যদি কিছু বলেন। শোনা যাক চায়ের সঙ্গে।

কে যেন সসঙ্কোচে কথা বললে আমাদের দল থেকে। সে যেন ভয়কে জয় করেছে অতি কষ্টে।

তাই হোক। বললেন তীর্থপতি। কাটিং খাতা খুলে পাতা ওলটাতে শুরু করলেন। এক পাতায় তাঁর চক্ষু থেমে গেল। তিনি পড়তে থাকেন—

"এ শহরে আজকাল দু'চার এজুকেটেড ইয়ংবেঙ্গলও পৌত্তলিকতার দাস হয়ে পূজো-আচ্ছা ক'রে থাকেন; ব্রাহ্মণভোজনের বদলে কতকগুলি দিল্‌দোস্ত মদে ভাতে প্রসাদ পান। আলাপি ফিমেল ফ্রেন্ডেরাও নিমন্ত্রিত হয়ে থাকেন। পূজোবো কিছু বিফাইন্ড কেতা। কারণ অপর হিন্দুদেব বাড়ী নিমন্ত্রিত প্রদত্ত প্রণামী টাকা পুরোহিত ব্রাহ্মণেরই প্রাপ্য; কিন্তু এঁদের বাড়ী প্রণামীর টাকা বাবুর একাউন্ট ব্যাঙ্কে জমা হয়। প্রতিমের সামনে চর্বির বাতি জ্বলে ও পূজোর দালানে জুতো নিয়ে ওঠবার এলাওয়েন্স থাকে। বিলেত থেকে অর্ডার দিয়ে সাজ আনিয়ে প্রতিমে সাজান হয়—মা দুর্গা মুকুটের পরিবর্তে বনেট পরেন স্যান্ডুইচের শেতল খান, আর কলাবউ গঙ্গা-জলের পরিবর্তে কাৎলীকরা গরম জলে স্নান ক'রে থাকেন। শেষে সেই প্রসাদী গরম জলে কর্মকর্তার প্রাতরাশের টি ও কফি প্রস্তুত হয়।

পাঠ শেষ হ'তেই ঘরের মধ্যে হাসির কলগুঞ্জন শোনা যায়। হাসির কোবাস যাকে বলে। তীর্থপতি কিন্তু হাসি সম্বরণ করেন। চায়েব পেয়ালায় পর পর কয়েকটা চুমুক দিয়ে স্বগত উক্তির সুরে বললেন,—হুতোম ইজ ইউনিক। অদ্বিতীয়।

—সেযুগের দুর্গাপূজায় সাহেব-সুবোরা না-কি নিমন্ত্রণ খেতে আসতো।

কে প্রশ্ন করলে খেয়াল নেই তীর্থপতির। খাতার পাতা থেকে মুখ তোলেন না। পাতা উলটে চলেন একের পর এক। পাঁপরের খানিক অংশ মুখে পুরে বললেন,—শুধু কি নিমন্ত্রণ! সেই সঙ্গে বাইনাচ দর্শন। ফরাসীতে তামাক খাওয়া। সেযুগের 'বঙ্গদূত' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। এই পত্রিকায় যুক্ত ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাম-মোহন রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি। সম্পাদক ছিলেন নীলরত্ন হালদার। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে। বঙ্গদূতের একটি চিঠি তোমাদের শোনাতে চাই। চিঠিখানি এই—

শ্রীযুত বঙ্গদূত সম্পাদক মহাশয়েষু—

এই কলিকাতা রাজধানী মধ্যে শারদীয় মহোৎসবে ত্রিবিধ লোকের আলয়েই জগদ্ধাত্রীবরীর পূজা হয় সকলে স্ব স্ব মতে ও বিভবানুসারে নানোপচারে তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন কেহ বা ইতরঙ্গে রাগরঙ্গের বাহুল্য না করিয়া মুখ্যাঙ্গ হোম যাগ যজ্ঞাদি ও বিবিধোপহারে পূজা সাঙ্গ করেন কেহ বা মহাঘটা পূর্বক ঝাড় লণ্ঠন বাদ্য নাচ কাচের আধিক্য পূর্বক প্রকৃত কার্য পূজা সংক্ষেপেই

(শেষাংশ ১০২ পৃষ্ঠায়)

মর্যাদা / জরাসন্ধ

কালো-বর্ডার-দেওয়া খামখানা টেবিলের উপর চাপা দেওয়া ছিল। ঘরে ঢুকে চোখে পড়তেই মধুরবাবুর বুকের ভিতরটা নড়ে উঠল। কে জানে, কার "খবর" এল! খুলতে গিয়ে হাতটাও কেঁপে গেল। এক নজর দেখবার পর আর কোনো চাঞ্চল্য অনুভব করলেন না। এর জন্যে বোধহয় ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত ছিলেন। অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। খোলা চিঠিখানা হাতে করে জানালার বাইরে নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন।

সুপ্রভা কী কাজে ঘরে এসেছিলেন। স্বামীকে ঐ অবস্থায় দেখে ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে বললেন, কার চিঠি?

বলতে গিয়ে অজানা আশঙ্কায় গলাটা কেঁপে উঠলো।

মধুরবাবু তেমনি জানালার বাইরে দৃষ্টি রেখেই বললেন, ব্যানার্জি সাহেব গেলেন।

সুপ্রভার মুখের উপর ম্লান ছায়া ঘনিয়ে এল। আর কোনো কথা বললেন না মধুরবাবু গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, সেদিন দেখে কিন্তু মনে হয় নি, এত শিগগির যাবেন। এটা বোধহয় আমার জন্যেই হল।

—"ওমা, সে কী কথা!" সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন সুপ্রভা, "তোমার জন্যে হবে কেন? সবই নিয়তি।"

—আমার সেই হঠাৎ গিয়ে পড়াটা বাড়ির কেউ তো ভালো চোখে দেখেন নি।

—তা তুমি আগে থেকে কেমন করে জানবে? নিজের ইচ্ছাতেও যাও নি। উনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন বলেই গিয়েছিল।

—হ্যাঁ; হয়তো সেই ডেকে পাঠাবার জের আর টানতে পারলেন না। একটা মাসের মধ্যেই ওরা অত বড় লোকটাকে—

কথাটা শেষ করলেন না মধুরবাবু—সুপ্রভা সেদিন স্বামীর মুখে যতটা শুনেছিলেন, তার থেকেই বাকীটুকু বুঝে নিলেন। কিন্তু অসুস্থ পুরোনো মনিবকে দেখতে গিয়ে উনি যে কোনো অপরাধ করে ফেলেছেন, একথা মেনে নিতে পারলেন না। তাছাড়া, তার সঙ্গে এই মৃত্যুর হয়তে সত্যিই কোনো যোগ নেই। ওটা মধুর-বাবুর মিথ্যা অনুমান। সেটা আশ্রয় করে স্বামীর মনে যে অকারণ মেঘ জমে উঠেছে, তাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। বেশ খানিকটা জোর দিয়ে বললেন, থাকগে; ও নিয়ে মিছেমিছি মন খারাপ করো না।

"ভাজ" কবে? ভুরু

মধুরবাবু হাতের চিঠিখানায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, এগারই মানে পরশু।

—লোকজন খাওয়াচ্ছে নিশ্চয়ই?

—কি জানি? দাঁড়াও, দেখছি।

চিঠির উল্টোপিঠে "স্মারকলিপি" দেওয়া ছিল। পড়ে গেলেন—'সকাল আটটায় সভারেহণ; নটায় নামকীর্তন; সন্ধ্যা, সাতটা থেকে দশটা—জ্ঞাতি বান্ধবাদির আপ্যায়ন।

—সে আবার কী?

—ঐটাই বোধহয় খাওয়াদাওয়া। তমনি করে লেখে আজকাল।

—মরুকগে। তুমি সকাল বেলাটা এবার ঘুরে এসো।

—কী হবে গিয়ে? যাঁর সঙ্গে সম্পর্ক, তিনি চলে গেলেন। ওরা আমার কে? একখানা চিঠি যে মনে করে পাঠিয়েছে, তাতেই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।

—একি আর ওরা পাঠিয়েছে? যাঁর "কজ", তাঁর ইচ্ছেতেই এসেছে। তাঁর কথা ভেবেই তোমার একবার যাওয়া দরকার। স্বর্গ থেকে সবই দেখতে পাচ্ছেন তো।

স্ত্রীর কথাটা মথুরানাথের মনে লাগল। স্বর্গত মনিবের ইচ্ছা বা আদেশ বলেই একে গ্রহণ করলেন। তাঁর জীবিতকালে যেমন ভোনদিন সেটা অমান্য করেন নি, আজও করবেন না। "আপ্যায়নে তাঁর প্রয়োজন নেই, শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হয়ে পরলোকগত আত্মার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে আসবেন। সেটুকু তাঁর অবশ্যকরণীয়।

টেবিলের দেরাজ খুলে খামটা রাখতে গিয়ে সেদিনের চিঠিখানা চোখে পড়ল। ব্যানার্জি সাহেবের শেষ হস্তাক্ষর। চাকরীজীবনে অনেকগুলো বছর প্রায় প্রতিদিন ঐ লেখার সঙ্গে না হলেও সইটার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে। "পরিচয়" বললে কিছুই বলা হল না। ওর প্রতিটি রেখা, প্রতিটি বাঁক ও বিন্দু তাঁর চোখের উপর ভাসত। মোটা কলম দিয়ে বড় বড় অক্ষরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে সই করতেন—জে কে ব্যানার্জি। প্রত্যেকটি অক্ষর স্পষ্ট ও পুরুত। যে জানে না, কোনোদিন দেখে নি, সেও এক নজরে পড়ে ফেলতে পারত।

বেশির ভাগ 'অফিসারের' সই পড়া যায় না। কোনো অক্ষরটাই পুরো নয়, এর অধখানার সঙ্গে ওর তিন-চতুর্থ জড়িয়ে আছে। অনেকটা ইচ্ছাকৃত। নিজের নামটাকে রহস্য ও অস্পষ্টতার অন্তরালে লুকিয়ে রাখাই বোধহয় স্বাক্ষরকারীর মনোগত অভিপ্রায়। 'নাম' জেনে কী করবে লোকে? তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তো 'পদের', সেই পদটা জানুক। সই'এর নীচে টাইপিস্ট সেটা বসিয়ে দেবে। নামটা যেন too Sacred সকলের কাছে প্রকাশ্য নয়। ওটা জানবে শুধু তারা, যাদের সঙ্গে সম্পর্কটা অফিসিয়াল নয়, ব্যক্তিগত।

কিন্তু ব্যানার্জি সাহেবের কোথাও কোনো লুকোচুরি বা অস্পষ্টতা ছিল না—না স্বভাবে, না স্বাক্ষরে। লোকটা ভিতরে বাইরে এক। কাজ নিয়ে কথা। ঐটিই ছিল তাঁর সম্পর্ক-নির্ণয়ের মান। ঐ দণ্ডটা দিয়ে কখনো আপনজনকে দূরে ঠেলে দিতেন, কখনো পরকে টেনে এনে বসাতেন আপনজনের আসনে।

মথুরানাথ যখন স্কুলে উপরের দিকে পড়েন, তাদের ইংরেজির মাষ্টার ছিলেন প্রমথ সেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, " Character" কথাটার একটা মানে হল চরিত্র, আরেকটা Letter বা অক্ষর। এ দু'এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। কে কতটা চরিত্রের লোক তার হস্তাক্ষর থেকেই তা বোঝা যায়। যার ভিতরে Boldness আছে তার হাতের লেখাও Bold;— আমরা বলি, He writes a o d hand. যে স্পষ্টবাদী, মনে মুখে এক, তার লেখার ভিতরে সেই স্পষ্টতা ফুটে উঠবে; আর যার মনের মধ্যে প্যাঁচ, তার অক্ষরগুলোও প্যাঁচালো।

প্রমথবাবু হয়তো এটা কোনো মতবাদ হিসাবে বলতেন না। অনেকটা ঠাট্টাচ্ছলে, যে-সব ছেলের হাতের লেখা খারাপ, তাদের একটু খোঁচা দেওয়া বা ঐ নিয়ে একটু মজা করা—এইটুই ছিল আসল উদ্দেশ্য ছেলেরা হাসত। তাদের মত মথুরবাবুও সেদিন একে হাল্কাভাবেই নিয়েছিলেন। কিন্তু চাকরি করতে এসে বিভিন্ন উপরওয়ালার সই দেখে তার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, মাষ্টার মশাই ঠিকই বলতেন। অন্ততঃ ব্যানার্জি সাহেবের বেলায় তার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না।

মাস্খানেক আগে এই চিঠিখানা যখন এল মথুরবাবু শিরোনামার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেও ধরতে পারেন নি, কার লেখা। অনেকদিন দেখেননি, সেটা কোনো কারণ নয়। এ লেখার সঙ্গে আগের দিনের লেখার মিল খুঁজে পাননি। সেই দৃঢ় ঋজু ভঙ্গি, সেই সুঠাম বলিষ্ঠতা কোথাও নেই। অক্ষরগুলো যেন ভেঙে দুমড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। সেই দিকে চেয়েই মথুরবাবুর বুকের ভিতরটা হাহাকার করে উঠেছিল। বুঝেছিলেন, এ লেখা যার সে মানুষটার জীবনেও এমনি কোনো বিপর্যয় ঘটে গেছে।

সংক্ষিপ্ত চিঠি। ইংরেজিতে লেখা কাজকটি মাত্র লাইন—"আশা করি ভাল আছেন। আমি অনেকদিন যাবৎ শয্যাগত। আপনার সুবিধামত একবার আসিয়া দেখা করিলে খুশী হইব।"

তার নিচে সেই সই—জে কে ব্যানার্জি। কিন্তু তার মধ্যে না আছে মেদ, না আছে মজ্জা।

মথুরবাবু দেরি করেননি। পরদিনই অসুস্থ ভূতপূর্ব মনিবকে দেখতে গিয়েছিলেন। ব্যানার্জি সাহেব অবসর নেবার পর ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের নতুন তৈরী সি-আই-টি রোডে বাড়ি করেছেন, এ খবর আগেই পেয়েছিলেন। কখনো যাননি। নম্বরটা চিঠি থেকেই পাওয়া গেল।

২

মথুরানাথ দত্তের বয়স তখন তিরিশের কোঠায়, ব্যানার্জির বয়স বছর দশেক। পূর্ব বাংলার রামাগুলে একটা বড় নামকরা থানার ও-সি, অর্থাৎ ভারপ্রাপ্ত অফিসার। সেকেন্ড অফিসার গিয়েছিলেন জেলা সদরে কোন কাজে। ফিরে এসে বললেন খবর শুনেছেন, বড়বাবু?

মথুরবাবু চোখ তুললেন।

—গ্রীন সাহেবের বদলির অর্ডার এসে গেছে।

—তাই নাকি, এত শিগ্‌গির?

—ঐ রকম হাবাগোবা এস-পি দিয়ে কি এত বড় ডিস্ট্রিক্টের কাজ চলে? বিশেষ করে এই সময়?

—কে আসছেন, শুনলেন?

—শুনেছি বৈকি? আসবার সময় কাইঠা কালীবাড়িতে জোড়া পাঁঠা মানৎ করে এসেছি। হে মা কালী, অর্ডারটা যেন ফস্‌কে যায়।

মথুরবাবুর এনকোয়ারী রিপোর্টে লিখছিলেন। কপাল কুঞ্চিত করে বললেন, কে, বল তো?

—'ব্যানার্জি সাহেব', বড় বড় চোখ করে বললেন হোসেনুদ্দি।

—কোন্ ব্যানার্জি?

—এখনো বুঝতে পারছেন না? জে কে। পি সি হলে তো এসেই হরির লুঠ দিতাম।

মথুরবাবুকে মোটেই চিন্তিত বলে মনে হল না। অসমাপ্ত রিপোর্টে হাত দিয়ে বললেন, ভয় পাবার কী আছে। জোরালো মানুষ এক দিক দিয়ে ভালো। যা করবার নিজেই করে, অন্যের কথায় ওঠে-বসে না।

—"জোরালো বলে জোরালো!" উচ্চকণ্ঠে সেকেন্ড করলেন সেকেন্ড অফিসার। কারো কাছে মাথা নোয়াবার ধার ধারে না। সাহেব কালেক্টরের সঙ্গে রীতিমত টক্কর দিয়ে চলে, শুনে এসেছি পুলিশ ক্লাবে। গ্রীন সাহেবের মত নয়। গ্রীন সিগন্যাল ফেলা আছে, যার খুশি চলে যাও।

সিগন্যাল ফেলার ভঙ্গি করে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন ছোটবাবু।

মাস ছয়েক পরে নতুন এস-পি এলেন ইন্সপেক্শনে। তখন বর্ষা কাল নদীর পারে থানা। স্টীমলঞ্চ একেবারে ঘাটের কাছে এসে ভিড়ল। থানার পাশে পোস্ট অফিস, তার পরেই স্কুল। "ইস্টীমারের" মোটা গলার হুঙ্কার শুনে ছেলের দল হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল, যদিও তখন বেলা তিনটা, পুরো স্কুলের সময়। দু-একজন মাস্টার মশাইকেও দেখা গেল ছেলেদের ভিড়ে।

স্টীম'-এর যুগ হলেও এই দূর অঞ্চলের বেশির ভাগ লোকের কাছে রেল-স্টীমার তখনো অ-দৃষ্ট বস্তু। তার অভাব মেটায় এই স্টীমলঞ্চ, তাও বছরের মধ্যে বর্ষার দুটি মাস, কালেক্টর বা পুলিশ সাহেব কালেভদ্রে যখন থানা তদারক করতে আসেন। নদীর দু'ধারে কাতারে কাতারে লোক এসে দাঁড়ায়। নানাবয়সী মেয়ে-পুরুষ। পর্দানশীন মোস্লেম বধূও দূরে দাঁড়িয়ে ঘোমটাটা একটু ফাঁক করে বিস্ময়ভরা কালো চোখ তুলে তাকায়। মাইনর স্কুলের ছেলেরা তখনো বেঞ্চি আগলে বসে থাকবে, অতিবড় কড়া হেডমাস্টারও তা আশা করেন না।

"ইস্টীমার"-এর সঙ্গে একটি ডিঙ্গি নৌকো থাকে। তারই বা বাহার কত! ঘাটে আসতে হলে তাতে করে আসতে হয়। ব্যানার্জি সাহেব যখন সেই বোট-এ উঠবার উদ্যোগ করছেন, ছেলেরা চঞ্চল হয়ে উঠল।

দিকে নজর পড়তেই চাঞ্চল্যটা দমে গেল। বিলাতী নয়, দেশী সাহেব, বাঙালী। সুতরাং অতটা ভীত হবার কারণ নেই। তবু ওরই মধ্যে যারা একটু কম সাহসী, তারা পিছনে হটে এল, কেউ কেউ চলেও গেল, দুঃসাহসীরা ঘাটটা ছেড়ে দিলেও আশে পাশে ছড়িয়ে রইল। ভাবখানা হল—সাহেবের ভাবগতিক দেখে যথাকর্তব্য স্থির করবে।

ব্যানার্জি সাহেব তীরে উঠেই কাছে যে ছেলেটিকে পেলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের হেডমাস্টার মশাই আছেন?

ছেলেটা একেবারে থ। পুলিশ সাহেব বাংলা বলছে। তাও জড়িয়ে পেঁচিয়ে সাহেবী কায়দায় নয়, একেবারে তাদের মত সোজা বাংলা। পাশ থেকে আর একজন বলে উঠল, আছেন, সার।

ঘাটের ঠিক উপরেই থানার কর্মীরা যথারীতি লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিকে এগিয়ে গেলেন এস-পি। ওখানকার যা পর্ব সেরে নিয়ে, ও-সিকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, স্কুলটা কোন্ দিকে?

মথুরবাবু হাত তুলে দেখিয়ে দিতেই সেদিকে পা বাড়ালেন। ও-সি পিছন পিছন যাচ্ছিলেন। থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ইউ নিড নট কাম।' হাতের বেটে ছড়িটা দিয়ে ছেলেদের এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করলেন। তারা ছুটতে ছুটতে স্কুলে গিয়ে ঢুকল।

ব্যানার্জি সাহেবের রং তেমন ফর্সা নয়, কিন্তু দীর্ঘ উন্নত দেহের স্বাস্থ্যটি উজ্জ্বল। পরনে নিখুঁত ফিট-করা ইউনিফর্ম। তার মধ্যে কৃতী দর্জির হাত তেমনি, সুষ্ঠু দেহ গঠনের কৃতিত্ব তার চেয়ে কম নয়। সরু ছড়িটা বগলে চেপে লম্বা লম্বা পা ফেলে মিনিট তিনেকের মধ্যেই স্কুলের বারান্দায় গিয়ে উঠলেন। হেডমাস্টার টুইল সার্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। এম-ই বা মিডল ইংলিশ স্কুল। ষষ্ঠ শ্রেণীতেই শেষ। গত বছর থেকে হাই স্কুলে পরিণত করবার প্রথম ধাপ হিসাবে সপ্তম শ্রেণী খোলা হয়েছে। উপরের দু-ক্লাশ মিলিয়ে গুটি বাইশেক ছেলে। তাদের মধ্যে অনেকেরই গোঁফের রেখা স্পষ্ট, কারো কারো সেটি আবার এরই মধ্যে বেশ কালো এবং পুরু হয় উঠেছে। অর্থাৎ বয়সটা পুলিশের নজরে পড়বার পক্ষে যথেষ্ট। তখনো 'নন কো-অপারেশন' আন্দোলনের ঢেউ মিলিয়ে যায় নি। সেই সূত্র ধরে কিছু কিছু ধর-পাকড় চলছে। তা ছাড়া এখানে সেখানে দু-চারটা 'স্বদেশী' ধরণের ডাকাতি বা লুটপাট উপলক্ষ করে কারো কারো গতিবিধি সম্বন্ধে খোঁজ খবর জিজ্ঞাসাবাদ লেগেই আছে। সেজন্য হেডমাস্টারকেই থানায় ডেকে নেওয়া হয়। পুলিশের ছোট-বড় কোনো কর্তা স্কুলে কখনো পদার্পণ করেন নি। এবারে স্বয়ং এস-পিকে এখানকার মাটিতে পা দিয়েই হন হন করে সোজা তাঁর স্কুলের দিকে আসতে দেখে প্রৌঢ়, নিরীহ মাইনর স্কুলের এফ-এ পাশ

কী বলে কেমনভাবে কোন ভাষায় অভ্যর্থনা জানাবেন, ভেবে পেলেন না। ব্যানার্জি তার জন্যে অপেক্ষা করলেন না। তাল গাছের সিঁড়ি বেয়ে মাটির দাওয়ায় উঠতে উঠতে দুহাত তুলে সবারে নমস্কার জানালেন এবং এদিক ওদিক দেখে নিয়ে কোণের দিকে হোগলাপাতার বেড়া ঘেরা যে কামরাটা চোখে পড়ল—একাধারে লাইব্রেরী, অফিস, মাস্টার মশাইদের হুঁকালয় ও বিশ্রাম কক্ষ—তারই পানে এগিয়ে চললেন।

ঢুকতেই বাধা পড়ল। ঠিক সামনেই একখানা আধময়লা মোটা ধুতি আড়াআড়ি-ভাবে টাঙানো। হেড মাস্টার তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটানে সেটা খুলে ফেললেন। ব্যানার্জি সাহেব লক্ষ্য করলেন, বেড়ার গায়ে ঐ রকম আরো দু-তিনখানা ধুতি সার্ট শুকোতে দেওয়া আছে। হেডমাস্টার এস-পির দৃষ্টি অনুসরণ করে সলজ্জ কৈফিয়তের সুরে বললেন, মাস্টার মশাইরা বেশির ভাগই আশেপাশের গ্রাম থেকে ডিঙ্গি নৌকো বা তালের ভোঙ্গায় করে আসেন। বৃষ্টি পড়লে জামা কাপড় বাঁচানো মুস্কিল। ছেলেদের আবার এই টাঙিয়ে দেবার সুবিধে-টুকুও নেই। ভিজে কাপড়েই থাকতে হয়।

ব্যানার্জি সাহেব জানালার ধারে সরে গিয়ে দাঁড়ালেন। ঠিক সামনেই দূরপ্রসারিত জলেমগ্ন মঠ এবং তার ওপারে গাছপালা ঘেরা গ্রামের দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলেন। সাদা চামড়ার সাহেব হলে হয়তো এই নিয়ে কিঞ্চিৎ সকৌতুক কৌতূহল কিংবা ছদ্ম সহানুভূতি প্রকাশ করতেন। কিন্তু তিনি এ দেশের লোক, যদিও এ-অঞ্চলের নন। ছেলেবেলায় স্কুলে যেতে আসতে খাল বিল নদী নালা না পেরোলেও বর্ষার পাঁক নামক প্রগাঢ় কোমল বস্তুটির কঠোর স্বাদ তাঁকে পেতে হয়েছে। সেই কথাই বোধহয় মনে পড়ছিল। কয়েক মুহূর্ত তারপরেই টেবিলের সামনে ফিরে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন এবং হেডমাস্টারকেও বসতে অনুরোধ করলেন। পকেট থেকে কয়েকখানা কাগজ বের করতে করতে হাসি মুখে বললেন, দুটো কাজ নিয়ে এলাম। এক নম্বর—আপনার ছেলেরা যে রকম সদলবলে আমাকে রিসিভ করতে গিয়েছিল—যদিও জানি, সেটা আমাকে নয়, আমার বাহনটাকে—তার বদলে আমার একবার ঘুরে যাওয়া উচিত বলে মনে হল।

হেডমাস্টার অত্যন্ত লজ্জিত হলেন—কিছুতেই আটকানো যায় না, সার। বকাবকি করে দেখেছি, শাস্তিও কম দিইনি। কিন্তু ঐ হর্ইসিলটা একবার কানে গেলে—

—'আর স্থির থাকতে পারে না' যোগ করলেন এস-পি। যাক, ও বিষয়ে পরে আসছি। এবার দ্বিতীয় কাজটা সেরে নিই।

হেডমাস্টার বুঝলেন, এবার তাকে অনেক বেশী কঠোরতর কৈফিয়তের দায়ে পড়তে হবে, জবাবদিহি করতে হবে হয়তো কোনো অর্বাচীন ছাত্রের সত্য বা কল্পিত রাজনৈতিক

গতিবিধির। 'বলব না' বলবার উপায় নেই, 'জানি না' বলেও এড়ানো যাবে না। তিনি স্কুলের হেডমাস্টার এবং স্থানীয় লোক। তাঁর প্রতিটি ছাত্রের নাড়িনক্ষত্র নখদর্পণে রেখে দেবেন, তাদের কর্ম ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হবেন, এইটুই আশা করেন সরকারী কর্তৃপক্ষ।

ব্যানার্জি সাহেব মাস্টার মশাইএর মুখের দিকে তাকিয়েই তাঁর বিব্রত ভাবটা বুঝতে পারলেন। মৃদু হেসে বললেন, আপনার ছেলেদের সম্বন্ধে কিছু নয়। ব্যাপারটা আমার; অর্থাৎ আমি যাদের চাই, তাদের নিয়ে। তাহলেও আপনার একটু সাহায্য দরকার।

কাগজখানা ওঁর সামনে খুলে ধরে যোগ করলেন, 'দেখুন তো, হাতের লেখাটা চেনা মনে হচ্ছে কি-না।' বলে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকালেন।

হেডমাস্টার এক নজর দেখেই চিনলেন। তাঁরই কোনো শ্রীমানের লেখা। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিলেন না। এস-পির অভিজ্ঞ পুলিশী চক্ষু তার প্রয়োজন বোধ করল না। বাচনিক উত্তরের অপেক্ষা না করেই আরেক-খানা চিঠি তেমনি মেলে ধরে বললেন, আর এটা?

সেখানাও চিনতে অসুবিধা হল না। ভয়ে ভয়ে বললেন, কিসের চিঠি? কী লিখেছে এরা?

—কী লিখেছে, তা নিয়ে আমার বা আপনার কোনো দুশ্চিন্তা নেই। জানা দরকার, কে বা কারা লিখিয়েছে।

হেডমাস্টার তখনো সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন দেখে আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন এস-পি—"এগুলো হচ্ছে এখানকার ও-সির নামে বেনামা দরখাস্ত" অনেক অ্যালিগেশন আছে।"

'ও-সির নামে!' অতিমাত্রায় বিস্মিত হলেন হেডমাস্টার।

'তাঁর বিরুদ্ধে এই বাঁদরগুলোর কি বলবার আছে? তাছাড়া বড়বাবু লোকটি এত ভালো—"

—পুলিশের আবার বেশী ভালো হওয়াও বিপদ। সে যাক। এর মধ্যে যা আছে তার সঙ্গে এই ছেলে দুটোর কোনো সম্পর্ক নেই। তারা সখ করে বা ইচ্ছে করে লেখেও নি। তাদের দিয়ে লেখানো হয়েছে। আমার ইন্টারেস্ট সেইখানে। আপনি এই ছেলে-দুটিকে বুঝিয়ে দেবেন, এদের কোনো ভয় নেই। ওরা যে নাম করবে, কারো কাছে প্রকাশ পাবে না। শুধু আপনি জানবেন, আর আপনার কাছ থেকে আমি জানবো। আশা করি আপনার কোনো আপত্তি নেই।

—"না, না, আপত্তি কিসের? ব্যাপারটা আমি আজই এদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে আপনাকে জানিয়ে দেবো। কিন্তু স্যার—" একটু ইতস্ততঃ করে বললেন হেডমাস্টার,

কিছুতেই আটকানো যায় না স্যার /

"এগুলো যে আমার ছেলেদের লেখা, আপনি জানলেন কেমন করে?"

—ওসব আমরা জানি। এই জাতীয় কাজ যারা করে, তাদের রীতি-নীতি ধরণ-ধারণ আমাদের চেনা হয়ে গেছে—এই রকমের ছোট ছোট ছেলেই ওদের বাহন, যাদের ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করা সহজ, লোকের নজরও বিশেষ পড়বে না।.....আচ্ছা, এবারে চলুন আপনার ছাত্রদের একবার দেখে যাই। রিটার্ণ ভিজিটটা তো ওদেরই প্রাপ্য।"

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, এক কাজ করুন। ছুটির সময় হয়ে গেছে। ওদের বরং এই বারান্দায় আসতে বলুন। এইখানেই দেখাটা হয়ে যাক।

সাতটা ক্লাস মিলিয়ে শখানেক ছেলে। জ্বরজারির সময় বলে ২০।২৫ জন অনুপস্থিত। হেডমাষ্টারের নির্দেশে ড্রিল মাষ্টার (তিনি আবার নিচের দিকে ভূগোলও পড়ান) এক এক ক্লাস করে সবাইকে বারান্দায় এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ছেলেগুলো, বিশেষ করে যারা ছোট, ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়াল। বড়দের মধ্যে কয়েকজন এল মনে মনে বেশ খানিকটা বেপরোয়া ভাব নিয়ে। "ইস্টিমার" দেখতে গিয়েছে তো কী হয়েছে? দেখা যাক, ওঁরা বলেন পুলিশ সাহেব। বেশী কিছু করলে তাবাও দু-কথা শুনিয়ে দেবে। তার জন্যে তৈরী হয়ে রইল।

এস পি একবার সকলের সামনে দিয়ে ঘুরে গেলেন। দু-একটি ছোট ছেলেকে আদর করলেন, একজন স্বাস্থ্যবান বড়-ছেলের বুকের উপর মৃদু ঘুষি মারলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা; তোমরা কে কে স্টীমারে করে বেড়াতে যাবে, হাত তোল।

কোনো সাড়া নেই। এ প্রস্তাবটা এমন অভাবনীয় কেউ যেন বিশ্বাস করতেই পারছে না। কিম্বা সাহেব হয়তো ঠাট্টা করছে তাদের সঙ্গে। প্রশ্ন সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল হেডমাস্টারের মুখের উপর। তিনি কি একটা ইঙ্গিত দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো হাত সোজা উপরে উঠে গেল। এস, পি, বললেন, বেশ। কিন্তু একটা কথা দিতে হবে। এর পরে যেদিন স্টীমার আসবে তোমাদের ঐ থানার ঘাটে—আমিই আসি কিম্বা আর কেউ-কেউ ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে যাবে না। ছুটির পরে যাবে কিন্তু স্কুলের সময়ে নয়। তোমরা ছাত্র, তোমাদের একটা মান আছে না? অমন আদেখলের মত ছুটে যাবে কেন?.....ঠিক তো?

প্রায় সব মাথাগুলো একদিকে হেলে পড়ল। অনেকে মুখেও বলল, হ্যাঁ স্যার। ব্যানার্জি সাহেব হেডমাস্টারকে বললেন, ওদের তাহলে থানার ঘাটে পাঠিয়ে দিন। আমি সারেংকে বলে দিচ্ছি, খানিকটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসুক।

এস, পি ঠিকই সন্দেহ করেছিলেন। মথুরবাবুর বহু দুষ্কর্মের দীর্ঘ তালিকার আসল রচয়িতা তাঁর সেকেন্ড অফিসার। অনেক দিন আছেন এই থানায়, এমন কতগুলো স্থানীয় সুবিধা ভোগ করছেন, যা আইনবিরুদ্ধ। কাজেকর্মেও যথেষ্ট শিথিল। মথুরবাবু এসে এই দুদিকেই কড়া নজর দিয়েছিলেন। 'বেনামা' দুখানা তারই প্রত্যাঘাত। ছোটবাবুর আর একটি দোসর ছিল —একটি কনষ্টেবল। পাশের গ্রামে বাড়ি। ছেলেদুটিকে সেই জুটিয়েছিল, এবং যথারীতি কোনো 'স্বদেশী' মামলায় জড়িয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে কাবু করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি।

ব্যানার্জি সাহেবের প্রথম ইন্সপেকশন। সেটা যে ব্যাপক হবে, থানা-প্রশাসন এবং তার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের কাজকর্মের কোনো দিক, কোনো খুঁটিনাটি বাদ পড়বে না, এটা সকলেরই জানা। তারই ভিতর দিয়ে কৌশলে এবং সকলের অজানতে দরখাস্ত-বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে যতটা জানা যায়, জেনে নিলেন। তার কোনো আভাস দিলেন না, ও-সি-র কাছেও ভাঙলেন না। সদরে ফিরে গিয়ে কনষ্টেবলটিকে বহু দূরে কোনো দুর্গম জায়গায় বদলি করলেন, এবং সেকেন্ড অফিসারকে টেনে নিলেন কোতোয়ালী থানায়, যেখানে তার গতিবিধির উপরে নিজেই খানিকটা নজর রাখতে পারেন।

অনেক বছর পরে, মথুর দত্ত তখন সার্কেল ইন্সপেক্টর, ব্যানার্জি সাহেব, এই সব নামহীন বা ছদ্মনামা অভিযোগ সম্পর্কে কী "অ্যাকশন" নেওয়া উচিত, সেই আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁকে এই দরখাস্তের কথা বলেছিলেন। তার আগে তিনি কিছুই জানতে পারেন নি।

চাকরির বোঝা নামিয়ে দিয়ে এসেছেন কতদিন! এখনো মাঝে মাঝে এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, এবং সদাশয় মনিবটির কথা মথুরবাবুর মনে

হয়। আর সবাইকে প্রায় ভুলেই গেছেন। এই 'বেনামা'র ব্যাপারে অন্যান্য কর্তাদের কাছে তাকে কত না লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে। তারা বুঝতেন না (অথবা বুঝেও হয়তো খানিকটা মন্দা করবার লোভে চেপে যেতেন) যে নিচের স্তরের কর্মীদের হাতে এটি একটি অমোঘ অন্তর্ঘাতী বাণ, যা দিয়ে ইন্দ্রজিতের মত মেঘের আড়ালে বসে অবাঞ্ছিত উপরওয়ালাকে অনায়াসে ঘায়েল করা যায়, অথচ নিজেদের গায়ে আঁচটুকুও লাগে না।

মথুরা দত্ত কাজের লোক, তাঁর নিচে যারা থাকত, তাদের কাছ থেকেও কাজ চাইতেন এবং আদায় করে ছাড়তেন। ফাঁকি কুড়েমি কিংবা গাফিলতিকে প্রশ্রয় দিয়ে অনুকর্মী-দের কাছে "জনপ্রিয়" হবার তাঁর কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না। ফল হত শত্রু বৃদ্ধি। বড্ড খিটখিটে লোকটা, দাও একখানা বেনামা ঝেড়ে'। একগাদা অ্যালিগেশন'। এস. পি-র হাতে পৌঁছতে না পৌঁছতেই সীল করা খামে ফিরে এল ও'রই হাতে—'ডিটেলড্ রিপোর্ট' চাই। নামে রিপোর্ট, আসলে কৈফিয়ত, কল্পিত অপরাধের জবাব-দিহি। যারা 'ঝেড়েছিল' মোটা খাম এবং গলার বহর দেখেই উল্লসিত—এসে গেছে বাঁশ! তখন অন্য কোনো ঠিকানা থেকে অন্য হাতের লেখায় ছাড়ল আরেকখানা, এমনি করে চলল। কর্তৃপক্ষ বিরক্ত হলেন—ডেকে নিয়ে ধমকালেন, বারে বারে এত অভিযোগ আসছে কেন তোমার নামে। কোনো কোনো এস, পি, আবার 'গোপন' তদন্ত চালালেন, ঐসব দর-খাস্তের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু 'এনকোয়ার' অর্থাৎ জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া এনকোয়ারী হবে কেমন করে? সুতরাং গোপন কিছুই রইল না। বাণ যারা ছুড়েছিল, তারা জানল, এবং সকল লক্ষ্যভেদের আনন্দটা চেপে রাখবারও প্রয়োজন বোধ করল না।

ব্যানার্জি সাহেব থাকতে থাকতেই মথুরবাবু সদর থানার অফিসার ইন-চার্জ হয়ে গেলেন। খুশী হয়েছিলেন বৈ কি? যদিও কাজ বেশী, দায়িত্ব অনেক কিন্তু মাইনে একই। চার্জ নিলেন ফজল্ করিমের কাছ থেকে। জানেকটা সিনিয়র, যাবার সময় বলেছিলেন, নতুন সদরে এলে, ভালোই। এখন অন্দরমহলের ঠেলা সামলাতে পারলে হয়।

—অন্দরমহল!

করিম সাহেব আর কিছু বলেন নি, চোখ টিপে একটু রহস্যময় হাসি হেসে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

দিন পনের পরে সকালের দিকে নিজের ঘরে বসে কাজ করছিলেন। এস পি-র আর-দালী সুজন সিং যথারীতি সেলাম করে এক টুকরা কাগজ আর পাঁচ টাকার একখানা নোট তাঁর সামনে রেখে বলল, মেমসাহেব বলেছেন, জিনিসগুলো যেন আজ সন্ধ্যার পরেই কুঠীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

—'কী এটা?' কাগজের ভাঁজ খুলতে খুলতে বললেন মথুরবাবু।

—মাসের বাজার।

লম্বা ফর্দ। চাল, ডাল, তেল, নুন, ঘি, ময়দা—মসলাপাতি—তখনকার দিনেও শ-খানেক টাকার মাল। একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নোটখানা এগিয়ে ধরে বললেন, এটা বরং তুমি নিয়ে যাও। জিনিসের সঙ্গেই পুরো টাকার বিল যাবে। এক সঙ্গে দিয়ে দিলেই হবে।

আরদালী হাত না বাড়িয়েই বলল, টাকা ফেরৎ নিয়ে গেলে মেমসাহেব গোসা হবেন।

—কেন?

আরদালী আর কোনো জবাব দিল না। নোটখানা পকেটে পুরে মথুরবাবু বললেন, আচ্ছা, তুমি যাও।

থানার একজন সিপাইকে ডেকে মাল-পত্রগুলো একটা কোনো ভালো দোকান থেকে নিজে দেখেশুনে কিনে বড় সাহেবের বাংলোতে পৌঁছে দেবার নির্দেশ দিলেন। তারপর যোগ করলেন, দোকানদারকে এই টাকাটা দিয়ে, বাকী টাকার বিলটা ঐ সঙ্গে দিয়ে এসো।

সিপাইটি তখনো দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললেন, কী হল?

লোকটি প্রথমটা ইতস্ততঃ করল। তার-পর দু'চাররার ঢোক গিলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যা জানাল, তার সারাংশ হল এই—হুজুর, হয়তো এখনো জানেন না, এটা এখানকার রীতি নয়। মেমসাহেব ভারী রাগী লোক। বিল-টিল দেখলে ক্ষেপে উঠবেন। এরকম ফর্দ ফি মাসেই আসে। মাল তারাই পৌঁছে দেয়। বিল নিয়ে আসে বড়বাবুর কাছে।

সিপাইটি একটু ঝুঁকে পড়ে গলা নামিয়ে বলল, আগের বড়বাবু সবাইকে ধমকে শাসিয়ে রেখেছেন, এসব কথা যেন বাইরে না বেরোয়। সাহেবের কানে গেলে কারো 'নকরি' থাকবে না।

সন্ধ্যার পর মথুরানাথ নিজেই গিয়ে উঠলেন "লক্ষ্মী ভাণ্ডারে" ওখানকার যেটা সবচেয়ে বড় মুদী দোকান। জিনিসগুলো তাদেরই লোক দিয়ে যথাস্থানে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করলেন, এবং বিল নিজের কাছে রেখে দিলেন। কর্মসূত্রে এস পি-র সঙ্গে প্রায়শই সাক্ষাতের প্রয়োজন থাকে। পরে যেদিন গেলেন, (অফিসে সাহেব একাই ছিলেন) কাজ সেরে বেরিয়ে আসবার সময় বিলটা পকেট থেকে বের করে তাঁর সামনে রেখে বললেন, টাকাটা কি এখন সঙ্গে আছে, স্যার? না হলে থাক, পরে অন্য সময়ে—

—কিসের টাকা?

—সেদিন চাল কিনতে বেরিয়েছিলাম। লক্ষ্মী ভাণ্ডার' বলে যে দোকানটা আছে বাজারের মধ্যে, ওখানে বসে নমুনা দেখছি, সুজন সিং একটা ফর্দ নিয়ে এল। ওর আবার অন্য কোথায় কাজ ছিল। বললাম, তোমাকে আর আসতে হবে না। জিনিসগুলো আমিই পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। এখানকার লোকগুলো যা ধাঁড়বাজ নিজেরা দেখেশুনে না নিলে যা তা চালিয়ে দেয়, ওজনেও ঠকায়।

ব্যানার্জি সাহেব পকেট থেকে পার্সটা বের করে মাথা নাড়লেন, সবটা বোধ হয় হবে না।

মথুরবাবু বলতে যাচ্ছিলেন, থাক, অন্য এক সময়ে দিলেই হবে, তার আগেই সাহেব বলে উঠলেন, ও, আচ্ছা, দাঁড়ান।

ড্রয়ার খুলে চেক বইখানা বের করে টাকাটার একটা চেক কেটে দিলেন।

নেপথ্যে কী ঘটেছিল, কিংবা কিছুই ঘটেছিল কিনা, মথুরবাবু জানেন না। তবে ওখানে থাকাকালে ঐ জাতীয় আর কোনো ফর্দ তিনি পান নি, থানায় অন্য কারো কাছেও আসে নি। আসল ব্যাপারটা শুনবার পর, যদি শুনে থাকেন, সাহেব সেটা কী ভাবে নেবেন, তাই নিয়ে প্রথম কিছুদিন খানিকটা দুর্ভাবনা যে হয় নি, তা নয়। সেটুকু মুছে যেতেও দেরি হয় নি। ব্যানার্জি সাহেবের কথায়, সুরে, আচরণে, বা ও-সির উপর তাঁর মনোভাবে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন দেখা দেয় নি।

৩

সকাল আটটা নাগাদ মথুরবাবু সি. আই, টি রোডের বাড়িতে গিয়ে যখন উঠলেন, তার আগে সমস্ত পথটা সেই দীর্ঘদিন পিছনে-ফেলে-আসা দিনগুলোর মধ্যেই নিমিষ্ট হয়ে রইলেন। জে, কে, ব্যানার্জির সেই ঋজু, উন্নত দেহ, সেই শান্ত গম্ভীর মুখ, সেই দীর্ঘ পদক্ষেপ, সেদিনকার নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে চোখের উপর ভেসে উঠছিল।

অত্যাধুনিক ডিজাইনের বাড়ি। সুদৃশ্য গ্রীল দেওয়া ফটক। ঢুকেই বাঁদিকে এক ফালি বাগান, ডান দিকের প্রশস্ত বাঁধানো পথটা সোজা গ্যারাজে গিয়ে ঠেকেছে। সামনে বসবার ঘর। বারান্দায় উঠে বৈদ্যুতিক ঘণ্টার সুইচ টিপতেই একটি ছোকরা চাকর এসে জিজ্ঞাসা করল, কাকে চাই?

—ব্যানার্জি সাহেবের সঙ্গে দেখা করবো।

—তিনি তো এখানে নেই, দিল্লী গেছেন। আজ ফিরবার কথা আছে।

—দিল্লী গেছেন! কিন্তু—

—আপনি বুড়োবাবুর কথা বলছেন? তার তো খুব অসুখ।

—আমি তাঁকে দেখতেই এসেছি।

—আচ্ছা, দাঁড়ান।

চাকরটি ভিতরে চলে গেল। মথুর-বাবুকে বাস্-এ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। পা-দুটো টনটন করছিল। ভিতরে ঢুকে একটা সোফায় বসলেন। পাশের কামরার স্ত্রী ও পুরুষ কণ্ঠের হাসি কলরব কানে এল, তার সঙ্গে চিনামাটির বাসনের ঠং ঠং, কাঁটা চামচের আওয়াজ। ভাঙা ভাঙা কথাবার্তার সুর যেটুকু ভেসে আসছিল তার থেকে বোঝা গেল, বাক্যালাপ ও আহার একসঙ্গে চলছে। সম্ভবতঃ ওটা ডাইনিং রুম, এবং এখন ব্রেকফাস্টের সময়। হঠাৎ একটা ঝাঁঝালো তীক্ষ্ণ ভরাট গলা শুনতে

পেলেন। স্ত্রীকণ্ঠ। "কার সঙ্গে দেখা করবে?"

—"বুড়ো বাবুর সঙ্গে"—এ গলাটি ছোকরা চাকরের, এইমাত্র যার সঙ্গে কথা হয়েছে।

—অসুখ বলিস নি?

—বলেছিলাম। বললে, তাই শুনেই দেখতে এসেছি।

—মুহূর্তের বিরতি। তারপর আবার কানে গেল, "নাম কি, জিজ্ঞেস কর।"

চাকরটি ফিরে এল। মুখ দেখে মনে হল যাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে গেছে, তার এই অনধিকার প্রবেশ এবং অসঙ্কোচে আসন-গ্রহণ কার্যটি সে মোটেই প্রীতির চোখে দেখছে না। সেটা কথায় প্রকাশ না পেলেও কণ্ঠস্বরে চাপা রইল না। বেশ একটু ঝাঁজের সঙ্গে প্রশ্ন করল—আপনার নাম কী?

—"আমার নাম মথুরানাথ দত্ত। অনেক-দিন সাহেবের কাছে কাজ করেছি।" কথা-গুলো এমন সুরে বললেন, যাতে করে পাশের কামরাতেও পৌঁছায়।

চাকরটি ফিরে যাবার আগেই একটি বর্ষিয়সী মহিলা পরদা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। "মেমসাহেব।" পুলিশ ক্লাবে কোন পার্টি বা ঐ জাতীয় উপলক্ষে কয়েকবার দেখেছেন মথুরবাবু। মোটরে করে এখানে-ওখানে যেতে আসতেও কখনো কখনো চোখে পড়েছেন। অনেকটা ভারী হয়ে পড়েছেন সেদিনের তুলনায়। খুব রূপসী ছিলেন। আজ সে রূপ নেই, থাকবার কথাও নয়, কিন্তু সাজ-গোজ এবং প্রসাধনের বাহুল্য দিয়ে তাকে ধরে রাখবার প্রয়াস অতিশয় স্পষ্ট। বৃদ্ধ মথুরবাবুর ক্ষীণ দৃষ্টিতেও সেটা ধরা পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললেন, আমি মথুর দত্ত, একদিন সাহেবের অধীনে চাকরি করতাম। ওঁর অসুখ শুনে—

—হ্যাঁ, উনি কবছর থেকেই খুব ভুগছেন। নিচে নামতে পারবেন না।

—যদি অনুমতি করেন, আমি ওঁর ঘরে গিয়েই দেখা করতে পারি। একটা চিঠিও লিখেছেন আমাকে।

—চিঠি লিখেছেন! কই, দেখি।

চিঠিখানা সঙ্গে ছিল। মথুরবাবু মেম-সাহেবের হাতে দিলেন। একটি বাইশ, তেইশ বছরের ছেলেও এসে দাঁড়িয়েছিল। ব্যানার্জি সাহেবের মেজো ছেলে। মায়ের পিছনে দাঁড়িয়ে সেও পড়ল চিঠিখানা। তার-পর মা ও ছেলের দৃষ্টি-বিনিময় হল। দুজনের চোখেই বিস্ময় ও বিরক্তির ভ্রূকুটি।

চিঠিটা ফিরিয়ে দিয়ে মিসেস্ ব্যানার্জি বললেন, আচ্ছা, আপনি একটু বসুন।

মিনিট দশেক অপেক্ষা করবার পর, সেই চাকরটি এসে বলল, আসুন আপনি।

আগাগোড়া মোজেইক। বারান্দা সিঁড়ি ঝকঝক করছে। দোতলায় উঠে প্রশস্ত করি-ডোর দিয়ে খানিকটা এগিয়ে একখানা ঘরের সামনে গিয়ে পর্দাটা তুলে ধরল। ঢুকতে গিয়েই কেমন একটা চামসে গন্ধ নাকে এল। মথুরবাবু অজ্ঞাতসারে রুমালটা বের করলেন কিন্তু পাছে রুগীর চোখে পড়ে তাই নাকে চেপে ধরলেন না। ঘরটা বেশ অন্ধকার। ওদিকের জানালাগুলো সব বন্ধ। তারই মধ্যে যতটা ভাঁহর হল, দেখলেন, একজনের মত একটা খাট, তার উপর একটি দীর্ঘ শীর্ণ দেহ শুয়ে আছে। একটা ভাঙা ভাঙা ক্ষীণ কণ্ঠ শুনে এল—কে?

—আমি, স্যার। মথুর দত্ত।

—ও আপনি এসেছেন?"...(ওরই মধ্যে একটু যেন আনন্দের সুর) বসুন। জানালা-গুলো খুলে দেয়নি বুঝি? কখন যে আসবে ছোঁড়াটা!

—আচ্ছা, আমি খুলে দিচ্ছি, স্যার।

জানালা ক'টা খুলে দেবার পর মনিবের দিকে যখন তাকালেন, মথুরবাবুর মনে হল, ওগুলো না খুললেই ভালো ছিল। সেই জে, কে, বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই রূপ নিজের চোখে এমন স্পষ্ট করে দেখতে হত না। আবছায়া একটা আভাস নিয়েই ফিরে যেতে পারতেন।

পাশে একখানা চেয়ার ছিল। তারই উপর স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। এতদিন পরে দেখা; কোনো কথা খুঁজে পেলেন না। সমস্ত বুকখানা যেন এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত বারবার মুচড়ে উঠতে লাগল।

ব্যানার্জি সাহেবই আবার কথা পাড়লেন —আমার চিঠিটা পেয়েছিলেন তাহলে?

—হ্যাঁ, চিঠি পেয়েই আসছি। আপনার কী অসুখ, স্যার?

হার্টের ট্রাবল। তার সঙ্গে ইনসমনিয়া।

—হজম হয়?

—তা হয়। হজমে বিশেষ গোলমাল নেই।

—সকালে কী খেয়েছেন?

—এখনো খাইনি। এবার খাবো।

শিয়রের ধার ঘেঁষে একটা টিপয় বসানো। ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকালেন। সেই দৃষ্টি অনুসরণ করে মথুরবাবুরও নজর পড়ল তার উপর। দেখলেন, একটা ছোট্ট ডিসের উপর দু-টুকরো টোস্ট, তার পাশে একটা পেয়ালা প্লেট দিয়ে ঢাকা। কি মনে করে পেয়ালাটার গায়ে হাত দিলেন মথুরবাবু। বললেন, এতে বুঝি দুধ?

—হ্যাঁ;

—কিন্তু এ তো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

—তা হোক, সামান্য গরম থাকলেই চলবে। শীর্ণ শিথিল হাত-পাগুলোকে অনেকক্ষণ যেন টেনে গুটিয়ে বিছানার উপর উঠে বসলেন এবং একখানা টোস্ট তুলে নিয়ে চিবোতে শুরু করলেন। চিবোবার ধরণ দেখেই বোঝা গেল, রুটির টুকরোটা শুকিয়ে চিমড়ে হয়ে গেছে। মথুরবাবু আর থাকতে পারলেন না, বলে ফেললেন, আমি বরং চাকরটিকে ডাকি, খাবারটা বদলে দিয়ে যাক।

—না, থাক। ও হয়তো বাজারে-টাজারে গেছে।

মথুরবাবু কয়েক মিনিট মালিকের সেই দুঃসহ ভোজন-দৃশ্য বসে বসে দেখলেন। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে বললেন, ওষুধ-টষুধ কিছু খাচ্ছেন না, স্যার?

—মাঝে মাঝে খাই, ডাক্তার যখন বলে। আজই তার আসবার কথা। এখনি আসবে।

—তাহলে একটু বসি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসবেন বৈ কি। যে জন্যে আপনাকে আসতে লিখেছি, তাই তো বলা হয় নি।

মথুরবাবু অপেক্ষা করে রইলেন। ব্যানার্জি সাহেব এক চুমুকে চা-টা শেষ করে বললেন, আপনাদের ওদিকটা বেশ ফাঁকা শুনেছি, গাড়ি-ঘোড়ার হিড়িক নেই, একটা লেকও রয়েছে কাছাকাছি।

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। সেই লেকের ধারেই আমার বাড়ি।

—আপনার ধারেকাছে আমার জন্যে একটা ছোট বাসা দেখে দিতে পারেন?

কয়েক সেকেন্ড থামলেন। মথুরবাবুও নীরব। তারপর আবার ব্যানার্জি সাহেবের কথা শোনা গেল—আমি একাই থাকবো। সামান্য রান্না আর দেখাশুনো করবার জন্যে একটা লোকও আপনাকে ঠিক করে দিতে হবে।

অনুকূল উত্তর প্রত্যাশায় সাগ্রহ দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন তাঁর ভূতপূর্ব বিশ্বস্ত, কর্মঠ এবং কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারীর দিকে।

মথুর দত্তও বোধ হয় সেই পুরানো দিনের মধ্যে চলে গিয়েছিলেন। ক্ষণকাল ভেবে নিয়ে হাত দুটো জোড় করে স্নিগ্ধ বিনীত কণ্ঠে বললেন, যদি অনুমতি করেন, আমার একটা কথা বলবার আছে, স্যার।

—বলুন না?

—অন্য বাসা দেখতে হবে না। আপনি আমার কাছে চলুন।

ব্যানার্জি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। মথুরবাবু বলে চললেন, একতলা বাড়ি, সামনেই লেক, থাকবার মধ্যে আমি, আমার স্ত্রী আর একটি মেয়ে। দুটো ছেলে, দুটোই বাইরে থাকে—একজন পুণা, আরেকজন আমেদাবাদ। যথেষ্ট জায়গা আছে। আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। আমরা সবাই মিলে আপনার সেবা করবো।

—আপনার ঘাড়ে গিয়ে চাপবো?..., চিন্তান্বিত ভাবে ধীরে ধীরে বললেন ব্যানার্জি সাহেব।

মথুরবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন বাইরে জুতোর শব্দ পেয়ে থেমে গেলেন। ঘরে ঢুকলেন ডাক্তার। প্রথমেই তাকালেন ওঁর মুখের দিকে। কপাল কুঞ্চিত করে বললেন, চেনা চেনা মনে হচ্ছে যেন?

"ও, তাই তো। আমারই খেয়াল হওয়া উচিত ছিল," খুশির সুরে বললেন ব্যানার্জি সাহেব, "আপনি থাকতে থাকতেই তো উনি সার্কেল ইন্সপেক্টর হয়ে এলেন।"

—"অনেকবার গিয়েছি আপনার কাছে"—যোগ করলেন মথুরানাথ।

—গিয়েছেন, মানে যেতে হয়েছে। ডাক্তার

বিশেষ করে সদর হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন ছাড়া পুলিশের কোন্ কাজটি চলে? বলে, হো হো করে হেসে উঠলেন ডাক্তার দাশ। হঠাৎ হাসি থামিয়ে রুগীর দিকে ফিরে বললেন, তারপর, কেমন আছেন, স্যার? শুয়ে পড়ুন।

মিনিট দশেক ধরে নানাভাবে রোগী পরীক্ষা চলল। তার মধ্যে দু-চারটি প্রশ্ন। উত্তরে ব্যানার্জী সাহেব জানালেন, ঘুমটা ভালো হচ্ছে না আর খাওয়াতেও তেমনি রুচি নেই। ডাক্তার বললেন, ঘুমের জন্যে একটু হাঁটা চলা দরকার। দিনরাত শুয়ে বসে থাকলে একটা পঁচিশ বছরের ছোকরারও ঘুম চলে যায়।

—আপনি বলবার পর থেকে রোজ বিকেলের দিকে ঐ বারান্দায় গিয়ে মিনিট কয়েক পায়চারি করছি। বেশীক্ষণ চলতে পারি না। বড্ড উইক মনে হয়। —তার মানে, যা খাওয়া দরকার, খাচ্ছেন না। কী খেতে ইচ্ছে করে বলুন।

—সে-সব উদ্ভট জিনিস। শুনলে আপনি হাসবেন। —বলুন না?

—একটু শুক্‌তো, ওলের ডগার ডালনা, পোস্তচচ্চড়ি, মোচার ঘণ্ট—ছেলেবেলায় মা করে দিতেন।

উদ্ভট কে বললে? সবটাই উপাদেয়, লোভনীয়ও বটে। তবে, এখানে—

বলে, হঠাৎ থেমে গেলেন ডাক্তার। তার পর বললেন, এবার উঠি। অনেক জায়গায় যেতে হবে। আপনি বসুন, মিস্টার দত্ত। পুরনো বস; অনেকদিন পরে দেখা।

ডাক্তার দাশ উঠে দাঁড়াতেই মথুরবাবুও উঠলেন। মনিবের দিকে চেয়ে বললেন, আমি এখনি আসছি, স্যার।

করিডোরে চলতে চলতে কথা হল, ডাক্তার বললেন, অসুখ বিশেষ কিছু নয়, ওষুধ-টষুধেরও আজকাল তেমন দরকার নেই। দরকার একটু যত্ন, আত্তি, যেটা এখানে—থাক, সেসব আমার না বলাই ভালো।

—বলতে হবে না, ডাক্তারবাবু, আমি এই-টুকু সময়ের মধ্যেই অনেকটা বুঝে নিয়েছি। আমার একান্ত ইচ্ছা, ওঁকে আমি আমার বাড়িতে নিয়ে যাই। একটা চেঞ্জও হবে। তা ছাড়া, আপনার ডিরেকশন মত দেখাশুনোও আমরা করতে পারবো। খাবার-দাবারও উনি যা চান কিংবা আপনি যা বলবেন—

—কোথায় থাকেন আপনি?

—সন্তোষপুর, লেকের একেবারে ধারে।

—খুব ভালো। তাতে আমারও সুবিধে। আমি থাকি যাদবপুরে। যখন-তখন গিয়ে দেখতে পারি। উনি রাজী হয়েছেন তো?

—আপনি যদি একটু বলেন—

—এখ্‌খনি বলছি।

দ্রুতগতিতে ফিরে এসে ঘরে ঢুকেই বললেন, মথুরবাবু যে প্রস্তাব করেছেন, সব দিক দিয়ে চমৎকার। আপনি আর দোমনা করবেন না, স্যার। সম্ভব হলে আজই চলে যান।

—আমি ভাবছিলাম—

মথুরবাবুর প্রস্তাবে উনি মনে মনে খুশী হয়েছেন, এটা দুজনেই বুঝতে পেরেছিলেন। তবু যে দ্বিধা করছেন, তার কারণটাও অনুমান করে নিলেন। ডাক্তার দাশ বললেন, ভয় নেই; ওঁর ওপরে আপনাকে আর্থিক বা কোনো ব্যাপারে কিছুমাত্র নির্ভর করতে হবে না। সেটা উনি নিশ্চয়ই চাইছেন না। কি বলেন মথুরবাবু?

মথুরবাবু দাঁত জিভ কেটে বললেন, সর্বনাশ, আমি কি ওঁকে চিনি না? শুধু সেবা করবার অধিকারটুকু চাইছি।

ব্যানার্জি সাহেবের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ডাক্তারের দিকে ফিরে বললেন, আপনি বরং নিচে একবার—

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমি এখনি বলছি গিয়ে।

ড্রইং রুমে গোটা পরিবারটিকেই এক-সঙ্গে পাওয়া গেল। বড় ছেলে দীপক কিছুক্ষণ আগেই দিল্লী থেকে ফিরেছেন। সওদাগরী অফিসের বড় চাকরে। তাঁদের সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে মন্ত্রিমহলে কদিন ঘোরাঘুরি করে এলেন। সেই প্রসঙ্গে নানা-রকম মজাদার কাহিনী শোনাচ্ছিলেন। শ্রোতারা বিপুল কলরোলে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। ডাক্তার ঢুকতেই বাধা পড়ল। প্রস্তাব শুনে সব চোখগুলো কপালে উঠল। মিসেস ব্যানার্জি কিছুক্ষণ থ হয়ে বসে থেকে বললেন, এসব আপনি কী বলছেন, ডাক্তারবাবু? চেঞ্জে যেতে হয় পুরী, ওয়ালটেয়ার আছে, দার্জিলিঙ নৈনিতাল আছে। সে সব ফেলে কিনা সন্তোষপুর, সে তো একটা অজ পাড়াগাঁ শুনেছি।

ডাক্তার দাশ বললেন, জায়গাটাই এখানে বড় কথা নয়। দেখতে হবে পেশেন্টের মন কী চায়, কোথায় তিনি ভালো থাকবেন।

"I take serious exception to your remark Doctor' বেশ খানিকটা উত্তেজনার সুরে বললেন দীপক, "নিজের বাড়িঘর, পরিবার পরিজন সব ছেড়ে পরের বাড়িতে গিয়ে তিনি ভালো থাকবেন, এটা আপনার কেমন ধারা কথা হল? তা ছাড়া, আমরাই বা যেতে দেবো কেন?"

মিসেস ব্যানার্জি বললেন, ওঁর না হয় ভীমরতি ধরেছে, যা খুশি বলতে পারেন, আমরা তো আর সেই তালে তাল দিতে পারি না।

—এখানকার হালচাল দেখেশুনে আমার যা ভালো মনে হয়েছিল তাই বললাম। গেলে ওঁর সব দিক দিয়েই উপকার হত, কটা দিন বেঁচে যেতেন।

বলে, আর কোনো বাদ-প্রতিবাদের অপেক্ষা না করে উঠে দাশ উঠে পড়লেন এবং জোরে জোরে পা ফেলে গাড়িতে ঢুকেই স্টার্ট দিলেন।

এঞ্জিনের সেই গর্জনটা যেন প্রবল বেগে ছুটে এসে কিছুক্ষণের জন্যে এদের মুখ বন্ধ করে দিল। তারপর দীপক হঠাৎ বলে উঠলেন, সে লোকটা কোথায়?

—"কার কথা বলছিস?" জানতে চাইলেন মা।

—সেই দারোগাটা।

—আহা, তার কী দোষ? উনি যদি চিঠি দিয়ে ডেকে আনিয়ে কাঁদতে বসেন, আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করুন, সে কি 'না' করবে? বড় ঘরের কেলেঙ্কারির গন্ধ পেয়ে আরো বরং মুখিয়ে আসবে।

বিবাহিতা বড় মেয়েও দাদার ফেরার খবর পেয়ে দেখা করতে এসেছিল। গম্ভীরভাবে বলল, সত্যি, বাবাকে বেশ স্পষ্ট করে বলা দরকার, যার তার কাছে এমনি করে কাঁদুনি গাওয়া চলে না। সমাজে আমাদের একটা পজিশন আছে, মান মর্যাদা আছে।

দীপক লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন, আমি এখনি যাচ্ছি।

ছোট ছেলে কলেজে পড়ে। এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। এবার বলল, ছেড়ে দাও না, এ নিয়ে একটা হুজ্জত্ করে কী লাভ?

—তুই থাম।' বলে দীপক ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেলেন। সকন্যা মিসেস্ ব্যানার্জিও তার অনুসরণ করলেন।

অতঃপর একদা-প্রবল-প্রতাপ বলিষ্ঠচেতা পুলিশ-প্রধান এবং বর্তমানে রুগ্ন, দুর্বল, অসহায় ও বৃদ্ধ জে, কে, ব্যানার্জির রোগশয্যার পাশে যে পারিবারিক দৃশ্যের অবতারণা হল, মথুর দত্ত একতলায় বসেই তার তাপ ও ঝাপটা সুস্পষ্ট অনুভব করলেন। তাঁকে নীচে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল। মিনিট পনের পরে সেই চাকরটি এসে আবার উপরে ডেকে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখলেন, ঘরে আর কেউ নেই। তাঁর ভূতপূর্ব মনিব এক চোখ বুজে পড়ে আছেন, বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে গলায় একটু শব্দ করতে ওঁর দিকে তাকালেন। আগের চেয়েও আরো ক্ষীণ, নির্জীব কণ্ঠে বললেন, আপনাকে মিছেমিছি কষ্ট দিলাম মথুরবাবু। ভেবে দেখলাম, এ অবস্থায় আপনার ওখানে গিয়ে থাকাটা ঠিক হবে না। আচ্ছা, আপনি এবার আসুন। ঘাড়টা একধারে একটু নুইয়ে মথুর দত্ত ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন।

Contact **RANKI SHAHOO**

Over Phone 67-2861 & 4986 for your

***Labour & Transport* problems**

কলমটা নেই। সোনালি দামি কলম—এ জিনিষ বড়-দুর্লভ এখনকার দিনে। সকলেরই বড় কথা, কলমটা বড্ড মেনে দিয়েছিল, অভ্যাসের গুণেই হয়তো—এ কলম হাতে নিয়ে বসলে খরখর করে লেখা বেরিয়ে আসে। ভাবতে হয় না মোটে, কলমই যেন বানিয়ে বানিয়ে লিখে যায়।

এ হেন কলমটা গেল। সারা বাড়ি তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছি লেখা-টেখা মাথায় উঠে গেছে। হাত মুচড়ে নুলো করে দিল, লিখব আর কেমন করে?

শান্তা আর আমি—দুজনের সংসার। আর ছোকরা চাকর একটা—রঞ্জিত। হেন অবস্থায় স্ত্রীর কাছে লোকে সহানুভূতির প্রত্যাশা করে। ঠিক উল্টো। রণং দেহি ভাব শান্তার ঃ কে তোমায় নুলো করল শুনি? মানুষটা কে?

চোর—

ঠারে ঠোরে বললে হবে না। কাকে সন্দেহ করছ, শুনতে চাই—

মোটমাট তিনজন তো আমরা। আমার জিনিষটা নিজে আমি চুরি করতে যাই নি। আর টাকা কড়ির ব্যাপার হলে না হয়—

ঢোক গিলে বলি, মানে নিজের জন্য নয়—ভাবতে পারতাম, সংসার খরচের দায়ে নিয়ে নিয়েছ তুমি। কিন্তু কলম কেন নিতে যাবে?

শান্তা এগিয়ে দিল ঃ তিন জনের ভিতর দুজন তবে বাদ হয়ে গেল। রইল গিয়ে—

বলতে বলতে আপনি হয়ে উঠল ঃ সে জানি। রঞ্জিত দু-চোখের বিষ হয়েছে তোমার। 'মা' বলে ঐ যে আমার কাছে কেঁদে এসে পড়েছিল, আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছি। অনাথ গরীব মানুষ—সে চোর না হয়ে অন্য কে হতে যাবে?

তা বলে কলম টেবিল থেকে পাখনা মেলে উড়ে পালাতে পারে না।

গর্জে উঠল শান্তা ঃ তুমি সরিয়েছ দোষটা রঞ্জিতের ঘাড়ে পড়বে বলে। তাড়ানোর অজুহাত।

কুরুক্ষেত্রের উদ্যোগপর্ব। এমনি সময় যাকে নিয়ে ব্যাপার—সেই রঞ্জিত কেঁদে এসে পড়ল।

সর্বনাশ হয়েছে মাগো। ঘুমিয়েছিলাম দুপুরবেলা, বালিশের তলায় চাবি—চাবি নিয়ে ট্রাঙ্ক খুলে দশটাকার নোটখানা নিয়ে নিয়েছে আর বাবু যে সেই রুমাল দিয়েছিলেন—

অন্যও জিনিষ নিয়েছে হয়তো। কিন্তু রুমালের কথায় স্ববশ হয়ে রঞ্জিত আর বলতে পারে না। বম্বে থেকে আমার এক বন্ধু ডজনখানেক ছাপা রুমাল পাঠিয়েছিল, একটা তার মধ্যে বখশিস করেছিলাম রঞ্জিতকে। মানে শান্তাই দিয়েছিল তাকে। সামনের ফাল্গুনে রঞ্জিতের বিয়ে—বিয়ে করতে যাবার সময় বুকপকেট থেকে সৌখীন রুমালের একটা কোণ বের করে দেবে, বরের বাহার খুলবে তাতে। রুমাল পরম যত্নে সে বাক্সে রেখে দিয়েছিল।

শান্তা চোখ পাকাল আমার দিকে। অর্থাৎ রঞ্জিতকে বড় যে সন্দেহ করছিলে—এবার? নেহাৎ রঞ্জিত সামনের উপর বলে কথাগুলো বলল না। তোলা রইল জানি, নিরিবিলিতে সুদে-আসলে শোধ নেবে।

আমি সান্ত্বনা দিই ঃ ভাবছ কেন রঞ্জিত? রুমাল আরও আছে, আর একটা দেবো। টাকা দশটাও দিয়ে দেবো। বিলের সাতটা মাস মাত্র বাকি—টাকা এখন তোমার কাছে দশ মোহরের সমান। তোমার টাকা-রুমাল যে নিয়েছে-সেই লোকই আমার লেখার ঘরে ঢুকে কলম চুরি করেছে। দিনদুপুরে ঘরে ঢুকে চুরি। ছাড়ব না আমি, ডিটেকটিভ লাগিয়ে চুরির আস্কারা করব।

ধাপ্পা নয়। একেবারে হাতের কাছেই ডিটেকটিভ— দুর্গাদাস। আমায় খুব খাতির করে। রঙ্গক্ষেত্রে যতক্ষণ রঞ্জিত মাত্র ছিল, ডিটেক্‌টিভের নামোচ্চারণের উপায় ছিল না, শান্তা আস্ত রাখত না তা হলে আমায়। তৃতীয় লোক এসে পড়ার এখন আর বাধা নেই।

কলমটা চাই দুর্গাদাস, তবে বুঝব তোমার ক্ষমতা।

দুর্গাদাস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আদ্যোপান্ত শুনল। বলে তদন্ত আমরা বাড়ি থেকে শুরু করি। আগে চাকরবাকর—

শিউরে উঠে বারণ করি ঃ দাদা বলে মান্য করো, আমায় কেন বিপদে ফেলবে। চাকর নামে যিনি এ বাড়িতে বিচরণ করেন, আসলে তিনি গুরুঠাকুর—

খাতির দুর্গাদাস পদ্ধতি বদলায়। বলে, ড্রয়ার খুলে কলম নিয়ে গেছে। বাকি ড্রয়ারগুলোও হাতড়েছে নিশ্চয়? যেমন আছে ঠিক তেমনি থাকবে, আপনার কি বউদির কারো হাতের ছাপ না পড়ে।

রঞ্জিতকে ডেকেও সেই কথা ঃ তোমার খোলা ট্রাঙ্ক যেমনটি আছে তেমনি রেখে দাও। রাতটা থাকুক এমনি, সকালবেলা আমাদের লোক আসবে।

পরের দিন ফিঙ্গারপ্রিণ্ট-বিশেষজ্ঞেরা এসে গেল। ম্যাগ্নিফাইন গ্লাস ঘুরিয়ে এখানে-ওখানে বিস্তরক্ষণ প্রণিধান করে দেখে। টেবিলের উপর আর রঞ্জিতের বাক্সে শাদা মতন গুঁড়া ছড়িয়ে সন্তর্পণে মুছে দেয়। ক্যামেরা নিয়ে এসেছে—টুক টুক করে ফোটো তুলল বিস্তর। দলবল নিয়ে বিদায় হয়ে গেল।

ক'দিন পরে দুর্গাদাসের আবির্ভাব।

হদিস পেলে কিছু?

তাচ্ছিল্যের সুরে দুর্গাদাস বলে, পাঁব না মানে? এই বিজ্ঞানের যুগে চোর ধরা তো ডাল-ভাতের সামিল। চুরি করতে এসে চোর নাম-ধাম লিখে রেখে যায়। লেখা সব নিয়ে এসেছি, শুধু পড়ে নেবার অপেক্ষা।

আঙুলের ছাপের একগাদা ফোটোগ্রাফ ব্যাগ থেকে বের করল। দু'খানা বাছাই করে নিয়ে মেলে ধরল সামনে ঃ দেখুন—

আমি কি বুঝব। তুমি পড়তে জানো—পড়ে দেখে যা বলবার বলো।

কিছু বিরক্ত হয়ে দুর্গাদাস বলে, কেন বুঝবেন না? কাণা মানুষেও বুঝতে পারবে—

ফোটো হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, মিলিয়ে দেখুন। এই ছাপ আপনার টেবিলের উপরের, আর এটা রঞ্জিতের বাক্সের। কি দেখছেন বলুন এবারে?

দেখছি তো অন্ধকারই শুধু। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করে বলা যায় না। দুর্গাদাসই সদয় হয়ে বুঝিয়ে দিল ঃ কার্ড মিলিয়ে দেখুন, হুবহু এক। একই হাতের আঙুলের ছাপ। দুটো মানুষের মুখের আদল কিম্বা হাতের লেখা যেমন এক হয় না, আঙুলের ছাপও তেমনি একরকম হবার জো নেই। চক্ষুর প্রমাণ দেখে দিই, আসুন।

ব্যাগের মধ্যে দেখছি কালির প্যাডও রয়েছে। সম্মতির অপেক্ষা মাত্র না করে প্যাডের কালি আমার বুড়ো আঙুলে মাখিয়ে দুর্গাদাস ছাপ তুলে নিল। রঞ্জিতকে ডাকেঃ তুমি এসো এবার। তারও আঙুলের ছাপ নিল।

দুটো ছাপ চোখের সামনে নিয়ে ভাল করে দেখে আমার হাতে দিল ঃ একেবারে আলাদা, দেখছেন? হতেই হবে। সিদ্ধান্ত তা হলে কি দাঁড়াচ্ছে?

আন্দাড়ির মতো বলে ফেলি, আমার কলম আর রঞ্জিতের রুমাল একই লোকে নিয়েছে।

সায় দিয়ে দুর্গাদাস আরও জুড়ে দেয় ঃ সেই লোক আপনি নন, রঞ্জিতও নয়। যেহেতু ছাপ আলাদা। চোর হল বাইরের, দিনদুপুরে বাইরে থেকে এসে ঢোকে—পয়লা নম্বরের ঘুঘুচোর সে মানুষ—

কিন্তু মানুষটা কে, ধরো।

দুর্গাদাস তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, তদন্তের পনের আনা সেরেছি তো ঐ এক আনাও বাকি থাকবে না দাদা। মানুষ ধরব, দেখিয়ে নিয়ে যাবো।

অবাক হয়ে বলি, একআনা কি বলছ দুর্গাদাস। আরও তো বেশি গোলমাল—ঘর নাকচ করে অজানা সমুদ্রে দাপাদাপি—

দুর্গাদাস বলে, অজানা নয়, সমুদ্রও নেই আর। ঘুঘুচোর বলেই সুবিধা—পুকুরের মাছের মতন তারা সব আমাদের কাছে জিয়ানো থাকে। রেজেস্ট্রি-খাতায় নামধাম কাজ-কর্মের ফিরিস্তি, লাইব্রেরিতে ফিঙ্গারপ্রিণ্টের বিপুল সংগ্রহ। ফোটোর সঙ্গে মিলিয়ে হাতকড়া পরানোর কাজটুকু মাত্র বাকি এখন। মানুষ আমি আন্দাজে ধরছি একজন দু-জন নয়—ভারী-সাবি দিব্যি একটি দল। একলা তোমার বাড়ি নয় দাদা পাড়ায় পাড়ায় এমনি রহস্যময় চুরি হচ্ছে।

করিৎকর্মা বটে দুর্গাদাস। পরের দিনই হাতকড়া-পরানো একটি লোক নিয়ে আমার বাড়ি হাজির। চোর দেখতে সকলে বারান্ডায় এসে জুটেছি। কঙ্কালসার চোর—সামনে থেকে টানছে এক কনস্টেবল, পিছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছে আর একজন। দুই ইঞ্জিনে চালিয়ে নিয়ে এসেছে; নইলে মুখ থুবড়ে পড়ে যেত নির্ঘাৎ।

দুর্গাদাস রঞ্জিতকে বলে, চিনতে পারো কিনা দেখ। এবাড়ির আশেপাশে কিম্বা পাড়ার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখেছ কি না।

রঞ্জিত এক নজরে আবিষ্ট হয়ে দেখছিল। থতমত খেয়ে বলে উঠল, কই, না—

দুর্গাদাস হুঙ্কার দিয়ে ওঠেঃ ঠাহর করে দেখে বলো। চোর হুট করে ঘরে ঢোকে না। আগে থেকে ঘোরাঘুরি করে সুলুক-সন্ধান নেয়।

তখন বুঝি দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়ঃ হুঁ, দেখেছি বটে—

চোর লোকটা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, দেখেছ আমায়, কোথায় দেখেছ? ধর্মকথা বলো—

সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে দুর্গাদাস তার চুলের মুঠি ধরলঃ আবার চালাকি খেলছিস? খেলা করে পার পাবি নে, সত্যি জিনিস সরলভাবে স্বীকার কর—

লোকটা তটস্থ হয়ে বলে, যে আজ্ঞে। এই রাস্তায় এই বাড়ি থেকেই নিয়েছি আমি। টিনের বক্স থেকে টাকা নিয়েছি, টেবিলের খোপ থেকে কলম।

প্রশ্ন করি ঃ কি রকম টেবিল আমার—বড় না ছোট? কি রঙের? টেবিল আছে কোন্ ঘরে?

দুর্গাদাস আহত কণ্ঠে বলে, এটা কিন্তু জুলুম আপনার দাদা। অত্যাচারই বলব। টুক করে এসে কাজ সেরে চলে গেছে—তার মধ্যে ফিতে মেপে টেবিলের মাপ জোখ করবে? ঘর নিরিখ করে রাখবে? এত সময় ছিল কোথা? জেরা করবেন না, জেরায় হেরে যাবে।

লোকটাও কবুল জবাব দিলঃ আজ্ঞে না, জেরায় পেরে উঠব না।

বেশ, জেরা বন্ধ। পায়ের উপর ছড়া-ছড়া দাগ কিসের বাপু? এটা কিছু মাপ-জোখের ব্যাপার নয়, এটা বলো।

দুর্গাদাস হেসে বলে, জবাব দে বে। সত্যি কথাই বলবি। দাদা কত কি সন্দেহ করছেন হয় তো। এত খেটে মরি, বদনামের তবু অন্ত নেই কি হয়েছিল, পায়ের উপর কিসের দাগ ওগুলো?

একবার দুর্গাদাসের দিকে তাকিয়ে লোকটা বলে, মশা বড্ড লক আপে—

দুর্গাদাস বলে, এতদূর বুঝতে পারিনি। আজকে মশারির বন্দোবস্ত হবে, মশা আর কামড়াতে পারবে না।

আমি বললাম, তা-ই তো উচিত। গড়গড় করে সবই তো স্বীকার করে গেল, এর উপরে আর মশা দিয়ে কামড়ানো উচিত হবে না। কিন্তু আসলের কিছু হয়নি দুর্গাদাস। চোরের গরজ নেই, আমি চাই কলম। অমন কলম একটা বই দুটো হয় না।

দুর্গাদাস মাথা চুলকে বলে, সেই তো মুশকিল দাদা। কমাল চোরে সঙ্গে সঙ্গে পাচার করে দেয়। খুন করে ফেললেও তারপরে আর খোঁজ দিতে পারে না। চোর ধরে এনে দেখিয়ে গেলাম, কলম আনতে পারব কিনা কথা দিতে পারি নে।

সরেজমিন তদন্ত সেরে চোর নিয়ে দুর্গাদাসের দলটা চলে গেল। এতক্ষণের নির্বাক দর্শক শান্তা এইবারে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেঃ তুমি যেন খুশি নও, মনে হচ্ছে। রঞ্জিত ফসকে গেল সেই দুঃখে? সংসারের মালিক হলে তুমি। আমায় মা বলতে অজ্ঞান—সেই দোষে রাখতে না চাও, স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিলেই তো হয়। নির্দোষীকে কলঙ্ক দিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা কেন?

(শেষাংশ ১০৩ পৃষ্ঠায়)

পুরো একটি কর্মব্যস্ত সপ্তাহ কলকাতায় কাটিয়ে রাঁচি ফিরে চলেছে সমীর সোম একটা রাত্রির মামলা। ট্রেনে ঘুম হল তো ভালই, না-হলে কাল রাঁচি পৌঁছে সুদসুদ্ধ পুষিয়ে নেবে। চলন্ত ট্রেনে ঘুম তো বড় একটা হয় না কারো। সমীর সোমের বেলায়ও তাই। যদিও গত বার-চোদ্দ বছরের মধ্যে রেলে এয়ারকন্ডিশন করা সেলুন ছাড়া সাধারণ কামরায় ক্বচিৎ যাতায়াত করতে হয়েছে সমীর সোমকে, তবুও। কিন্তু পুরোপুরি বেশ কয়েক ঘণ্টার বিশ্রামও আর নইলে নয়—দেহ আর মনের এমনই অবস্থা। কলকাতায় কাজের তদারক এলে প্রতিবার যা হয় এবারও ঠিক তাই পরিচিত মুরুব্বিদের সেলাম জানানো, স্বল্পপরিচিত মুরুব্বি আর শাঁসাল ক্লায়েন্টদের সঙ্গে সম্পর্কটা পাকাপোক্ত করে নেওয়া, সঙ্গে করে আনা ফাইলে হরেক রঙের ফ্ল্যাগ আঁটা ডজন দুই অতি জরুরী অথচ অদ্যাবধি জবাব না-পাওয়া চিঠির সুব্যবস্থা করা, ইত্যাদি ব্যবসা সংক্রান্ত কর্তব্য তো আছেই। এ ছাড়া আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের আতিথ্যগ্রহণ এবং তারও ওপর স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ফরমায়েসি জিনিসপত্র সংগ্রহ, সবই ঐ কয়েকটি দিনের মধ্যে সমাধা করতে হয়। ফলে সব মিলে শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা যা দাঁড়ায় তাতে কলকাতা ছাড়বার দিনটা হয়ে পড়ে প্রাণান্তকর। সেই ছোটাছুটি আর মানসিক উৎকণ্ঠা।

রাত্তিরে ট্রেন যখন হাওড়ার প্ল্যাটফরম থেকে বেরিয়ে এল সাতদিনের একটানা পরিশ্রমের পর এই প্রথম স্বস্তির নিঃশ্বেস ফেললে সমীর সোম। ক্লান্তির ভারে দেহ ভেঙে পড়ছে। এখুনি শুয়ে পড়তে হয়। রাত্রের আহার আগেই সারা হয়েছে এখন শুয়ে

পড়লেই হয়। সেলুনে ওঠার আগেই তার খাস আরদালি পরিপাটি বিছানা বিছিয়ে রেখেছে। তাছাড়া শোবার পোষাক তোয়ালে টর্চ জলের ফ্লাস্ক সিগারেটের টিন, এমন কি ঘুম ভেংগে উঠে মুখ ধোবার আর দাড়ি কামাবার সাজ-সরঞ্জাম মায় প্রসাধন-দ্রব্য পর্যন্ত হিসেব করে সব ঠিক ঠিক জায়গায় সাজিয়ে রেখে সে নিজের কামরায় গিয়ে উঠেছে।

পোষাক বদলে নিয়ে পাশের শেলফের ওপর রাখা ছোট ব্যাগটা খুলে একবার চোখ বুলিয়ে নিল সমীর সোম। সেটা বন্ধ করে দু পা এগিয়ে এসে দরজাটা টেনে দেখল ঠিক বন্ধ করা হয়েছে কি-না। তারপর জোরাল আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলে। নিস্তব্ধ কামরায় জ্বলতে থাকল সবুজ রঙের টিমটিমে আলো। ট্রেন ততক্ষণে একটা স্থির গতি নিয়ে নিয়েছে। সংগে সংগে সেলুন মৃদু ছন্দে ডাইনে বাঁয়ে ঈষৎ দুলছে। ক্লান্ত দেহে নিদ্রার কোলে ডুবে যাবার পক্ষে অবস্থাটা অনুকূল। নিদ্রায় আচ্ছন্ন হল সমীর সোম।

কতক্ষণ কেটেছে ঠিক নেই তবে রাত তখন গাঢ় হয়েছে। কোন একটা স্টেশনে ট্রেন এসে দাঁড়াল। গাড়ী থামার ঝাঁকানিতে হোক কিম্বা নিস্তব্ধ রাত্তিরে আচমকা কোন কুলির চিৎকারেই হোক ঘুম ভেংগে গেল সমীর সোমের। নিদ্রাতুর চোখ দুটো যেন কিসের খোঁজে এদিক ওদিক ঘুরে এল কয়েক বার। যেন পাশে কাউকে দেখতে পাবে আশা করছিল সমীর সোম। হাত বাড়িয়ে তোয়ালেটা তুলে নিয়ে মুখখানা ধীরে ধীরে মুছলো। তোয়ালেটা ভিজে ভিজে ঠেকল। বাঁ-হাতখানা কপালের ওপর বুলিয়ে দেখে হাতটা কপালের ঘামে ভিজে গেছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সেলুনের মধ্যে আশ্বিনের শেষে প্রায় মাঝরাত্তিরে শরীর ঘামে ভিজে যাবার কথা নয়। সমীর সোমের চোখে মুখে এখন একটা উৎকণ্ঠা আর হতাশায় মেশান ভাব। তোয়ালেটা রেখে দিয়ে আধশোওয়া অবস্থায় ফ্লাস্কটা টেনে নিয়ে ঢক ঢক করে খানিকটা জল খেয়ে ফেললে। ফ্লাস্ক যথাস্থানে তুলে রেখে সেই আধশোওয়া অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে সিগারেটের টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে দুই ঠোঁটের মাঝখানে আলতো করে গুঁজে দিলে। লাইটারটা রয়েছে আর একটু দূরে। সমীর সোম একটু ঝুঁকে লাইটারটা ধরবার আগেই সিগারেটটা আলগা হয়ে মুখ থেকে খসে পড়ে গেল। দ্বিতীয়বার আর সিগারেট ধরাবার চেষ্টা না করে চাদরখানা গলা অবধি টেনে নিয়ে সে শুয়ে পড়ল আবার।

ট্রেন আবার কখন চলতে আরম্ভ করেছে খেয়াল হয়নি সমীর সোমের। আগের স্টেশনে ঘুমটা আচমকা ভেংগে যাবার সময় থেকেই একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়েছে সে। কার মুখের আবছা একটা ছবি থেকে থেকে তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে তন্দ্রার ফাঁকে ফাঁকে। সমীর সোম চিনেও চিনতে পারছে না সে মুখ। একবার মনে হয় এই বুঝি ধরা পড়ল পরমুহূর্তে যায় মিলিয়ে। বিরক্ত আর অসহায় বোধ করছে সমীর সোম। সমস্ত শরীর ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন, ঘুমে চোখের পাতা দুটো কেবলই বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু বন্ধ হওয়া মাত্র আবছা মুখখানা আবার উঠছে ভেসে। প্রাণপণ চেষ্টা করে সমীর সোম একটু ঘুমের জন্যে। কিন্তু নিষ্কৃতি নেই। ঘুরে ফিরে আবার সেই মুখ।

হতাশ হয়ে উঠে পড়লো সমীর সোম। কোনমতে হেলান দিয়ে বসে হাত বাড়িয়ে জোরাল বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। কড়া আলোয় আর সিগারেটের ঝাঁজে শরীরের জড়তাটা কিছু কম লাগছে। এবার খানিকটা স্থির হয়ে ভাবতে পারছে সমীর সোম। কার মুখের ছবি বার বার তার ঘুমন্ত চোখের সামনে ভেসে উঠে তাকে ঘুমোতে দিচ্ছে না। এত আবছা সে ছবি যে ধরা শক্ত। কিন্তু সমীর সোম এতক্ষণ ধরে দুর্ভোগ সহ্য করে বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছে। খুঁজে সে বার করবেই। হঠাৎ মনে আসছে একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা। আধ-পোড়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে সে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে জোরে জোরে টানতে লাগলো। কয়েক ঘণ্টা আগে হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাট-ফরমের ওপর তার সেলুনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যখন সে বাল্যবন্ধু শিবনাথের সংগে একটা অত্যন্ত জরুরী আলোচনায় ব্যস্ত সে সময়ে ঠিক তার গা ঘেঁসে একটি সুবেশা মহিলা অনুরূপ সৌখীন বেশধারী একজন পুরুষের সংগে হনহন করে ইঞ্জিনের দিকে এগিয়ে গেলেন। শিবনাথের সংগে গুরুতর আলোচনায় মেতে থাকলেও ঐ মধ্যবয়সী ফ্যাশনেবল মহিলাটি সমীর সোমের নজর এড়ায় নি। না এড়াবার একটা বিশেষ কারণ (সমীর সোম এখন সাতচল্লিশ পার হয়ে আটচল্লিশে পড়েছে। চুলে তার পাক ধরেছে কয়েক বছর আগেই, সে হিসেবে পার্শ্ববর্তিনী সব রমণী যে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই এমন নয়) পাশ থেকে দেখা মহিলার মুখের গড়ন, ছিপছিপে লম্বা চেহারা আর সোজা হয়ে হাঁটার ভংগী মুহূর্তের জন্যে সমীরের মনকে নড়া দিয়ে গিয়েছিল। কেবল এক মুহূর্তের জন্যে সে তখন বন্ধুর সংগে আলাপে এমনই ব্যস্ত যে শুধু চোখ দিয়ে মহিলাকে দেখা ছাড়া ও বিষয় ভাববার কোন অবকাশই পায় নি দেখার সুযোগও বেশীক্ষণ ছিল না ঐ ভীড়ের মধ্যে। তার দু-তিন মিনিটের মধ্যেই ট্রেন ছাড়ার সিগন্যাল পেয়ে শিবনাথ তাকে সেলুনে উঠিয়ে দিয়েছে।

সমীর সোমের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিন্তা-ধারা ধীরে ধীরে পূর্বচিহ্নিত পথে ঢুকে একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুতে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করছে। তন্দ্রার ঘোরে দেখা সেই আবছা মুখ-খানা ক্রমশঃ একটা স্পষ্ট রূপ ধরছে। ধরছে কেবল তার দুটি চোখের সামনে। মনের ভেতরকার ভাবনাগুলো এখনো তালগোল পাকিয়ে জমাট বেঁধে আছে। তবে আর বেশীক্ষণ নয়। কুহেলীমুক্ত হয়ে যে মূর্তি ধীরে ধীরে চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে আর তার সংগে সংগে সমীর সোমের স্নায়ুতে যে কম্পনের সৃষ্টি হলো তার রেশ স্মৃতির জটপড়া তারে একসময়ে গিয়ে পৌঁছবেই। একটু সময় হয়ত লাগবে। বহু বছরের অবহেলায় জড়ানো তারগুলোয় অনেক ধুলো জমেছে যে। জায়গায় জায়গায় মরচেও ধরেছে। সে আবর্জনার প্রলেপ উঠে গেলেই তার আবার ঝন্‌ঝনিয়ে উঠবে। সেইটুকুর অপেক্ষা।

বিছানার ওপর অর্ধশয়ান অবস্থা ছেড়ে সোজা হয়ে উঠে বসেছে সমীর সোম। জ্বলন্ত সিগারেটটা কোন্ সময় মুখ থেকে খসে পড়েছে মেঝের ওপর। নীল রঙের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠছে। সমীর সোমের চোখ দুটো খোলা—কিন্তু সে খোলা চোখে দৃষ্টি বোধহয় নেই।.. ...আশ্চর্য! হাওড়ায় প্ল্যাট-ফরমের ওপর ঐ অদ্ভুত ঘটনাটা এতক্ষণ সে ভুলে রইল কী করে। এ ত সেই অপরিচিতার মুখ যা তন্দ্রার মধ্যে ওর চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠেছে!

স্মৃতির শক্ত জট এবার শিথিল হয়ে

খেলা জোড়ার খেলা

টেলিনর

খুলে খুলে আসছে। কে ঐ অপরিচিতা? মাথার মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব করছে সমীর সোম। প্রথমে ক্ষীণ প্রদাহ। দেখতে দেখতে সে জ্বালা অসহ্য হয়ে ওঠে। কপালের শিরগুলো ফুলে উঠেছে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। চারদিকে সব কিছু দুলছে ঘুরপাক খাচ্ছে। কী যেন একটা ঘটতে যাচ্ছে এই মুহূর্তে। হঠাৎ তার চারদিকে যেন প্রকৃতির তাণ্ডব সুরু হয়ে গেল। স্থানকালের জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে সমীর সোম। মাথাটা এখুনি যন্ত্রণায় ফেটে চৌচির হয়ে গেল বুঝি। শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সমীর সোম। তার পা টলছে সমস্ত শরীর টলছে। কারা যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চাইছে। সামলাতে পারল না সমীর সোম, গড়িয়ে পড়ল বিছানার ওপর। তখনো চারদিকে ঝড়ের উন্মত্ততা আর অশান্ত সাগরের গর্জন।

ঝড়ের দাপাদাপি আর সমুদ্রের মাতামাতি এক সময় শান্ত হয়ে এল। বিছানার এক পাশে উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিল সমীর সোম। এখনো তার দেহ থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। অবশেষে কাঁপুনি থামল। ধীরে ধীরে আবার উঠে বসলো সে। ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক চাইল। না কোথাও কিছু লণ্ডভণ্ড হয় নি, যেখানকার যা সব ঠিকই আছে। ট্রেন ছুটে চলেছে আপন মনে। বাইরে থেকে ভারী চাকার একঘেয়ে গুম গুম আওয়াজ আর মাঝে মাঝে ইঞ্জিন থেকে হুইসলের শব্দ। আর সব নিস্তব্ধ। সমীর সোম এবার অনেকটা সুস্থ বোধ করছে। মাথাটাও অনেকখানি হালকা মনে হচ্ছে একটু ঝিমঝিমে ভাব ছাড়া। এইমাত্র যে এতবড় ঝড় বয়ে গেল এখান দিয়ে তার কোন চিহ্ন নেই এখানে। কোথাও কোন পরিবর্তন চোখে পড়ে না।

চোখে না পড়লেও পরিবর্তন একটা ঘটে গেছে। আর সে পরিবর্তন বড় সামান্য নয়। সমীর সোমের সযত্নে গড়া দম্ভের প্রাচীরে আজ ফাটল ধরেছে। যে প্রাচীরের আড়ালে দীর্ঘ পনের বছর ধরে সে নিঃশংকচিত্তে ঘুরে বেড়িয়েছে, দীর্ঘকালের অভ্যাসের ফলে যে প্রাচীরের অস্তিত্বটাই সে প্রায় ভুলতে বসেছিল আজকের এই ঝড়ের কাপটায় তার গায়ে চিড় ধরল বুঝি। পনের বছর আগেকার জীবনের একটি স্বপ্নময় পরিচ্ছেদ আর তার পরের জীবনের মাঝখানে সমীর সোম নিজের হাতে এই সীমারেখা টেনে দিয়েছিল একদিন। তার বিশ্বাস ছিল যে, অতীতের সেই অবাঞ্ছিত স্মৃতি ঐ সীমারেখা ছাড়িয়ে তার বর্তমান জীবনের ওপর ছায়াপাত করতে পারবে না। সমীর সোম স্বভাবত হিসেবী মানুষ। তার নিজের হিসেব মতে নিজের জীবনটা যেমনভাবে কাটাবে বলে সে স্থির করেছে ঠিক সেই ভাবেই সে কাটিয়ে যাবে এ সম্বন্ধে তার কোন সন্দেহ ছিল না। এ সব বিষয়ে তার মনের দৃঢ়তা অপরিসীম। আরো একটা কথা। বাস্তব জীবনে সেন্টিমেন্ট বা ঐ ধরনের কোমল প্রবৃত্তির যে কোন দাম নেই এটা সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে শিখেছে। ওখানে সে কোন সতেই দুর্বলতা রক্ষা করতে প্রস্তুত নয়। তাই কোথাও সেন্টিমেন্টের সামান্য গন্ধ পেলেই সমীর সোম সচেতন হয়ে ওঠে।

যে সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে গত পনের বছর ধরে সমীর সোমের সুশৃংখল ধরা-বাঁধা জীবন কাটছে, তার মধ্যে ব্যবসার সম্পর্ক ছাড়া নিছক সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এমন মানুষ সে আঙুলে গুনতে পারে। প্রথম বা দ্বিতীয় স্তরে না হলেও দেশের হালআমলের শিল্পপতিদের মধ্যে সমীর সোমের স্থান ঠিক তার নীচে ত বটেই। বছরে তার আয় অন্ত থেকে দশ লক্ষ টাকা। এ শিল্প প্রতিষ্ঠানের একমাত্র অধিকারী বর্তমানে সে নিজেই। এ থেকে অনুমান করা শক্ত নয় যে ব্যবসার ওপরই তার মমতা সব চেয়ে বেশী। একথা অকপটে স্বীকার করতে তার কোন সংকোচ নেই। ব্যবসার বাইরে যারা তাদের মধ্যে অবশ্যই প্রথমে এসে পড়ে রমলা। স্ত্রী বলে তো বটেই। তাছাড়া রমলা তার জীবনে না এলে আজকের এই প্রতিষ্ঠা সে পেত কোথায়? তার পরেই আসে তার চোদ্দ বছরের মেয়ে রুমা আর ন' বছরের ছেলে সঞ্জয়। এদের দুজনের সংগেই তার রক্তের টান। তবে রুমার ওপর টানটা যেন কিছু বেশী। শুধু প্রথম সন্তান বলে কি? কিন্তু সে কথা এখন থাক।

সমীর সোমের বন্ধু ইয়ার বলে যারা খ্যাত এক্জনকে বাদ দিলে তারা সকলেই হয় প্রতিষ্ঠানের অফিসার না হয় তারই মত শিল্পপতি। তাদের অনেকের সংগে সমীর সোমের বন্ধুতা বহু দিন বিস্তৃত হলেও তা কখনো গভীর হবার সুযোগ পায় নি। তাদের সংগে মেলামেশার কেন্দ্রস্থল কখনো অফিসঘর কখনো হোটেলের লাঞ্চ বা ডিনার টেবিলে, কখনো বা স্থানীয় ক্লাবের লাউঞ্জে। নিতান্ত কারো জন্মদিন বা ঐ জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠান উপস্থিত হলে কোন কোন সন্ধ্যায় সমীর সোমের বাড়ীর সংকীর্ণ প্রাঙ্গণ তাদের দেখতে পাওয়া যায়। এর চেয়ে নিকটতর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ কেউ বড় একটা পায় না। ব্যতিক্রম ঘটে কেবল একজনের বেলায়। সে হল সমীর সোমের বাল্যবন্ধু শিবনাথ। শিবনাথের বসবাস কলকাতায় সমীর সোম আজ পনের বছর ধরে রাঁচিতে। এর ফলে দুজনের সাক্ষাৎ ঘটে ন' মাসে ছ' মাসে। অভাবটা পুষিয়ে নেয় দুজনেই পরস্পরকে চিঠি লিখে। শিবনাথ চাকুরে মানুষ। সে বন্ধুর মত লক্ষ টাকার মুখ না দেখলেও মোটা মাইনের চাকরী করে। তা ছাড়া বোনাস আর এদিক ওদিক থেকে যে উপরি পায় তা দিয়ে স্বচ্ছন্দে সংসার প্রতিপালন করেও হাতে কিছু টাকা জমিয়েছে। শিবনাথ গাংগুলী দিলখোলা ফুর্তিবাজ মানুষ। বয়সে সমীরের চেয়ে দু-তিন বছরের বড়ই হবে। দু-জনের জীবনদর্শন প্রায় এক ধরণের। তাই ছেলেবেলা থেকে দু-জনের মধ্যে যে মনের মিল তা আজও প্রায় অটুট। সুযোগ পেলে সমীর সোমের মত সেও তার সদ্ব্যবহার করে শীঘ্রই শিল্পপতি হতে পারত। কিন্তু তা হতে পারেনি বলে তার বিশেষ দুঃখ নেই। সমীর সোমের সৌভাগ্যের ওপর তার কোন ঈর্ষা নেই। বরং যৌবনকালে যেমন একাধিকবার সমীর সোমের আপৎকালে বুদ্ধি যুগিয়ে কার্য উদ্ধারের নতুন নতুন পথ বাৎলে দিয়ে এসেছে, প্রয়োজন হলে আজও তেমনি পাশে এসে দাঁড়ায়। তবে বয়স হবার সংগে সংগে একটা বিষয়ে বুদ্ধিমানের মত দুজনেই পরস্পরকে একটু তফাতে থাকতে দিয়েছে। সেটা হল পারিবারিক জীবন। এখানে দুজনেই যথেষ্ট সাবধান হয়ে চলে।

ট্রেনের গতি মন্দ হয়ে আসছে। গাড়ীর তলা থেকে আওয়াজ এল ঝড় ঘড় ঘটাং ঘটাং ঘড় ঘড়। কামরাটা হঠাৎ একটু বেশী দুলে ওঠায় সমীর সোম চমকে উঠে এদিক ওদিক চাইতে লাগলো। না ভয়ের কিছু নেই। লাইন বদলাচ্ছে। কাঁচের জানলার মধ্যে দিয়ে দেখা গেল দূরের আকাশ লালে লাল হয়ে উঠেছে। তা হলে জামসেদপুর এসে গেল।

সামনের ছাইদানে একগাদা ছাই জমে উঠেছে আর তার সংগে মিশিয়ে রয়েছে কয়েকটা আধপোড়া সিগারেট। সিগারেটের ধোঁয়ার সেলুনের হাওয়া ভারী আর ঝাঁঝাল হয়ে উঠেছে। সমীর সোমের চোখে আজ বোধহয় আর ঘুম আসবে না। সে একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে চলেছে। তার মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে তার মন চলে গেছে অন্য কোনখানে।

মন থেকে যাকে মুছে ফেলেছিল সমীর সোম তার অসামান্য ইচ্ছাশক্তির জোরে, দীর্ঘ পনের বছর পরে কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে আজ সে সমীর সোমের সব চেষ্টা বিফল করে তার সামনে মূর্তিমতী হয়ে উঠলো অবাক হচ্ছে সমীর সোম দুজনের চেহারার এমন অদ্ভুত সাদৃশ্যের কথা মনে করে। শুধু মুখ আর চেহারার মিল নয় হেঁটে চলার ভংগীটুকুর মধ্যেও কি অদ্ভুত মিল। আরো অবাক লাগছে ভাবতে যে, হাওড়া স্টেশনে চোখের সামনে মহিলাটিকে দেখেও তখনি তার মনে পড়লো না। একটু চমকে উঠেছিল বটে কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এটা কি তার সেই অসাধারণ ইচ্ছাশক্তির হাতযশ—না অন্য কিছু? এমন তো হতে পারে যে, ঠিক সেই সময় শিবনাথের সংগে জরুরী আলোচনায় মন ছিল বলেই অন্য কিছু ভাববার অবকাশ সে পায় নি। কারণ যাই হোক তনিমা যে এসেছিল তাতে সন্দেহ নেই সমীর সোমের। এখন সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে কোন এক স্টেশনে ট্রেন থামতেই হঠাৎ কি কারণে তার ঘুম ভেঙে গেল আর কেনই বা সর্বাংগ তার ঘামে ভিজে গিয়েছিল।

তনিমা সান্যাল আজ বেঁচে নেই। এ পৃথিবীতে অজর অমর হয়ে কেউ আসে না। সবাইকেই এক সময় চলে যেতে হয়। কেউ যায় দুদিন আগে কেউ দুদিন পরে। আর

এও সত্যি যে, আপনজনকে চিরকালের জন্যে হারানোর যে বেদনা তা শত মর্মান্তিক হলেও মানুষ চিরজীবন তা মনে রাখে না। সে আবার হাসে, গল্প করে, খায়, গান গায়, কাজ করে মনের সহজ আনন্দে। তাকে দেখে মনেই হবে না এই একই মানুষ কিছুদিন আগে আপনজনকে হারিয়ে বুক চাপড়ে কেঁদেছে, যন্ত্রণায় আছাড় খেয়েছে, মাথা খুঁড়েছে আবার শোকে নির্বাক হয়ে গেছে। এই নিয়ম। এটাই স্বাভাবিক। আবার এও দেখা যায় মৃত্যুশোক ভুলে যে মানুষ সহজ আনন্দ কোলাহলে মেতে উঠেছিল সহসা তার দৃষ্টি উদাস, দু চোখে তার অশ্রু টলমল করছে। এও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

কিন্তু সে কথা নয়। সমীর সোমের জীবনে তনিমার মৃত্যু ঘটেছে অন্য ভাবে। তনিমা নিজেকে এমনভাবে সরিয়ে নিয়েছে কিম্বা সমীর সোম তাকে এমনভাবে সরাতে পেরেছে যে তনিমার স্মৃতি তার পরবর্তী জীবনের ওপর একটিবারের জন্যেও ছায়াপাত করতে পারে নি। এখানেই সমীর সোম অসাধারণ। এতখানি অসাধারণত্বের দাবী করতে পারে একমাত্র সেই। ধরণী সান্যাল পারে নি। ধরণী সান্যাল আজ কোথায় কী ভাবে বেঁচে আছে কে জানে। যদি বেঁচে থাকে তাহলে তার অসংখ্য বিজনেস মীটিং আর ডিনার পার্টির ফাঁকে ফাঁকে কোন নিঃসঙ্গ মুহূর্তে তনিমার মুখখানা তার মনের গেলাসের মধ্যে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠাই স্বাভাবিক। ধরণী সান্যাল যেমন মানুষই হোক তনিমা তার বিবাহিতা স্ত্রী তো।

সিনেমার পর্দার মত সমীর সোমের স্মৃতিপটে একের পর এক ভেসে উঠছে সেই দিনগুলো আর সেদিনের সঙ্গী-সাথীরা যারা সেদিন ছিল তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যাদের সাহচর্যে রাঁচি ইউনিয়ন ক্লাবের লনে তার কর্মক্লান্ত দিনের অবকাশ ভরে উঠতো হাল্কা আলাপ আলোচনায়, বেপরোয়া ঠাট্টা ইয়ার্কি আর বসালো পরচর্চায়। সুধা মিশ্র আর তার টেনিস-চ্যাম্পিয়ন-স্বামী মুকুল মিশ্র রাঁচিতে সদ্য আগত সমীর সোমকে যারা টেনে নিয়ে গিয়েছিল রাঁচির প্রোগ্রেসিভ সমাজের সবসেরা মিলনক্ষেত্র রাঁচি ইউনিয়ন ক্লাবে, এদের আজ মনে পড়ছে। এই দুজনের সহায়তা ভিন্ন অত সহজে স্বনামধন্যা সোসাইটি লেডি তনিমা সান্যাল অথবা মেয়ের পুতুল রমলা ত্রিপাঠির নাগাল পাওয়া সম্ভব হতো না। মনে পড়ছে স্নেহময়ী তপতী মুখার্জি আর তার প্রৌঢ় স্বামী সৌম্যদর্শন নিখিলেশ মুখার্জিকে যাদের আশ্রয়ে বাড়ীর ছেলের মত সমীর সোম কাটিয়েছিল রাঁচির প্রথম বছরটা। তার পরেই আসে মিলি ল্যামডেন তার লাস্যময়ী রূপ আর চটুল ভ্রূভঙ্গী নিয়ে। তনিমার অভিন্নহৃদয়া বন্ধু চিরযৌবনা মিলি —যার তিনতলার ফ্ল্যাটখানা দিনের পর দিন মাসের পর মাস ধরে সুযোগ জুটিয়েছে সমীর সোম আর তনিমার অবাধ এবং অবৈধ মেলা-মেশার। সবশেষে আসে ধনীর দুলালী রমলা ত্রিপাঠির গা ঘেঁসে আর এক ধনীর দুলাল, শুধু তাই নয়, রাঁচির তরুণ সমাজে ঈর্ষার পাত্র আর আধুনিকা কুমারীকুলের বহু অভীপ্সিত নায়ক উচ্চশিক্ষিত সুদর্শন তরুণ এঞ্জিনীয়ার প্রবীর চৌধুরী।

ট্রেন ইতিমধ্যে কখন জামসেদপুর পার হয়ে এসেছে সমীর সোম খেয়াল করে নি। রাঁচি পৌঁছতে এখনো কয়েক ঘণ্টা লাগবে। হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল এখনো দুটো বাজতে বাকী আছে। বাকী রাতটা যে ঘুমিয়ে কাটবে এমন আশা নেই। জামসেদপুর স্টেশনে গরম চা বা কফির অর্ডার দিলে হতো। রেলে এ্যালকোহল পানের অভ্যাস সমীর সোমের নেই কোনদিন। কিন্তু এই অবসাদ-গ্রস্ত শরীর আর মন নিয়ে বাকী রাতটা জেগে কাটানোর কথা ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে। দেখা যাক লাঞ্চ-বাস্কেটে আরদালিটা যদি কিছু ভরে দিয়ে থাকে। উঠে গিয়ে লাঞ্চ-বাস্কেটের ডালা খুলতে দেখা গেল তার এক কোণে থার্মসটা আর অন্য কোণে সুদৃশ্য প্যাকেটে মোড়া কিছু স্যান্ডউইচও রাখা আছে। মনে মনে আরদালিকে ধন্যবাদ জানালে সমীর সোম। থার্মসটা তুলে নিয়ে বিছানায় ফিরে এল। ফ্লাস্কে কফি ভর্তি রয়েছে। গেলাসে গরম কফি ঢেলে নিয়ে হেলান দিয়ে শুয়ে কফির গেলাসে চুমুক দিতে দিতে আবার আগের চিন্তায় ডুবে গেল। পুরনো দিনের কথা এমন কি ছেলেবেলার কত কথা আজ তার মনে পড়ে যাচ্ছে। মনে পড়ছে স্কুলের দিনগুলো আর মা বাবার কথা,—বিশেষ করে বাবাকে।

মানুষের অসাধ্য কাজ নেই,—পরিশ্রম আর অধ্যবসায় দিয়ে মানুষ তার ভবিষ্যৎ ইচ্ছামত গড়ে নিতে পারে—এই ধরণের কথা আর সেই সঙ্গে দেশ-বিদেশের নানা কর্মবীরের গল্প সে ছেলেবেলায় বাবার কাছে শুনেছে। শুনতে তার ভালো লেগেছে গল্প হিসেবে। তখন সে স্বপ্নেও ভাবেনি আঠার বছর বয়স পার হতে না হতেই তাকে কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হবে। শশাঙ্ক সোম তেজী ও ন্যায়নিষ্ঠ লোক ছিলেন। চাকুরিজীবীর জীবনে অতখানি তেজ আর ন্যায়বিচার থাকলে ফল সব সময় শুভ হয় না। শশাঙ্কর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। চাকুরিতে আশানুরূপ উন্নতি লাভ করতে পারলেন না। কিন্তু তার জন্যে তাঁকে ক্ষুব্ধ হতে দেখা যায়নি। স্বাস্থ্য ছিল তাঁর যেমন অটুট মনের তেজও ছিল তেমনি অনমনীয়। একমাত্র সন্তান সমীরকে তিনি নিজের মনের মত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারেননি। সুস্থ শরীরে আপিস গিয়ে দুঘণ্টার মধ্যেই মাথার শির ছিঁড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। সেই অবস্থায় তাঁকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনা হল। তারপর দুদিনও কাটেনি। জ্ঞানও আর ফিরে আসেনি। সমীরের বয়স তখন আঠার বছর। কলেজে পড়ছে।

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে শশাঙ্ক সোম টাকাকড়ি ঘরবাড়ী কিছু না রেখেই মারা গেলেন। সমীর তার বাবার কাছে অর্থ বা সম্পত্তি না পেলেও পেয়েছিল মজবুত লম্বা-চওড়া শরীর আর তেমনি মনের বল। পিতৃহীন হয়ে প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালে সাহায্য হয়ত কিছু পাওয়া যেত। কিন্তু সমীর সোম সে পথে না গিয়ে একা বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। বোগগ্রস্তা মায়ের কাকুতি-মিনতি পর্যন্ত তাকে টলাতে পারলো না। কলেজের পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে সে অর্থ উপার্জনে মন দিলে। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি। যুদ্ধের কল্যাণে এ দেশেও দিকে দিকে ওলট-পালট সুরু হয়ে গেছে। যুগের গতিবেগ ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্ছে। এ দেশেও সাধারণ জনসমাজের মধ্যে রীতি-নীতি, ন্যায়-অন্যায় সব কিছুরই নিত্যনতুন সংজ্ঞা আর মাপকাঠি তৈরী হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষের রুচি বদলাচ্ছে আর বদলাচ্ছে সব জিনিসের প্রতি মানুষের মূল্যবোধ। মানুষ এখন দেখছে শুনছে অনেক বেশী। অল্প সময়ের মধ্যে শিখে ফেলছেও অনেক। সমীর সোম এই গড্ডলিকা প্রবাহে নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ রেখে এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সে এগিয়ে এসেছে। যুদ্ধ শেষ হতে না-হতে এল দুর্ভিক্ষ, এল ইংরেজের সঙ্গে শেষ সংগ্রাম। তারপরেই এল দেশব্যাপী দাঙ্গা, হানাহানি লুঠতরাজ। চললো দেশময় অরাজকতা। ঘরে ঘরে উঠল কান্নার রোল। এই হানাহানি হট্টগোলের মধ্যে সমীরের চিররুগ্না মা অল্প কয়েকদিন রোগ ভোগ করে মারা গেলেন। সমীর জ্ঞান হওয়া অবধি মাকে কোন-দিন সুস্থ শরীরে দেখেনি তাই মনে মনে এ দুর্ঘটনার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ছিল। আজ বন্ধনমুক্ত হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে কর্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

রাতারাতি অবস্থা ফেরেনি সমীর সোমের। সময় লেগেছে অনেক আর পরিশ্রমও করতে হয়েছে প্রচুর। ঠেকতে হয়েছে, ঠকতে হয়েছে নানা জায়গায় নানাভাবে। রকম রকম ঘাট আর আঘাটের জল খেয়ে অবশেষে পায়ের তলায় শক্ত মাটির সন্ধান পেয়ে সমীর সোম উঠে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হয়েছে। মানুষের মনে জেগেছে নতুন প্রেরণা নতুন উৎসাহ, আশা আর উদ্দীপনা। নানারকম রঙীন কল্পনার নেশায় দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতা যখন পাড়ায় পাড়ায় আনন্দ উৎসবের আয়োজনে মত্ত সমীর সোম তখন ক্লাইভ স্ট্রীট আর বড়বাজারের গলিতে গলিতে ঘুরেছে ভাগ্যের অন্বেষণে। চাকরির উমেদারী নয়। সমীর সোমের নজর অনেক উঁচুতে। চাকরি যদি করতেই হয় এমন চাকরি সে করবে যেখানে লোকে তাকে সেধে ডেকে নেবে, সে কৃপাপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াবে না। এমনি করেই নিজেকে গড়েছে, কর্মজগতে দৈনন্দিন সংগ্রামের জন্যে তৈরি করেছে সমীর সোম বছর বছর ধরে। সলাপরামর্শের প্রয়োজন হলে কখনো প্রাজ্ঞ প্রবীণদের কাছে উপস্থিত হয় নি। সে সময় বন্ধু শিবনাথই তার একমাত্র সহায়।

অনলস পরিশ্রম আর অটুট ধৈর্যের ফল পেয়েছে সমীর সোম। লোকে ডেকেই

নিয়েছে ওকে নানা কাজের জন্যে। ক্রমে ওর ব্যবসায়ী-বুদ্ধি আর বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়ে নির্ভরে দায়িত্বের কাজও ছেড়ে দিয়েছে ওর ওপর। কাউকে ঠকাতে হয় নি বড় একটা। সমীর সোমও জানে এই কাজের মধ্যে দিয়ে কেমন করে নিজের ভবিষ্যতের কাজ গোছাতে হয়। তাই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তার এদিক ওদিক নেই। ব্যবহারিক জীবনে বিশেষ করে চাকরির ক্ষেত্রে লয়্যালটির একটা বাঁধাধরা সীমানা আছে। সেখানে আদর্শবাদের প্রশ্রয় দিলে আখেরে ঠকতে হয়—সমীর সোমের এই বিশ্বাস। ভবিষ্যতের পথ সুগম করার চেষ্টায় সে বিশ্বাস কখনো হারায় নি সে। এইভাবে পথ তৈরী করে নিতে হয়েছে সমীর সোমকে। ধাপে ধাপে সে উঠেছে সুযোগের সিঁড়ি বেয়ে। কারো উপদেশ, অনুনয় ওকে ধরে রাখতে পারে নি বেশি দিন এক জায়গাতে। এইভাবে দেখতে দেখতে বার বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল। এই বার বছরে অন্তত ছটা বড়ো বড়ো আপিসে ঘুরে এসেছে সমীর সোম একজিকিউটিভের চাকরি নিয়ে। এক থেকে তিন বছরের বেশি কোথাও তাকে ধরে রাখা যায় নি। ডানকান ডানলপ থেকে সুরু হয়ে গিলেন্ডার্স বার্ড ম্যাকিনন মেকেঞ্জি পার হয়ে অবশেষে এসে ঢুকল স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাকুয়ামে একটা বিভাগের ছোট কর্তা হয়ে। ছ'মাস না কাটতেই খবর এল কোম্পানী তাকে রাঁচি আপিসের ডেপুটি চীফ করে পাঠাতে চায়। একটু দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করেছিল সে সময় সমীর সোম। যে কলকাতায় তার জন্ম যার বুকে জীবনের বত্রিশটি বছর তার কেটেছে তাকে হঠাৎ ছেড়ে যেতে হবে ভাবতে কেমন লাগে। কিন্তু এমন অলস ভাবনাকে প্রশ্রয় দেবার স্বভাব তার নয় বিশেষতঃ যেখানে সম্মান আর প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। প্রতিষ্ঠার শিখরে পৌঁছবার পথে এখনো অসংখ্য ধাপ পড়ে রয়েছে। ভাবালুতার সময় এখন নেই। এবারেও সমীর-সোম তার কর্তব্য স্থির করে ফেললে সহজেই। কলকাতার ওপর ওর মোহ সামান্যই। সে কাজের মানুষ। কাজের মধ্যে দিয়েই কলকাতার সঙ্গে তার যা কিছু সম্পর্ক আজ। সেই কাজই যখন টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাইরে মিথ্যে মায়া বাড়ান কেন? আর রাঁচি থেকে কলকাতা কিছু হাজার দু হাজার মাইলের পথ নয়। ফিরে আসতে কতক্ষণ?

পথের দূরত্বই যে ফিরে আসার একমাত্র বাধা নয় একথা সমীর সোম আজ যেমন বুঝেছে সেদিন তেমন বোঝেনি। বোঝা সম্ভব ছিল না সেদিন। সেদিন ইঁট-কাঠ-লোহা আর অর্ডার ইন্‌ভয়েস ডেপ্রিসিয়েশন ডিমাণ্ড ড্রাফ্‌ট ক্রেডিট নোট ব্যালান্স শিট এসব নিয়েই গড়ে উঠেছিল সমীর সোমের জগৎটা, এর বাইরে আর কিছু নিয়ে ভাববার সময় ছিল না তার সেদিন। এমন কি মানুষকেও টাকা রোজগারের যন্ত্র ছাড়া আর কিছু ভাবতে সে প্রায় ভুলে গিয়েছিল।

পুরের বছর আগে আজকের মতই সে একদিন রাঁচির ট্রেনে চেপে বসেছিল। নতুন জায়গা সম্বন্ধে উন্মাদনার সঙ্গে সেদিন তার মনে কত ভাবনাই না ভীড় করে এসেছিল। মনে পড়ছে আজ সমীর সোমের। তার বয়সের পক্ষে তার নবলব্ধ চাকরির দায়িত্ব আর সম্মান দুইই অনেক বেশী। সেখানে তার অধীনস্থ কর্মীরা কী ভাবে তাকে গ্রহণ করবে, কী চোখে দেখবে। চাঁদের ব্যবহারই বা ঠিক কিরকমটা হবে। নতুন জায়গায় সকলের সঙ্গে নিখুঁতভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে কি না, এই রকমের নানা ভাবনায় সেবারেও সে প্রায় সারাটা রাত ট্রেনে জেগে কাটিয়েছিল। তখন বর্ষার শেষ। ভোরের দিকে ঝেঁপে বৃষ্টি নামল। সারারাত্রির ভাবনায় আর উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে—আজ হাসি পাচ্ছে সেই ঘুম ভাঙার কথা মনে করে। এমন ঘুম ঘুমিয়েছিল সেদিন যে ট্রেন রাঁচি স্টেশনে এসে দাঁড়াবার পরেও তার ঘুম ভাঙে নি। পাশের বার্থের ভদ্রলোক নামবার সময় যদি ডেকে না দিতেন সমীর সোমকে তাহলে একটু অসুবিধেয় পড়তে হতো। আপিস থেকে যারা ছোট সাহেবকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিল তারা প্ল্যাটফরমের ওপর ছোটাছুটি করেও সন্ধান করতে না পেরে ফিরে গিয়েছিল সাহেব হয়তো নি সিদ্ধান্ত করে। এদিকে ঘুম ভেঙে অবস্থাটা অনুধাবন করে সমীর সোম রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়লো। তার ল্যাণ্ডলেডি মিসেস মুখার্জির স্টেশনে তাকে রিসিভ করতে আসার কথা। আপিসের লোকজনও নিশ্চয় এসেছে। কিন্তু সমীর সোমের পোষাক পর্যন্ত তখনো গায়ে ওঠে নি। সমীর সোম প্রায় লাফ দিয়ে গিয়ে ঢুকলো ল্যাভেটরির মধ্যে। কোনমতে চুলে বার দুই চিরুণী চালিয়ে গায়ে পোষাক গলিয়ে নেমে পড়ল প্ল্যাটফরমের ওপর। প্ল্যাটফরম প্রায় ফাঁকা। দূরের একটা কুলিকে ইসারা করে ডেকে ট্রেনের কামরা থেকে জিনিসপত্র নামান হল। এখন কী করা যায়। মিসেস মুখার্জি স্বয়ং স্টেশনে উপস্থিত থেকে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন লিখেছেন। তাই বাসার ঠিকানা নিয়ে মাথা ঘামায় নি সমীর সোম। তাকে দেখতে না পেয়ে ভদ্রমহিলা নিশ্চয় হতাশ হয়ে এতক্ষণে ফিরে গেছেন। আপিসের কোন লোককেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। যাক গে নিজের চেষ্টাতেই বাড়ী খুঁজে নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। দুরাণ্ডা—এইটুকুই কেবল মনে আছে। সমীর সোম কোটের পকেট হাতে ঢোকাল ওয়াল্টেটটা বার করবার জন্যে। ওর ভেতরেই পুরো ঠিকানা পাওয়া যাবে।

এমন সময় দেখা গেল দূরে পাতলা রঙীন বর্ষাতি গায়ে ছাতা হাতে নিয়ে একটি মহিলা ব্যস্ত ভাবে এগিয়ে আসছেন সমীর সোমের দিকে। একটু কাছে আসতে বোঝা গেল মহিলাটি কাকে যেন খুঁজছেন অথচ জিজ্ঞাসা করতে যেন সংকোচ বোধ করছেন। আরো একটু কাছে এসে সমীর সোমের সুটকেসের ওপর মোটা অক্ষরে তার নামটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তারপর ছাতাসুদ্ধ হাতটি অপর হাতের সঙ্গে যুক্ত করে নমস্কার জানালেন।

—আপনিই নিশ্চয় মিস্টার সোম? নমস্কার।

—মিসেস মুখার্জি? নমস্কার। দেখুন বড়ই লজ্জায় পড়েছি। আপনি কি এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন আমার জন্যে?

—আমার ত অপেক্ষা করবারই কথা। কিন্তু এতে লজ্জার কি আছে। চলুন, বাইরে ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে। গড়াতে বসে আলাপ করা যাবে। কি বলেন?

—চলুন।

স্টেশনের বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। বাড়ীর একজন চাকরকে মিসেস মুখার্জি সঙ্গে এনেছেন মালপত্র তদারকের জন্যে। সে সমীর সোমকে সেলাম করে কুলির মাথা থেকে সুটকেস বিছানা ইত্যাদি নামিয়ে গাড়ীতে উঠিয়ে দিল। মিসেস মুখার্জি ট্যাক্সিতে উঠে ইঙ্গিতে সমীরকে পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন।—উঠে আসুন, মিস্টার সোম।

—আমি এই সামনের সীটেই বসি না।—দ্বিধাজড়িত স্বরে প্রস্তাব করে সমীর সোম।

—তা কি করে হবে? ওখানে তো নগেন বসবে আপনার খুচরো জিনিসপত্র সামলে নিয়ে। আপনি এখানেই আসুন, উঠে পড়ুন।—মিসেস মুখার্জির কণ্ঠে সহজ আদেশের সুর। অগত্যা উঠে বসে সমীর সোম যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে।

গাড়ী ছেড়ে দিতে সমীর সোম আর একবার তার ত্রুটির জন্যে ক্ষমা চাইতেই কৌতুকের হাসিতে ভরে উঠল মিসেস মুখার্জির মুখ।

—কি আশ্চর্য, এতে হয়েছে কি বলুন ত? ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়াটা কি এমনই দোষের,—বিশেষ করে আপনার মত ছেলে-মানুষের পক্ষে?

'ছেলেমানুষ' শব্দটা খুব মনোমত না হলেও মিসেস মুখার্জির স্বরে যে আন্তরিকতা তাতে রাগ করা যায় না। তবু সমীর সোমের মনে হল এই কয়েক মিনিটের মধ্যে এতখানি অন্তরঙ্গতার চেষ্টা না হলেই ভাল ছিল। অচেনা দেশে এসে নিরুপায় হয়ে ওদের পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকতে যাচ্ছি। তাই বলে আলাপ হতে না হতে এত মাখামাখি ঠিক নয়। একটু নড়েচড়ে জানলার দিকে মুখ করে বাইরের দিকে চেয়ে বসে থাকে যাতে ভদ্রমহিলা বেশী কথা বলার সুযোগ না পান। নিতান্ত মামুলি দুটো একটা প্রশ্ন যেমন, ট্রেনে কোন অসুবিধা হয়েছিল কিনা, আজই আপিসে যেতে হবে কিনা, এ ছাড়া আর কোন প্রশ্ন করলেন না মিসেস মুখার্জি। কয়েকটা মোড় ঘুরে একটা সুদৃশ্য ছোট দোতলা বাড়ীর সামনে এসে ট্যাক্সি দাঁড়াল। বাড়ীখানা ছোট হলেও আধুনিক কায়দায় তৈরি। সামনের গেট

ছপাঁরিয়ে ছোট একটু বাগান। তার মাঝখান দিয়ে লাল কাঁকর বিছান পথ গিয়ে শেষ হয়েছে বারান্দার সামনে। সর্বত্র একটা পরিচ্ছন্ন ভাব। বাইরের গেটের একপাশে গ্যারাজ। গ্যারাজে সম্প্রতি গাড়ী থাকে বলে মনে হয় না। এখন সেটা মালী বা ভৃত্যদের আস্তানা।

ভৃত্য নগেন আগে নেমে পেছনদিকের দরজা খুলে দিতে মিসেস মুখার্জি প্রথমে নেমে পড়ে সমীরকে আহ্বান জানালেন।

—এই আমাদের বাড়ী, মিস্টার সোম। আপনি ভেতরে চলুন। জিনিসপত্র নগেন সব দেখেশুনে নিয়ে আসছে।

বারান্দার একপাশে ওপরে ওঠার সিঁড়ি। সমীরকে পথ দেখিয়ে দোতলায় তার ঘরে নিয়ে এলেন মিসেস মুখার্জি।

—এই আপনার ঘর। পেছনের দরজাটা খুললেই আপনার বাথরুম। সামনের ঘেরা বারান্দাটাও আপনার। সিটিংরুম, স্টাডি যেমন খুশি ব্যবহার করবেন। আচ্ছা, আমি আপনার ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করিগে। আপনি ততক্ষণ হাতমুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিন। কেমন?

সমীর সোম ঘরখানা ঘুরেফিরে দেখতে লাগলো। এমন অরামের সাজান ঘর পাবে সে আশা করে নি। বড় বড় জানলা; তাতে সুন্দর পরদা লাগানো। পরিষ্কার দেয়াল ক্রীম রং করা। ঘরে খাট আলমারি সোফা টেবিল চেয়ার সব ঠিক ঠিক জায়গায় সাজান। বাড়তি আসবাব কিছু নেই। কিন্তু যা যা আছে তার প্রত্যেকটিই ঝাড়ামোছা সযত্নে রক্ষিত। ঘেরা বারান্দাটাতে আর এক প্রস্থ টেবিল চেয়ার বই রাখার শেলফ খাবার ছোট টেবিল সাজান রয়েছে। ঘরে আর বারান্দায় দেয়ালে খান দুই-তিন বাঁধান ছবি দেশী ও বিলিতি মিলিয়ে। দুখানা ল্যান্ডস্কেপ আর একখানায় একটা প্রকাণ্ড ফুলের সাজি। শিল্পীর তুলিতে ফুলগুলো তাজা আর জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। মনে হয় আঙুল দিয়ে ছুঁলে এখুনি মাথা দোলাতে থাকবে।

নগেন কোন ফাঁকে বারান্দায় তার স্যুটকেস দুটো রেখে দিয়ে গেছে। কোটটা গা থেকে খুলে রেখে সমীর বাথরুমে ঢুকলো। হাত-মুখ ধুয়েমুছে ঘরে ঢুকেই ওপাশ থেকে মিসেস মুখার্জির গলা শুনতে পেল।

—চা কি বারান্দায় বসে খাবেন, না ঘরে?

—এই যে, বারান্দাতেই আসছি।—বলতে বলতে ঘর পার হয়ে দরজার পরদা সরিয়ে সমীর বারান্দায় বেরিয়ে এল। মিসেস মুখার্জিও ব্রেকফাস্ট ট্রে দু হাতে ধরে ওদিক থেকে বারান্দায় এসে ঢুকলেন।

—এই চেয়ারটায় বসুন। চা আনতে বোধহয় একটু দেরী হয়ে গেল, মিস্টার সোম। খুব খিদে পেয়েছে ত?—এই বলে ট্রেটা সমীরের সামনে ছোট টেবিলের ওপর রেখে খাবারের প্লেট এগিয়ে দিয়ে চা ঢালতে লাগলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

সমীর সোম রীতিমত কুণ্ঠিত বোধ করছে। এসব অভ্যেস ত তার নেই। বাড়ীর ঘরে বসে খাবারের প্লেট তার দিকে কে কবে এভাবে এগিয়ে দিয়েছে তা মনে পড়ে না। বাড়ীতে বা হোটেলে চাকর খানসামার হাতে সে বরাবর খেয়ে এসেছে। চেয়ার থেকে প্রায় উঠে পড়ে সমীর যথাসম্ভব আপত্তি জানায়।

—আপনি কেন এত কষ্ট করছেন মিসেস মুখার্জি! চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই তো হতো। দিন চা আমি ঢেলে নিচ্ছি।

—স্থির হয়ে বসুন ত আপনি। এতে আর কষ্টটা কোথায় দেখলেন? সারারাত ট্রেন জার্নি করে এসেছেন। খেয়ে বিশ্রাম করে সুস্থ হোন আগে।—এই বলে চায়ের পেয়ালাটা এগিয়ে দেন সমীরের সামনে।

আবার সেই সহজ আদেশের সুর। এবার আর সমীর সোমের খারাপ লাগছে না। তেমন বাড়াবাড়িও মনে হচ্ছে না। সপ্রতিভ ভাবে সে চায়ের পেয়ালাটা টেনে নিলে। আর চুপ করে থাকাও ভালো দেখায় না। একটা কিছু বলা দরকার।

—কই বসলেন না ত, দাঁড়িয়েই রইলেন যে। আর আপনার চা?

মিসেস মুখার্জি পাশের চেয়ারটায় বসলেন আলগাভাবে।

—এক কাপ কফি খেয়েই স্টেশনে গিয়েছিলুম যে। আবার একবার বসতে হবে ওঁর সঙ্গে। মিস্টার মুখার্জি এই সবে ঘুম থেকে উঠলেন। কাল রাত্তিরে একটা পার্টি ছিল, ফিরেছেন বেশ রাত করে। তাই আজ এই দেরী। না-হলে উনি খুব ভোরেই ওঠেন।

সমীর সোম এতক্ষণে ওঁর দিকে ভালো করে চাইতে পারছে। আড়ষ্ট ভাবটা এবার কেটেছে। রঙীন বর্ষাতি জড়ান যে মিসেস মুখার্জি তাকে স্টেশন থেকে নিয়ে এলেন ইনি বেন সে মিসেস মুখার্জি নন। পরনে তাঁর এখন ফিকে লাল পাড় গরদের শাড়ী। বাদামী রঙের ব্লাউজের হাত কনুইয়ের নীচে পর্যন্ত নেমে এসেছে। কপালে সিঁদুরের একটা ছোট্ট টিপ। চোখে দেখে মনে হয় বয়স এখনো তিরিশের কোঠা পার হয় নি। মুখে চোখে বয়সের কাঠিন্যের ছাপ এখনো পড়ে নি। দেহের বাঁধুনিতে এখনো যৌবনের আভাস সুস্পষ্ট। মাথার কাপড় প্রায় কপাল পর্যন্ত নেমে এসেছে কাজেই চুল বিশেষ চোখে পড়ে না। কেবল কাঁধের কাছে খোঁপার একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। সমস্ত দেহ জুড়ে কেমন একটা স্নিগ্ধ লাবণ্যের প্রকাশ যা চোখ আর মনকে সহজেই আকর্ষণ করে। মনে সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলে।

—এবার আপনি বিশ্রাম করুন। আমি ওদিকে দেখি। ওঁর চা খাওয়া শেষ হলে একবার নিয়ে আসব এখানে—আপনি ত আছেনই।

উঠে চলে যাচ্ছিলেন। কি মনে হতে একবার দাঁড়ালেন।

—একটা কথা বলবার ছিল মিস্টার সোম। একটু থেমে আবার বললেন,—আমাদের এখানে আপনার আগে আর কোন গেস্ট আসে নি। আপনিই প্রথম। তবে বিশ্রিতি প্রথা মত আপনাকে গেস্ট হিসেবে দেখবো এ আমরা চাই না। যতদিন থাকবেন আমাদের একজন হয়েই থাকুন এই আমাদের ইচ্ছে, অবশ্য তাতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে। যখন ইচ্ছে বাড়ী আসবেন যখন দরবার হবে বেরুবেন। যা দরকার হয় বলবেন, কেমন? আচ্ছা যাই এখন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গৃহকর্তা মিস্টার মুখার্জিকে সঙ্গে নিয়ে এলেন মিসেস মুখার্জি, আলাপ করিয়ে দিলেন। সমীর সোম ইতিমধ্যে তার পোষাকপরিচ্ছদ ইত্যাদি আলমারিতে সাজিয়ে রেখেছে। আপিসের ফাইল কাগজ-পত্র সামান্য যা সঙ্গে এসেছে সেগুলো টেবিলের ড্রয়ার গুছিয়ে রাখলে। এ ছাড়া জিনিসপত্র বিশেষ কিছু নেই। দু-পাঁচখানা বই যা সকলেই সঙ্গে নিয়ে ঘোরে সমীরের তা নেই। বই পড়ার অভ্যেস কলেজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়েছে। একমাত্র পাঠ্য তার কাছে খবরের কাগজ আর দেশী ও বিদেশী বিজনেস জার্নাল।

দরজায় টোকা দিয়ে সমীরের সাড়া পেয়ে মিসেস মুখার্জি ঘরে ঢুকলেন, তাঁর পেছনে তাঁর স্বামী নিখিলেশ মুখার্জি। সমীর উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করার পর নিখিলেশ কপালে দু হাত ঠেকিয়ে নমস্কার জানালেন। শান্ত সৌম্য সুঠাম চেহারা। ধবধবে ফর্সা গায়ের রং, প্রশস্ত ললাট, চোখে কালো শেলের পুরু কাঁচের চশমা। মাথার কাঁচাপাকা চুল বিরল হয়ে আসছে। মাথার মাঝখান খানিকটা টাক চোখে পড়ে। বয়স মনে হয় পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। মিসেস মুখার্জির পাশে এঁকে প্রায় বেশ ভারিক্কী দেখায়। কথা কম বলেন বটে তবে অমায়িকতায় ভরা। মিলিটারি একাউনটসের অফিসার ছিলেন। বয়স পূর্ণ হবার আগেই স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছেন। পড়াশোনা নিয়েই বেশীর ভাগ সময় কাটান। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অতিথিবৎসল। বাড়ীতে বন্ধুবান্ধবের আনাগোনা লেগেই আছে তা বোঝা গেল ঘন ঘন টেলিফোনে এঁদের তলবের বহর দেখে। মিসেস সেন একজনের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ শেষ করে ফিরে এসে সমীরকে উদ্দেশ করে জানালেন এখনকার মিশ্র দম্পতি সমীরকে দেখার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওরা আজ বিকেল নাগাদ এসে পড়বে জানিয়েছে।

নিখিলেশ মুখার্জি সবিনয়ে বিদায় নিয়ে উঠলেন। মিসেস মুখার্জিও উঠতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সমীরের অনুরোধে আবার বসলেন। মনে হলো সমীর বসতে বলায় তিনি খুশিই হলেন।

—আপনার কাজে কোন ব্যাঘাত ঘটালাম না ত মিসেস মুখার্জি?

—না মোটেই নয়। কাজ আর কতটুকু বলুন। দুটি প্রাণীর সংসার। তবু পরিচিত দু-চারজন গল্পগুজব করতে আসে তাই সময়টা কেটে যায় একরকম। এই ত সুধা আর সুকল্প এখুনি আসতে চাইছিল আপনার

সঙ্গে আলাপ করতে। কিন্তু আপনি নিশ্চয় ক্লান্ত তাই বিকেল পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছি। ওরা হয়ত আজই আপনাকে ক্লাবে টেনে নিয়ে যেতে চাইবে। ভারী ছেলেমানুষ দুজনেই। আর বড় ভালো। মুকুল আপনারই মত হবে বয়সে।—

কথাটা শুনতে অস্বাভাবিক লাগে। বয়স যার সমীর সোমের মত তার সঙ্গে এঁদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক কেমন করে হয় ভেবে পায় না সমীর। তাছাড়া যারা তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে এত অধীর তাদের পরিচয়টাও জেনে রাখা ভালো। প্রশ্ন করতেই মিসেস মুখার্জির চোখ দুটি যেন ছলছলিয়ে উঠল।

—ওদের সঙ্গে পরিচয় সে অনেক দিনের। আমার ছেলে বীরু এদের দুজনেরই খুব প্রিয় ছিল, বিশেষ করে মুকুলের। দুজনেই টেনিস নিয়ে মেতে থাকতো। বীরু বেঁচে থাকলে হয়ত আজ মুকুলের মতোই টেনিসে নাম করতে পারত।

মিসেস মুখার্জির গলাটা ধরে আসছে লক্ষ্য করছে সমীর। নিজেকে অভিসম্পাত দিচ্ছে মনে মনে এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের জন্যে। কিন্তু এর মধ্যে মিসেস মুখার্জি নিজেকে সামলে নিয়েছেন। একটু থেমে পরিষ্কার গলায় আবার বলতে থাকেন।

—লেখাপড়াতেও ভালো ছিল ওর বাবার মত আর ছিল তেমনি সবল আর আমুদে। ঐ একটিমাত্র সন্তান আমাদের ওকে ঘিরেই আমাদের শেষ জীবনের স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল। ভালোভাবে বি-এস-সি পাশ করল। বিলেতে গিয়ে হাযার ইঞ্জিনীয়ারিং পড়বার সব ঠিকঠাক এমন সময় বিনামেঘে বাজ পড়ল। গাড়ী হাঁকিয়ে হাজারিবাগে পিকনিক করতে বেরোল—আর ফিরলো না বীরু—যাবার পথেই সর্বনেশে এ্যাক্সিডেন্টে গাড়ী উল্টে গেল।

কয়েক সেকেণ্ড থেমে আবার বললেন—

—বয়সে কিছু বড় হলেও মুকুল ছিল বীরুর সবচেয়ে বড় বন্ধু। তাইত বীরু থাকতে যেমন আসতো আজও তেমনি আসে আমাদের কাছে। সারা জীবন আমাদের বাঙলার বাইরেই কাটছে। কে বাঙালি কে নয় তার হিসেব রাখার দরকার হয় নি কখনো। এখানকার ছেলেমেয়েরা নিজের লোকের মতই মেশে আমাদের সঙ্গে, অবশ্য বাঙালির অভাব নেই রাঁচিতে। যাক যা বলছিলুম—ঐ যে শূন্য গ্যারাজ দেখলেন আমাদের, সেই থেকে ওটা ঐভাবে পড়ে আছে। আর গাড়ী রাখা হয় নি। দরকারও আর নেই।

ঘরের মধ্যে একটা থমথমে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বাইরের আকাশও মেঘলা। সব মিলিয়ে বেশ অস্বস্তি বোধ করছে সমীর সোম। এ বাড়ীতে ঢুকতে না ঢুকতে এই বাড়ীর এই করুণ ইতিহাস জানার জন্যে মন একেবারেই তৈরি ছিল না। মিসেস মুখার্জির অমায়িক ব্যবহারকে আজ সকালেই গায়ে পড়া ভাব মনে করে যে ভুল করেছিল সে কথা মনে করে এখন লজ্জা হচ্ছে সমীরের। এ অবস্থায় তার দিক থেকে সমবেদনার কথা কিছু বলা দরকার। কিন্তু কি বলবে সে ভেবে পায় না। তার বিগত জীবন যে অবস্থা আর আবহাওয়ার মধ্যে কেটেছে সেখানে এ ধরণের সুখদুঃখ বোধের অবকাশ ছিল না। তবু এ অবস্থায় একেবারে চুপ করে বসে থাকা যায় কি করে? কোনমতে দু-চারটে সান্ত্বনার কথা গুছিয়ে বলার চেষ্টা করে।

—ক্ষমা করবেন আমায়, মিসেস মুখার্জি। আমার ত কিছুই জানা ছিল না। আলাপ করতে গিয়ে না-জেনে আপনাকে কষ্টই দিলুম।

মিসেস মুখার্জি সমীরের অস্বস্তিকর অবস্থা বুঝে নিজেকে আরো সহজ করবার চেষ্টা করছেন। মুখে হাসি এনে বললেন,—

—তা কেন ভাবছো মিস্টার সোম। আপনি ত কিছু জানতে চান নি, আমিই ত এসব কথা বলে শুধুশুধু আপনার মনকে ভারী করে তুলছি। ক্ষমা আমারই চাওয়ার কথা। কিন্তু তা চাইবে না কেন তা আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন। আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। সে হিসেবে একটা অধিকারও রাখছি। না হলে আপনার সঙ্গে দেখা হতে না হতে এত জুলুম করতে পারতুম না আপনার ওপর। আমার স্বামী এত কথা আপনাকে বলবেন না। কিন্তু জেনে রাখবেন উনিও মানুষের সঙ্গ চান মনে মনে। এরপর যখন ক্লাবে যাবেন দেখবেন ঐ গম্ভীর অল্প কথার মানুষটি কি সহজভাবে ছোট বড় সকলের সঙ্গে মিশে যান।

—আমার দিক থেকে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন মিসেস মুখার্জি। সামাজিক আদব-কায়দা হয়ত তেমন জানি না, কারণ সে সুযোগ হয় নি আমার। তবে আপনারা আজ আমাকে যেভাবে গ্রহণ করলেন তার মর্যাদা আমি দেবার চেষ্টা করবো।—সমীর সোম একটানা এতগুলো কথা গুছিয়ে বলতে পারলো দেখে নিজেই আশ্চর্য হল। ব্যবসামহলের বাইরে সমাজের অন্দরমহলে এই তার প্রথম পদচারণ। ওর অন্যমনস্কতা ভাঙ্গলো মিসেস মুখার্জির উত্তরে,—

—আপনি যে কাজ নিয়ে এসেছেন, সমাজের যে-স্তরে আপনাকে মেলামেশা করতে হবে সেখানে হয়ত আদবকায়দার প্রয়োজন হবে। কিন্তু এ বাড়ীতে ওটার কোনই দরকার হবে না দেখবেন। বরং উল্টোটাই। এই যে আপনি কথায় কথায় মিসেস মুখার্জি বলে ডাকছেন এটাও কিন্তু আমি আর বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারবো না। আমার নাম তপতী। সুধা মুকুল এদের সকলেরই আমি মাসিমা। আপনার কাছে মাসিমা না হয় নাই হলুম, দিদি হতে দোষ কি। কি বলেন, আপত্তি আছে?

—আপত্তি করার পথ আপনি রাখলেন কোথায় কিন্তু তাহলে আমার দিকটাও ভাববেন আশা করি। আমার নাম আপনি জানেন। আমাকে সমীর বা সোম যে-কোন নাম ধরে ডাকলেই চলবে। মিস্টার বাবু এগুলো বাদ যাক। তাহলে আপনিটাও বিদায় হবে সঙ্গে সঙ্গে।

এরপর দুজনেরই সরবে হাসি। ভারী ভাবটা কেটে গেছে দুজনেরই মন থেকে। সমীর সোম নতুন জীবনের আস্বাদ পেয়ে পরম নিশ্চিন্ত বোধ করছে। তপতী মুখার্জি এবার উঠলেন,—

—এবার যেতে হয় আমাকে। রান্নার কতদূর হল দেখি গে। স্নান সেরে রেখো। খাবার সময় হলে খবর দেবো। খাবার ঘরে একসঙ্গে বসে খেতে অসুবিধে নেই ত?—এই বলে উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

খাবার ডাক পড়তে সমীর নীচে নেমে এল ডাইনিং রুমে। নিখিলেশ খাবার টেবিলে বসেছিলেন। সমীরকে দেখে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন। তপতী ইংগিতে তাকে নিষেধ করে বললেন,—সমীরকে আমি কথা দিয়েছি এ বাড়ীতে আদবকায়দার বাঁধাবাঁধি নেই। কাজেই তোমাকে উঠতে হবে না। কী বল, সমীর?

—নিশ্চয়, সেই কথাই ত হয়ে আছে,—বলে নিখিলেশের সামনের চেয়ারে সমীর বসে পড়ল।—আপনিও বসবেন ত?

—এই যে, তোমাদের সব ব্যবস্থা করে দিই আগে,—বলে তপতী নিপুণ হাতে প্রথমে সমীরের ও পরে নিখিলেশের খাবার সাজিয়ে দিয়ে শেষে স্বামীর পাশে গিয়ে বসলেন নিজের থালাটা নিয়ে।

খেতে খেতে নিখিলেশ সমীরের কাজকর্ম সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়েছেন। কথায় কথায় সমীরের স্থানীয় চীফের কথা উঠল। জি কে কৃষ্ণস্বামীকে নিখিলেশ চেনেন যদিও পরিচয় তেমন নেই। বার কয়েক দেখেছেন এখানে-ওখানে। লোক মুখে কৃষ্ণস্বামী সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনেছেনও। লোক মন্দ নয়, কাজের মানুষ বলে সুনামও আছে। তবে একটু দাম্ভিক প্রকৃতির মানুষ। সহজে নিজের সার্কল ছেড়ে নড়েন না। অন্যান্য কথাও হল। সমীরের মনে পড়ল তার পৌঁছনর খবরটা মিস্টার কৃষ্ণস্বামীকে জানিয়ে রাখা ভালো। আজ রবিবার! চীফকে নিশ্চয় টেলিফোনে তার বাড়ীতে পাওয়া যাবে। না গেলেও একটা মেসেজ দিয়ে দেওয়া যাবে।

খাওয়া শেষ হলে সমীর নিখিলেশের সঙ্গে দোতলায় উঠে গেল কৃষ্ণস্বামীকে টেলি-ফোন করতে। তপতী বললেন,—টেলিফোন সেরে এবার একটু ঘুমিয়ে নাও। বিকেল হতে না হতেই ওরা এসে পড়বে।

নতুন পরিবেশে দিবানিদ্রা তেমন হল না। ঘুম যখন ভাঙল ঘড়িতে তখন মাত্র তিনটে। তবু বিছানাতেই পড়ে রইল চোখ বুজিয়ে। একটা পর্ব ভালোয় ভালোয় চুকলো। বলতে গেলে আশার অতিরিক্ত ভালো। যতদূর মনে হচ্ছে এখানে সে নিরুপদ্রবে বাস করতে পারবে। বাকী রইল নতুন আপিস আর নতুন চীফকে নিয়ে ভাবনা। কাল যতক্ষণ না আপিসে গিয়ে বসছে ততক্ষণ এ ভাবনা থাকবেই। আশা করা যাক সেখানেও কোন

(শেষাংশ ১০৪ পৃষ্ঠায়)

তুমি আসছ না কেন?

কেন যে আসছ না, বুঝতে পারছি না। তোমাকে কতদিন—কতদিন ধরে যে ডাকছি। সমস্ত অন্তর দিয়ে ডাকছি। তবুও—

তুমি আসছ না। আমি জানি। জানি, তুমি এই পৃথিবীর বায়ুতরঙ্গে ভেসে ভেসে ঈথারের ভেতর দিয়ে হাজার হাজার নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ আর নীহারিকাপুঞ্জ পার হয়ে অনেক অনেক দূরে চলে গেছে। খুব সহজ নয় আসা। তবুও অনেকে আসে।

হ্যাঁ, বিশ্বাস কর, অনেকে আসে। বসে। কথা বলে। দু' দণ্ড তার সঙ্গে বেশ গল্প-গুজব করা যায়। আমার সময়টা বেশ কেটে যায়! কিন্তু—

তুমি কিছুই বোঝ না। বুঝতে চাও না। তুমি কি সেই ছোটবেলার মতই রয়ে গেছ? এখনও—এখনও আমাকে কষ্ট দিয়ে তুমি কি আনন্দ পাও.....

আবছায়া অন্ধকার ঘর। দরজা বন্ধ। ঘরের ভেতরে আর কে আছে—কে থাকতে পারে! কার সঙ্গে কথা বলছে নতুন বৌ!

বন্ধ-দরজার কপাটের ওপারে দাঁড়িয়ে তীব্র উত্তেজনায়, কৌতূহলে একেবারে জ্বলে যেতে থাকে মাধুরী। তার চেতনার ওপরে ভারী বোঝার মত নেমে আসে তার নতুন বৌদি বরুণার সম্বন্ধে এক কুৎসিত সন্দেহ।

মাকে ডাকবে না কি! না। সে ঠিক হবে না। এসব দেখলেই চীৎকার করে কেঁদে-কেটে অনর্থ বাধিয়ে বসবে। আগে দেখা যাক ব্যাপারটা কি?

বারান্দার ওপরে কোন জানালা নেই। দুটো জানালা আছে বটে, সে দুটোই রাস্তার দিকে। আর সেদিকে বারান্দা নেই। তাই—

দরজার কড়ার পাশে একটা ছোট ছিদ্রেই একটা চোখ রাখল। আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে

উঠল। ওরা তিনজন খাটের ওপর বসে কি করছে।

ঘরে সবুজ আলো জ্বলছে। শেওলার মত হাল্কা সবুজ অন্ধকারে কিছুই তেমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কেমন মায়াময় রহস্যে-ভরা মনে হচ্ছে তার বহুদিনের পরিচিত সেই ঘরটাকে।

ফুলের সুগন্ধের সঙ্গে মিশে ধূপের সৌরভ আসছে। একজনও একটা কথা বলছে না কেন। ওরা চুপচাপ বসে কি করছে—কি করতে পারে।

দরজায় ধাক্কা দিতে যাবে, এমন সময় রান্নাঘর থেকে হেমাঙ্গিনীর গলার স্বর শোনা গেল—খুকু, কোথায় গেলি রে—

বেশিদিন নয়। এক বছর নয়, দু' বছর নয়, মাত্র একমাস হলো এ বাড়ির মেজছেলে নবনীর বিয়ে হয়েছে। এখনও বড়ঘরের আলমারীর মাথার ওপর বিয়ের মুকুট ঝকমক করছে, এখনও ঠাকুরঘরের মেঝেতে জ্বলজ্বল করছে আলপনায় আঁকা লক্ষ্মীর পদাঙ্কলেখা। কিন্তু—

কোন উল্লাস নেই। হাসি নেই। গান নেই। যেন চৌধুরীদের এই বাড়ির সমস্ত আনন্দের মৃত্যু হয়েছে। চাপা একটা অস্বস্তিতে থম থম করে চারিদিক। কেউ মুখ ফুটে কিছু বলে না। কিন্তু সকলের মনেই একটা প্রশ্নই ঘোরাফেরা করে—

এমন সুন্দর, মিষ্টভাষী, শান্তিপ্রিয় ছেলের এ কেমন বিয়ে হলো?

—কোন অসুখ-বিসুখ ছিল নিশ্চয়ই।

—কি সম্বন্ধই যে নিয়ে এল ঠাকুরমশায়—থাম, তিনি এলেই তাকে ধরব—

মা ও মেয়ে গোপনে আলোচনা করে। বড়ছেলে দিল্লীতে চাকরি করে। সপরিবারে সেইখানেই থাকে। সে-ও খুব দুঃখ করে চিঠি লিখেছে। মেজভাই নবনীকে নির্দেশ দিয়েছে, কোন মনস্তাত্ত্বিককে দিয়ে যেন বৌদিকে পরীক্ষা করানো হয়...

শুধু একজন। একটিমাত্র লোক বরুণের স্বপক্ষে। সে—এই বাড়ির ছোট ছেলে অজয়। সে মা-কে, বোনকে বলে, তোমরা মেজবৌদিকে বুঝতে পারবে না। বৌদি খাঁটি স্পিরিচুয়ালিস্ট—

—মানে?

—কি বলব, তোমরা বিখ্যাত ইংরেজ স্পিরিচুয়ালিস্ট ভর্বলিউ স্টেনটেন মোজেসের নাম শুনেছ? আর তাঁর লেখা বই "স্পিরিট টীচিংস" তো পড়োই নি, অজয় হঠাৎ থেমে যায়। বেশ চিন্তিত মনে হয় তাকে। হয়ত ভাবে, আরও সোজা করে কি বললে মা বুঝতে পারবেন, বুঝতে পারবে মাধুরী!

একেবারে জড়বাদী মানুষ এরা। সঙ্কীর্ণ স্বার্থের হাজারও প্রহরী ওদের মনকে চেতনাকে অহরহ সতর্কভাবে পাহারা দিয়ে আছে। কোন পারলৌকিক চিন্তা, অধ্যাত্মবাদী কোন ধ্যানধারণাকে তাদের মনের আশপাশে পর্যন্ত ঘেঁষতে দেবে না। তাই নতুন বৌদিকেও ওরা কোনদিন বুঝতে পারবে না। পারবে মেয়ে ছেলেরা বরুণা বড় কষ্ট পাবে এই সংসারে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর বিষণ্ণ হয়ে ভাবে অন্তর। কিন্তু—

বরুণার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে একটি কথা বলে না, একটি মন্তব্য করে না তার স্বামী। দর্শনের অধ্যাপক নবনী। স্ত্রীকে নিয়ে সে সুখী কি দুঃখী, তাও হেমাঙ্গিনী ও মাধুরী বুঝতে পারে না।

নবনী ডক্টরেটের জন্য তৈরী হচ্ছে। তার গবেষণার বিষয় হল, পাশ্চাত্য দর্শনে সাংখ্যের প্রভাব। সে তার কলেজের সময়টুকু ছাড়া সকাল-সন্ধ্যা লাইব্রেরীতে পড়াশুনো নিয়ে ডুবে থাকে।

বরুণার সম্বন্ধে সে একেবারে নির্বিকার। উদাসীন হয়ে থাকতে চাইলেও সংসার তাকে থাকতে দেয় না। হেমাঙ্গিনী বলে, তুই কেমন বুঝছিস বলতো? একটু থেমে কি যেন ভেবে আবার বলে, ও আমাদের সঙ্গে কথা বলে, হেসে-খেলে সংসারের কাজ-কর্ম করে, বেশ সহজ হয়েই থাকতে চায়, বুঝলি। কিন্তু—

—কিন্তু কি?

কথা বলে না হেমাঙ্গিনী। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখদুটো জলে ভরে আসে। শুধু কান্নার ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্ফুট স্বরে বলে, তুই সুখী হবি না বাবা—এই বৌ নিয়ে কিছুতেই কোনদিনও তুই সুখী হতে পারবি নে—

বরুণাকে রান্না করতে দিয়ে উনানের গনগনে আগুনের দিকে তাকিয়ে কি ভাবে। ভাবতে ভাবতে চোখ পুড়িয়ে ফেলেছিল একদিন। সব সময় সে অন্যমনস্ক। সমবয়সী মাধুরীর সঙ্গে বেশি কথা বলে না, এইজন্যই কি মা-র মনে এত ক্ষোভ? না, আরও কোন কারণ আছে; নবনী ভাবে, মজবের কিন্তু খুব শ্রদ্ধা আছে ওর ওপরে। নতুন বৌদির সঙ্গে বেশ মেলামেশাও করে...

সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষের তত্ত্বচিন্তার কালস্রোতে ভেসে যায় ওসব অসার ভাবনা একেবারে তলিয়ে গেল।

সেদিন বরুণা সকালে উঠেই শাশুড়ীর সঙ্গে তরকারী কুটতে বসল। সাধারণত একটু বেলা করে ওঠে সে। আজ হঠাৎ কি হল কে জানে!

—দুঃখের কুটনোই কুটে ফেলব মা?

—তুমি আবার এর ভেতরে এলে কেন? এখুনি হয়ত আগুনে বেটে ফেলবে—

বরুণার মুখে অন্ধকার নেমে এল। কেন— কেন তাকে কেউ সহ্য করতে পারে না? কি করেছে সে? সমস্ত শরীর জ্বরের মত অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। একটা কথা বলল না। নিঃশব্দে কাজ শেষ করে উঠে চলে গেল।

এল নবনীর ঘরে। সাংখ্যদর্শন আর হিস্ট্রি অফ ফিলসফির মোটা মোটা বইয়ের ভেতর থেকে তার পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল।

—তোমার তো সময় হবে না, তাই না?

নবনীর কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল।

—আচ্ছা, বেশ-বেশ। তোমাকে যেতে হবে না। আমি ছোটঠাকুরপোকে নিয়ে একটু বেরোতে চাচ্ছি—

—বেশ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার পড়ায় মন দিল।

চৌকাঠের বাইরে এসে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বরুণা। তার মনে হল, এই স্নেহ-প্রেম-মমতার পৃথিবী থেকে এরা তাকে অজানা এক অন্ধকারের রাজ্যে নির্বাসিত করে দিতে চাইছে! যতবার—যতবার সে ডুবন্ত মানুষের মত হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে আলো-বাতাসে ভরা মাটির দিকে আসতে চেষ্টা করেছে ততবার ওরা তাকে অন্ধকারের সমুদ্রের ভেতরে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে।

অনেক আশা করেছিল। অনেক স্বপ্ন দেখেছিল। বিয়ের পর বর পাবে। ঘর পাবে। ভুলতে পারবে। ভুলে যাবে সেই পুরানো সর্বনেশে নেশা। কিন্তু—

কে জানত, তার জীবনের অভিশাপের সেই খেলার সঙ্গী হবে তার নিজের দেবর! কিন্তু—

তবুও বেঁচে যেত। বেঁচে যেতে পারত যদি তার স্বামী ছোট সুখ, ছোট আশা নিয়ে সন্তুষ্ট, সাধারণ মানুষ হত? যদি তার দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগও থাকত!

তাও না। সে একটা কিছু নিয়ে সময় কাটাতে পারে। থাকতে পারে মেতে। তাই নবনী যেন মনে মনে খুব খুসী। খুব পরিতৃপ্ত। দর্শনের জটিল চিন্তাভাবাক্রান্ত সেই ধূসর ও অস্পষ্ট জগতের ভেতরে বসে সে পরম আনন্দে দিন কাটাচ্ছে। কাটাতে পারছে। তুমি কি একবার জিজ্ঞাসা করতেও পারতে না যে, আমি ঠাকুরপোর সঙ্গে কোথায় যাচ্ছি। তোমার কি কোন দায়িত্বই নেই—এসব কথা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু—বলতে পারল না। পারল না আবার ফিরে নবনীর ঘরে যেতে। অবশ হয়ে আসছে তার পা দুটো। আর তার দেহ, তার মন, তার সমস্ত চেতনা শবের মত ভারী, অনড় ও অবসন্ন হয়ে যেন এক মহাশূন্যের ভেতরে তলিয়ে যেতে লাগল।

—এ কী বৌদি, তুমি মেজদার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? মাধুরী এল।

—মাথাটা কেমন ঘুরে উঠেছিল ভাই—

—বিয়ের আগে নিশ্চয়ই তোমার কোন অসুখ-বিসুখ ছিল—

অসুখ ছাড়াও বরুণাকে কেন্দ্র করে আরও একটা কুটিল সন্দেহ মাধুরীর মনটাকে এঁকে-বেঁকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলছিল। ছোড়দার সঙ্গে ওর অত মাখামাখি কিসের?

সে তীক্ষ্ণচোখে বরুণার গতিবিধি লক্ষ্য করে। ওকে বিস্মিত করে দেয় বরুণার চাল-চলন। সব সময় বৌদি কেমন আচ্ছন্নের মত থাকে। কি ভাবে ও। চোখদুটোতে ঘুমের জড়তা মাখানো। রাত্রে ভাল করে

ঘুমোয় না, না কি! দু'-একদিন তার নজরে পড়েছে, গভীর রাত্রে জানালার গরাদ ধরে বাইরের অন্ধকারের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বিয়ের আগে নিশ্চয়ই কারও সঙ্গে ভাব-ভালবাসা ছিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা দোতলার শেষপ্রান্তে অজয়ের ঘরের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মাধুরী।

ঘর অন্ধকার কেন? একটু আগেও তো ছোড়দা ঘরে ছিল! তাহলে কি ওরা.....ছিঃ ছিঃ, উত্তেজনায়, ঘৃণায় তার মনটা একেবারে দড়ির মত পাকিয়ে গেল।

নীচু হয়ে বসে দুই দরজার ফাঁক দিয়ে তাকাল! ওরা তিনজন ছোড়দার টেবিলে চক্রাকারে বসে রয়েছে। ছোড়দা, বরুণা আর গীতা। গীতা, পাশের বাড়ির মেয়ে। তারই বন্ধু!

ওদের কারো মুখে কোন কথা নেই। যেন নিঃশব্দে বসে কিসের ধ্যান করছে। ঘরে আলো নেই। শুধু খাটের নীচে একটা মোমবাতি জ্বলছে। মোমের মৃদু আলোয় ঘরের চারিদিকে রহস্যময় ছায়া ছায়া অন্ধকার ছড়িয়ে রয়েছে।

টেবিলের ওপরে ঝকঝকে সাদা ফুলস্কেপ কাগজ পেতে রাখা হয়েছে। কাগজের ওপরে একটা পানাকৃতি কার্ডবোর্ডের ঠিক মাঝখানে ছোট ছিদ্র করে একটা ছোট পেন্সিল আটকানো রয়েছে।

কার্ডবোর্ডের ওপরে প্রথমে আলগোছে হাত রেখেছে বরুণা। ঠিক তার ওপরে পড়েছে অজয়ের হাত, তারপরে আছে গীতার হাত।

অপূর্ব একটা আলোয় বরুণার মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। অল্প অল্প কাঁপছে ঠোঁটদুটো। আর চোখের দৃষ্টিটা সুদূর হয়ে উঠেছে। যেন এই মাটির পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক—অনেক দূরের এক অজানা জগৎ সে দেখতে পাচ্ছে।

সব চুপ। সব শান্ত। ঘরের ভেতরে নিথর স্তব্ধতা থম থম করছে। সেই মৃত্যুর মত প্রগাঢ় নিস্তব্ধতার ভেতরে শুধু দেওয়াল-ঘড়িটা টিক্ টিক্ শব্দ করে চলেছে।

হঠাৎ কার্ডবোর্ডটা একটু যেন নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বহুদূর থেকে দৈববাণীর মত এক একটা করে প্রশ্ন করতে লাগল বরুণা।

—জানতে পারি কি; আমরা যাঁকে চাইছি, আপনিই সেই ব্যক্তি?

—হ্যাঁ। কার্ডবোর্ডের সঙ্গে লাগানো পেন্সিল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সাদা কাগজের ওপরে ওই 'হ্যাঁ' কথাটা লেখা পড়ল।

—আপনি কোন্ স্তরে আছেন?

—তৃতীয় স্তরের ওপরের অঞ্চলে।

—আপনার সঙ্গে আর কে কে আছেন?

—আমি বিদ্যাসাগর। আমার সঙ্গে যাঁরা যাঁরা সমাজসংস্কারের কাজ করতেন, যেমন রামমোহন রায়, রাজনারায়ণ বসু, ইত্যাদি আরও অনেকে আছেন—

—আপনি যেখানে আছেন, সেই জায়গাটা কেমন?

—জায়গাটা পৃথিবীর মতই। নদী, গাছপালা, মাঠ, সবই আছে। কিন্তু অপরূপ তাদের সৌন্দর্য। পৃথিবীর মত এখানে সূর্য নেই। কিন্তু তাই বলে অন্ধকারও নেই। অদ্ভুত ও অপার্থিব আলোয় সমস্ত দেশটা উদ্ভাসিত। সেই আলোয় গাছপালা, নদী, বন, মাঠ ঝলমল করছে। সব যেন জ্যোৎস্নার মত সেই নরম আলো দিয়ে তৈরী.....

সাদা কাগজের ওপরে আরও হিজিবিজি লেখা ফুটে উঠল। কি লেখা পড়ছে তা ওরা চেষ্টা করেও বুঝতে পারল না।

হঠাৎ ঘরের ভেতরে কোথা থেকে একটা দমকা বাতাসের ঝড় এল! প্রবলবেগে কাগজের ওপরে কার্ডবোর্ডটা চলতে লাগলো। কিছুতেই তারা তিনজন সমস্ত শক্তি দিয়েও কার্ডবোর্ডের বেগটা সংযত করতে পারল না।

বাইরে মাধুরীর বুকের রক্ত হিম হয়ে গেছে।

অজয়ের মুখে ভয়ের ছায়া।

গীতার মুখ পাংশু। আর—

বরুণার চোখমুখ কঠিন হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। হাওয়ায় কাঁপা বাঁশপাতার মত থর থর করে কাঁপছে সে। আর মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ বেরোচ্ছে।

অজয় সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠল, আপনি বিদ্যাসাগর হয়ে এরকম করছেন কেন?

—আমি বিদ্যাসাগর নই।

—কে আপনি?

—তা বলব না।

—কেন এসেছেন এখানে? কি চান আপনি—

—আমি সব সময় চেষ্টা করি পৃথিবী থেকে দূরে—বহুদূরে উপরের স্তরে চলে যেতে। কিন্তু সর্বদা ও আমাকে মনে মনে স্মরণ করে। ডাকে। ওর আকর্ষণ আমি কিছুতেই এড়াতে পারি না.....

অদৃশ্য মানুষের সেই মৃদুকণ্ঠ যেন আরও কি বলতে চাইছিল। হঠাৎ টলে পড়ে গেল বরুণা চেয়ার থেকে মাটিতে।

—ঠক্—ঠক্—ঠক্—

দরজার ওপরে প্রচণ্ড ধাক্কা পড়তে সুরু করল। অজয় দরজা খুলল।

—কি হয়েছে?

—বরুণা কি ফিট হয়ে গেছে?

—পানের মত দেখতে এই কার্ডবোর্ডটা কি?

অনেক প্রশ্ন। অনেক কৌতূহল। হেমাঙ্গিনী, মাধুরী, বাড়ির ঝি-চাকর, দু'-একজন ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীর একটি ছোটখাটো জনতা। এদের আড়ালে নবনীকেও দেখা গেল।

হেমাঙ্গিনী সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে খবর পাঠিয়েছিল। ডাক্তারও এসে পড়লেন। পাড়ার সবচেয়ে প্রবীণ ও বিচক্ষণ চিকিৎসক হরিশবাবু। অ্যালোপ্যাথি এবং কবিরাজী দুটোই প্র্যাকটিশ করেন। ফিজিওলজি থেকে সুরু করে মনস্তত্ত্ব ও প্রেততত্ত্ব পর্যন্ত এমন বিষয় নেই যাতে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য নেই।

ডাক্তারকে দেখেই বরুণা উঠে বসল। চোখমুখও বেশ সহজ ও স্বাভাবিক মনে হল। কিন্তু লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারল না।

হাত ধরে বরুণার নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করতে করতে বললেন, হরিশবাবু—খুব ভয় পেয়েছিলে কোন কারণে?

—হ্যাঁ।

বরুণার দিকে আর না তাকিয়ে, টেবিলের ওপরের কার্ডবোর্ডটা আর লেখা কাগজগুলো দেখে বললেন, বুঝতে পেরেছি—সব বুঝতে পেরেছি। এই প্ল্যানচেট নিয়ে মাথা ঘামালে এরকম হবেই। মানুষ পাগল হয়ে যায়—মরে যাওয়াও অসম্ভব নয়—

—বলেন কি ডাক্তারবাবু, মানুষকে পাগল করার জন্য, মেরে ফেলার জন্যই কি অতবড় অধ্যাত্মবাদী মিঃ প্ল্যানচেট আবিষ্কার করেছিলেন এই যন্ত্র, নবনীর গম্ভীর ও কঠোর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল অজয়।

অজয়ের কথা যেন শুনতে পেলেন না হরিশবাবু। গম্ভীর হয়ে কাগজে একটা প্রেসক্রিপশন লিখে বরুণার হাতে দিয়ে বললেন, এই ওষুধ খাবে। সংসারের কাজের ভেতরে নিজেকে ডুবিয়ে রাখবে। আর কখনও কোন আত্মাকে প্ল্যানচেটে ডাকবার চেষ্টা করো না। তোমার হার্ট খুব দুর্বল, বলেই হেমাঙ্গিনীকে ইঙ্গিত করলেন ভেতরে নিয়ে যেতে বরুণাকে।

হেমাঙ্গিনী চিকিৎসকের নির্দেশ পালন করলেন। পাড়া-প্রতিবেশীদের খুবই কৌতূহল ছিল প্ল্যানচেট সম্বন্ধে। কিন্তু তাদেরকেও সরিয়ে দেওয়া হল।

—শোন অজয়, যদিও ডাক্তার, কিন্তু এই স্পিরিচুয়ালিজম কিংবা অকাল্ট সায়েন্স নিয়ে অনেক পড়াশুনা করেছি। বহুকাল থেকে পৃথিবীর দেশে দেশে গবেষণা হচ্ছে মৃত্যুর পরে আত্মার পরিণতি নিয়ে! মৃত্যুর পরেই মরদেহের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও কি ধ্বংস হয়ে যায়? যদি আত্মা থাকে, তাহলে কোথায় থাকে, কেমন করে থাকে, তা নিয়ে অনুসন্ধান চলছে বহুযুগ আগে থেকে। এই বিষয়ে আমাদের দেশ প্রাচীনকাল থেকে অনেক অগ্রসর। ভারতীয় যোগী-ঋষিরা তাঁদের আশ্চর্য শক্তি দিয়ে দূরদর্শন, দূরশ্রবণ অর্থাৎ মৃত মানুষের আত্মার সঙ্গে কথা বলতে পারতেন, দেখতে পর্যন্ত পেতেন, একটু থামলেন হরিশবাবু। কপালের ঘাম মুছলেন। চোখের দৃষ্টি গভীর হয়ে উঠল।

এবার নবনীর নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, বুঝলে নবনী, তোমার সাংখ্য যাকে বলেছে সূক্ষ্মদেহ, প্রেততত্ত্ববিদ ব্যালফোর স্টিউয়ার্ট তাকেই বলেছেন ইথারিক বডি। আত্মাও দেহধারণ করেই ঘুরে বেড়ায় এবং সেই দেহ তৈরি হয় ইথারের তরঙ্গ

দিয়ে। এখন শোন, কেমন করে প্ল্যানচেটের সঙ্গে লাগানো পেন্সিল দিয়ে স্পিরিট তার বক্তব্য লিখে যায়।

প্ল্যানচেটের আবিষ্কর্তা মিঃ প্ল্যানচেট এবং "স্পিরিচুয়ালিজম" গ্রন্থটির লেখক ডক্টর এ্যাসবার্ণসেরও বিশ্বাস, মানুষের দেহের ভেতরে আছে অনেকগুলো গ্যাস। এই সমস্ত গা থেকে, হাত-পায়ের আঙুল থেকে পর্যন্ত অদৃশ্য এই গ্যাস বেরিয়ে দূরে ইথারের ভেতরে, যেখানে সূক্ষ্মদেহী আত্মারা থাকে সেইখানে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

এখন যাঁরা প্ল্যানচেটের বোর্ড ধরবেন, তাঁদের মনযোগ যত বেশি হবে তত বেশি পরিমাণে তাঁদের হাতের আঙুল থেকে গ্যাস বেরোবে। এই নির্গত গ্যাস চুম্বকের মত টেনে আনবে সূক্ষ্মদেহী আত্মাদের। তারা এলেই প্ল্যানচেটের ভেতরে আসে গতি। তাদের উত্তর পেন্সিলে লেখা হয়।

আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করার আরও উপায় আছে। টক টক শব্দ করা, তারাল প্ল্যানচেট আরও অনেক রকম আছে—

বৌদি তো বিয়ের বহু আগে থেকে না-কি এসব করছে। কিন্তু আজ ফিটের মত হচ্ছে কেন বলতে পারেন?

—প্ল্যানচেটের নীচের এই কাগজগুলো দেখে বুঝতে পারছি, বিদ্যাসাগর মশাইয়ের আত্মা আনতে পেরেছিলেন তোমার বৌদি। খুব ভাল মিডিয়াম সে। কিন্তু—

একটু থামলেন হরিশবাবু। নবনীর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, ওর মনের ভেতর নিশ্চয়ই ব্যথার মত খচ খচ করে একজনের কথা। সে পৃথিবীর কাছাকাছির লোকের মানুষ। মহৎ, পুণ্যাত্মা কাউকে ডাকতে চাইলেও বরুণার মনের টানে সে এসে পড়ে। হয়ত আগে এসেছেন যে মহাপুরুষের আত্মা তিনি বড় হন বলেই মিডিয়াম ভীষণ কষ্ট পায়—হরিশবাবু উঠলেন। যেতে যেতে বললেন, তুমি বৌমাকে এসব করতে নিষেধ করো নবনী। এ এক অদ্ভুত সর্বনেশে নেশা। বৌমা নিজেও মরবে। তোমাদেরও মারবে—

—এই এই অজয়কে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে যান ডাক্তারবাবু। এই প্রথম নবনী কথা বলল।

পড়াশুনোর ব্যাঘাত হয়েছে। তাই যেন তাকে একটু রুক্ষ বলে মনে হল। বলল, অজয় আগে এম-এটা ভাল করে দাও। তারপর থিয়োসফির চর্চা করো—

অত্যন্ত রাশভারী মেজাজের মানুষ। তাই তার একটা কথার উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করে চলে যাচ্ছিল অজয়।

—শোন, আজ প্ল্যানচেটে বসতে কে বলেছিল? তুমি না,—তোমার মেজবৌদি?

—না। মেজোবৌদির খুব আপত্তি ছিল আমিই জেদ করে—

কিন্তু বরুণাকে ডেকে একটা কথা বলল না নবনী। প্ল্যানচেট প্রসঙ্গই তুলল না। এমন কি কার কথা তার সব সময় মনে হয়, সে সম্বন্ধে বেন কৌতূহল প্রকাশ করল না।

এতদিন বরুণাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল, বিরক্তি ছিল। এবার তাকে কেন্দ্র করে চাপা একটা ভয় নাসা বাঁধল প্রত্যেকের মনে। মাধুরী যা দু'একটি কথা বলতো, তাও বন্ধ করে দিল। হেমাঙ্গিনী শাশুড়ী হয়েও তাকে ভয়ের চোখে দেখতে লাগল।

—ধর তুই আমাকে আমার গুরুদেবের ওখানে দিয়ে আয়, না হয় ওকে বাপের বাড়ী রেখে আয় বাবা! আমি ওই মেয়ের সঙ্গে থাকতে পারবো না। হেমাঙ্গিনী গোপনে ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করে।

—জীনপরী ভূত নামাতে পারে যে, সে ইচ্ছা করলে আমাকে মেরে ফেলতেও পারে সে তো ডাইনীর মতই—

অজয় চুপ করে শোনে মাধুরীর কথা। ভাবে একটা সাবালকের কথা বলে ওকে বোঝাতে যাওয়া বৃথা।

সকলের অভিযোগ শোনে নবনী। কিন্তু কিছু বলে না, আর—

বরুণা সেদিনের ঘটনার পর থেকে সে ভাবছে ধরণী দ্বিধা হও। এ বাড়ীতে তার অস্তিত্বের জন্য পর্যন্ত সে লজ্জিত। শাশুড়ী ননদের সঙ্গে মিলেমিশে সংসারের কাজকর্ম করা সহজ হতে চাইতো যেটুকু, তাও আর করবে না। করতে পারে না। সে এগিয়ে গেলেই মা ও মেয়ে সভয়ে সরে যায়। এইখানে এই বাড়ীতে এত ঘৃণা আর অবহেলার ভেতরেই তাকে বহুদিন আরও বহুকাল বেঁচে থাকতে হবে। চোখের সামনে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। নিজের জীবন সম্বন্ধে হতাশার অন্ধকার। এই হতাশা থেকেই আসে আবার সেই দুর্নিবার আকর্ষণ। যাকে সে গভীরভাবে ভালবাসত সেই মৃতের আত্মার সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলে তার মনটাকে হাল্কা করার আকর্ষণ।

একদিন কলেজ থেকে ফিরেই নবনী আবার দেখল, তার ঘরটা অন্ধকার। সন্ধ্যায় সব ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে, শুধু তার ঘরটাই অন্ধকারে মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে।

আবার—আবার প্ল্যানচেট করতে সুরু করেছে নিশ্চয়ই। শাশ্বতদর্শনের গবেষকের শান্ত মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। যা কখনো করেনি, তাই করল। সে চিৎকার করে বলল, তুমি করছো কি—আবার তুমি প্ল্যানচেটে নিয়ে বসেছো—

প্রচণ্ড ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে দড়াম করে দরজায় লাথি দিল। কিন্তু দরজা খোলাই ছিল। অত জোর লাথির প্রয়োজন ছিল না। দপ করে আলো জ্বলে উঠল। আলোয় ভেসে গেল ঘর।

সে দেখল, টেবিলে মাথা রেখে শুয়ে রয়েছে বরুণা। তুমি কি—কি বলে তো? মানুষ না আর কিছু? বিয়ের পর একদিনও তুমি আমাকে শান্তি দেও নি, বাড়ীর সবাইকেও অতিষ্ঠ করে তুলেছ, বলেই বন্য উন্মাদের মত প্ল্যানচেটের কার্ডবোর্ডটা মাটিতে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে পিষে ফেলল। টেবিলের একপাশে সযত্নে সাজানো ছিল কতগুলো বই, 'পরলোকের কথা', ব্যালফোরের 'ইনভজবল ওয়ারল্ড,' আস্বার্ণসের 'স্পিরিচুয়ালিজম' আরও এই জাতীয় অনেক বই। এক একটা বই মেঝের ওপরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল।

পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল বরুণা।

মেঝেময় ছড়ানো বইগুলোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল নবনী। একেবারে শান্ত। যেন ঝড়ের পরে অবশ্য।

সে নিজেই অবাক হয়ে গেল। কোথায় থেকে সে পেল এত শক্তি। তার মত শান্ত মানুষ এত ক্ষিপ্ত হলো কি করে। তার মনে হল, বরুণার নিস্পৃহতা, উদাসীনতা, বহু রাত্রির প্রত্যাখান, ওর স্কিজিফ্রেনিয়াই তাকে তিলে তিলে এই শক্তি দিয়েছে। এটা আকস্মিক আবেগ নয়—অন্ধ উন্মত্ততা নয়। এই শক্তির ভেতরে আছে তার অনেক প্রতীক্ষা অনেক সংযম, অনেক নিঃশব্দ প্রস্তুতি। কিন্তু—

ও কী! বরুণা হাসছে মনে হচ্ছে। ও কি ভাবছে থিয়েটার করছে সে। আবার তার মাথায় খুন চেপে গেল। —হাসছো কেন, —কেন হাসছো, কেন—কেন—কেন? বরুণার ঘাড় ধরে ঝাঁকি দিতে লাগল নবনী।

কেন হাসছে কি বলবে। কেমন করে বলবে। একমাত্র ভাই মারা যাওয়ার পর থেকে পাড়ার এক মহিলার কাছে থেকে প্ল্যানচেট করতে শিখেছিল। প্ল্যানচেটের চিন্তা তাকে সবসময় আচ্ছন্ন করে রাখতো। মনে হতো তাকে কে যেন শ্বাসরোধী অন্ধকার কারাগারে বন্দী করে রেখেছে। বিয়ের আগে থেকে, পরেও এই অদৃশ্য কারাগার থেকে সে মুক্তি চেয়েছে। নবনীর এই পাগলের মত প্ল্যানচেট ভেঙ্গে ফেলার ভেতরে সে তার মুক্তির ইঙ্গিত খুঁজে পেয়েছে। তাই—

তাই নবনীকে বিস্মিত করে দিয়ে তার শিশুর মত সরল মুখে ঝরতে লাগলো নিঃশব্দ হাসির ঝরণা, সেই সঙ্গে আচমকা চোখ ফেটে জল এসে পড়ল তার। চোখে জলে ও হাসির আলো-ছায়ায় অন্ধ হয়ে এল বরুণার চোখ॥

বহু অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের সাহায্যে সরকারী, বে-সরকারী ও বহু মার্চেন্ট অফিসের কার্য-পদ্ধতি অবলম্বনে লিখিত

MAN OF BUSINESS

মূল্য ১৷৷০ টাকা

কাজের লোক বা কেরাণী শিক্ষাদর্পণ পাঠ করিলে আর চাকরীর জন্য উমেদারী করিয়া সাহেবের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে না। যাঁহারা অভিজ্ঞ কেরাণী বলিয়া বেতন বৃদ্ধি করিতে চাহেন, তাঁহারা মনোযোগ দিয়া পাঠ করুন, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবেন, কাজের লোক হইবেন।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
বঙ্কিমবিহারী মুখুজ্যে স্ট্রীট, কলি-১২

বাছা কতটুকু জানে

বিষ্ণু দে

তন্বী সে যে! আহা বাছা কতটুকু জানে!
মোহিনীর প্রচ্ছন্ন পাহাড়
হৃদয়ে মন্থিত শিলা। যদি পঞ্চশর তাকে হানে
তাহলে অতনু ভস্ম, চূর্ণ চূর্ণ হাড়
পথের হাওয়ায় উড়বে কিংবা ভিজবে নিজেরই উঠানে।

বৃদ্ধেরা কিই বা জানি নিজেদের?
তন্বী আহা ! কিই বা সে জানে?
অসাড় সত্তার ক্ষমতার দুরন্ত পাহাড়
হৃদয়ে ঘুমন্ত তার, সে যে ভাবে রূপের বিজ্ঞানে
তার মায়া বিশ্বজয়ী, সে যে ঘোরে আগ্নেয় জেদের
স্বপ্নঘোরে, আজও তার ব্যক্তির স্বরূপ আহা ভেঙে গড়ে হাড়॥

কবি লেখেন

দিনেশ দাস

বস্তীর পুরোনো এক টিনের ঘর
মাথার উপর বাঁশের দরমা-আঁটা চাল।
চালার উপর বাস করে রাজ্যের ইঁদুর
নীচে একটা সরু তক্তপোষ
তার নীচে টিনের প্যাঁটরায় বইয়ের গাদা
ফালি তক্তপোষের ওপর একটি টুল রেখে
কবি লেখেন।

দেয়ালে হুকের গায়ে কাপড় ও পাঞ্জাবী ঝোলানো
ঘরের কোণে একটা জলের কুঁজো
কবির পরনে লুঙি
গায়ে গেঞ্জি—কাঁধের ওপরটা ঝাঁঝরা।
সমস্ত সভ্যতার বিদ্রূপ সর্বাঙ্গে মেখে
কবি লিখে চলেন।

রাত্রে টুলের ওপর মোমবাতি জ্বলে
হঠাৎ জ্বলে ওঠে কবির মন একটি শুচিশুভ্র শিখায়ঃ
নরম রাত্রির মৃণালে
যেন আলোর পদ্ম জাগে।
চারিদিকের আঁধারের কালো পাথর বিদীর্ণ ক'রে
যেন শুভ্র স্ফটিক জলের ফোয়ারা ওঠেঃ
সমস্ত পৃথিবীর বিদ্রূপকে ব্যঙ্গ করে
কবি লেখেন।

সোনালী দিনের মন

আশাপূর্ণা দেবী

মেয়ের বিয়ের 'সমাপ্তি অনুষ্ঠান' অষ্টমঙ্গলার পালা সবে কাল চুকেছে, তবু আজই জামাই নেমন্তন্নর দিন নির্বাচনের হিসেব কষতে বসলো অমলা। আপন মনেই হেসে হেসে বললো, 'এক্ষুণি থেকে মেয়ে-জামাইয়ের যা 'ভাবে'র বহর দেখছি, দেরী করা ঠিক হবে না। আজ তো বুধবার, বেস্পতি, শুক্কুর দুটো দিন বাদ দিয়ে সামনের শনিবারেই—'

তারপর ভাবলো, 'শোভনতার একটা চলতি প্রথা আছে, প্রথমবার শুধু একা জামাইকে নেমন্তন্ন করা চলবে না। জামাইয়ের ভাইদেব কবতে হবে।' অমলারা চার বোন, প্রত্যেকটি মেয়ের ব্যাপারেই এ প্রথাটা পালন কবতে দেখেছে মাকে। কাজেই ওটা করা চাই। জামাইয়েব নিজেব ভাই অবিশ্যি একটি, কিন্তু পিসতুতো ভাই আছে দুটি, একই বাড়ি থেকে তাদের বাদ দেওয়াটা ভাল দেখাবে না।

এদিক থেকেও দু'চার জনকে বললে ভাল হয়, বিয়েতে যারা বড্ড খেটেছে, তারা তো ভাল করে খেতেই পাবে নি, তাদের একবাব সামনে বসিযে যত্ন করে না খাওয়ালে, থেকেই যাবে অতৃপ্তি।

দূর কুটুম্ব কেউ নয়, লৌকিকতার সম্বন্ধও নয়, অমলারই নিজের ছোট ভাই, মামাতো একটি দ্যাওর, দুটি ভাগ্নে, এরাই। বাবলির বিয়েতে ওরা ভাল করে খায়নি, অমলার সেটা কম দুঃখু নাকি?

সব মিলিয়ে ধর না দশ বারো জন। চা ছাড়া যেমন তেমন করে সারলেও চলবে না, যার নাম নতুন জামাই নেমন্তন্ন! থাক না থাক দু' সারি বাটি সাজিয়ে সমারোহটা তো দেখাতে হবে?

বারে বারেই অনেকদিন আগে দেখা নতুন জামাই নেমন্তন্নর দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠছিল। সব ছবিই অমলার বাপের বাড়ির দালানেব পটভূমিকায়। এ বাড়িতে নিজের মেয়ের বিয়ের আগে কোনো মেয়ের বিয়ে দেখেনি অমলা। ননদ তা' সুধানন্দর দিদি, আর কোনো ননদের পাট নেই। ভাসুর নেই যে ভাসুরঝি থাকবে।

সে যাক, এই নেমন্তন্নে সুধানন্দর উপর চাপ একটু পড়বে। এই সবে 'ডুব' দিয়ে উঠেছে। কিন্তু কি আর করা। ওই ক'জনকে বলতেই হবে।

কপিজ পেন্সিল নিয়ে রান্নার তালিকা প্রস্তুত করতে বসলো অমলা। শাকভাজা কেউ খায় না তবু শাক দিয়ে সুরু করা নিয়ম। ওতে নাকি পরমায়ু বৃদ্ধি হয়।...যাতে ভাল হয় তা তো দেখতে হবে।

সাঁইত্রিশ বছর মাত্র বয়েস অমলার, তবু মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলে দিব্যি গিন্নী হয়ে উঠেছে আত্মীয় স্বজন সবাই তো ওর শ্বাশুড়ি হওয়া দেখে হেসেই অস্থির। অমলার কিন্তু—

চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ল অমলার। আট বছরের কাবলী ছুটে এল রক্তমুখী হয়ে, 'মা, জামাইবাবু এসেছে।'

'জামাইবাবু!'

মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা আতঙ্কের শিহরণ খেলে গেল অমলার, ওদের বাড়ির আকস্মিক কোনো বিপদ আপদের কথাই মনে এসে ছেল। বিয়ের ঝামেলায় হঠাৎ মায়ের অসুখ-বিসুখ করলো না তো? নাকি বাপেরই? বাবলিকে নিয়ে যেতে এসেছে হয়তো...চিন্তাটা অমলার একটু বেশীই গতিশীল, তাই এ-ও ভেবে ফেললো, যদি ওদের বাড়িতে কোনো বিপদ হয়, নির্ঘাৎ বাবলিকে অপয়া বলবে। এ যুগের লোক সভ্য হয়েছে বলে যতই গৌরব করুক, ওসব বলতে ছাড়বে না। কাবলী আর একবার তাড়া দিয়ে ওঠে 'ও মা!'

অমলা অবশ্য ততক্ষণে উঠে দৌড়তে সুরু করেছে।

কিন্তু দৌড়ে গিয়ে এ দৃশ্য যে দেখতে হবে অমলাকে নীচের তলায় নেমে, তা কি নামবার সময় স্বপ্নেও ভেবেছিল?

থতমত অমলা বসবার ঘরের দরজার কাছে ছেলে পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বড় সোফাটায় বাবলি আর সরোজ বসে আছে গায়ে গা ঠেকিয়ে!

উচ্ছ্বসিত হাসির আলোয় জ্বল জ্বল করছে দুজনেরই মুখ!

অমলার মেয়ে-জামাইয়ের ভাবের বহর অষ্টমঙ্গলাতেই লক্ষ্য করেছে অমলা, তবু এতটা আশা করে নি। তাই থতমত খেলো! জামাইকে বলে কয়ে নেমন্তন্ন করে আনাতে হল না, মেয়েকে ঠেলেঠুলে বরের ঘরে পাঠাতে হল না, নিজেরাই দিব্যি সহজ হয়ে গেল ওরা।

এতে কি অমলার খুব বেশি আহ্লাদ হওয়া উচিত ছিল না? তবু যেন সে সুর বাজল না। অমল্য যেন তার "পর্ট ওয়ান" পড়ুয়া মেয়ের এই নির্লজ্জতার পার্ট দেখে আহত হলো।

এখন কি অমলা সাড়া দিয়ে নিজের আবির্ভাব ঘোষণা কববে? শ্বাশুড়ী অথবা গৃহকর্ত্রী হিসেবে অভ্যর্থনায় তৎপর হবে?

অমলা সেকেলে হতে পারে, বোকা নয়। অমলা নিঃশব্দে সরে এল। কিন্তু মনের মধ্যে সড় সড় একটা অশান্তি অদৃশ্য কাঁটার মত খচ্ খচ্ করতে লাগলো।

সুধানন্দ এখুনি ফিরবে, বাড়ি ঢুকেই বাবলির প্রেমালাপের দৃশ্য দেখবে! ওই প্যাসেজটার মুখোমুখিই তো বসবার ঘর।

আশ্চর্য!

বাবলিরই কি সে কথা একটু মনে পড়ছে না? না কি কাণ্ডজ্ঞান এবং সময়জ্ঞান দুই হারিয়ে ফেলেছে?

কাবলীকে দিয়ে ওদের দরজাটা কি ভেজিয়ে দেওয়াবে অমলা?

ফিরে এসে কাবলীকে দেখতে পাচ্ছিল না, সহসাই চোখে পড়লো মহোৎসাহে সাজ সুরু করেছে কাবলী। বলা বাহুল্য জামাইবাবুই তার লক্ষ্যকেন্দ্র! শুধু সাধারণ একটা ছিটের ফ্রক পরে তো আর জামাইবাবুর সামনে বেরোনো চলে না?

হাসি পাবারই কথা, তবু অমলার রাগ হল। জোরে জোরে বললো, 'শুধু শুধু নাইলনের ফ্রক বাব করে পরেছিস যে? কে দিলে বাব করে?'

কাবলী সেকালের শিশু নয় যে ভয় খাবে, কাবলী সতেজে বলে উঠলো, 'দেবে আবার কে? নিজেই নিয়েছি। আলমারির চাবি তো তোমার সব সময় আলমারিতে লাগানোই থাকে।'

'থাকে বলে খুলবে তুমি?'

কাবলী মার এই তিরস্কাব বাণীতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে আপন মনে পাউডারের কৌটো খুলে ঝেড়ে ঝেড়ে বর করতে থাকে।

অমলার ইচ্ছে করে ঠাশ করে একটা চড় বসিয়ে দেয় ওই অগ্রাহ্যবাজ মেয়েটাকে, কিন্তু তাতে বিপদের আশঙ্কা আছে। সেইটুকুতেই

যে কাবলী স্বর্গ-মর্ত-পাতাল এক করে কান্না জুড়বে, তাতে সন্দেহ নাস্তি।

অতএব নতুন জামাইয়ের কানে উঠবে। জনের বাসনা মনে চেপে খোলা আলমারিটার ভিতরের বন্ধ দ্রুয়ারের চাবি খোলে অমলা। চাকরকে বাজারে পাঠাতে হবে এখুনি, ভাল মিষ্টি নিয়ে আসুক। মিষ্টি আর চা?

একটু ভাবল অমলা। বাজারের নোনতা দেওয়া চলবে না, দিনকাল খারাপ। অথচ হঠাৎ বাড়িতেই বা কি তৈরি করে দেওয়া চলে? ডিম পর্যন্ত বাড়িতে নেই! তবে কি—

আবার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে অমলার। বাবলি এসেছে। সঙ্গে বর। বাবলির মুখ চোখ আনন্দে ছলছল করছে বাবলির কণ্ঠস্বরে সেই ছলাৎ ছলাতের স্পন্দন। কিন্তু সজ্জার লেশমাত্র নেই বাবলির। মাথায় কাপড় নেই, চোখে নম্রতা নেই, আহ্লাদে উছলে ওঠা স্বরে বরের সামনেই মাকে বলে, 'এই দেখো মা কাণ্ড! আগে কিছু বলে নি, হঠাৎ এসে বলছে লাইটহাউসের দুখানা টিকিট কেটেছে—'

অমলা যেন বুঝতে পারে না, অন্যমনস্কের মত গলার স্বরে বলে, 'টিকিট কেটেছে!'

'তাই তো বলছি। বলে কি যেতেই হবে। বলছি কাল আমার উইকলি একজামিন, শুনছে না।'

অমলা তবুও চুপ করে থাকে।

অমলা মেয়ের ওই হাসোলাসো উছলে ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দশদিন আগেও না বাবলি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলছিল, 'সবাই মিলে কী যে করলে তোমরা আমার! পড়া-টড়া বিচ্ছিরি হয়ে যাবে, ক্লাশের মেয়েদের কাছে কিরকম লজ্জা করছে!'

দশদিন আগে ক্লাশের মেয়েদের কাছে লজ্জা করেছিল বাবলির, এখন মার-সমনেও লজ্জা করছে না।

পিছন থেকে বর বলে ওঠে, 'ওঃ উইকলি ভারী তো! একজামিন তো এখন রোজের ব্যাপার! বলুন তো!'

শেষ কথাটা অবশ্য অমলাকেই বলা।

অমলা অগত্যা বলে, 'হ্যাঁ, প্রায় রোজই শুনি—'

'দেরী হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বাবুলি', বর তাড়া দেয়, 'শেষে অন্ধকারে হোঁচট খেতে হবে।'

বাবলি!

অমলা ঘরে বসেই একটা হোঁচট খায়। তবু অমলা অস্ফুটে বলে, 'একটু চা-টা—'

না না, চা লাগবে না—' সরোজ ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'আর দেরী করলে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।'

মানে হয় না?

আর মানেহীন কাজ এ যুগে কেউ করে না। তাই তাড়াতাড়ি নেমে যায় ওরা 'যাচ্ছি' বলে।

অমলা বলতে যাচ্ছিল 'কাপড় বদলাবি না?' বলতে পারল না। বাবলি তো সেজেই বসে ছিল। সর্বদাই থাকে সেজে বরাবর। যে ছিল সবদাহ থাকে সেজে বরাবর। সে অভ্যস আট বছরের কাবলীকেও ধরেছে।

জামাইবাবু কথাই বলল না। নাইলন ফ্রক পরা কাবলী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, দেখে মনটায় দুঃখ হল।

কাবলীকে ওদের সঙ্গে নিল না, আশ্চর্য! ভাবল অমলা, চক্ষুলজ্জা হল না একটু?

কাজটাকে ভারী অসভ্যতা মনে হল অমলার। নতুন বৌদি, নতুন জামাইবাবু, ছোটদের কাছে একটা অলৌকিক বস্তু, তার কাছে কাছে ঘুরে কৃতার্থ হয় ভাবা, এবং কিছুতেই ওদের ওই আরাধ্য দেবতাদের কাছ থেকে নড়ানো যায় না, এটাই চিরদিনের জানা।

আর এও জানা, নতুন বৌদি, নতুন জামাইবাবুও তার মন রাখে। বাড়ির লোকরা যখন বলবে 'আঃ তোরা যে জামাইবাবুকে পাগল করে তুলবি, বেচারাকে একটু ঘুমোতে দে।' তখন জামাইবাবুই বলবে 'না না কিছু করেনি, আমার তো খুব ভালই লাগছে।'

এই সবই জানার জগতের ব্যাপার ছিল অমলার, এইমাত্র বিয়ে হয়েছে, এখুনি এরকম দেখেনি। খুব একটা বিস্ময়ের ধাক্কা খেলো অমলা, নিজেরই মেয়ের কাছে।

নতুন বিয়ের মাধুর্যের আস্বাদ তবে পাবে কখন ওরা, যদি সব নতুনত্ব একদিনেই ঘুচিয়ে বসে?

ধীরে ধীরে উন্মীলিত হবে ভালবাসার কুঁড়ি ধীরে ধীরে উন্মোচিত হবে হৃদয় রহস্য সোনালী রোদের সকাল আস্তে আস্তে উদ্ভাসিত হবে উঠবে উজ্জ্বল প্রখর শুভ্রতায়, এই তো স্বাদ, এই তো আস্বাদ!

স্বাদহীন, আস্বাদহীন অসহিষ্ণু উগ্র উপভোগ কি মুহূর্তে নিঃশেষ করে দেবে না সব রং, সব রহস্য!

অপেক্ষার আবেগের মধ্য দিয়ে, প্রতীক্ষার রোমাঞ্চের মধ্য দিয়ে, সংযমের মধুরতার মধ্য দিয়ে, তিলে তিলে এগিয়ে যাওয়ার যে পথ, সেই তো গভীর আনন্দলোকের পথ।

ঘরের জানলায় শুধু হাতে হাত রেখে বসে থাকার যে অনির্বচনীয় উপলব্ধি, সে উপলব্ধি কি মিলবে হাটের হট্টগোলের মধ্যে?

এ যুগে সে কথা বুঝতে চাইবে না, তবে?

মন দিয়ে মন জানবার, চোখে চোখে শুধু চেয়ে থাকবার, ভালবাসার হাত দিয়ে ভালবাসার হাত ছোঁয়ার ধৈর্য থাকবে না?

স্বর্ণহংসীর গল্প কি ভুলে গেছে এ যুগ? তাই মুদ্রা প্রাপ্তিতে মন ওঠে না ওর? রসে টসটস সোনালী দিনকে হত্যা করে বসে প্রখর সূর্যালোকের আশায়!

একটা নিশ্বাস পড়ল অমলার।

সেই তার বাবলি!

কত সাধ করে কম বয়সে বিয়ে দিয়েছে তার অমলা, তার আর খুশির, লজ্জা আর আনন্দের মধ্যের মাধুর্যে প্রস্ফুটিত হবে বলে।

এ-ঘরে-ওখানে বড় বড় মেয়েদের দেখেছে অমলা বিয়ে হতেই গিন্নী হয়ে যায়, শ্বশুরবাড়ি এসেই বরের পকেট সামলায়, 'বিয়ের আগে এতদিন এত টাকা কী করেছ?' তার হিসেব চায়। দুটো দিনও 'বর-বশ' থাকতে রাজী হয় না ভাবা, কর্তা-গিন্নী হয়ে বসে।

বাবলিরাও আর 'বর-বশ' থাকবে না, কর্তা-গিন্নী হয়ে উঠবে। সেই প্রখর স্পষ্ট লেখা হয়ে গেছে ওদের মুখে।

'মা!'

দরজার কাছে চাকরটা এসে দাঁড়ালো, সুধানন্দর পোর্টফোলিওটা নিয়ে।

বাবুর অফিসের চাপরাশি পৌঁছে দিয়ে গেল, বলে গেল বাবুর ফিরতে রাত হবে।'

ফিরতে রাত হবে। কথাটা নতুন নয়।

মাঝে মাঝে এমন হয় সুধানন্দর। অফিসে মীটিং থাকে। খবর পাঠায়, আর সে খবর পেলেই দুঃখে, অভিমানে চোখে জল এসে যায় অমলার। 'রাত হবে' তার মানে সমস্ত সন্ধ্যাটা ধূসর মরুভূমির চেহারা নেবে। বাড়ির কর্তা সন্ধ্যায় বাড়ি না ফিরলে কী যে ফাঁকা ফাঁকা লাগে!

আজ হঠাৎ কিন্তু খবরটায় ভারী আরাম পেল অমলা। যেন বেঁচে গেল। বেঁচে গেল, এখন থেকে সেই রাত্রির দশটা পর্যন্ত স্বামীর কাছে লজ্জিত হতে হবে না অমলাকে।

হ্যাঁ, লজ্জিত বৈ কি।

বাবলি অমলাকে লজ্জায় ফেলেছে।

কাবলীকে পড়াতে বসাতে ইচ্ছে হল না, দিদি নেই, জামাইবাবুর হৃদয়হীনতা, বাপের অনুপস্থিতির খবর, সবগুলো মিলিয়ে বেচারাকে মনমরা করে দিয়েছে, তাই একটা গল্পের বই ধরে দিল অমলা ওকে।

নিজেও তাই নিল।

কী করবে এই দীর্ঘ সন্ধ্যাটা?

কিন্তু গল্পের বইতে মন বসল না অমলার, সে মন ঘুরে বেড়াতে লাগল অনেকদিন আগের একটা দিনের পৃষ্ঠায়।

মেয়ের বিয়ে দিতে বসে পর্যন্ত নিজের সেই সোনালী দিনগুলোর ছবি বারে বারে ফুটে উঠেছে অমলার মনের সামনে, বারে-বারেই তুলনা এসে গেছে, অমলা লজ্জা পেয়েছে, সে তুলনাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে।

আজ যেন নিজেকে ছেড়ে দিল।

আর অন্তরের কৌটোয় তুলে রাখা অমলার সেই সোনালী দিনগুলো আনন্দ-বেদনা, ভয় সুখ, আবেগে কুণ্ঠা, সবকিছুর দল মেলে দিয়ে জেগে উঠলো।

অমলাকে ভাবতে হবে না, অমলা শুধু দেখবে। অমলার শুধু ঘাড়টা একটু ফিরিয়ে তাকাবার কাজ, সেই অনেকগুলো দিনের সমষ্টি দিয়ে গড়া একখানি 'দিন' আছে ওখানে। হারিয়ে যায় নি, মুছে যায় নি, বিবর্ণ হয়ে যায় নি।

হঠাৎ নিজ মনে একটু হেসে উঠল অমলা, মেয়েটা তা বলে কম পাকা ছিল না। নইলে ওইটুকু বয়সে রূপ দেখে মোহগ্রস্ত হয়?

সেজদির বিয়ের রাত।

চোদ্দ বছরের মেয়েটার ভাগ্যে পিঠোপিঠি দিদির বিয়ে বাবার ভাল একখানা জমিদার

ঢাকাই শাড়ী জুটেছিল, এবং সেইখানা গুছিয়ে পরে, নিজেকে প্রায় পরীর সমগোত্র ভাবছিল, বাইরের আসর থেকে রব উঠল, পান পান।'

সেজদির বিয়ের গৌরবে গর্বিত 'অমলা' নামের ওই মেয়েটা পুরো বিয়েবাড়ির পানের ভারটা নিয়েছিল নিজের হাতে, তাই তাড়াতাড়ি ছুটল পানের থালা হাতে।

মা কাকীমা বলল বটে। 'তুই আবার কেন? বড় হয়েছিস!'

কিন্তু রইল না তাদের কথা।

সঙ্গে সঙ্গে দিদি মেজদি বলে উঠল, থামোবাবু তোমরা! এক্ষুণি থেকে 'বড় হয়েছিস বড় হয়েছিস' বলে পাকা করে তুলো না। আজকাল আর ওকে কেউ বড় বলবে না।'

দিদিদের সমর্থনে থমকে থাকা ঘোড়া আবার ছুটেছিল।

কিন্তু বরযাত্রীদের পান সরবরাহ করতে গিয়ে ঘোড়াটা যেন হরিণীতে পরিণত হল।

বরের কাছ থেকে খানিক তফাতে বসে থাকা একটা ছেলের দিকে তাকিয়ে মোহিত হয়ে গেল অমলা।

'মনের বীণা' বলে একটা কথা গল্প কবিতায় দেখেছে অমলা, বড়রা বারণ করলেও লুকিয়ে উপন্যাস পড়া বন্ধ যায় না, সেই উপন্যাসের মাধ্যমে ওই 'মনের বীণায় ঝঙ্কার ওঠা' গোছের কথাও শেখা হয়ে গেছে কিন্তু নিজের মধ্যে হঠাৎ যে শিহরণ উঠল, সেটার মানে বুঝতে পারল না অমলা, অকারণ একটা ভয়ের অনুভূতিতে বুকের মধ্যেটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠল অমলার, নিজেকে অপরাধী অপরাধী লাগল, আর তাকাতে পারল না সেই অনুপম সুন্দর মুখের দিকে।

কি করে তাকাবে?

বিশ্বসুদ্ধ লোক যে অমলার দিকেই তাকিয়ে আছে, তাতে তো আর সন্দেহ নেই?

নিথর নিথর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাতে থালাটা কয়েকজনের সামনে ধরে, এবং সেই পরম রূপের দিকে মাত্র না গিয়ে ছুটে পালিয়ে এল অমলা।

এখানে বহু সম্পর্কের বৌদিকুল বসে জটলা করছিল। অমলাকে দেখেই বলে উঠল, 'কি-রে বর কেমন দেখলি?'

ধড়াস করে উঠল অমলার ঢাকাই শাড়ীর আঁচলে ঢাকা ছোট্ট বুকটা।

এ ঠাট্টা কবলো কেন বৌদিরা!

বৌদিরা কি উঁকি মেরে দেখছিল অমলার গতিবিধি?

অমলার যেন ওখানে নিজেকে স্বয়ম্বরা সভায় রাজকন্যার মত লাগছিল, সেই লুকনো চিন্তাটুকু কি ধরে ফেলেছে ওরা?

কিন্তু অমলা তো দুবার তাকায় নি!

অমলা তো পানের থালা নিয়ে তার দিকেও যায় নি!

মীরাবৌদি আর একবার ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'কী-রে, পছন্দ হয় নি বুঝি? তাই মন্তব্য নেই! তা' এতো আর তোর বর নয় বাপু, দিদির বর। 'কালো' বলে তোর এত মর্মাহত ভাব কেন?'

অমলা যেন জলের তলা থেকে আস্তে আস্তে ভেসে উঠে।

অমলা যেন অন্ধকার ঘর থেকে আলোর জানালার মুখোমুখি দাঁড়ায়।

সেজদির বরের রূপের প্রশ্ন তুলেছে ওরা, নতুন বিয়ের বরের।

কিন্তু বরের দিকে তাকালো কখন অমলা?

কই দেখে নি তো কোন দিকটায় বর বসেছে? তবু সেজদির যে কালো বর হচ্ছে, এ কথা শুনেছিল মুখে মুখে, সেই শোনাটা কাজে লাগালো।

ঝঙ্কার তুলে বললো, 'মর্মাহত আবার কি? কালোবর বুঝি ভালো?'

বৌদিগুলো অকারণেই হি হি করে হেসে লুটোপুটি খেয়ে বলে উঠলো 'সেরেছে! অমলার বিয়ের সময় তো দেখছি বর-খুঁজতে ভুগতে হবে।'

ওদের ওই হি হি হাসি ভাল লাগলো না অমলার!

অমলা সরে এল।

কিন্তু অমলার মনের বীণার সেই হঠাৎ বেজে উঠা তারটা যেন একেবারে থেমে গেল না। বাজতেই লাগল আস্তে আস্তে মৃদু সুরে।

'ওকে আরবার দেখতে হবে।'

এইটাই ছিল সেই সুরের ভিতরের ভাষা।

দেখতে হবে কে ও?

ও-কি সেজদির বরের বন্ধুদের-একজন, না-কি সেজদির শ্বশুরবাড়ির কেউ?

যথারীতি খাবার জায়গা হয়েছে তিনতলার ছাতে।

অতএব বরযাত্রীদের বাইরের সেই 'আসর থেকে ছাতে উঠতে হবে ভিতরবাড়ির একতলা দোতলা দুটো দালান পার হয়ে অন্তঃপুর বিধ্বস্ত করে।

অমলা বরযাত্রীদের খেতে যাবার অপেক্ষায় রুদ্ধশ্বাসের মুহূর্তে গুণতে লাগল। দু-দুটো দালান দু-দুটো সিঁড়ি পার হয়ে ছাতে উঠবে, নামবে, একবারও দেখতে পাবে না অমলা?

অনেককাল আগের কথা নয়, তবু তখনো অমলার বাপের বাড়িতে বাহির মহল আর অন্দরমহলে ভেদ ছিল, অনাত্মীয় পুরুষদের সামনে মেয়েদের অকারণ বেরোনোয় নিষেধ ছিল, তাই বরযাত্রীদের যখন খেতে ডাকা হল, তখন অমলার ছোটকাকা আগে এসে মেয়েদের সাবধান করে দিয়ে গেলেন।

অমলার কাকীকে ডেকেই বললেন, 'এই এবার বরযাত্রীরা খেতে যাচ্ছে।'

ওই সংবাদটার মধ্যেই যে নিহিত থাকল নিষেধ আর শাসন, সে কথা সংবাদদাতা ভালই জানে, তাই বাহুল্য কিছু বলল না।

কিন্তু অমলা দেখল অমলার থেকে এক-বছরের বড় পিসতুতো দিদি শিউলী দিব্যি ওই চলতি রাস্তারই একাংশে একটা জানলা ঘেঁসে দিব্যি কায়দা করে দাঁড়িয়ে রইল ছোট মামার আদেশ না শুনতে পাওয়ার ভানে।

বরযাত্রীদের দেবার জন্যে যে একহালি বেলফুলের মালার গাদা এসেছিল, তার থেকে একগাছা মালা বাগিয়েছে শিউলী, এবং বেশ লীলাভরে সেই মালাটাকে হাতে জড়াচ্ছে এবং খুলছে।

অতএব—। অতএব কি তা বোঝা যাচ্ছে! কিন্তু শিউলীদি যদি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, অমলাই বা পারবে না কেন?

ঘণ্টাখানেক আগেও যদি এ দৃশ্য দেখত অমলা, বরতে পারত না শিউলীর হৃদয় রহস্য।

কিন্তু এই এক ঘণ্টার মধ্যে অমলার অনেকখানি বয়েস বেড়ে গেছে, তাই অমলা মনে মনে বলে ওঠে, 'বুঝেছি।'

তারপর আপন হৃদয়ে বলসঞ্চয় করে। শিউলীদি যদি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, অমলাই বা পারবে না কেন?

এক ঘণ্টা আগে হলে অমলাই হয়তো এসে শিউলীকে শাসন করতো। 'এই শিউলীদি, শুনতে পেলি না ছোটকা কি বলে গেলেন?'

কিন্তু এখন সে শাসনের দিকে গেল না। এখন অমলা মনে ঠিক করে নিল, ছোটকা দেখতে পেয়ে বকলে বলে দেবে অমলা, 'শিউলীদি তো ছিল।'

কাজেই এখন শিউলীর কাছে এগিয়ে এসে বেশ সিঁড়মুখো হয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠল অমলা, 'মালা কোথায় পেলি রে?'

শিউলী অকারণ রহস্যের হাসি মুখে মেখে উত্তর দেয়, 'পেয়েছি এক জায়গায়।'

ভাবখানা যেন 'দিয়েছে একজন নিষিদ্ধ কেউ।'

হঠাৎ বুকটা হিম হয়ে গেল অমলার, শিউলীদির লক্ষ্যবস্তুও সেই 'সে' নয় তো? ইতিমধ্যেই চেনা হয়ে যায়নি তো? ওর জন্যেই দাঁড়িয়ে নেই তো শিউলীদিটা?

রাগে দুঃখে মনটা ছলছলিয়ে উঠল বেচারী অমলার। মনে হল শিউলী যেন অমলার কোনো একটা প্রিয়বস্তু চুরি করে নিয়ে নিয়েছে।

অমলা কি শিউলীর এই নির্লজ্জতার এখান থেকে সরে যাবে? চলে যাবে নিজের দাবি ছেড়ে দিয়ে?

সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগেই ঘটে গেল ঘটনাটা। সিল্কের পাঞ্জাবী আর আদ্দির পাঞ্জাবী, শান্তিপুরী ধুতি আর কাঁচি ধুতির ঢেউ এসে গেল দালানে।

ঢেউয়ের পর ঢেউ।

মস্ত বড় ছাদ।

শুধু বরযাত্রী নয়, কন্যাযাত্রীদেরও তোলা হচ্ছে।

এই দ্রুত ধাবমান বিপুল জনস্রোতের মধ্যে থেকে খুঁজে পাবে অমলা সেই পরম বাঞ্ছিত মুখটিকে?

কি করে পাবে? পায় না।

অমলা কি অসভ্য শিউলীদিটার মত তাকিয়ে থাকতে পারবে প্যাট প্যাট করে?

অমলা তো শুধু সিঁড়িতে উঠে যাওয়ার পর তাদের পাঞ্জাবির পিঠ দেখতে পাচ্ছে।

ঢেউ শেষ হল।

ফেনাক্ত জলনির মত কয়েকটা মাছের কালিয়া মাখা মালকোঁচা আঁটা ছেলে, ছোলার ডালের বালতি হাতে করে ছুটলো তাদের পিছন পিছন। অতএব আশা নির্মূল হলো।

চোখে জল এল অমলার।

শিউলীর পৃষ্ঠ বলেই যে এখানে দাঁড়াবার সাহস জন্মেছে, ভুলে গেল সে-কথা, মনে হল শিউলীদির সামনে না হলে ভাল করে, তাকিয়ে দেখতে পারতাম!

পারলাম না।

ও পাছে ধরে ফেলে তাই অন্যদিকে চেয়ে রইলাম। সেই অসতর্কতার অবসরে কোথা দিয়ে সবাই চলে গেল।

দলের মধ্যে চেনা মুখও ছিল বৈকি কিন্তর। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়াতে পারল না অমলা, কাকে কাকে দেখেছে।

এইখান দিয়ে যখন উঠেছে, এইখান দিয়েই নামবে! ভাবল অমলা।

দোতলায় দালানে থাকব না—এবার, কোনো ছুতোয় একতলার দালানে দাঁড়াবো। ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে কোনো ছুতো করে ঢুকতে পারলে সব চেয়ে সুবিধে। জানলার সামনে দিয়েই পার হতে হবে সবাইকে। আর অমলা অনায়াসেই বড়দের বলতে পারবে, আটকে পড়েছিলাম, বেরোতে পারিনি। বাবাঃ কী গাদা-গাদা লোক।

যেন অমলার গতিবিধির দিকেই তাকিয়ে আছে সবাই। যেন অমলার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করতেই চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আশ্চর্য, শিউলীদিদির কী সাহস!

কিন্তু কখন নামবে ওরা?

অনন্তকাল ধরে খাচ্ছে কেন?

মেয়েদের দোতলার দুখানা ঘর খালি করে খাওয়ানো হচ্ছে, অমলাকে ডেকে গেল অমলার নন্দা, 'এই পেতনী খেতে বসলি না? এই-বেলা বসে পড়। এরপর আর জুটবে না কিছু। বরযাত্রীরা যা এন্ডার খাচ্ছে, মালাই-কারি তো খতম।'

অমলা সেই খতমের সংবাদেও বিচলিত হল না। অমলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'আহা নেমন্তন্নিদের সঙ্গে বসে যাব আমি। আমি যেন বাড়ির লোক নয়?'

'তবে থাক। বাড়ির লোকের মর্যাদা নিয়ে বসে থাক। এর পর শুধু ছ্যাঁচড়া চিবোস। ওটাই খা বাঁচবে।'

নন্দা চলে গেল।

আর অমলা ভাঁড়ার ঘরে কোন কাজের ছুতো করে ঢোকা যায় তাই ভাবতে লাগল।

প্রথম ভাললাগা, প্রথম চাতুরী! স্মৃতিটা অম্লান রয়ে গেছে আজও।

ভাঁড়ার ঘরের জানলার দিকে তাকিয়ে দেখেনি কেউ, যেমন জলস্রোতের মত এসেছিল, তেমনি জলস্রোতের মতই এগিয়ে গেল।

অমলা ওদের মুখ দেখতে পাচ্ছিল না, শুধু পাশের দিক, অমলার মনে হচ্ছিল পর পর শুধু জামার সারি চলেছে হেঁটে।

তারপর ঘটল এক অভাবনীয় ঘটনা।

প্রায় অলৌকিকের মত।

শেষের সে।

প্রায় হঠাৎই মুখ ফিরিয়ে তাকাল সে।

অমলার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন একটা আলোর প্রবাহ বয়ে গেল। আর অমলার বুকটা সেই তখনকার মতই থরথরিয়ে উঠল। আর তারপর ভয়ে হৃৎপিণ্ডটা যেন হাতুড়ি পিটতে লাগল। কখন শুধু তো ফিরেই তাকায়নি সে, কথা বলে উঠেছিল হেসে হেসে।

বলেছিল, 'এখন পানের ভার কার হাতে?'

অমলার মুখ দিয়ে অবশ্য উত্তর বেরোয় নি। 'সে' রুমাল দিয়ে হাতটা ঘসে ঘসে মুছতে মুছতে বেশ কিছু সময় ব্যয় করছিল, সেই অবসরে আবার বলেছিল, 'আর কারুর হাতে হলেই মুস্কিল, তবু যদি পাবার আশা থাকে—'

অমলার অবশ্য এই বাগ্বৈদগ্ধির মানে বুঝতে দেরী হল না।

অমলা যে পানের থালা নিয়ে ওর দিকেও যায়নি সে কথা তো তার ভুলে যায় নি অমলা। কিন্তু ছেলেটা কি সাংঘাতিক। এত সহজে দিব্যি কথা বলে বসলো?

কিন্তু আর কথা না বললে মান থাকে না তাই যেন বক্ষামেই বলতে হল অমলাকে, 'খাবার আগে পান খেলে খিদে চলে যায়।'

হেসে উঠল ছেলেটা।

বলল, 'ইস! এটা তো জানা ছিল না। তোমার আর কি কি জানা আছে?'

অমলা কি আরো কথা চালাবে না কি? অমলাদের বাড়িতে আর কেউ নেই? কর্তৃপক্ষের শাসন নেই?—অমলার সেই বাচাল-হাসি বৌদিরা নেই? আর অমলার প্রাণে ভয় নেই?

আছে, সবই আছে।

তবু অমলা আরও একটা কথা কয়ে নিল।

বলে ফেলল, 'আর কিছু জানা নেই। আমার দিদিকে কেমন দেখলেন বলুন?'

'তোমার দিদি? চমৎকার! তুমি কনের বোন বুঝি? নিজের বোন?'

অমলা শাড়ী পরে বেড়াচ্ছিল, তবু ছেলেটা অমলাকে 'তুমি'ই বললে। তবে অমলা তাতে চটেও উঠল না।

অমলা সম্মতির ঘাড় নাড়ল।

ও বললো, 'তাই বুঝি? তোমার ওপরেই?'

'হুঁ।'

'ওর নাম তো নির্মলা, তোমার নাম কি?'

অমলার দুর্মতি হল।

অমলা বলে বসলো, 'আমার নাম নেই।'

ছেলেটা হেসে উঠলো।

'নাম নেই? তা হলে 'অনামী' বলে ডাকা যাবে।'

তা 'অনামী' নামে অনেক দিন পর্যন্ত ডেকেছে সে।

বাঁদিও তখন ওই নামকরণ করেই চলে গিয়েছিল।

সামনের কে যেন ডেকেছিল, 'চৌধুরী, তুই আসবি, না ওখানে কোথাও জমে গেলি?',

সেজদির বিয়েতে কি ভোজ খেয়েছিল অমলা?

না, সেদিন খাওয়া হয়নি অমলার। নন্দার কথামত 'সব খতম' হয়ে যাওয়ার জন্যে নয়। সবই ছিল, ছিল না শুধু অমলার খাবার ক্ষমতা।

অমলার গলার কাছ পর্যন্ত যেন বুজে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল।

অমলা অবাক হয়ে ভেবেছিল, এতগুলো লোক থাকতে ওই বা কেন মুখ ফিরিয়ে দেখল?

আর ওই বা কেন কথা বলতে এল?

আরও অন্যে তো পাবতো।

অনেক রাত্রে বিয়ে, অমলা মাকে বলে করে শুয়েছিল, বিয়ের সময় যেন তাকে ডেকে দেন মা। সেজদির বিয়ে দেখবে না সে? বাসরে বসবে না? তবে না কি অনেক রাত্তির হয়ে গেছে, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

মা জাগিয়ে দেননি, মা ভুলে গিয়েছিলেন, একেবারে ভোরবেলা ঘুম ভেঙেছিল অমলার।

সকাল হয়ে গেছে।

সেজদির বাসর দেখা হয়নি অমলার।

কেউ ডেকে দেয়নি তাকে।

সেজদি পর্যন্ত মনে করিয়ে দেয়নি কাউকে। অমলাকে বাদ দিয়েই বাসরের আমোদ সম্পূর্ণ হয়েছে?

অমলার চোদ্দ বছরের জীবনে কখনো এমন নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতার মুখোমুখি হতে হয়নি। বুক ফেটে যাচ্ছিল অমলার।

ঘুমিয়ে যে সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখেছিল অমলা। আর সেই স্বপ্নের আবেশ সারাক্ষণ ছড়িয়ে ছিল ঘুমের মায়া, সেকথা আর মনে পড়ল না। অমলার মনে হলো, তার মত অবহেলিত দুঃখী জীব পৃথিবীতে আর নেই।

কিন্তু শুধুই কি সেজদির বিয়ে দেখতে না পাবার এই মর্মান্তিক কষ্ট?

শুধুই কি জীবনে আর তো কখনো সেজদির বিয়ে দেখা হবে না। এই যন্ত্রণাই মনকে কুরে কুরে খাচ্ছে?

জীবনে তার সঙ্গে হয়তো আর কখনো দেখা হবে না,—এ ইতাশাও কি ছিল না?

যদি অমলা ঘুমিয়ে না পড়তো, যদি অমলা বিয়ে দেখতে বসতো, আর যদি সেই ছেলেটাও সেই বিয়ের আসরে—

এমন কি হতে পারে না?

যদি সে সেজদির শ্বশুরবাড়ির কোনো নিকট আত্মীয় হয়?

যেরকম আত্মীয়ের বিয়ে না দেখলেই চলে না। তাহলে তো থাকতো সে!

কী বোকামীই করল কাল অমলা?

নামটা বললেই বা কি হতো?

নিজের নামটা বলেই সঙ্গে সঙ্গে তো

বলে উঠতে পারতো, আমার নাম [illegible] জেনে নিলেন, নিজেরটা কি শুনি?'

তাহলেই তো জানা হয়ে যেত।

জানা হয়ে গেলে কী পরমার্থ হতো তা ভাবে না অমলা, তার নিজের বোকামীতেই যে জানা হল না, সেইটা ভেবে হায় হায় করতে থাকে প্রাণ।

সেই 'হায় হায়' একহয়ে যায় সেজদির বাসর হারানোর 'হায় হায়'-এর সংগে!

এঘরে এসে প্রায় আছড়ে পড়ল, 'সেজদি, আমায় ডেকে দিতে বললি না?'

তখন বর বাসর থেকে উঠে গিয়েছিল বোধকরি মুখ ধুতে, সেজদি হাঁটুর ওপর মুখ গুঁজে বসেছিল ঘুম ঘুম রাঙা রাঙা চোখে। গতকালকের সেই কনে চন্দন আঁকা আহ্লাদ চাপা উদ্ভাসিত মুখটা এখন যেন অন্য রকম হয়ে গেছে। আর একজনের হয়ে গেছে।

মুখের রংটা তো সমস্ত ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে প্রায় কালোর পর্যায়ে এসে ঠেকেছে।

ভাড়াকরা মখমলের বিছানায় বাসর। পরের বলেই কিছুমাত্র যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেনি কেউ, সেটাকে দলিত মথিত করে মাত্র বর-কনের জায়গাটুকু ছেড়ে গড়া দু-তিন ছোট ছেলে-মেয়ে ঘুমিয়ে আছে। নেহাৎ ছোটদের পাগুলো আবার জুতোমণ্ডিত। বলা বাহুল্য সে জুতো বড়দের জুতোর চাইতে কিছু কম নোংরা নয়।

আর বর-কনের গলার জুঁইয়ের গোড়ে থেকে খসে-পড়া যে ঝরা জুঁইয়ের পাপড়ি দলিত পিষ্ট হয়ে ওই বিছানার উপর পড়েছিল, সেগুলোকেও জুতোর কাদার চাইতে কিছু কম নোংরা লাগছিল না।

হয়তো এই ঠিক।

কনের আজ সকালের মানসিক অবস্থার সংগে এই পটভূমিকাই প্রয়োজন। গতকাল পর্যন্ত সে এবাড়ির মেয়ে ছিল, এদের উৎসবের মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করছিল, তাকে ঘিরেই সমারোহের বন্যা বয়েছিল, তাই তখন আলো ঝলমল ঝকঝকে ঘরটা খাপ খেয়েছিল।

আজ উৎসবের আলো নিভেছে বাঁশী থেমেছে, আজ সেই তার চিরকালের ঘর থেকে বিদায় নিচ্ছে। আজ সে ঘরের কেউ নয়। আজ তার গোত্র বদলেছে, পদবী বদলেছে, দাবী গেছে।

তাকে এবার বিদায় দেবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠেছে তার চিরদিনের আপন জনেরা।

কেঁদে ভাসাবে, তবু বলবে, 'ওরে আর দেরী কিসের? লগ্ন যে উৎরে যাচ্ছে—।'

যাত্রার লগ্ন!

চিরদিনের ঘর থেকে চির-বিদায়ের লগ্ন।

এ যেন মৃত্যুরই একটা পকেট সংস্করণ!

প্রাণ ফেটে যাচ্ছে, তবু ধরে রাখতে চেষ্টা করছি না, চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছি, তবু 'আর একটু থাক' বলছি না।

'গাড়ী এসে বসে আছে, তুমি ওঠ গিয়ে তোমার সেই প্রস্তুত করা রথে!'

এই পরিবেশে বুঝি ওই দলিত ফুল, শুকনো মালাই মানায়।

লানাইতেও তাই বিচ্ছেদের সুর।

'সেজদি' ডাকে সেজদি নির্মলা চোখ তুলে চাইল, কে বলবে এই চোখ দুটোই গত-রাত্রে খুসিতে ঝকঝক করছিল।

এই এক দুঃখের জীবন মেয়েদের।

পৃথিবীর প্রায় সব সমাজেই মেয়েদের এ দুঃখ।

যে মাটিতে জন্মাবে, যার রস আহরণ করে বড় হয়ে উঠবে, সেই মাটি থেকে উপড়ে তুলে নিয়ে যাবে আর একজন। সেখানেও হয়তো সব মিলবে কিন্তু এই বিচ্ছেদের বেদনা কি মিলোবে?

না, মিলোয় না। অতএব দুটো পরিবারের সুখ দুঃখের ভার বইতে হবে, দুটো পরিবারের ভালবাসার ভার বইতে হবে, আর একজনের চোখ থেকে আর একজনকে বিদ্বেষের দৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে হবে।

বাপের বাড়ি আর শ্বশুরবাড়ি।

দুটো সত্তা দিয়ে আগলাতে হবে এই দুটো বাড়িকে।

শ্বশুরবাড়িতে বাপের বাড়ির সমালোচনা অসহ্য, বাপের বাড়িতে শ্বশুরবাড়ির সমালোচনা অসহ্য। অথচ নিন্দে তারা করবেই।

যারা তাদের চিরকালের নিজস্ব জিনিসটাকে 'নিজের' করে নিল, এক কড়া দাবিও রাখতে দিল না, স্বভাবতঃই তাদের উপর আসেই বিরক্তি।

আবার অপর পক্ষে শ্বশুরবাড়ি যখন দেখে আমার ঘরে থেকেও আমার ঘরের বৌটির প্রাণ পড়ে আছে সেই পুরনো ঘরে—তখন বিরক্তি না এসে উপায় নেই।

অথচ মেয়েরা কিছুতেই ছাড়তে পারবে না সেই ঘরের ভালবাসা, যে ঘর তাকে এক দিন সমারোহ করে বিদায় দিয়েছে।

নির্মলার চোখে ভর্ৎসনা।

নির্মলা বিক্ষুব্ধ গলায় বলে উঠল, 'আমি তোকে খুঁজে বেড়াবো?'

'বাঃ কাউকে বলতে পারতিস তো? মাকে এত করে বললাম'—

হঠাৎ কেঁদে ফেলে অমলা।

হয় তো বা সত্যিই দিদির বিয়ের বাসর দেখতে না পারার লোকসানেই।

নির্মলাও সংগে সংগে কেঁদে ফেলে। আবার দুইবোন অতঃপর পাছে কেউ ঘরে এসে কান্না দেখে ফেলে, তাই তাড়াতাড়ি চোখ মুছে নেয়।

সেজদি বলল, 'আমার কাজগুলো করিস।'

অমলা মাথা না হেলিয়ে এবং কথা না বলেও সম্মতি দিল।

সেজদি বলল, 'সবাই যেন কাল ওখানে যায়।'

অমলা শুকনো গলায় বলল, 'ওরা নেমন্তন্ন করেছে?'

'ওমা, করবে না কি?'

অকৃতজ্ঞ অমলার মনটা আবার দুলে উঠল। দিদির নতুন শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দিদিকে দেখবার আশায় নয়। আর এক সম্ভাবনায়।

এবাড়িতে যদি এসেছে, ওবাড়িতেও নিশ্চয় আসবে সে।

সেজদি আর একবার বলল, 'বাবার পানে চুন বেশি দিয়ে ফেলিস নি।'

অমলা মাথা নাড়লো। শান্ত মুখে।

অথচ এই পানে চুন বেশির কথায় একদিন লাঠালাঠি হয়ে গিয়েছিল সেজদির সংগে। অমলা পান সেজেছিল। বাবার জিভ পুড়ে গিয়েছিল চুনে, সেজদি বলেছিল, 'যেমন অগ্রাহ্য করে করবে! খালি খেলায় মন।'

ব্যস।

হয়ে গিয়েছিল।

সেজদির একমুঠো চুল উঠে এসেছিল অমলার হাতে।

সেজদিকে চেঁচিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল জীবনে আর কক্ষণো ওকথা বলবে না। অথচ আজ আবার বলে ফেলল।

এরপর সেজদি ঈষৎ কৌতূহলের সংগে বলল, 'কেমন দেখলি?'

অর্থাৎ 'বর কেমন দেখলি?'

নির্মলার কাছে অমলার মতামতের মূল্য আছে। অমলা মাত্র চোদ্দ বছরের হলে কি হবে, নির্মলাও তো সাড়ে পনেরো।

নির্মলার প্রশ্নে অমলা বলে উঠল, 'দেখলাম আবার কখন? ঘুমিয়েই মরলাম তো!'

'ওমা সে কি!' সেজদি বলে উঠলে এসেছে তো রাত আটটায়। তখন থেকে ঘুমোচ্ছিলি তুই?'

অমলা হঠাৎ চোখে সর্ষেফুল দেখে। সত্যি রাত আটটা থেকে কী করছিল সে? নতুন জামাইবাবুর সংগে ভাব জমাবার চেষ্টাতো করেনি? নতুন জামাইবাবু নামক একটা জীব যে এসেছে তাদের বাড়িতে, তাই কি খেয়াল করেছে?

কিন্তু শুধুই কি জামাইবাবু?

গত কাল কত কত লোকইতো এসেছিল। এসেছিল মামাতো বোনেরা, পাড়ার বন্ধুরা। আত্মীয়-স্বজন কত জনেরা।

কাকেই বা ভাল করে দেখেছে অমলা?

দেখেছে সবাইকেই যেন ভাসাভাসা, আবছা আবছা।

অমলার সারা মন একাগ্র হয়ে থেকেছে নতুন এক উন্মাদনায়। অমলা এখন অবশ্য সে কথা বলল না। বলল, 'যা ভীড়, যা গোলমাল! উঃ!'

সেজদির বিয়ের পর বেশীদিন যায় নি, হঠাৎ আবার একদিন হৃদ্‌পিণ্ডে হাতুড়ি পড়ল অমলার। শুনলো তারও বিয়ের কথা উঠে পড়েছে। উঠিয়েছে সেজদিই।

তার নাকি চমৎকার সুন্দর একটি দূর-সম্পর্কের দ্যাওর আছে, আর তারা নাকি ছেলের বিয়ে দেবার জন্যে প্রস্তুত।

অমলার মা উৎফুল্ল হয়ে বললেন অমলার বাবাকে, 'এমন পাত্তর সহজে পাবে না তুমি। আর তারা সামনের শ্রাবণেই দিতে প্রস্তুত—'

শেষাংশ ১১১ পৃষ্ঠায়

আমার চিঠিটা পেয়ে খুব অবাক হয়েছ তাই না? আমাদের এই অজ পাড়াগাঁয় তোমার পূর্বপুরুষের নোনাধরা ক্ষয়িষ্ণু ভিটেয় বসে দেখছি দিব্যচক্ষে। আমার চিঠিখানা তোমার হাতেই ধরা আছে। বিস্ফারিত চোখে দু'তিনবার আমার শ্রীহস্তের লেখাটা পড়ার পরও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি তোমার চোখমুখ থেকে। যে কলকাতা আমার ধ্যানের, আমার স্বপ্নের অমরাবতী সেখানে আমি যেতে চাই না স্পষ্টাক্ষরে লেখা এই কথা কয়টি পড়ে তুমি যেন বিশ্বাসই করতে পারছ না।

সত্যি কথাই তো! বিশ্বাস করবে কি করে? তোমার কাছে আমার কলকাতায় যাবার আবেদন নিবেদন এতকাল বৃথাই মাথা খুঁড়ে মরেছে। আমি পাগলের মত বায়না ধরেছি কলকাতায় যাবার।

তুমি বিরক্ত হয়ে বলেছ একদিন—কি আছে বলো তো কলকাতায়? কি এমন আকর্ষণ তোমার? কে আছে সেখানে?

আমি তোমার কথার ইঙ্গিত ধরে জবাব দিয়েছি হাসিমুখেই অত্যন্ত ধীরস্থির ভাবে —আমার মন। আমার মনটাই যে পড়ে আছে কলকাতায়!

তোমার মুখ থেকে উবে গেছে বিরক্তি। আমাকে পরীক্ষা করার কৌতূহলটা উঁকি দিয়েছে তোমার চোখেমুখে।—তোমার মনের যে উপায় নেই কলকাতা ছাড়া! দেহটাকে বাঁচাবার জন্য তোমার মনরূপী আমাকে থাকতেই হয় যে!

—তাহলে কায়াটাও যাক্! তুমি আমাকে খেতে দিও না, শুধু আমাকে থাকতে দিও কলকাতায়! আমি বেড়াব, সিনেমা দেখব তাতেই বেঁচে থাকব সশরীরে।

কৌতুক ছেড়ে বাস্তবে নেমে এসেছ তুমি। কলকাতার বিভীষিকাময় বর্ণনায় তোমার রসনা ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে—বামে! কলকাতায় মানুষ থাকে। অফিসে যাও ট্রাম-বাসে বাদুড় ঝোলা অবস্থায় প্রাণটুকু হাতে নিয়ে। বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত বলা যায় না কোথায় কখন বাস উল্টে বা চাপা পড়ে মরে থাকি! তার ওপর চাল নেই তেল নেই, জল নেই, যা আছে তার দাম আকাশছোঁয়া! সব ভেজাল, ভেজালে ভরা কলকাতা। বর্ষা নামলে সাঁতরে কেটে অফিসে যাও! এই তো অবস্থা তোমার স্বপ্নের নগরীর! এখানে তুমি যেতে চাও! —হাঁ, চাই! ওর মধ্যেই বাঁচার মন্ত্র আছে! তুমি শুধু একটা দিকই দেখেছ! অন্য দিকও আছে! অজস্র মেয়েপুরুষ ওখানে কাজ করছে, বাঁচার জন্য লড়ছে! হাসছে, জীবনকে ভোগ করছে! পড়ে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে—

এত সব ভাল ভাল কথা শুনে তুমি ঘাবড়েই গিয়েছিলে। বই পড়া মুখস্ত করা বুলি নিশ্চয়ই!

সত্যিই কলকাতা কি তুমি সেবারে না নিয়ে গেলে চিনতাম না! ঐ কলকাতা যেমন গড়তে পারে, ভাঙতেও সে তেমনি ওস্তাদ। তোমাকেই সে ভেঙে গড়েছে। ওখানে গিয়েই তো চিনলাম তোমাকে ভাল করে! দেখলাম ফাঁকির জৌলুসে সে তোমার মত কত অজস্র মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, ভুলিয়ে দেয় ফেলে আসা জীবনকে। সতেজ মনটাকেও তার ছাঁচে ফেলে জন্ম দেয় নতুন মানুষের!

তাই তো তুমি খুঁজে পাও না আমার চিঠিতে কলকাতায় না যাবার কারণ। খুঁজে তুমি পাবেও না। আমার মনের লেখা তো পড়তে পার না তুমি! একদিন হয়তো পারতে!

তাই তুমি অকারণেই খুঁজে মরলে সারা শহরে! ঘুরে বেড়ালে, অফিস করলে। অফিস থেকে ফেরার পথে সিনেমা-পাড়ায় সুবেশা তরুণীদের মধ্যে খুঁজে দেখতে চাইলে। সেখানে তুমি আমাকে পাবে কোথায়? তারা খুশীর আবেগে লঘুপক্ষ বিহঙ্গের মত উড়ে চলেছে সিনেমা হলের দিকে টিকিট না পাওয়ার ভয়ে। তুমি চেষ্টা করলে তাদের মুখের লেখা পড়তে! সেখানে তো কলকাতায় যাবার কথা লেখা! সাফল্য আর আনন্দের ঝরণাধারার কলকল শব্দ আর হাসির ফোয়ারা সেখানে। কলকাতায় যাওয়ার স্বপক্ষের বিচিত্র রঙ সেখানে। না যাওয়ার যুক্তি কোথায়।

খুঁজে পেলে না। আমার কলকাতায় না যাওয়ার কারণ। তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেও হদিস পেলে না কলকাতা কেন বিষিয়ে উঠল আমার চোখে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে চেষ্টা করলে। আমার অঙ্গে তোমার কল্পনার তুলি বুলিয়ে অনেক রং লাগালে। তোমার প্রয়োজনমত সৃষ্টি করলে আমাকে ঐ অপ্সরাদের মত করে। ওদের বিলোল কটাক্ষ আমার চোখের কোণে আবিষ্কার করলে, ওদের মিষ্টি হাসি আমার শুকনো বিবর্ণ অধরে দিলে গুঁজে আর সেই হাসিতে ঝরে পড়ল সপ্তসুরের মূর্ছনা।

অতএব এমন একজন মর্ম সঙ্গিনীকে তোমার নর্ম সঙ্গিনী করে কাছে নিয়ে এলে। রূপ রস গন্ধ স্পর্শে তোমার চিত্তলোকের বিচিত্র আনন্দধারার উৎসমুখ খুলে বিভোর হয়ে রইলে। স্বর্গলোকের সৃষ্ট তোমার কল্পনায় মেনকার আসনে বসালে আমাকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হল আমার উপস্থিতির। আমার না আসার বদলে আসার কারণগুলো তোমার কাছে হয়ে উঠল জীবন্ত।

আশ্চর্য! ঠিক যেখানে তুমি খুঁজে পেলে না আমার না আসার কারণ আমি সেখানেই পেয়েছি আমার মনের কথা। ঐ আপাতঃ অনন্ত যৌবনা কলকাতাতেই পেয়েছি আমার না যাওয়ার কারণ। ঐ হাসি আর আনন্দের স্বর্গে কয়েক দিনের জন্য গিয়ে এই গ্রামের নরকবাস শ্রেয়তর মনে হয়েছে আবার।

তাই তোমার চিঠিখানা খুলে বসেছি আমি। তোমার চিঠির সুন্দর ভাষার সঙ্গে একদিন কলকাতায় আমাকে নিয়ে তুমি যে বিব্রত হয়েছিলে তার মিল খোঁজার চেষ্টা করছি। যার কল্পনা শক্তি এত, যার বুকের মধ্যে এমন প্রাণঢালা ভালবাসা সে মানুষ কলকাতায় আমাকে কাছে পেয়ে এমন শুকিয়ে উঠেছিল কেমন করে? সেই মানুষটাই কি লিখেছে এই প্রেমপত্র যার স্ত্রীকে কাছে পেলে প্রেম উবে যায়! তোমার পত্র পড়তে পড়তে সত্যিই হাসি পাচ্ছে। মেলাতে পারছি না তোমাকে। তুমি লিখেছঃ পাশে তুমি নেই কেউ নেই। এই ভয়ঙ্কর নির্জনতা আমাকে গ্রাস করছে একটু একটু করে। আমার এ নিঃসঙ্গতা কাটাতে তুমি যদি পাশে থাকতে কি ভালই যে হোতো! শ্রাবণের এই ঝর ঝর বারিধারা আমাকে ঘুম-পাড়ানি গান গেয়ে তোমার কোলে ঠাঁই দিত।

কি সুন্দর তোমার এই চিঠি। বিয়ের ঠিক পরেই সেই মধুময় দিনেও এমন চিঠি পাইনি যা দীর্ঘ দশ বছর পরে লিখেছ।

ইচ্ছামৃত্যু

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

এখন নির্জন রাত্রে পড়ছি। আমার সারাদিনের কর্মব্যস্ততায় অবসর কোথায়! রাত্রে ছেলেমেয়ে ঘুমালে তোমার চিঠি নিয়ে বসি। পড়তে পড়তে তোমাকে চোখের সুমুখে দেখি। দেখি দুটো মানুষ তোমার মধ্যে ঘুমিয়ে। একজন দূর থেকে স্বপ্ন দেখে আমাকে রূপকথার রাজকন্যার আসনে বসায়। আবার কাছে পেলে বিগত-যৌবনা নখদন্তহীন স্থবিরের আসনে বসিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়।

সত্যি, এমন দুজন মানুষ কেমন শান্ত হয়ে পরস্পর বাস করে একই দেহের মধ্যে বলতো! তোমার প্রেমময় মূর্তির মধ্যে আমাকে দেখতে পায়, না এমন একজন মানুষও উঁকি দেয়! তাকে তুমি চেন না। আমি চিনি, খুব বেশী করে চিনি। কলকাতায় তুমি সেবারে না নিয়ে গেলে চিনতাম না।

কি ভালই যে লাগছিল তখন। তোমার সঙ্গ প্রথম সেই আমার বাইরে যাওয়া। কখনে

বাজছিল আমার জলতরঙ্গের সুর। হঠাৎ সুরভঙ্গ হল তোমার সরব গর্জনে। চোখে দেখলাম তোমার ক্রোধের আগুন। ছেলের প্রতি বিরক্তিতে।—বার বার তাকে কিনে দিতে হবে যা দেখবে? অসুখ করবে না এই সব বাজে জিনিস খেলে?

—তুমি কিনে দিচ্ছ কেন—আমি তখনও স্বামীসঙ্গ সুখে বিভোর। দেখছিলাম বাপ ছেলেকে পাশাপাশি। একজনের আবদার আরেক জনের মনে কৃত্রিম ক্রোধ সৃষ্টি করলে কেমন সুন্দর লাগে।

—দেবু না, বাড়ি থেকে খেয়েই এল না। এমন জেদ ঐ ছেলের। আদর দিয়ে দিয়ে যে কি সর্বনাশ করেছ—

তখনও তোমার সে মানুষের পরিচয় মেলেনি। একটু একটু করে সে দেখা দিল। একদিন বাসে করে নিয়ে যাচ্ছিলে হাসপাতালে। কত মানুষই তো স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে গল্প করতে করতে হাসিখুশীর ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ তুলে চলেছে। তুমি আমাকে বসিয়েছ মেয়েদের সিটের গাদাগাদির মধ্যে। আর তুমি বসেছ ও মাথার ড্রাইভারের পিছনে। তোমাকে দেখাও যাচ্ছিল না যদিও চেষ্টা করেছি আমি বার বার। আমার ইচ্ছা ছিল তুমি পাশে বসিয়ে কলকাতার রাস্তার দু-পাশের দর্শনীয় জিনিসগুলো আমায় দেখাবে। হায় আমার আশা!

আর একদিন বাড়ি থেকে বের হবার সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে আমার সাজপোশাক আর প্রসাধন। দেখে তোমার ভ্রূযুগল কুঁচকে উঠল বিরক্তিতে। বলেই ফেললে—সং-এর মত সেজেছ রাস্তায় লোক তোমায় দেখলে হাসবে যে—কেন? ঘোমটা দিয়েছি বলে?

—না, না, এই বাজে শাড়ি আজকাল পরে কেউ?

শাড়ি পাল্টাবার সময় নেই তখন আর। এই শাড়ি তুমিই কিনে দিয়েছিলে পছন্দ করে দু বছর আগে। এর মধ্যে সে বিশ্রী হয়ে গেল। ভাবছিলাম কি দ্রুত তোমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে, দেখেছিলাম আড়চোখে পথে যেতে যেতে অন্য আধুনিকাদের সঙ্গে তুলনা করে দেখছ আমাকে তুমি বার বার। একবার সেদিকে চাও আর একবার আমার দিকে। তাদের বেশী বা আধুনিক নতুন ঢং-এর খোঁপার দিকে চেয়ে আমার পুরানো রীতিতে বাঁধা চুলের বোঝার ভার তোমার মুখটাকে ভারী করে তুলেছে দেখলাম।

আরও স্পষ্ট ধরা পড়ল সিনেমার গিয়ে। তোমার পাশে বসে আমি। আড়াই ঘণ্টা বসেছিলাম তোমার পাশে। কয়েকবার মুখ তুলে চেয়েছি। দেখেছি তুমি আমার কাছে নেই। তুমি যেন অনেক দূরে বসে আছ। তোমাকে স্পর্শ করেছি, তোমার হাতের ওপর রেখেছি হাত। তুমি নিষ্প্রাণ কাঠের মত বসে থেকে শেষে সরিয়ে দিয়েছ আমার হাতটা।

—চল, চা খাই গিয়ে রেস্টুরেন্টে! মুখ ফুটে নিজেই বলেছি যদিও ভেবেছিলাম তুমি আপনা থেকে একথা বলবে।

—না, বাড়ি যাই চল, মা ভিড়।

তুমি আমাকে চিনতে চাওনি। আড়াই ঘণ্টা তোমার পাশে বসে তোমার প্রিয়তমা। চিঠিতে নিত্য নূতন সম্বোধনে যাকে উদ্দেশ করে কাব্য করতে সেই আমি তোমার পাশে। তুমি একবার চেয়েও দেখনি আমাকে। এক-জন অপরিচিতা মহিলা পাশে বসে সিনেমা দেখলে অজানা গুরুর যেমন ভাব দেখায় ঠিক তাই। আমি তোমার কানের কাছে মুখ নিয়ে শুধিয়েছি—কেমন দেখছ। খুব সুন্দর নয়? গুরুগম্ভীর জবাব দিয়েছ—হুঁ।

সিনেমা হলের বাইরে এসে কিন্তু তুমি অন্য মানুষ। তোমার চোখের দৃষ্টি খুব সজাগ। আমি পাশে আছি বলেই তুমি চেয়ে চেয়ে দেখেছ অন্য মেয়েদের। তাদের দিকে আকুল দৃষ্টিতে চেয়েছ। কি ব্যাকুল তৃষ্ণা তোমার। যেন আমার বদলে পাশে বেশবাসে পরিপাটি ঐ আধুনিকাদের একজন থাকলে কি ভালই না হোতো। এমন কি পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ বছরের বুড়িটা যেভাবে বিয়ের কনের মত সেজে এসেছে তার দিকেও তুমি চেয়ে চেয়ে আমার সঙ্গে তুলনা করতে চেয়েছ।

না বাপু! আমার দরকার নেই। পঞ্চাশ বছরের ঐ বুড়ীর মত বগলকাটা ব্লাউজ পরে অতি আধুনিকা হবার সখ আমার নেই। আর ঐরূপে তোমায় ভোলাব না।

ওর চেয়ে এ আমি ভালই আছি। তুমি মাসে মাসে একবার করে বাড়ি আসবে। আমি থাকবো তোমার প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে। তুমিও সারা মাস ধরে শুধু চোখের দেখায় ক্লান্ত হয়ে যখন তোমার স্বপনচারিণীকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে না পেয়ে আমাকে চাইবে কাছে পেতে, তখন তোমার মাসান্তিক ব্যাকুল বাহুবন্ধনের মধ্যে ধরা দেব আমি। রাত্রির শেষ ট্রেণে ফেরা ক্লান্ত তোমার মন জুড়ে থাকব আমি একটি রাত্রির জন্য। সেই আমার ভাল।

সত্যি কি দরকার বলতো। কলকাতায় তোমার কাছে থেকেও থাকব তোমার মনের নাগালের বাইরে। তোমার মুখ থেকে উবে যাবে হাসি আর আনন্দ। তুমি বার বার শোনাবে আমাকে বিপুল খরচের কথা। কাছে থেকেও আমি থাকব তোমার থেকে দূরে।

দরকার কি! এই তো বেশ আছি। দূরে আছি বলেই তো তোমার আমি প্রিয়তমা। দূরে আছি বলেই তো আমার প্রশস্তিতে ভরা চিঠি আসে। দূরে আছি বলেই তো আমি চিঠির মাধ্যমে তোমার মনের মধ্যে নিশ্চিন্তে থাকতে পারি।

দরকার নেই আমার শহরের আলো হাসি গান। দরকার নেই শুধু তোমার নির্বাক গম্ভীর কায়াটাকে আমার আশে পাশে ঘুরতে দেখে।

এর চেয়ে এই দূর পল্লীর ভেঙে-পড়া তোমার পৈতৃক ভিটার অন্ধকার ঘরও ভাল। তোমার এই ঘরের চারপাশের জঙ্গলগুলো বড় হতে হতে তোমার ঘরটাকে অক্টোপাশের মত চেপে ধরতে চাইছে। তাইতো সন্ধ্যা নামার অনেক আগে তোমার ঘরে নেমে আসে আঁধার। তখন এই অন্ধকার যেন আমার টুঁটি টিপে ধরতে আসে। ছেলেমেয়ে তখনও খেলা থেকে ফেরে না। আমি একা একতলা এই বাড়িটায়। নিঃসঙ্গতায় তখন মরে যাই যেন।

তবু ভাল। মাসান্তে একবার দেখব তোমার হাসিমুখ। একটুখানি সোহাগ। সব সময় তোমার কাছে থেকে গম্ভীর মুখ দেখার চেয়ে এ আমার ক্ষণিকের সুখ অনেক বেশী ভাল। এ ছাড়া কাছে থাকলে যে পাব না সেই কাব্যময় চিঠি। তোমার ঐ মিষ্টি কথায় ভরা চিঠির লোভ কি কম নাকি?

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক
বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধরণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরাম-চন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড দুই টাকা, ২য় খণ্ড দুই টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

ভারত দর্শন

সাধনা ও সমন্বয়

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সাধনা, সাধক শব্দগুলি আমরা নিত্যই ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু কিসের সাধনা, কোন্ পথের সাধক? সাধারণত ধর্ম ও ঈশ্বর প্রসঙ্গেই এ দুটি বাক্য প্রয়োগ করা হয়। তখন তাদের ব্যবহার বা অর্থ হয় লৌকিক। কিন্তু যখন একটি বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যবস্তুর একাগ্রচিত্তে অনুসরণ বোঝায়, তখন সাধনার অর্থ হয় বাঙ্ময়। রাজনীতির ক্ষেত্রে সাধনা কথাটির ব্যবহার করতে আমরা কিছু দ্বিধাগ্রস্ত হই এবং সেই সংকোচ ও সংশয়ের পিছনে ন্যায্য কারণ আছে,—যথা কূটনীতির প্রয়োগ, সাময়িক সুবিধাবাদ, নৈতিক মনোবলের অভাব ও বাস্তব জ্ঞানের প্রাধান্য। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রেও আদর্শনিষ্ঠ, সত্য-সাধক চরিত্র বিরল নয়। প্রমাণ—এব্রাহাম লিঙ্কন, গান্ধীজী এবং সাম্প্রতিক কালের মধ্যে পণ্ডিত নেহরু। এঁদের কর্মনিষ্ঠা, মনের ও চরিত্রের ঋজুতা, সর্বোপরি মানবাদর্শের উপর আস্থা ও শ্রদ্ধাকে সাধনা ছাড়া আর কি নামে অভিহিত করা যায়! এক কথায় বলা চলে—যাঁরা একটি কোনও মহৎ আদর্শকে কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করেন, অনুসরণ করেন; যার জন্য তাঁরা স্বার্থিকার-প্রমত্ত হন না, নির্ভীক হৃদয়ে প্রতিকূল এমন কি সঙ্কট অবস্থার মধ্য দিয়েও অগ্রসর হতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না, তাঁরাই সাধক।

ভারতে, বাহির বিশ্বে, এই ধরনের সাধক জন্মেছেন ও কাজ করে গেছেন। কেউ সিদ্ধ, কেউ বা ব্যর্থকাম। কিন্তু সিদ্ধির মাত্রার উপর সাধনার মহত্ত্ব নির্ভর করে না, যদিও জগতের মানুষ সাধারণত লব্ধ কীর্তি আর প্রাপ্ত কৃতিত্বকেই বড় করে দেখে। যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ীর কাল থেকে সুরু করে মধ্যযুগের সেন্ট ফ্রান্সিস অ্যাসিসিনারোলা, শ্রীচৈতন্য, কবীর, আবার বর্তমান যুগের রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, টলস্টয়, গান্ধীজির সাধনা কি সমপর্যায়ের, সিদ্ধি সমস্তরের? মাপকাঠি আর ফিতের সাহায্যে সাধনার গভীরত্ব বা বিপুলতাকে যাচাই করা যায় না। কারণ যেটা করা হল, পাওয়া গেল, সেটা নিশ্চয়ই বড় জিনিস। কিন্তু যেটার সম্যক্ উপলব্ধি হল না, নাগালের বাইরে রয়ে গেল, সেটা বিফল ব্যর্থ বলে বাতিল করে দেওয়া যাবে কি? জ্ঞান কর্ম যে-কোনো বড় আদর্শ বা উদ্দেশ্যকে বোঝার ও পাওয়ার জন্য আপ্রাণ ও নিরন্তর প্রচেষ্টা কি কোনও অংশে কম মহৎ, মানবাত্মার স্ফুরণ উৎসরণ হিসেবে কি কম মূল্যবান?

স্বামী বিবেকানন্দের দেহান্তকালে তাঁর চল্লিশ বছরও পূর্ণ হয় নি। কিন্তু ঐ সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি কি না করে গেলেন? দেশে-

শ্রীরামকৃষ্ণ

বিদেশে তাঁর বিস্ময়কর প্রচার-কর্মের সাফল্য ও তাঁর ব্যক্তিগত সম্মান-সমাদরের কথা বলছি না। তিনি কত কি ভেবেছিলেন, 'ভাববার কথায় যে সব সমস্যার কথা বলেছিলেন সমাধানের উপায় চিন্তা করেছিলেন, কন্যা-কুমারীর কাছে নির্জন স্বীপে বসে যে ভারত-স্বপ্ন তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তার মহিমা ব্যক্ত করেছিলেন, নির্ভীক কণ্ঠে জনপ্রিয়তার খাতির না করে স্বদেশ ও বিদেশকে যে কঠোর ও অপ্রিয় সত্য শুনিয়েছিলেন,—এ সব তাঁর কীর্তির চেয়েও মহৎ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা স্মরণ করা যাক। যা চেয়েছিলেন, তা কি পেয়েছিলেন? এক হিসেবে তাঁর জীবন তো ট্র্যাজিক। যাদের ভালো তিনি করতে গেছেন, তাদের কাছেই তিনি আঘাত খেয়েছেন। যে কর্মসূচী তিনি নৈতিক দায়িত্ব, দেশের কল্যাণের জন্য অবশ্য-কর্তব্য বলে পালন করতে গেছেন, সে সব জায়গায় তিনি অনুরূপ সফল হতে পারেন নি। কিন্তু নীতি,

বিদ্যাসাগর

আদর্শ বর্জন করেছিলেন কি? শত বাধা অগ্রাহ্য করেছেন, জিদ ছাড়েন নি। কিসের প্রেরণায় তিনি বিদ্যাসাগর হতে পেরেছিলেন? ঐটেই তাঁর সাধনা, এক কথায় মনুষ্যত্ব। ভারতের ও পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বিভিন্ন মার্গে বিভিন্ন মতের নীতির ও আদর্শের তন্ময় সাধনা দেখা যাবে। একাধিক কবি, শিল্পী, কর্মীর জীবন-নায়ন তারই উজ্জ্বল ভাষ্য। তবে ঐ আঁকড়ে থাকা, ঐ নিষ্ঠা ও ধ্যানসর্বস্বতাই হচ্ছে মূল কথা। কৃতের চেয়ে অ-কৃত, লব্ধের চেয়ে চেষ্টিত আরও বড় জিনিস, যদিও পৃথিবীতে নগদ-বিদায়ের কদরটাই বেশী।

সাধন কথাটির প্রাকৃত অর্থ ছিল অন্য। কিন্তু সিদ্ধির উপায় হিসেবেই একে আমরা গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ এমন একটি উপকরণ এবং প্রধান উপকরণ, যার সাহায্যে একটি বিশেষ কাজ সম্পন্ন হয়। তাই থেকে মানে দাঁড়িয়েছে, কোনও মহৎ লক্ষ্য বা আদর্শ উপলব্ধির জন্য অনবচ্ছিন্ন মহৎ প্রচেষ্টা। ভারতের মাটিতে সাধনার চাষ কিছু বেশী, তার বীজ বহুধা বীক্ষিত। ফলে সাধক বলতেই আমরা তাঁকে দৈবশক্তির অধিকারী বলে সাব্যস্ত করে নিই। কিন্তু ভারতীয় ইতিহাস কি শুধু ঐ কথাই বলে? ঈশ্বর-সাধনা, মুক্তি-কামনা নিশ্চয়ই আমাদের দেশের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তা ছাড়াও অন্য অনেক কিছু আছে যা মুখ্যত ধর্মসাধনা নয়। দেশের মঙ্গল, বিশ্বের কল্যাণ, অর্থাৎ সমাজের সমগ্র মানবজাতির হিতসাধনায়, শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনের কল্পনায় একাধিক হৃদয়বান মনীষী আপনাকে নিযুক্ত করেছেন। ধর্মের বেলায়ও সমন্বয় সাধন করেছেন।

আমার মনে হয়, সমন্বয়ের সাধনাই ভারতের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য। প্রাচীনের ও নূতনের, দৈবের সঙ্গে মর্ত্যের, স্বদেশের ও বিশ্বের, পার্থিবের সঙ্গে পারমার্থিকের সূত্র-সন্ধান অর্থাৎ মিলন স্থাপনই হচ্ছে ভারতীয় সাধনার মূল ধারা। সাংস্কৃতিক ঐক্য, মানবিক ঐক্য, সত্যাদর্শের সঙ্গে আত্মিক যোগ এ দেশের বিভিন্ন সাধককে বিভিন্নভাবে, জ্ঞানের বা কর্মের ক্ষেত্রে প্রেরণা দিয়েছে, পরিচালিত করেছে। অসার ও অসৎকে বর্জন, ধ্রুব ও ঋতকে গ্রহণ, এই পথেই সমন্বয়ের সাধনা চলেছে। রাজা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ এরই সন্ধানে আপন আপন পন্থায় কাজ করে গেছেন। প্রশ্ন, প্রশ্নদ্বন্দ্ব সমস্যা উঠেছে, বিরোধও [illegible] নিয়েছে। কিন্তু জীবনে ও কর্মে, চিন্তায় ও বক্তব্যে এঁরা প্রমাণ করে গেছেনঃ দেশের মানুষ কেবল মারাঠী গুজরাটী বাঙালী নয়, ভারতীয় এবং নিখিল মানবগোষ্ঠীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভক্তি দিয়ে হোক আর যুক্তি দিয়েই হোক, মানুষের উন্নতি হল সবচেয়ে বড় সাধনা। ধর্মের বিভিন্ন মত বিভিন্ন পথ। কিন্তু লক্ষ্য একঃ মুক্তি। শুধু কৃচ্ছ্রসাধনে বৈরাগ্যে নিজের মুক্তি নয়। জিজ্ঞাসায় চিন্তায় স্বাধীনতায় সেবায়, এক কথায় সমগ্র মানবসমাজের সঙ্গে অভিন্ন একাত্মবোধের সর্বান্তঃকরণ প্রচেষ্টাই হল সত্যকারের মুক্তি।

এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দিতে চাই। রামকৃষ্ণ-ভক্তরা বিদেশে বিবেকানন্দের ভ্রমণ প্রচার ও নানা প্রসঙ্গের আলোচনা তেমন সুনজরে দেখেন নি। তাঁরা বলেছিলেন, নিভৃত ধ্যান ও অধ্যাত্মসাধনাই হল গুরুর প্রদর্শিত পথ। শাস্ত্রচর্চা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা প্রচারকার্য বা পরার্থপর কর্মসূচী—এর কোনটাই তাঁর অভিমত ছিল না। এই সমালোচনার উত্তরে বিবেকানন্দ বলেছিলেন—আগে লোকে আমায় বুঝুক, তার পর রামকৃষ্ণকে। মতবিরোধটা আরও স্পষ্ট হল, যখন একদিন বলরামের বাড়ীতে যোগানন্দ বললেন যে অধ্যাত্মকামীদের পক্ষে ভক্তিই হল শ্রেষ্ঠ পথ, এই হল গুরুর মত। সমাজ-কল্যাণ, সেবা-প্রতিষ্ঠান, স্বাজাত্যবোধ—এ সব হচ্ছে বিবেকানন্দের নিজস্ব ব্যাখ্যা ও কর্মপদ্ধতি, যেটা তাঁর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিদেশী সফরের ফল। এতে স্বামীজী অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন— কে চায় এ ভক্ত মুক্ত? আমি চাই জড় দেশবাসীকে তামস-মুক্ত করতে। যদি তারা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কর্মযোগে উদ্বুদ্ধ হয়, তার জন্যে আমি হাজার হাজার মাইল ঘুরতে রাজী। কাউকে আমি মানি না। শুধু তাকেই মানি যে নিজের ভক্তি মুক্তি না চেয়ে অন্যের সেবা সাহায্য করে। এও সাধনা —নিজের সঙ্গে পরের। মনগড়া আর লৌকিক আচার বা অনাচারের বাধা অতিক্রম করে, আমিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডীমুক্ত হয়ে, বহু ও বিপুলের সঙ্গে অন্বয় সাধনা। রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' পড়লে বোঝা যাবে, তাঁর বক্তব্য বা আদর্শটা কি ছিল। ভারত-দর্শনের মূল কথা হচ্ছে—ভূমার সাধনা। রবীন্দ্রনাথের জীবনে, চিন্তায় ও কর্মে, এই সাধনার রূপই প্রকটিত হয়েছে। ভারতের ঐতিহ্য, ভারতের সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর চেয়ে

রাজা রামমোহন

বেশী সচেতন কেউ নেই। কিন্তু সেই ভারতকে বিশ্ব-সমাজের সঙ্গে, আপন ঐতিহ্য বজায় রেখে, বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে ভারতবাসীকে নিখিল মানবের সঙ্গে তিনি যুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তা বোধহয় সম্পূর্ণ নয়। তিনি অবতার কি না, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। আমাদের মতন এখনও অর্ধশিক্ষিত দেশে, যেখানে সাধুতা ও সাধনার চেয়ে যৌগিক শক্তি আর বিভূতিলীলার রহস্য-মাহাত্ম্যই বেশী, সেখানে রামকৃষ্ণের সাধনার প্রকৃত চরিত্র তত্ত্ব বোঝা খুব সহজ নয়। কিন্তু আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব-পরিবৃত থেকে যে মহান্ পুরুষ এই সংসার ও সমাজের পরিবেশেই আপনার অমূল্য উপদেশ বিতরণ করে গেছেন, তাঁর মধ্যে যে আদর্শ মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ ঘটেছিল—যা সচরাচর ঘটে না, অনেক কালের ব্যবধানে মাত্র দু-একটি মানবচরিত্রে যার আশ্চর্য সুন্দর সার্থক সমন্বয় ঘটে—একথা নিঃসন্দেহ। প্রাচ্য ভূখণ্ডে

একাধিক মহামানব জন্মগ্রহণ করেছেন যাদের উপদেশ এই ভাবেই বিকীর্ণ হয়েছে। রূপক ও বাক্-সাহিত্যের একটি বড় নমুনা হ'ল বাইবেল ধর্মগ্রন্থ। যীশু খৃষ্টের 'প্যারেব্‌ল' আর রামকৃষ্ণের কথকতা হল প্রাচ্য দেশের সাধনা, ঐতিহ্য ও প্রকাশ-ভংগীর উজ্জ্বলতম নিদর্শন। তার মধ্যে আছে—জ্ঞানের সারমর্ম, যা এক দিকে অন্ধভক্তি অপর দিকে নিছক যুক্তি বিজ্ঞানের, বিশুষ্ক মতবাদের অনেক ঊর্ধ্বে।

ইতিহাস কালের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করা দরকার। হিন্দুসমাজের যে পরিবেশে তাঁর আবির্ভাব, সেটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে আগে বাংলা দেশে, তারপর ভারতের অন্যত্র একটা বড় রকমের সংকট উপস্থিত হয়েছিল—ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির সংকট। একদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম প্লাবনে নব্য শিক্ষার উগ্র আকর্ষণ, অপর দিকে নব্য সমাজের উচ্ছৃংখলতা। একদিকে বৈষয়িক বুদ্ধি, অপর দিকে সংশয়বাদ। ধনী দরিদ্রের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, সমাজের মধ্যে অজ্ঞতা বিলাস-ব্যসন প্রভৃতি অজস্র গলদ, অকারণ বিধি-নিষেধের বেড়াজাল। ধর্ম-জীবনেও প্রচুর গ্লানি; কেবল বিভিন্ন মতবাদ আর আড়ম্বর-অভিমান। ঠিক এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। নানা ভাবে সাধনা করে তিনি যে অবস্থায় উন্নীত হলেন, সেখানে প্রাচীন ও অর্বাচীন সমাজের অভিমান ও যুক্তি স্তব্ধ হয়ে রইল। মানুষের কল্যাণকামনায় যখন তিনি গল্পচ্ছলে লোকশিক্ষা দিতে লাগলেন, তখন অভিজাত মধ্যবিত্ত দরিদ্র, সকল শ্রেণীর মানুষ চলে এসেছিল এই নিরভিমান সাধক পূজারীর কাছে। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা নগণ্য, সমাজের চালচলন জানা ছিল না। কিন্তু গৃহী অথচ বিষয়বিতৃষ্ণ, সামাজিক অথচ ত্যাগী, দেশমৃত্তিকার অকৃত্রিম সন্তান অথচ জ্ঞানী এই পুরুষের সর্বভেদিনী বুদ্ধিবৃত্তির অসাধারণ পরিচয় পাবার জন্য সে সময়কার শ্রেষ্ঠ ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা, তাঁর কাছে স্বেচ্ছায় হাজির হয়েছিলেন। উপদেষ্টার মধ্যে যেমন কোনও ফাঁক ছিল না, উপদেশের ভিতরেও তেমনি ফাঁকি ছিল না। স্বভাব-কবির সহজ কল্পনা, কথকের বাক্‌ভংগী, সত্যানুসারীর ঋজু দৃষ্টি, জ্ঞানীর সতর্ক পর্যবেক্ষণ-শক্তি একটি সত্তার এমন সহজ ও সাবলীলভাবে মিলিত হয়েছিল যে মনে হয়—তিনি যদি ধর্মগুরু না-ও হতেন, তবু তাঁর মনের ও হৃদয়ের অসামান্য বৈশিষ্ট্য, তাঁর নির্ভীক সবল স্বাধীন চিত্ত, কোমল-কঠিন চরিত্র, জাগ্রত দৃষ্টি ও সত্যনিষ্ঠা তাঁকে যে কোনও দেশে যে কোনও যুগে অসাধারণ পুরুষ বলেই চিহ্নিত করত। সর্বধর্মের তত্ত্ব-সমন্বয় করে তিনি সেই মহা-সত্য উপলব্ধি করেন, যাকে গিলবার্ট মারে বলেছেন: Do ma divides, religious experience unites, মতবাদের বিতর্ক-বিচারে নিরর্থক বিরোধ ধর্মের গভীর অভিজ্ঞতাতেই প্রকৃত মিলন। ধর্মের এই সূক্ষ্মগভীর অনুভব, বিশ্ব-মানব-ধর্মের সংগে একাত্মবোধই রামকৃষ্ণ-সাধনার তাৎপর্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্র ও সাধনা সম্পর্কে সমন্বয় কথাটিই সবচেয়ে বেশী প্রযোজ্য। কেন না আমাদের সমাজে ও ধর্মে তাঁর যে বিশিষ্ট দান ও স্থান, তা ঐ সমন্বয়ের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, সেটি ছিল যুগসন্ধিক্ষণ। বাংলার সমাজ ও ধর্মজীবনের তখন ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা। দরিদ্র ও পরাধীন দেশের শিল্প সাহিত্য বাণিজ্য শ্রীহীন প্রাণহীন পরানুগ্রহ-পুষ্ট। বাইরের জগতে তখন বাঙালীর কোনও মুক্তির উপায় ছিল না। সেই সময়ে তিনি শাশ্বত মানব সত্যধর্মের মূল কথা প্রচার করলেন অতি বোধগম্য ভাষায়, ঘোষণা করলেন মনের

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বাধীনতা। তাঁর মধ্যে গোঁড়ামির বন্ধন ছিল না। জাতিভেদ সম্পর্কে তাঁর মত ছিল উদার। হিন্দুয়ানির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য তাঁর জিদ ছিল না। অপর ধর্মের প্রতি, বিদেশী সমাজের প্রতি তাঁর কোনও সংকীর্ণ মনোভাবও ছিল না। আচার-অনুষ্ঠানকে তিনি যুক্তিতর্কে প্রতিষ্ঠিত করতে চান নি, অথচ স্বজ্ঞানে দেশী সংস্কারকে অবজ্ঞাভরে বর্জন করেন নি। পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের বুলি তিনি মুখস্থ করেন নি, যুগের চলতি ধারণা ও মতের সংগে তাল মেলাবার চেষ্টাও করেন নি। বিদেশী বিধর্মী অথবা নব্য সমাজকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে নস্যাৎ করতে যান নি। অথচ সকল ধর্মের প্রতি তাঁর সম-উদার মনোভাব দেখাতেও পশ্চাৎপদ হন নি।

সে যুগের ব্রাহ্মসমাজ ও তার নেতাদের সংগে শ্রীরামকৃষ্ণের সবিশেষ প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠেছিল এই কারণেই। কেশব সেন, ত্রৈলোক্য সান্যাল, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ভদ্রনীলতন ব্রাহ্ম ভক্তরা তাঁর কাছে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। তিনিও তাঁদের আন্তরিক প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতেন। এক হিসেবে শিক্ষিত ব্রাহ্মসমাজের সংগে সনাতন হিন্দুসমাজের প্রধান ঘটক হলেন রামকৃষ্ণ। জাতিভেদে অবিশ্বাসী এবং হিন্দুয়ানির তীব্র সমালোচক ব্রাহ্মদের সংগে একত্র পনাহারে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। অতএব এই দুই বিরুদ্ধ উপাদানের মধ্যে এত সহজ আকর্ষণ মিলন সম্ভব হয়েছিল কি করে? মনের এই প্রসার ও উদারতা বিনা সবন্বয়-সাধনায় কি সম্ভবপর হয়? উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রাহ্ম-সমাজের এই যোগাযোগ বা মিলন আমাদের ধর্ম ও সমাজের দিক থেকে একটি সার্থক গুরুত্ব-পূর্ণ ঘটনা। ব্রহ্মসমাজ যেমন তাঁর কাছ থেকে খোলাখুলি সমালোচনা অথচ আন্তরিক প্রীতির রসমাধুর্য পেয়েছিলেন, তিনি নিজেও তেমনি ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে এসে যথেষ্ট লাভবান্ হয়েছিলেন। এক দলের বিদ্রোহী চিন্তা, অপর জনের বিবর্তন বা সমন্বয়-সাধনা; উভয়ে উভয়ের পরিপূরক।

রাজা রামমোহনের সংগে যে ভারতীয় সাধনা, জিজ্ঞাসা ও মানবপ্রীতি সুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, তারই পরিণতি ঘটল ঐ শতাব্দীর শেষ ভাগে, রামকৃষ্ণের জীবনে ও বাণীতে। যে ত্রিধারায় ভারতীয় সাধনার বিচ্ছিন্ন প্রবাহ আমরা লক্ষ্য করি রামমোহনের উপনিষদ্-লব্ধ ব্রহ্মসাধনার দ্বারা প্রভাবিত বৈদান্তিক নব্য সমাজের যুক্তিবাদী চিন্তাধারায়, আর্যসমাজের অনুসৃত শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান ও সনাতন ধর্মরক্ষায়, এবং পরবর্তী কালে গীতার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন-ধর্মে—সেই ত্রিধারার সংগম হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরের প্রাংগণে। উনিশ শতকে সংস্কৃত সমাজ ও ধর্মভাবনায় প্রথম দিকে যে মৌলিক দ্বন্দ্বের আভাষ পাই—রামমোহন, দয়ানন্দ ও বঙ্কিম-প্রবর্তিত চিন্তাধারায় সেই দ্বন্দ্বের শোভন ও সংগত নিরসন দেখি রামকৃষ্ণের সাধনায় ও উপদেশে। বৈষ্ণব সাধক, মরমিয়া সুফীর দল মধ্য যুগ থেকে যে ঈশ্বর-উপলব্ধি, সত্যানুভূতি, বহু বিচিত্র খণ্ড-সত্তার পিছনে যে গূঢ় একাত্মতা সন্ধান করে ফিরেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই ঋদ্ধিময় ঐতিহ্যের পরম উত্তরাধিকারী। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই আমার ব্যক্তিগত ধারণা। তাঁর জীবনের মাধ্যমে ঐ সমন্বয়-সাধনা, ভারতীয় ঐতিহ্যের এই গতিশীলতা এবং ক্রমিক অভিব্যক্তিই আমার আকৃষ্ট করে। তিনি সাধু মুক্ত পুরুষ, এইটাই তাঁর সম্পর্কে শেষ কথা নয় বলে মনে হয়। ছবিতে বা ছাপার অক্ষরে পরম পুরুষ আবদ্ধ নন। বিশিষ্ট কালের জীবন্ত পটভূমিতে, সমাজ-শৃংখলার পরিপ্রেক্ষিতেই যুগন্ধর মানবের ঐতিহাসিক সার্থকতা বোঝা চাই। বিশেষ করে ভারতে, যেখানে বহুমুখী সাধনার সমন্বয় ঘটেছে, যার উত্তরাধিকার বিশাল এবং বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ।

কালের ধর্ম সম্পর্কে নতুন তত্ত্ব

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

প্রকৃতি বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক গতিধারা আজ বিংশ শতাব্দীতে মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে অণুপরমাণু রাজ্যের চাবিকাঠি, যে রাজ্যের অবস্থিতি মহাবিশ্বের অসীমের মধ্যে। এতদিনকার বনিয়াদী বিজ্ঞানের শাশ্বত ধ্যান-ধারণা বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান বিপ্লবের প্রচণ্ড আঘাতে এক নতুন গুণগত স্তরে উন্নীত হচ্ছে যেখানে 'শেষ' বলে কিছু নেই, 'চূড়ান্ত'ও নেই, আছে শুধু 'আপেক্ষিক'। এই আপেক্ষিকতার আবিষ্কর্তা আইনস্টাইন। তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের ভিত্তিতেই তিনি ঘোষণা করেন যে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে দুনিয়ার সব কিছুই পরিবর্তনসাপেক্ষ এমন কি ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র উপ-পরমাণু, ইলেকট্রন পর্যন্ত মানুষের প্রজ্ঞানের বর্তমান স্তরে (কালে) ইলেকট্রনকে পরমাণু-জগতের শেষ সীমা মনে হলেও, প্রজ্ঞান নতুন স্তরে উন্নীত হলে দেখা যাবে যে ইলেকট্রনও শেষ কথা নয়, তারপরে তার চেয়েও ছোট বস্তু-কণিকা আছে। সুতরাং ইলেকট্রন সম্পর্কে আজকের ধারণা চূড়ান্ত নয়, আপেক্ষিক। আগামীকাল সেই ধারণা আবার বদলাবে। নিউটনের মহাকর্ষতত্ত্বও আজ আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের দ্বারা আইনস্টাইনের মহাকর্ষতত্ত্বে রূপান্তরিত যার বক্তব্য হচ্ছে যে স্থান ও কাল মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তার মানে কাল কোন বস্তুনিরপেক্ষ বা অবাস্তব ব্যাপার নয়।

বাজারে ঘড়ি কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু সময় কি কিনতে পাবেন? না, নিশ্চয়ই পাবেন না। সময় যদি পণ্যের মত কেনাবেচা হোত তাহলে কোটিপতিরা জীবনের মেয়াদ বাড়িয়ে ফেলতেন টাকা দিয়ে সময় খরিদ করে। আমরা অবশ্য পারতাম না কারণ, পকেটে পয়সা নেই। আর বেশিদিন বাঁচাই তো বিড়ম্বনা। পয়সা যাঁদের আছে তাঁরা বলেন যে, সময় মানেই টাকা। আমাদের মত যাদের গতর বেচে খেতে হয় ধনীদের কাছে তাদের মূল্য তাদের সৃজন-ক্ষমতা দিয়ে বিচার হয় না। বিচার হয় তাদের মেহনত ভাঙিগয়ে কত টাকা কামানো যাবে তাই দিয়ে, নগদ টাকা দিয়ে। তাঁদের কাছে সময় মানে টাকা, মানুষ মানেও টাকা। যাই হোক সেই মানুষের মেহনত দিয়েই গড়ে উঠেছিল পিরামিড তাজমহল ইত্যাদি পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য। সেগুলির মধ্যে আমরা দেখছি সময় দিয়ে গুণ-করা বাস্তব শক্তির এক একটি বিরাট সমাহরণ।

কিন্তু সময় 'জিনিষটা' কী? আজ মানুষ বুঝেছে যে মহাজাগতিক মহাশূন্য—যা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় না। তাও শূন্য নয় কারণ তার মধ্যেও বাস্তব মহা-জাগতিক রশ্মি ও তেজস্ক্রিয় প্রবাহ অহরহ কাজ করে যাচ্ছে। সময়ও মহাশূন্যের মত ইন্দ্রিয়ের অগোচর যদিও ঘড়ি দিয়ে আমরা তা মেপে থাকি। কিন্তু যা মাপা যায় তা কি বাস্তব জিনিষ নয়? বস্তু না হলে মাপছি কি করে? তাই কিছুদিন যাবৎ সময় সম্পর্কে এক নতুন অনুমিতির কথা শোনা যাচ্ছে যা সত্য প্রমাণিত হলে স্বীকার করতে হবে যে, সময়ও একরকমের বাস্তব শক্তি (মেটিরিয়াল এনার্জি) যা মহাজগতের সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র ও নীহারিকা পুঞ্জকে চক্রাকারে আবর্তন করাচ্ছে, নিজেকে রূপান্তরিত করছে পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়ায়। এই অভিনব অনুমিতির মূল প্রেরণা হচ্ছে আইনস্টাইনের সেই তত্ত্ব যাতে তিনি বলেছেন যে সময় গতিবেগের উপর নির্ভরশীল।

এই অনুমিতির ব্যাখ্যা করা হয়েছে কতকগুলি তথ্য দিয়ে। যেমন ধরুন কোনো গুলী একই সময়ে বন্দুকের নলের মধ্যে থাকতে এবং লক্ষ্যবস্তু বিঁধতে পারে না। তার মানে কারণ ও কার্যের মধ্যে কাল ও স্থানের ব্যবধান থাকতে বাধ্য। যে গতি-বেগে কারণ কার্যে রূপান্তরিত হয় তাই হচ্ছে সময়ের গতিবেগ।

আধুনিক গণিতের সাহায্যে হিসাব করে বৈজ্ঞানিকরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, সময়ের গতি সরলরৈখিক নয়, চক্রাকার। আবর্তনশীল বস্তুর মধ্যে তার অক্ষ বা মেরুদণ্ডের উপর কাজ করে সময়ের গতি তার মধ্যে বাড়তি শক্তি আমদানী করে। কোনো ঘূর্ণায়মান জাইরোস্কোপ যন্ত্রের, সময়ের গতির চাপে, এক প্রান্ত চ্যাপ্টা হয়ে যায়, অন্য প্রান্ত হয়ে যায় সরু। জাইরোস্কোপ যন্ত্র ছোট বলে অতি সূক্ষ্ম কম্পিউটার ছাড়া সেই পরিবর্তন ধরবার উপায় নেই। কিন্তু গ্রহগুলি তো ছোট নয়। তাই সেগুলিতে সময়ের গতি যাচাই করা অনেক সহজ।

বৃহস্পতি ও শনির বহু আলোকচিত্র নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, মঙ্গল বা অন্য কোনো গ্রহ নিয়ে নয়, কারণ ঐ দুটি গ্রহের আবর্তন বেগ সবচেয়ে বেশি। ছবিগুলি থেকে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, বৃহস্পতি ও শনির উত্তর গোলার্ধ কিছুটা চাপা এবং দক্ষিণ গোলার্ধের নিচের দিক শালগমের নিচের দিকের মত সরু।

পৃথিবী, বৃহস্পতি ও শনির তুলনায় অনেক ছোট। তাই তার উপর সময়ের প্রভাব অনেক কম। তবু ভূপৃষ্ঠে মহাকর্ষশক্তি মেপে এবং কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পুৎনিকগুলি থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানা গিয়েছে যে, উত্তর গোলার্ধের ঘনাংক দক্ষিণ গোলার্ধের চেয়ে বেশি যা বৃহস্পতি ও শনির মত উত্তরে চাপা ও দক্ষিণে সরু আকৃতির ইঙ্গিত দেয়।

বৈজ্ঞানিকরা দেখেছেন যে উত্তর গোলার্ধের গড় বাৎসরিক তাপমাত্রা দক্ষিণ গোলার্ধের চেয়ে তিন ডিগ্রী বেশি। এতদিন এই ব্যাপারের কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় নি। আজ তাঁরা মনে করছেন যে সময়ের গতি আবহমণ্ডলের ভূসংলগ্ন স্তর উত্তর দিকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয় বলেই উত্তর গোলার্ধে তাপের এই আধিক্য।

কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক বলে থাকেন যে, প্রকৃতি সদাসর্বদা সাম্য ও স্থিতির দিকে যাচ্ছে। সেই জন্যই নাকি পাহাড়-পর্বত অবক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে সমতলভূমিতে নেমে আসে, গ্রহের আবর্তন বেগ হয়ে আসে মন্থর, কমে যায় নক্ষত্রগুলির তেজ। অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নাকি একদিন "তাপীয় মৃত্যু" ঘটবে।

কিন্তু সেই তাপীয় মৃত্যুর কোনো লক্ষণ তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না? এমন কি চাঁদের বুকেও সেদিন আগ্নেয় ক্রিয়া ধরা পড়েছে। পারমাণবিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে জন্মলাভ করছে নতুন নতুন নক্ষত্র। আজন্ম পরিচিত নক্ষত্রগুলিও আগের মতই সতেজ। সেই তেজ বজায় থাকছে কি করে যদি তারা ক্রমাগত শক্তি সরবরাহ না পায়? মহাবিশ্বে অবক্ষয় ক্রিয়ার ক্ষতিপূরণ হচ্ছে কোথা থেকে?

পারমাণবিক ক্রিয়াই কি তার একমাত্র উৎস নাকি এ ছাড়া আরো একটি উৎস কোথাও আছে, যা সদাসর্বদা বাড়তি শক্তি জোগান দিয়ে নক্ষত্রগুলিকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করছে?

আলোচ্য অনুমিতির মতে সময় হচ্ছে সেই শক্তির উৎস। সময়ের শক্তি সবসময় জ্যোতিষ্কগুলিকে অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে পুনরুদ্দীপ্ত করছে, সেগুলিকে স্থিতিসাম্যে থাকতে দিচ্ছে না। সূর্য ও তারাগুলির যত ইন্ধন আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে সময়।

আমাদের আবর্তনশীল ভূমণ্ডলের সব জায়গা কি সমান বেগে ঘোরে? না ঘোরে না। বিষুব রেখায় অবস্থিত কোন একটি বিন্দুকে পুরো একবার ঘুরে আসতে যতখানি রাস্তা যেতে হবে, মকর বা কর্কট ক্রান্তিতে অবস্থিত যে-কোন বিন্দুকে একবার ঘোরার জন্য তার চেয়ে অনেক কম রাস্তা যেতে হবে, কারণ বিষুবরেখা বরাবর পৃথিবীর ঘের সবচেয়ে বেশি। সুতরাং সময়ের গতিবেগ বিষুবরেখায় এক রকম, তার উত্তরে-দক্ষিণে অন্যরকম। বেগের সেই তারতম্য মানে শক্তির তারতম্য, অর্থাৎ ভরবেগের পার্থক্য। কোনো নতুন বা বাড়তি শক্তির আবির্ভাব না হলে ভরবেগের তারতম্য হতে পারে না। শক্তি মাত্রেরই সঙ্গে একটি পাল্টা শক্তি থাকে, যে দুটির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া একদিকে যেমন মহাকর্ষ কেন্দ্রকে ঠিক রাখে, তেমনি অন্য দিকে আবার গ্রহের আবর্তন শক্তিকে কিছুটা বাড়তি শক্তি জোগায়। সেই বাড়তি শক্তি উৎপন্ন হয় সময়ের গতিবেগ থেকে। আচার্য কজিরেফ হিসাব করে বলছেন যে সময়ের গতি থেকে উৎপন্ন শক্তির বেগ প্রতি সেকেন্ডে ৭০০ কিলোমিটার এবং পৃথিবীর মত যে সব গ্রহ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরে সেখানে সময়ের গতি হচ্ছে হাঁ-ধর্মী। আর অন্য কোনো সূর্যের রাজ্যে গ্রহগুলি যদি ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরে সেখানে সময়ের গতি হবে না-ধর্মী, এবং সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে সেই সব গ্রহ প্রতিবস্তু (অ্যান্টি ম্যাটার) দিয়ে তৈরি।

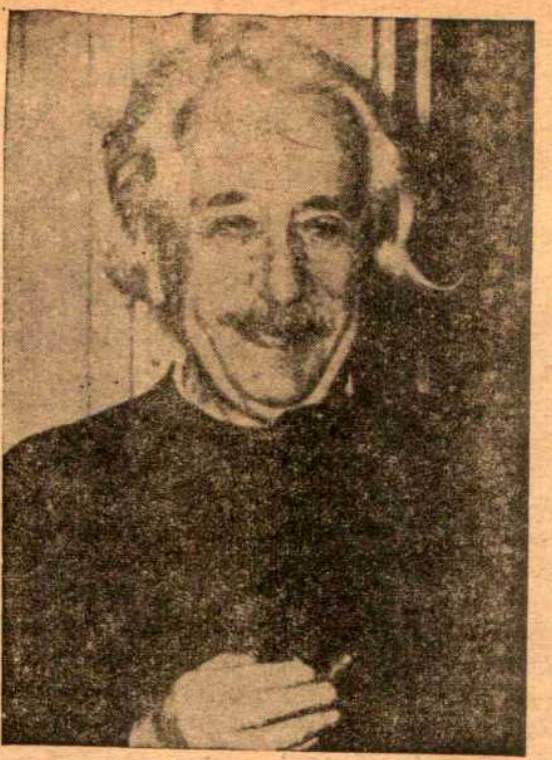

আইনস্টাইন

সময় যেমন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তেমনি শক্তি আবার সময়ে রূপান্তরিত হতে পারে।

সেই সুদূর ভবিষ্যতের কথা যদি কল্পনা করি যখন আমাদের এই পৃথিবী থেকে যাত্রী নিয়ে বহু মহাবিশ্বপোত অন্যান্য নক্ষত্রের রাজ্যে পাড়ি দেবে। ধরুন সেইরকম একটি উড়োজাহাজ এক অজ্ঞাত গ্রহের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই গ্রহের ভূমিস্পর্শ করার আগে যাত্রীদের জানতে হবে যে সেটি কোন্ উপাদানে গঠিত—বাস্তব উপাদানে নাকি প্রতিবাস্তব উপাদানে? আজ জানা গিয়েছে যে, বস্তু মাত্রেরই একটি পাল্টা প্রতিবস্তু আছে, যেমন হাঁ-এর পাল্টা হচ্ছে না, আলোর পাল্টা অন্ধকার, পজিট্রনের পাল্টা ইলেকট্রন। হয়ত বা সেই অপরিচিত গ্রহের উপাদানের পরমাণু-কেন্দ্রীণ হবে না-ধর্মী। যাকে কেন্দ্র করে আবর্তন করছে ইলেকট্রন নয়, পজিট্রন। সে ক্ষেত্রে সেখানে নামা মানেই সর্বনাশ, কারণ তখন পার্থিব বস্তুর সঙ্গে সেখানকার প্রতিবস্তু মিশে ঘটবে প্রচণ্ড এক পারমাণবিক বিস্ফোরণ, জাহাজ বা যাত্রীর আর কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না, সুতরাং উপায়? উপায় আছে যদি সময় সম্পর্কে অনুমিতিটি সত্য হয়।

বাস্তব উপাদানে গঠিত গোলকে সময়ের গতি যে দিকে, প্রতিবস্তু দিয়ে তিরি গোলকে সময়ের গতি হবে তার উল্টো দিকে, যার ফলে তার উত্তর গোলার্ধ হবে সরু এবং দক্ষিণ গোলার্ধ চ্যাপ্টা বা চাপা। কাজে কাজেই মহাজাগতিক যাত্রীরা জাহাজে বসে বহু দূর থেকে গ্রহবিশেষের আকৃতি দেখে বুঝতে পারবেন যে সেটি বস্তু দিয়ে তৈরি, নাকি প্রতিবস্তু দিয়ে। শুধু তাই নয়, গ্রহবিশেষ ঘড়ির কাঁটার দিকে না তার বিপরীত দিকে ঘুরছে সেটাও জাহাজ থেকে যাত্রীরা দেখতে পাবেন।

পুল্কোভো গ্রহবীক্ষণাগার থেকে তেজস্ক্রিয় দূরবীণের সাহায্যে যিনি চাঁদের বুকে অণুৎপাত দেখতে পান এবং শুক্রে মেরু-জ্যোতির অস্তিত্ব প্রমাণ করেন (বহু আগে এই দুটি বিষয়ে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন) সেই বিজ্ঞানাচার্য কজিরেফ মনে করেন যে সময়ের শক্তি মানুষ একদিন নিজের আয়ত্তে আনবে, অর্থাৎ এইচ, জি, ওয়েল্স্-এর 'সময় যন্ত্র' বাস্তবে রূপায়িত করা যাবে।

অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। উনবিংশ শতকের বিজ্ঞান গ্রন্থে দেখি, পরমাণু অবিভাজ্য, নক্ষত্রের রাসায়নিক গঠন অজ্ঞেয়, আপেক্ষিকতাবাদ বলে কোন তত্ত্বের অস্তিত্বই নেই। আজ বিংশ শতকে মানুষের জ্ঞান এগিয়ে গিয়েছে বহুদূর। মহাশূন্যের বস্তুগত চরিত্র সম্পর্কেই বা আগে আমরা কতটুকু জানতাম? আজ জেনেছি অনেক কিছু। সময়ের চরিত্রও মানুষ উদ্ঘাটন করবে। তখন মানুষকে আর কেউ সময় সাগরে ভাসমান অসহায় ভেলার সঙ্গে তুলনা করবে না, কারণ সময়ের অজ্ঞাত বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে তখন সে সময়কেই বাঁধবে নিজের কাজে লাগাবার জন্য।

কাব্যে ও চিত্রে বিচিত্র মিলন।

চিত্র শোভা এলবাম

নয়ন-মনোমোহন সুশোভন সংস্করণ।

কবিঃ—বিশ্বকবি কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; শিল্পীঃ—সর্বজনসুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা। এ সমন্বয়ের তুলনা সাহিত্যরাজ্যে কোথায়?

চিত্রে চিত্রে চিত্রময় সুশোভন এলবাম। বঙ্কিম-কটাক্ষের মাধুরীচ্ছটায় পুলকলীলা—আর ভাব-বিকাশের অমিয় মাধুরী। এ যেন মেঘে জ্যোৎস্নায়—হীরায় পান্নায়—কিশলয়ে পুষ্পে মধুর সম্মিলন।

সুদৃশ্য বাঁধাই—মূল্য ২৷৷০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

কে প্রথম দেখেছিল—তা বলা মুশকিল। তবে এসব নিয়ে বিকেল থেকে বেশ খানিক হয়ে গেছে। কলতলা থেকে বাইরের রক, রক থেকে বড় রাস্তা—তারপর স্প্রীঙের মতো টান-টান থাকা থেকে ছাড়া পেয়ে এই চারতলা বাড়ির ওপরতলায় শেষ হয়েছে হিড়িকটা।

শেষই বা হল কই? ছাড়া পেলেও স্প্রীঙ স্থিতিস্থাপকতায় পৌঁছে যেমন কিছু সময় থর থর করে কাঁপে, তেমনি কাঁপন ওপরতলার ছোট্ট ঘরটা থেকে নীচে অব্দি সারা বাড়িটার ভিতর ঘুরে ঘুরে কতদিন ফিরবে কে জানে।

এলাকাটা কেমন যেন রসকষশূন্য।

চারপাশে উঁচু থেকে তাকালে দেখা যায় অগুনতি স্কাই ক্রেপার ঢঙের ঢ্যাঙা অ-গড়নের বাড়ি। মধ্যে মধ্যে সমাধিস্তম্ভের আকারে অজস্র ঠাসবুনুনি একতলা দোতলা সেকেলে দালান। কোনটার সংগে কোনটার কোন সামঞ্জস্য নেই। একটা ফাঁকা আকাশ পেয়ে যার যা খুশী হুড়মুড় করে গজিয়েছে।

দেখতে দেখতে চোখ ব্যথা করেছিল সুমতির। কোথাও কি এককণা সবুজের চিহ্ন আছে! ওপাশে রেল লাইন—তার ঠিক কিনারা ঘেঁষে একটি বিরাট কারখানা। বড় বড় চিমনিগুলি ধোঁয়া উদ্গীরণ করে কখনও রাত্রিকালীন গাছের মরীচিকা দেখায়। যতদূর চোখ যায় ওই একই দৃশ্য। কাছাকাছি ভাগাড় থাকাও সম্ভব। কেননা সারাটি দিন কয়েক শো শকুন পালাক্রমে পাক খায় মাথার ওপর। তিনতলার বৌদির ছেলে টেক্কা সেদিন বিকেলে ঘুড়ি ওড়াতেই একটা শকুন তাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে অকূলে ভাসিয়ে দিল।

চারতলার ওপরের ঘর—বাড়িওলার হিসেবে সেটা পাঁচতলা এবং টাক চুলকে তার নাম দেওয়া হয়েছিল—ইন্দ্রালয়, আসলে টালির চাল চাপানো একটা চিলেকোঠা। চওড়া ছাদ-টুকুই যা স্বস্তিদায়ক—তার ওপর অনায়াসে বারোজন লোকে হাডু-ডু-ডু-টবল খেলতে পারে।

তারপর সুমতি সত্যিসত্যি দেখেছিল নীচের তলা থেকে সত্যি সত্যি বারোজন নারী ও পুরুষ মিলে হাডু-ডু খেলছে। প্রমথকে বলেছিল সে—দেখছো কী হচ্ছে?

প্রমথ নির্বিকারভাবে বলেছিল—প্রাইভেট পার্ক তো। বেচারারা খেলবেই বা কোথায়?

—খুব বিচ্ছিরি লাগে কিন্তু। বিকেলটা যে একটু ছাদে পায়চারী করবো, তার উপায় নেই! আচ্ছা বাসা জুটিয়েছিলে তুমি!

—একশো টাকায় এমন দেবালয় পাবে কোথায় শহরে?

—ইস্, দেবালয় না ইয়ে!

সুমতির হাত ধরে টেনে ঘরের জানালায় দাঁড় করিয়েছিল প্রমথ।—দ্যাখো, দ্যাখো, কী রোমান্টিক জায়গায় আমরা বাস করছি।

সন্ধ্যার শুরুতে শহরের বিস্তীর্ণ অংশ দেখা যাচ্ছিল—যার ওপর প্রগাঢ় ধূসরতা সমুদ্রের মতো উত্তরণ। অজস্র দীপমালায় শোভিত সে ব্যাপকতা ঠিক সমুদ্রেরই ফস্-ফরাসের জ্বল জ্বল করে-ওঠা লোনা জলের চুড়ায় চুড়ায়। তবু মনঃপূত হয় নি সুমতির। এ যেন বড্ড ফাঁকির ব্যাপার ঘটছে তলে তলে। রঙীন খেলনা দিয়ে ভোলানো হচ্ছে। এমন উঁচু জায়গায় পৌঁছে কেমন ভয়-ভয় আচ্ছন্নতা মনের পরতে পরতে দানা বাঁধে। মনে হয় মাটির সংগে কোন সংযোগ নেই বুঝি। মাথার ওপর—চার পাশের, শুধু নিষ্করুণ উজ্জ্বল শূন্যতা। শুধু শকুন আর বিষাক্ত ধোঁয়ার অলৌকিক সাপের মতো ফণা তুলে চলে-যাওয়া—তারপর সব উজ্জ্বল শূন্যতাকে সে ধূসর প্রসারে কেবল মেরেই ফেলে না, অর্থহীন করে তোলে। নিজেকে বড় ছোট মনে হয় তখন—বড় তুচ্ছ।

বেশ খানিকটা দূরে একটা পার্কমতো রয়েছে। তার নগ্ন মাটিতে ছুটোছুটি অবশ্য কম হয় না। কিন্তু সেও কেমন প্রাণহীন মনে হয় দূর থেকে। ঘাস গজানোর বিস্তর চেষ্টা হয়েছিল শোনা যায়, গজায় নি।

দোয়ার

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

—পাঞ্জাবে কোন দুঃখে? দোতলার সুখময়-বাবু বলেছিলেন।—ওয়ার্ডে সবশুদ্ধ কয়েক হাজার লোকের জন্য মাত্র ওই এক চিলতে জায়গা। গা ঘিন ঘিন করে উঠলে একটু দামলাতে পা বাড়াও ওদিকে। দেখবে কিছু-ক্ষণের মতো ডবল-রিডবল ময়লা জমে গেছে শরীরে।

—ময়লা কিসের?

—কয়েক হাজার লোক আন্ডারোচ্চাশুদ্ধ ওখানে ডবল মার্চ করছে। ধুলো কি কম ওড়ে! তাতে ফেরিওলার পাল। গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি চলতে ঘামের গন্ধ ওঠে। ছ্যঃ! বরং এই ছাদটাই ভালো।

শোভাপিসি বলেন—ও সুখময়, আমাকে বরং সেই চাঁইবাসাতে পাঠিয়ে দে বিনুর কাছে। এ যে মরুভূমি বাবা! মরুভূমি শব্দটা এমনি করে কে না বলে! অথচ চোখ-খুলে-চলা উটের প্রায় হয়ে উঠেছে দিনে দিনে। বেশ কাটাচ্ছে দিনগুলি রাতগুলি। সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল—তা বলে কাবুর কাজকর্মে উৎসাহ কমছে না। কেউ মনমরা হয়ে ঝিমোচ্ছে না। আপিস কামাই করছে না। বাসা বদলাবার চেষ্টাও নেই। বেশ চলছে নিয়মমাফিক। বাজার-রান্না-আপিস-সিনেমা-শয়ন। ফের উল্টো পাক।

অর্থাৎ ঘূর্ণিময় চাকাটা যথারীতি ঘুরছে। কেবল সুমতি একা মনমরা হয়ে কাটাচ্ছিল। মফঃস্বলের মেয়ে—বড় শহরে পড়লে হয়তো এমনি ঘাবড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। এইটে প্রমথর ধারণা। কিন্তু চাকরী পাবার পর টানা তিন বছর মেসে কাটালো...বাপ্‌স্, ভাবতে নাড়ী টানটান হয়। কী নিঃসঙ্গ রসকষহীন একঘেয়েমি!

সুতরাং প্রমথ অতিশয় সুখী। পরিবেশ দিয়ে কী হবে? এই ঘর—ওপরে ছাদ, ভিতরে সুমতি নামে যুবতী বৌ...বরং জানালা খুলে রাতের দিকে বেশ আরব্যোপন্যাস পাঠের আরাম লাগে হৃদয়ে!

ইত্যবসরে তুখোড় গরম পড়েছিল শহরে। আবহাওয়া আপিসের খবর যেহেতু হাওয়া-সংক্রান্ত, সবই শেষটা হাওয়া হয়ে যায়।...আর ভয় নেই—মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে বর্ষার মৌসুমী ঘোড়াটা দৌড়ে আসছে! এবং দিন যায় রাত কাটে—তার পায়ের শব্দও শোনা যায় না কানে। সুখময়বাবু বলেছিলেন—হিসেবে একটা অংকের ভুল মেরেছে ওরা।

নাঃ। এত গরম বিশ-বাইশ বছর ধরে দেখা যায় নি। নাভিশ্বাস উঠেছে পাড়াটায়। শোভাপিসি কলতলায় উবুড় হয়ে পড়ে রয়েছেন। বিমলা ইণ্ডি রতন টেক্কা ঘণ্টায় আশী হাজার মাইল বেগে ফ্যান চালিয়ে চক্রাকারে বসে রয়েছে। ওদিকে ওপরে টালির ছাদ, রোমান্টিক ঘরে বসে সুমতি বেলা দুটো নাগাদ হু-হু করে কেঁদেই ফেলল।

ঠিক সেই সময় ঘরের ভেতর কোথাও চিক্‌চিক্ টু...উ.....টু.....। বেশ কয়েকবার শব্দটা শুনে সুমতি চোখ মুছে কান খাড়া করেছিল।

চিক্...চিক্...চিক্...চিক্...টু—উ—টু!

যেন মাথার ভেতর দিকে কোথাও মিষ্টি জল চুইয়ে পড়ার শব্দ। সে চার পাশে তাকিয়ে কোথাও কিছু খুঁজে পেল না। নাকি আজ-গুবী কোন টিকটিকি বা আরশোলা। কিংবা ছুঁচো। আকাশের ওপর বাস করেও ওদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় নি। ঘরটায় আগে নাকি মালিকের নানা ধরণের পরিত্যক্ত জিনিষপত্তে ঠাসা থাকত। ফলে অজস্র ফাটল আর ফোকর। বিছেও দু-একটা দেখা গেছে। সুমতি ভয় হাতাহাতি যুদ্ধ করে তাদের ঘায়েল করেছিল।

টু...উ টু.....টু.....উ.....টু!

নাঃ! অন্য কিছু হবে। পাখি-টাখি বটে। চড়ুই খুব সম্ভব। সুমতি গনগনে বোদে জ্বলন্ত বাষ্পসংকুল শহরের দিকে তাকিয়ে ফের একটু কাঁদবার তালে ছিল। কিন্তু 'পাখি' শব্দটা মাথার ভেতরে ঠক্ ঠক্ করে ঠোকর দিতে শুরু করেছে ততক্ষণে।

পাখি শব্দটা প্রতিবার একেকটি ঘায়ে ভেতরের সূক্ষ্ম কোন আবরণ ছাড়িয়ে ফেলছে যেন। নাকনা তুলে যে-ভাবে হাঁড়ি থেকে মশলামাখানো মাংসের গন্ধ সে নেয়, ঠিক সেইভাবে ভেতরটা শুঁকে দেখতে থাকল সুমতি। বেশ মিষ্টি-মিষ্টি, সুগন্ধ, ভেজা-ভেজা একটা অপরূপ স্বাদেভরা ব্যঞ্জিত কিছু এই শব্দটা। 'পাখি' বললেই কার না মনে আসে, নীল আকাশ, সবুজ গাছ, ঘাস, ছায়া, জল, ভালোবাসা এবং অনুরূপ আরও কিছু শব্দাবলী! পাখি বলতে যেন প্রান্তর দেখি, গ্রাম দেখি, ঋতুদেব দেখতে পাই ভালোবাসার পুরুষ বা রমণীকে দেখি। 'পাখি' শব্দটা স্মৃতিতে সংস্কারে যেন গভীর জগত সৃষ্টি করে বেঁচে আছে। তার নাম ধরেই না বলা হয়েছিল—'যাও পাখি বোলো তারে, সে যেন ভোলে না মোরে'...কিংবা সেই গ্রাম্য গাথাঃ 'আমি যদি পাখি হইতাম, থাকত দুটি ডানা, উড়িয়া পইয়া তল্লাস করতাম বন্ধুরো ঠিকানা!' অবশ্য সুমতি কিছু লেখাপড়াও জানে। তাই তার মনে রবিঠাকুরের দু-চার লাইন কবিতাও ভেসে-ভেসে উঠছিল হয়তো। কী ভেসে উঠছিল সুমতি স্পষ্ট করে বলতে পারছে না অথচ সে লক্ষ্য করছে, দারুণ ব্যস্ততা শুরু হয়েছে ভেতরে ও বাইরের ইন্দ্রিয়গুলিতে। একটা লাজো-লাজো রব পড়ে গেছে সংগে সংগে। সে ঘরের প্রতিটি প্রান্ত, ছাদের কাঠ, ফাটল, খাটের নীচেটা, বাকসো ও আলনার কোণ, আলমারির পেছনদিক—সবখানে খুঁজে তাকে আবিষ্কার করতে চাচ্ছিল অথচ সামনে-পেছনে উপরে-নীচে প্রতিবারই ওই অতর্কিত ডাক...টু...উ...টু...চিক্-চিক্-চিক-চিক...টু...উ...টু!

বস্তুত সুমতি এই অবিচ্ছিন্ন খোঁজার মধ্য দিয়ে তার দুরন্ত গ্রীষ্মকে ভুলে যাচ্ছিল ভুলে যাচ্ছিল সে কোথায় রয়েছে। আকাশের কোলে ঝুলন্ত চিলেকোঠার ভাপধরা গুমোট এই ছোট্ট পৃথিবীটা সুমতিকে নিয়ে বুঝি মজা দেখছে মুখটিপে!

অনেক সময় ধরে শব্দটা লুকোচুরি খেলার পর শেষে সুমতি যখন হাল ছেড়ে দিচ্ছে, ঠিক তার পায়ের কাছে পেছনে শুনতে পেল...চিক্...চিক্...চিক্!

ঘুরে দেখে ফিক করে হেসে ফেলল সে। —ভারী দুষ্টুমি জানিস তো তুই!

স্বপ্ন নয়, ভ্রম নয়; একেবারে জলজ্যান্ত একটা পাখি। লাল টুকটুকে ঠোঁট। ডানা ও পিঠ কুচকুচে কালো। পেটটা ধূসর রঙের। পা দুটি গাঢ় হলুদ। আর লেজ ঝকঝকে সাদা। আকারে একটা শালিখের চেয়ে বড়ো নয়।

কী পাখি এটা?

সুমতি চেষ্টা করে দেখল সে চেনে না। কোনদিনই দ্যাখেনি। নাকি এসব পাখি শহুরে—শহরেই উঁচুতে কোথাও বাসা বেঁধে থাকে?

পাখি মানুষের বড় লোভের বস্তু। খাঁচায় পুষুক বা তাকে খোঁচাখুচি করে মেরেই ফেলুক—পাখি হাতের আওতায় এলে কার না লোভ হয়? সন্ন্যাসীদের কথা অবশ্যি আলাদা —সংসারী মানুষ পাখির প্রতি কম ঈর্ষা পোষণ করে না।

কথাটা পরে বলেছিলেন সুখময়বাবু। বলেছিলেন—জানা থাকলে কি আর এই ভাগাড়ে পড়ে থাকতুম মশাই? জোরসে হাওয়া কেটে দে হাওয়া হয়ে যেতুম!

—এ পৃথিবীতে আর থাকতে ইচ্ছে করে না। দিন গুণছি কবে ডাক আসবে! এই বলে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলেছিলেন শোভাপিসি। তিনিও বলেছিলেন—ওই পাখিগুলো কিন্তু বেশ আছে। আকাশে ভেসে-ভেসে বেড়াচ্ছে। মাটিতে থেকেও মাটির নয়। গুরুদেব বলেন, মনটিকে ঠিক ওই সুরে বাঁধতে হবে...

পরে আরও নানান মন্তব্য করেছিল লোকে। কিন্তু তখন সুমতি এতখানি তলিয়ে ভাবছিল না তা ঠিক।

সে মুগ্ধদৃষ্টে নিষ্পলক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল পাখিটাকে। কেমন করে এল—না ভেবে কোত্থেকে এল ভাবনায় বিভোর ছিল সে। একটা সোনার মোহর কুড়িয়ে পেলে যেমন আগেভাগে কি কিনবে তার হিসেব-নিকেশের চেয়ে কুড়িয়ে পাওয়ার বিস্ময়ে ডুবে থাকে, এ বিস্ময়ও তাই।

পাখিটা খাটের নীচে বার বার ঢুকে যাচ্ছিল, বেরিয়ে আসছিল। থেকে থেকে ডাকছিল। সুমতি তখনও—ভাবে নি সে কী করবে এবার। কিন্তু ততক্ষণে টেক্কা এসে হাজির ছাদে।—ও বৌদি, কী দেখছেন অমন করে? ইঁদুর না ছুঁচো? ওখানে কিন্তু কয়েকহাজার ইঁদুর আর ছুঁচোরা রয়েছে। গুণে দেখিছি—আপনার দিব্যি।

—তা নয়। পাখি!

—কী বললেন?

—পাখি।

—পাখি! যাঃ...টেক্কা ছোট্ট ইঁচড়েপাকা জিভটা বের করে ভেংচি কাটল।

—সত্যি। দেখবে এসো।

সুমতি যেন এতক্ষণে করার মতো কিছু পেলো। সে বাচ্চা মেয়ের মতো খিলখিল করে হাসছিল। টেক্কা সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় ঈষৎ কুঁজো হল। তারপর অবিকল শিকারী বেড়ালের মতো পা টিপে টিপে দরজার কাছে এল। ফিস ফিস করে বলল—কই, কই?

সুমতি তার হাসিটা আঁচলে ঢেকে আঙুল তুলে খাটের নীচেটা দেখাল। তার চালচলনেও অনুরূপ একটা সতর্কতা—গলার স্বরও চাপা।—ধরতে পারবে?

টেক্কা মাথা নাড়ল। তার চোখ দুটি জ্বলছে।

—পুষবো কিন্তু তোমার দাদাকে একটা খাঁচা.....

টেক্কা ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল—চুপ! টুঁ শব্দটি নট্।

জানালাগুলি হাত বাড়িয়ে বন্ধ করে দিল সুমতি। শেষে দরজাটাও। তারপর দুজনে খাটের নীচে হুমড়ি খেয়ে হাত বাড়াল। টেক্কা বলল—বড় অন্ধকার। আলোটা জেবলে দাও বৌদি!

আলো জ্বললে দেখা গেল পাখিটা খাটের পায়ার ওপাশে দেওয়ালের কোণে সেঁটে গেছে। সম্ভবত ভয় পেয়েছে। আর ডাকছে না একবারও।

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে টেক্কা তখন পাখিটাকে ধরে ফেলেছে। একটা ভয়ার্ত অস্ফুট কিচ্-কিচ্ শব্দ উঠছে ঠোঁটে। টেক্কা হাতের মুঠোয় পাখিটা ধরে দরজা খুলল। সুমতি কিছু বলার আগেই বেরিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল সে। সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছিল নীচের দিকে। সুমতি ছুটে এসেছিল। কিন্তু অনুসরণ করতে গিয়ে হঠাৎ রাগে ক্ষোভে এত অস্থির হয়ে উঠেছিল যে সিঁড়ির মুখে রেলিঙ চেপে ধরে সে স্তব্ধ হয়ে গেল একেবারে।

টেক্কা যে এতখানি বিশ্বাসঘাতকতা করবে সে কল্পনাও করতে পারেনি। ফের তার কান্না পাচ্ছিল। নীচের ঘরে গিয়ে পাখিটা চাইবে কি না ভাবছিল সে। কিন্তু বিমলাদিদি যা মুখ—হয়তো সোজাসুজি বলে বসবেন—পাখির গায়ে কি নাম লেখা আছে না-কি?

না। আকাশের পাখির গায়ে নাম লেখা থাকে না। কোত্থেকে আসে, কোথায় যায়!

সুমতি আস্তে আস্তে তার ঘরে এসে বসল।

আগাগোড়া ব্যাপারটা হয়তো হাস্যকর। কী একটা পাখি, তার জন্যে দুঃখ করার মানে হয় না। হয়তো নীচের তলারই কেউ রথের মেলা থেকে কিনে এনেছিল—ফাঁক পেয়ে পালিয়ে এসেছে। রঙকরা শালিখও হতে পারে। মালিক শেষ অব্দি খুঁজে নিয়ে যাবে। বনের পাখি ধরে এনে এখন বেশ দুপয়সা কামায় বেচারীরা।

তা ছাড়া, সুমতি স্মিত হাসছিল, তার আর ঐসব ছেলেমানুষী করার বয়স আছে? কদিন পরে তার খোকাখুকুই অমনি করে পাখি-ধরা নিয়ে মেতে উঠবে। দিনও বুঝি শেষ হয়ে এল। প্রমথ বলছিল, আগামীকাল সকালে একবার ডাক্তারের কাছে দেখিয়ে-শুনিয়ে আসবে। কখন কী হয়, বলা যায় না। প্রমথ আপিসে থাকতে ব্যথা উঠলে বড় অসুবিধা হবার কথা। অবশ্য শোভাপিসি, বিমলাদি বা আরও কয়েকজনকে বলে রেখেছে প্রমথ। নীচের তলায় একটা ফোন রয়েছে। গতিক বুঝলে যেন তাকে আপিসে খবর দেওয়া হয়। প্রমথ এত সাবধানী যে, পাছে ব্যথার চোটে সুমতি অজ্ঞান হয়ে যায়, তার ফোন নাম্বারটা দেওয়ালে বড় করে লিখেও রেখেছে।

সুমতি এতক্ষণে ফের ক্লান্ত বোধ করছিল। গরমও টের পাচ্ছিল। নঃ, রথ পেরিয়ে গেছে, আকাশ এখনও দারুণ নীলবর্ণ। এক-ফোঁটা মেঘের চিহ্নও নেই। সামনে প্রসারিত আকাশ দেখছিল সে। স্কাই-স্ক্রেপারগুলির ওপরে পাশে অনন্ত ঐ নীল ব্যাপকতায় আজ আর শকুনগুলিকেও ভ্রমণ করতে দেখা যাচ্ছে না।

প্রমথর আসতে একটু দেরী হয়। ওভার-টাইম পেলে ছাড়ে না সে। নৈলে সুমতিকে দেশে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতে হয়।

বিকেল নামতে নামতে নীচের দিকে একটা চেঁচামেচি শোনা গেল। সুমতি দারুণ ক্লান্ত বোধ করছিল। তাই নামতে ইচ্ছে করছিল না। মাথা ঘুরছিল একটু-একটু। সারা শরীরে রক্তচলাচল থেমে পড়ার মতো ঝিমঝিম ভাব। জানুদুটি বেশ ভার বোধ হচ্ছিল। ছাদের ওপর চেয়ার টেনে বসতে গিয়ে তার মনে পড়ল—এখনই দল বেঁধে বাড়িটার সকল বাসিন্দা ছাদে উঠবে। খেলাধুলোয় মেতে থাকবে।

সে দরজার মুখে সরে এসে বসল।

কিন্তু নীচে হৈ-চৈটা বেড়েই চলেছে। তারপর যেন টেক্কার প্রচণ্ড কান্না আর বিমলাদির তীব্র চিৎকারও শোনা গেল। এই কান্না আর চিৎকার ক্রমশ নীচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে। সুখময়বাবুর হেঁড়ে গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে এবার। আপিস থেকে ফিরলেন বুঝি। আরে, শোভাদিও চেঁচামেচি করছেন যে!

সুমতি উঠে গিয়ে ছাদের আলিসায় ভর করে নীচের দিকে তাকাল। বড় হাস্যকর দৃশ্য। একদল ছেলেবুড়ো মিলে হৈ-হৈ করে গেট পেরিয়ে পথের দিকে ছুটেছে। তাদের মধ্যে সুখময়বাবুও রয়েছেন। গেটের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে এ বাড়ির মেয়ে বাসিন্দারা। সকলেই হাত তুলে কী বা কাকে দেখাচ্ছে। পাখিটা নাকি?

পথের মধ্যে ভীড় জমে গেছে। সামনের রক থেকে কিছু লোকও দৌড়ে এল ভীড়ে। তারপর অবিশ্বাস্য দৃশ্য। একটা কাড়াকাড়ি ধস্তাধস্তি চলেছে কিছু নিয়ে। আর তখনই সুমতি স্পষ্ট দেখল—একটা পাখি—হ্যাঁ, সেই রঙীন অদ্ভুত পাখিটা উড়ে আসছে চারতলার কার্ণিশ লক্ষ্য করে।

অজস্র পাথরের টুকরো ছুঁড়ছে কে ভীড় থেকে। সুমতির বুকের কাছাকাছি আলিসার ওপরে সেটা ঠক করে ঘা খেল এসে। সুমতির ভীষণ রাগ হচ্ছিল। কিন্তু আরও পাথরকুচি আসছে ওদিকে। সে সরে এসে ছাদের মধ্যখানে দাঁড়াল। এবং তৎক্ষণাৎ তার পা থেকে মাথার চুল অব্দি যেন মুহূর্তে একটা ঢেউ খেলে গেছে। ঐ তো পাখিটা—সেই চেনা নানানরঙা পাখি, আগন্তুকের মতো তার ঘরে এসে প্রবেশ করেছিল!

সুমতি অসোয়াস্তি কাতর হয়ে উঠেছে এবার। কী বলে ডাকবে খুঁজে পাচ্ছে না। শেষে হাত বাড়িয়ে বলল—টুটু, সোনা আমার, এস।

সে একটু এগিয়ে ফের ডাকল। টুটু... আয়!

পাখিটা লাফিয়ে লাফিয়ে ছাদে ছুটে চলেছে। পাছে সিঁড়ির ওদিকে যায়, সুমতি ছুটে গিয়ে সেখানে দু হাত তুলে দাঁড়াল। সামনে বিশাল শূন্য ধূসর হয়ে যাওয়া আকাশ—নক্ষত্রের অস্ফুট আভাস বহু দূরে। ও যদি পালিয়ে যায়! ভয়ে ভয়ে সুমতি প্রায় স্বপ্নের ঘোরে ডাকতে লাগল—সোনা আমার, মাণিক আমার...তোমাকে খুব ভালবাসব। টু-উ, টু-উ...

পাখিটা ঘরে ঢুকেছে আবার। খাটের নীচে গিয়ে ডাকছে—চিক্-চিক্-চিক্-চিক্ টু-উ!

সুমতি অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু পারল না। হঠাৎ তার মাথা ঘুরে উঠল। মাটি আঁকড়ে ধরে বসতে গিয়ে সে অনুভব করল খুবই নীচের দিক থেকে একটা শিসিয়ে ওঠা সুতীব্র তীক্ষ্ণ ব্যথা ঘুরে ঘুরে উঠে আসছে। এই দারুণ যন্ত্রণাটা যেন শব্দময়। শব্দ করে শব্দ করে পাকে পাকে মরচে-ধরা পুরনো লোহার পাতে স্ক্রু খোলার মতো। মাংস কেটে কেটে ঝরে পড়ছে। আর্ত চিৎকার করে উঠে সে মাথা ছাদের মেঝেয় ঘষতে থাকল। চুলগুলি পিঠে ছড়িয়ে পড়েছিল সুমতির। এবং নীচে থেকে হুড়মুড় করে যারা এই ছাদে উঠে আসছিল, ব্যাপারটা দেখে তাড়া-তাড়ি ছুটে এল তার কাছে।

বিমলাদি এসেছিলেন সকলের আগে। তাঁর পেছনে শোভাপিসি। তাঁরা দুজনেই টের পেয়েছিলেন, কী ঘটতে চলেছে।

প্রমথর ফিরতে তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। আপিস থেকে বেরিয়ে কোথায় বন্ধুর বাড়ি একটা জরুরী কাজ সারতে গিয়েছিল।

সিঁড়িতে ওঠার মুখে সুখময়বাবুর সঙ্গে দেখা। সুখময়বাবু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বল-লেন—আরও খানিক দেরী করে এলেই পারতে! কী মানুষ তুমি হে; ঘরে অমন ডেঞ্জারাস ব্যাপার ফেলে...ছ্যাঃ!

প্রমথ চমকে গিয়েছিল!—কী হয়েছে সুখময়দা?

—শিগ্‌গির ওপরে যাও। বৌমার অবস্থা ভাল নয় শুনলাম।

প্রমথ পাগলের মত সিঁড়ি ভাঙছিল।

(শেষাংশ ১২৯ পৃষ্ঠায়)

সংস্কৃতির সংকট

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আগেকার দিনে যাকে লিবারেল এডুকেশন বা উদারনীতির শিক্ষা বলত, যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় সাহিত্য, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, শিল্পতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হত, এখন তার নাম হয়েছে হিউম্যানিটিজ বা মানবাত্মিক শিক্ষা এবং কেমন করে জানি না, বেশীর ভাগ মানুষের ধারণা হয়েছে, শিক্ষা হিসাবে তা অনভিজাত পর্যায়ের। তাই দেখি স্কুল থেকে বেরিয়েই অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী আজ চায় ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার হতে। সুযোগ না হলে, চায় উচ্চতর বিজ্ঞানের ডিগ্রি নিয়ে বীক্ষণাগার, কারখানা ও কারিগরী কর্মশালার গবেষক, পরিচালক হতে। নিদেন পক্ষে হিসাব-বিজ্ঞানের ডিগ্রি অর্জন করে তালিকাভুক্ত একাউন্টেন্ট হতে। এছাড়া নৌবিদ্যা, বিমান বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, খনি বিজ্ঞান, সংখ্যা বিজ্ঞান ইত্যাদি শেখার দিকেও ঝোঁক পড়েছে শিক্ষার্থীদের। এই সব বিভাগের যত শিক্ষা, তাই হল এখনকার দিনে মুখ্য পদবীর শিক্ষা, মানবাত্মিক শিক্ষার আসন এর নীচে। ধরেই নেওয়া হয়, আয়েসী ধনী-ঘরের ছেলে-মেয়েরা নামের সঙ্গে দু-একটা ডিগ্রি জোড়ার জন্যে সে-শিক্ষা নিতে আসে, আর আসে বোকা ছেলে-মেয়েরা ভবিষ্যতে স্কুল মাস্টার, কেরাণী বা টাইপিস্ট হবে বলে।

বলা দরকার যে এ একটা যুগগত প্রত্যয় এবং এর ভিত্তি আগাগোড়াই মূঢ়তা ও অবিবেচনার ওপর স্থাপিত। আসলে ধন-কৌলীন্যাশ্রিত সমাজে ধনই বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভার মাপকাঠি রূপে গৃহীত। তাই ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, এ্যাকাউন্টেন্ট, জাহাজী, বৈমানিক প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ভালো আয় করেন বলে মনে করা হয়, যে-বিদ্যা প্রভাবে এই আয় সম্ভব হয়, তাহা অবশ্যই শ্রেষ্ঠতর বিদ্যা। পক্ষান্তরে সাহিত্য, ইতিহাস দর্শন ও শিল্পশাস্ত্রে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেলে স্বল্প বেতনের মাস্টারী বা কেরাণীগিরি ছাড়া কিছু জোটে না। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি বা ডক্টরেট পর্যন্ত যেতে পারলে, হয়ত কোন ভালো কলেজে নয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাঁই হতে পারে এবং তখন কিছুটা মর্যাদাও বাড়তে পারে। কিন্তু তাবও দাম বেশী নয়, তাছাড়া সে-রকম সুযোগ অনেকেরই হয় না। তাই মানবাত্মিক বিদ্যায় উত্তীর্ণ গ্র্যাজুয়েটদের সর্বোচ্চ বাজার দর আজ দাঁড়িয়েছে একশো-দেড়শো টাকা। (যদিও উপার্জনশীল অপেক্ষা বেকার গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যাই দেশে বেশী।) লিবারেল এডুকেশন বা মানবাত্মিক শিক্ষার এই উপার্জনস্বল্পতাই এ-শিক্ষার দর নামিয়ে দিয়েছে না দেবে কেন? চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, রেডিও ইঞ্জিনীয়ার, সয়েল ইঞ্জিনীয়ার, কেমিস্ট, জিওলজিস্ট বা পাইলট হলে, পদ ও অর্থ দুদিকেই যতটা ওজন বৃদ্ধি পায়, মাস্টার, প্রফেসার, কেরানী বা টাইপিস্ট হলে কি তা হয়? যাঁদের বড়ী নেই, গাড়ী নেই, ব্যাঙ্কে মোটা অঙ্কের টাকা নেই, বহুলোক যাঁদের আজ্ঞাধীন নন, আজকের এই বৈশ্য-যুগে তাঁরা সম্মানার্হ হবেন কি করে?

কিন্তু এই পর্যন্ত এসে আমার বক্তব্যকে অনেকেরই ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে। ভাববেন না বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার অনুশীলনকে বা বৃহৎ শিল্প-বাণিজ্যকে আমি ছোট করে দেখছি। আপনাদের মতো আমিও বিশ্বাস করি যে একটা দেশের বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক সামর্থ্য অনেকটাই নির্ভর করে এ দুইয়ের ওপর এবং এ-জায়গায় অগ্রগামী জগতের সঙ্গে একতালে চলার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে সব দেশকেই, নইলে জাহাজ, এরোপ্লেন, যন্ত্রপাতি, কল-কব্জা, ওষুধ, বই, কারিগরী-মস্তিষ্ক, সব কিছুর জন্যেই চিরদিন বাইরের মুখ চেয়ে থাকতে হবে তাদের এবং সেই সব পণ্য সরবরাহ করে শক্তিশালী বিদেশীরা যেমন একদিকে তাদের অর্থনীতিক মেরুদণ্ড পঙ্গু করে রাখবে, অন্য দিকে তেমনি তাদের রাজনীতিক দুনিয়াতেও অভিভাবক রূপে চেপে থাকবে। সুতরাং বিজ্ঞানে, কারিগরী শিল্পে ও বৃহৎ বাণিজ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল হতে হবে এবং সে-জন্যে কর্মী, গবেষক, উদ্ভাবক ও তত্ত্বজ্ঞ রূপে তরুণ-তরুণীদের দলে দলে এগিয়ে আসতেও হবে, তাতে সন্দেহ নেই। অন্যের কথা যাক, আমাদের কথাই ধরুন: বিদেশী শাসনের প্রায় দুশো বছরে এ-দেশে বিজ্ঞান ও শিল্প-বাণিজ্যের বিশেষ কোন অগ্রগতিই হয়নি। বিদেশীরা এ-দেশের কাঁচামাল সস্তায় সংগ্রহ করে, তা দিয়ে ইংলণ্ডের কারখানায় রকমারি পণ্য তৈরি করেছে, আবার এ-দেশের বাজারে তা এনে বিক্রী করেই কোটি-কোটি টাকা কামিয়েছে। এই বিকিকিনির কাজে যতটুকু নগর-বন্দর, যান-বাহন ও তার-বেতার দরকার, ততটুকুই করেছে তারা এবং এই সাম্রাজ্যিক বাণিজ্য সহজে চালানোর জন্যে কেরাণী-কর্মচারী তৈরি করবে বলেই স্কুল-কলেজ বসিয়েছে। ফলে যুগের অনুপাতে সামাজিক অগ্রগতি আমাদের সামান্যই হয়েছে। ইংল্যাণ্ড বিদায় হওয়ার পরে আজ দেখা যাচ্ছে, অগ্রগামী দুনিয়ার ঢের পিছনে পড়ে আছি আমরা। এই পশ্চাদ্বর্তিতা ঘোচানোর জন্যে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন, এ আমি অস্বীকার করি না।

কিন্তু প্রয়োজন বলেই, এ-ধারণা কেন হল মানুষের এবং সেটা হতেই বা দেওয়া হল কেন যে, লিবারেল এডুকেশন জিনিষটা খেলো? শিক্ষার উদ্দেশ্য কি শুধু যাতে প্রচুর পণ্য উৎপন্ন হয়, এমন সমস্ত কারিগরী কৌশল আয়ত্ত করা এবং তা থেকে স্ফীত দক্ষিণা আহরণ করা? জ্ঞানের বিকাশ, বুদ্ধির বিস্তার, চিন্তা ও কল্পনার পরিপুষ্টি...এগুলো কি অনাবশ্যক জীবনের জন্যে? ধরণ দেখে মনে হচ্ছে, বেশীরভাগ মানুষের ধারণা তাই। সেই জন্যেই দেখি, উচ্চপদস্থ এবং দায়িত্বজনক কাজে অধিষ্ঠিত মানুষরাও গোটা পৃথিবীর ত দূরস্থান, আপন দেশের ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, শিল্প-কলা, সমাজ-বিন্যাস, লোকনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধেও ন্যূনতম জ্ঞানটুকু রাখেন না। রাখেন না বলে রাখার যোগ্যতা তাঁদের নেই, তা বলছি না। এদিকগুলোর উপযোগিতাই অনুভব করেন নি তাঁরা কোনদিন, কেন-না যে-শিক্ষা তাঁরা পেয়েছেন উপর দিকে এসে, তার মধ্যে এ-সবের বিন্দু-বিসর্গও পান নি। বরং উল্টো কথাই শুনেছেন এবং দেখেছেনও। মানবাত্মিক শিক্ষায় পেটের ভাত হয় না কারো, পক্ষান্তরে প্রযুক্ত বিদ্যায় মোটামুটি কাজ গোছানোর সহায়তা হয় সকলেরই। আসলে সমাজের ধন-প্রভু যে বণিক-সমাজ, তাঁরা মুনাফার মাপকাঠিতে বিচার করেই যে-সব বিদ্যা তাঁদের ঐশ্বর্য উৎপাদনে অধিক সহায়তা করে, তার জন্যে উচ্চতর মূল্য ধার্য করেন। আর বণিক প্রাধান্য সমন্বিত সমাজে বণিকের মাপকাঠিই হয় সার্বজনীন মূল্য নিরূপণের মাপকাঠি। ফলে প্রযুক্তি বিদ্যায় শিক্ষিতেরাই বিবেচিত হন প্রাজ্ঞতর বলে এবং তোতাপাখীর মতো আমরাও বলতে অভ্যস্ত হই যে মানবাত্মিক বিদ্যা কিছু নয়, ছেলে-মেয়েদের একটা কোন লাইন ধরিয়ে দেওয়াই মঙ্গলের উপায়।

আসলে আমার মতে ডাক্তারী, উচ্চ কারিগরী বা হিসাববিদ্যার মাথা যতই ধবধবে হোক এক

জনের দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্পতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদিতে চলনসই রকম অর্থাৎ ভিত্তিমূলক জ্ঞান না থাকলেও তাঁকে প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ বলা যায় না। এ-রকম মানুষের অন্তরে ঔদার্য বা শুচিতা থাকে না, চিন্তায় থাকে না সুস্থতা, দয়া-মায়া স্খলিত এই মানুষরা হয়ে ওঠেন-অর্থাহরণ ও স্বার্থসাধনের যন্ত্র মাত্র কারণ মানব-হৃদয়ের মহৎ ও সুকুমার বৃত্তি যেগুলি, তা স্ফুরণের জন্যে দরকার অনুভূতি ও ভাব কল্পনার উত্তাপ। সে জিনিস মেলে মানবাত্মিক শিক্ষায়। বস্তুমূলক শিক্ষায় তা নেই। তা শুধু মানুষকে ক্ষমতাই যোগায়, হাত ও বুদ্ধির কৌশলই শেখায়। অবিবেকী অথচ ক্ষমতাবান, এমন মানুষ সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক তাতে আর সন্দেহ নেই। দুঃখের বিষয় যে শুধু এদেশে নয়, সব দেশেই আজ এমন মানুষের সংখ্যা অত্যধিক বেড়ে গেছে, কেন না এটা গতি-বিজ্ঞান ও পাইকারী উৎপাদনের যুগ এবং তা গেছে বলেই, সারা দুনিয়ায় আজ এত অশান্তি। এমন অসুস্থ আক্রোশ আজ মানুষের মূলুককে বিধ্বস্ত করছে। এখন প্রমত্ত ও ধনলিপ্সা ও প্রমত্ততব পাল্লাপাল্লি মানুষকে শিখিয়েছে তথা-কথিত বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষাই, যা বাহ্য ঐশ্বর্য বৃদ্ধির উপায় বটে, কিন্তু অন্তরকে যা সমৃদ্ধ করে না। আমরা দেখছি সমস্ত পৃথিবী আজ অমিত ধন ও শক্তির অধিকারী হয়েও বেশীর ভাগ মানুষকে ক্ষুধার অন্নে বঞ্চিত করেছে, পৃথিবীকে ঘাড়ে ধরে ঠেলে নিয়ে চলেছে পারমাণবিক যুদ্ধের দিকে কিন্তু কেন? চিত্তবৃত্তির সমুন্নতিহীন জড় শক্তির অধিকার এছাড়া আর কি কববে?

জিনিসটা আমাদের দেশে এখনো হয়তো ভালো কবে অনেকের চোখে পড়ছে না। কারণ, গ্রুম শিল্পের পূর্ণ বিকাশের অধ্যায়েই আমরা এখনো পৌঁছতে পারি নি। কিন্তু উন্নত ও বিজ্ঞানগর্বী দেশগুলিতে ত' দেখছি 'গেল গেল' রব উঠেছে। বিখ্যাত ইংরেজ ইতিহাসবিদ টয়েনবী বলেছেন, যে মানুষ হোমারের মহাকাব্য দুটি এবং এসকিলাস, সফোক্লিস বা প্লেটো, এরিস্টটলের রচনাবলী পড়েনি, আদ্যন্ত বাইবেল পড়েনি, মোলাকাত করেনি ভার্জিল, জুভেনাল, টেরেন্স, প্লিনি ও সিসেরোর সঙ্গে, দান্তে, শেক্সপীয়র, মিলটন ও মলেয়ারকে যে চেনে না, পরিচয় করেনি রুশো ভলটেয়ার ও গ্যাটের সঙ্গে। কান্ট হেগেল, হার্বার্ট, স্পেন্সার, ডারউইন আর অন্তর্লোকে প্রবেশ করেনি, রাফেল, দাভিঞ্চি, এঞ্জেলো, বেঠোফেন, মোর্জার্ট, সপাঁ যাকে রসার্দ্র করেনি, সে লোক ইউরোপীয় ত' নয়ই, শিষ্ট লোক বলে গণ্য হতে পারে কি না, তা-ও সন্দেহের বিষয়। টায়েনবীর মতে এইগুলি হল ইউ-রোপীয়তার ভিত্তিমূলক জ্ঞান। এ জ্ঞান যাঁর নেই, অথচ যিনি সেরা শল্য চিকিৎসক, কিংবা সেরা হিসাব পরীক্ষক, অথবা অপেরা হাউসের সেরা গায়ক, তিনি অসম্পূর্ণ মানুষ এবং এই সব অসম্পূর্ণ মানুষরা আজ ব্যক্তি-মর্যাদার তুঙ্গ শিখরে উন্নীত এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার যাঁরা, তাঁরাও এই রকম বা এর চেয়েও বেশী অসম্পূর্ণ মানুষ বলেই, পশ্চিমী সভ্যতা আজ গতিহীন হয়েছে। শুধু পশ্চিমে নয়, এ অবস্থা আজ হয়েছে এবং আস্তে আস্তে হচ্ছে সব দেশেই। ভারতবর্ষেও বেদ, উপনিষদ, তন্ত্র ও ষড় দর্শনের নামও শোনেন নি, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি চোখেও দেখেন নি, ভাস, কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্টের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ত দূরস্থান পরোক্ষ পরিচয়ও নেই, বৌদ্ধ, জৈন্য, শৈব-শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, কারো কোন বার্তাই জানেন না, ভারতের ভাস্কর্য, স্থাপত্য, কারুকলা সঙ্গীত, ভারতীয় জীবন ও মনন পদ্ধতি, ভারতের কয়েক হাজার বর্ষব্যাপী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, কোন কিছু সম্বন্ধে অণুমাত্র জ্ঞান নেই, এমন সব মানুষরাই প্রায় সর্বত্র আজ ওপরওয়ালা হয়ে বসে আছেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সব কিছুরই প্রভু তাঁরা কারণ পদার্থ না থাকলেও, পদ ও অর্থ দুয়েরই অধিপতি ত! এই সব লোকের হাতে আজ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব গেছে বলেই, ভারতবর্ষে আজ তুলির চেয়ে হাতুড়ি বড় হয়েছে, কবির চেয়ে ব্যাপারীর আসন উঁচুতে। পণ্ডিত আজ হয়েছেন কৃপার কাঙাল।

চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখি, শিল্পী, সাহি-ত্যিক, শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী, এক-কথায় সকল পর্যায়ের মননশীল মানুষের মধ্যেই জেগেছে চরম একটা উদ্‌ভ্রান্তি। প্রচুর পয়সা ও উঁচু চেয়ার পাওয়ার জন্যে হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি করছেন তাঁরা। নিজ নিজ ব্রত বা বৃত্তিতে আর আস্থা নেই কারো। থাকবে কি করে? লেখকের চেয়ে যেখানে প্রকাশক বড়, নাট্যকারের চেয়ে নট ও প্রযোজক বড়, শিল্পীর চেয়ে শিল্পপতির আসন উর্ধ্বে, সেখানে কি সংস্কৃতিমানের পক্ষে আপন সাধনায় অবহিত থাকা সম্ভব? এই জন্যেই বিশ শতকের মেধাবী মানুষরা এই পর্যায়ের সাধনায় প্রত্যয়হীন হয়ে দলে দলে যাচ্ছেন প্রযুক্তি বিদ্যার রাজ্যে এবং সারা পৃথিবীতেই তাই দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আজ হয়েছে প্রথম শ্রেণীর কর্মীর অভাব। অনিবার্যভাবেই তার মান দ্রুত নেমে যাচ্ছে। শুধু পাশ্চাত্য দেশে নয়, সর্বত্র আজ সংস্কৃতির অবক্ষয় এবং তার কারণ আর কিছু নয়, মানবাত্মিক বিদ্যাকে পিছনের সারিতে ঠেলে দেওয়া এবং তার জন্যে নগণ্য দক্ষিণা ধার্য করা। এতে শুধু সংস্কৃতিই ক্ষতি-গ্রস্ত হচ্ছে না, মানবিক আদর্শও ক্রমশঃ নেমে আসছে এবং সামাজিক অসাম্য ও অশান্তির পরিধি বেড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে পারমাণবিক যুদ্ধই বোধহয় শেষ পর্যন্ত মানুষের পরমা গতি। এ থেকে বাঁচার উপায় কি বা কিসে, তা আমি জানি না। আমি শুধু ব্যাধিটার স্বরূপই ব্যাখ্যা করলাম। তবে সম্ভবতঃ লিবারেল ও টেকনিক্যাল শিক্ষার সমন্বয় এবং ধন বণ্টনে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে, আপনা থেকেই আবার নূতন জীবন-দর্শনের ব্যাপ্তি হতে থাকবে এবং সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ও মানবিক সুবিচারসম্পন্ন যে নূতন সমাজের স্বপ্ন দেখি আমরা, তা সার্থকতার মাটি স্পর্শ করবে।

Gopal Hosiery, Calcutta-32

হ্যাপি-ভিলা

আশাদেবী

ব্রজবাবু বললেনঃ চেঞ্জে যেতে চাও, যাও না। আমার বাড়ী আছে মাধবপুরে। যাও না, থাকো গে।—নাম 'হ্যাপি ভিলা', যেমন নাম তেমনি বাড়ী। এমনি একটা সুযোগ খুঁজছিলেন তারিণীবাবু। ব্রজবাবুর কথায় যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। বললেনঃ ভাড়া কত দিতে হবে?

ঃ ভাড়া আবার কী। যাও থাকো গে, থাকাও হবে, দেখাও হবে বাড়ীটা। কতদিন আমরা যাই না, চাকর-বাকরের হাতে পড়ে আছে।

ঃ বেশ কালই আমরা রওনা হয়ে যাব। সুরমা তো যাবার জন্যে এক পায়ে খাড়া।

ঃ তাই যাও। এক পয়সাও খরচ নেই—আমার চাকর-বাকর-মালি আছে। কিছু করতে হবে না তোমাকে, তারাই দেখাশুনা করবে—। কালই চলে যাও। ভাল কাজে দেরী করতে নেই জানো তো।

অতএব—মোটঘাট নিয়ে পরের দিনই তারিণীবাবু আর সুরমা রওনা হয়ে গেলেন। সারা পথই সুরমা শুধু বলতে লাগলেনঃ কি মজা হবে, কতদিন কলকাতার বাইরে যাই না। প্রকৃতির সুন্দর পরিবেশে ভাবি আনন্দে দিনগুলো কাটবে আমাদের।

ঃ তা কাটবে—। তারিণীবাবু একটা সিগারেট ধরালেনঃ এখানে যেন আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল।

রাত দশটায় মাধবপুরে গাড়ী এসে পৌঁছানোর কথা, ইলেকট্রিফিকেশনের দয়ায় এলো রাত বারোটায়। ট্রেন থেকে নেমে মালপত্র নামিয়ে দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। ব্রজবাবু বলেছিলেন, টেলিগ্রাম করে দেবেন, ওদের লোক থাকবে স্টেশনে। যদি না থাকে, তবে উপায়? কোথাও তো গাড়ীর টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

ঃ স্টেশনে কেউ আসেনি—?

ঃ না আসেনি—

ঃ আসেনি মানে—?

ঃ আসেনি মানে আসেনি—

ঃ এখন উপায়—?

ঃ উপায় আর কী। সারা রাত মশা তাড়াতে হবে—তারিণীবাবু বললেন অনাসক্ত কণ্ঠে।

ঃ সে কি! কেউ আসবে না?—ব্রজবাবু তো বলেছিলেন—

ঃ বলেছিল তো। —এখন না এলে কী করবো? গাড়ী তো দু ঘণ্টা লেট, যদি এসে ফিরে গিয়ে থাকে?

সুরমার মুখে ভয়ের ছায়া নেমে এলো। কী করা যায় এখন?

এমন সময় দূরে দেখা গেল একটা গরুর গাড়ী সঙ্গে ঝুলন্ত লণ্ঠন নিয়ে স্টেশনের দিকেই আসছে। সুরমার মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

ঃ আমাদের জন্যে বোধহয় গাড়ীটা আসছে।

ঃ বলতে বলতে গাড়ীটা এসে স্টেশনে থামলো এবং একটি পবননন্দনের মত বৃহদাকার কি যেন লাফ দিয়ে গাড়ী থেকে পড়লোঃ বাবু আপনারা কলকাতা—

মুখের কথা শেষ হতে না দিয়ে তারিণীবাবু বললেন—

ঃ আবে, এতো দেখী করতে হয়। মশায় যে আমাদের ছিঁড়ে খেয়ে ফেললো। আর কি পোকা— কেউ কুটকুট করে কামড়াচ্ছে, কেউ সমানে ঝুড়সুড়ি দিয়ে চলেছে—কেউ গিলতে চেষ্টা করছে—

ঃ আতো করবেই বাবু, এখানে ওনারা একটু বেশী আছেন কিনা!

ঃ সে দেখতেই পাচ্ছি।—এখন আর কথা না বাড়িয়ে মালপত্রগুলো তোলো গাড়ীতে—, বাড়ীর দিকে রওনা হই আমরা।

সুরমা ছটফট করছিল, সে গরুর গাড়ী দেখে একটু হতাশই হলো। বললে কতক্ষণে বাংলোয় পৌঁছবো?

ঃ তা চার ঘণ্টাও লাগতি পারে। আমি রাতে ভলো চোখে দেখি না আর গরুগুলোয় পথের মধ্যে প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়ে।

ঃ ওমা সে আবার কী—পুকুরে-নালায় তো গিয়ে পড়বে না।

ঃ না পড়তে পারে— তবে ভয় করবেন না। গাড়ী কতবার নালায় পড়ে গেছে, কিন্তু কেউ বলতে পারবে যে কখনও গাড়ী সেখানে পড়ে থেকেছে? বটুক ঠিক পৌঁছে দেবে। সে বাড়ীতেই হোক আর হাসপাতালেই হোক। উঠুন মা, এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে।

দুচোখ বড় বড় করে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো সুরমা। আর তারিণীবাবু শুধু অসহায় ভাবে একবার বটুকের মুখের দিকে চাইলেন।

গাড়ী অন্ধকার পথ ধরে চলতে লাগলো। সুরমা আগে এক এক বার গাড়ী থেকে সভয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন এখন অসহায়ভাবে শুয়ে পড়লেন। আর দুঃখেই মানুষের গলায় মাঝে মাঝে গান আসে, তাই তারিণীবাবু মালসীগাওয়া গলায় ধরলেন—"জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে মনের ভুলে।"

কিন্তু গানে সাড়া দিলো বটুক। সে এর অর্থ বুঝেছে।

ঃ বাবু, ভুলে নয়, ইচ্ছে করে।—সোজা পথে ডাকাত পড়ে যে—

স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মত উঠে বসলেন সুরমা। তাঁর মুখে কোন কথা নেই। কিন্তু সুরমার কাছে নেহাৎ ছোট হয়ে যাচ্ছেন ভেবে হাতের টর্চটা দেখিয়ে বললেন তারিণীবাবু, আসুক না—দেব ঘা কতক বসিয়ে। বেরিয়ে যাবে মজা তখন।

সুরমা নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়লো, সে কথা শুনে। স্বামীর বীরত্বে তার বিশ্বাস নেই।

যাই বলা হোক বটুক পাকা গাড়োয়ান। প্রায় রাত তিনটে নাগাদ গাড়ী এনে বাংলোয় পৌঁছে দিলে।

চারদিকে নিবিড় জঙ্গল। ঘরে তিন চারটে রামছাগল শুয়ে আছে—গোটা দুই গরু। আর এক পুরো ব্যাটেলিয়ান আরশোলা, ছুঁচো আর চামচিকে নিদ্রাভিভূত হয়ে আছে পরম নিশ্চিন্তে।

বটুক ঘরে ঢুকতে ঢুকতে একটু সলজ্জ ভাবে বললেঃ বাবুরা আজ আট বছরের মধ্যেও আসেন না। তাই ছাগল আর গরুগুলো আমি এখানেই রাখি। নেপির মাকে বলেছিলাম ঘরটা পরিষ্কার করে রাখতে,—এগুলো সরিয়ে নিতে। তা বোধহয় উনি ভুলেই গেছেন। আপনারা বাবু এই ঘরটায় শোন আজ, কাল সব ব্যবস্থা করে দেব আমি। কিছু চিন্তা নেই। রাত হয়েছে—যান শুয়ে পড়ুন। দরজা-টরজা ভালো করে বন্ধ করবেন— চোরের উৎপাত আছে—। ও হো, দরজায় তো হুড়কো নেই—। আচ্ছা কিছু

ভয় নেই। কাল সব ঠিক করে দেব।

বলে বটুক গোরু ছাগল নিয়ে চলে গেল। নেংটি ইঁদুর আর আরশোলার সংগে যুদ্ধ করে বাকী কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে দিলেন তারিণীবাবু, আর সুরমার চোখে জেগে রইলো কানে জবাফুল হাতে লাঠি ডাকাতের বিভীষিকা।

ভোরের দিকে একটু ঘুম এসেছে চোখে। সারা দিনের ক্লান্তিতে অমনি দরজা ধাক্কা দিয়ে একেবারে ঘরে ঢুকে পড়লো একটা গরু আর তার সংগে লাঠি হাতে বটুক।—বোঝা গেল বটুক এবার বাড়ী পরিষ্কার করতে লেগে গেছে।—গরুর দিকে তাকিয়ে সুরমা বললে: ধরো, ধরো, ও যে বিছানায় উঠে আসছে—

: না মা—ও তেমন গরু নয়। বলেই টক করে গলায় একগাছা দড়ি, সভাপতির গলায়

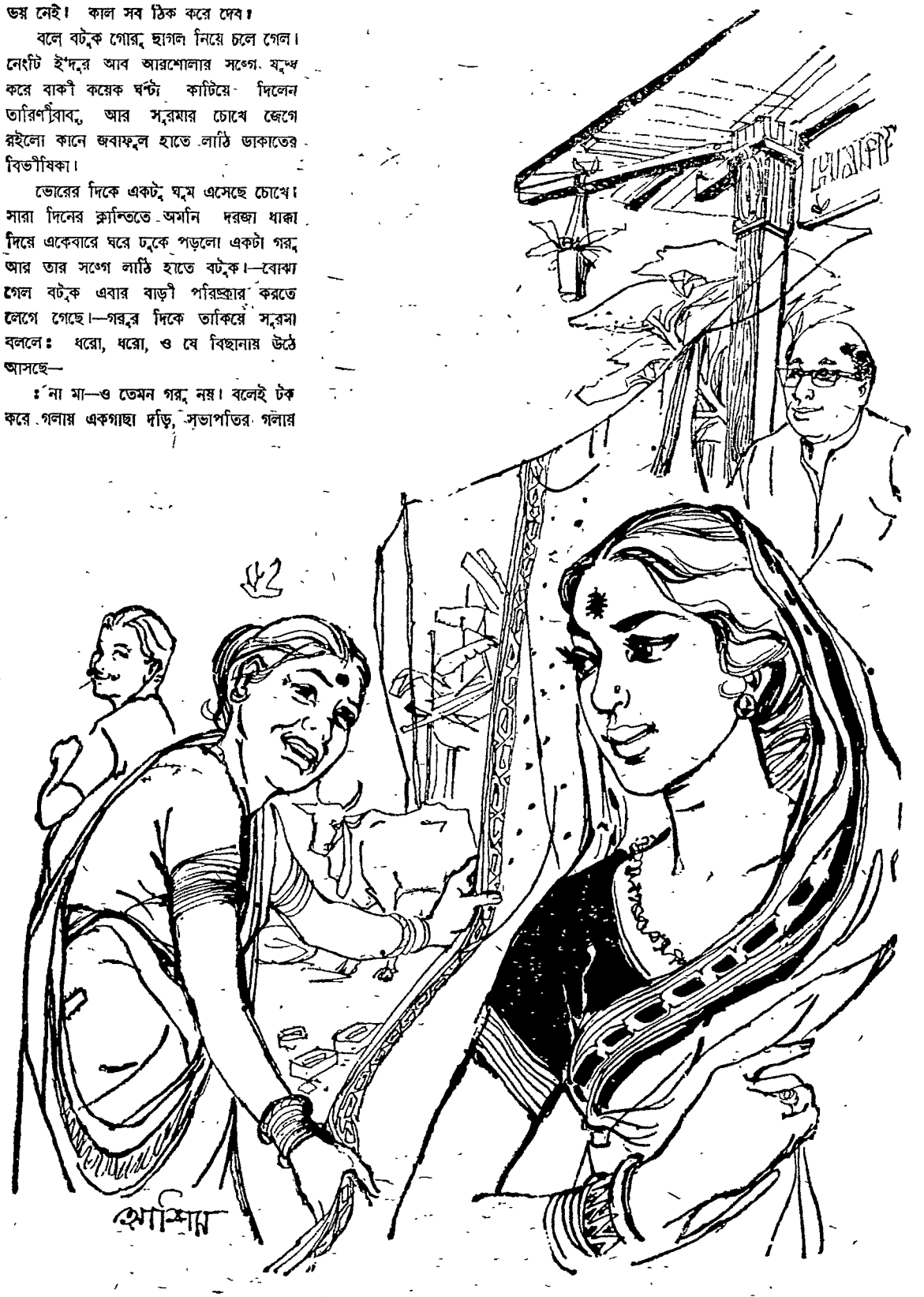

ফুলের মালা পরাবার মত করে, দিয়ে গোরুটাকে টেনে নিয়ে চললো বাইরে।

খানিক পর বটুকের স্ত্রী দু কাপ চা আর একবাটি মুড়ি এনে ওদের সামনে দিতেই যেন হাতে স্বর্গ পেলেন দুজনে। কাল থেকে খাওয়া নেই—চায়ের জন্যে প্রাণটা ছটফট করছে।

চা-টা খেয়ে একটু খুশী হয়ে বাইরে এলেন সুরমা। বাড়ী পরিষ্কার করবার জন্যে জন্য পনেরো কুলি লেগেছে। বটুক ব্যস্ত হয়ে তদারক করছে। বটুকের স্ত্রী রান্নার আয়োজন করছে। আটটি ছেলেপিলে গংগা-ফড়িঙের মত লাফিয়ে বেড়াচ্ছে বাড়িময় বাড়িতে মহোৎসব লেগে গেছে।

সুরমা বেশ খুশী মনে একবার এধার আর একবার ওধার ঘুরছেন। বটুক এসে দাঁড়ালো। মা কুড়িটা টাকা চাই—

: কেন?

: বাজারে যাব। এতগুলো লোক খাবে

—চালের যা দাম! আজ অজ হাট আছে, কিছু বেশী করে চাল কিনে রাখলেই ভালো। আপনি বরং চল্লিশটা টাকাই দিন।—

সুরমা আপত্তি করতে যাচ্ছিল কিন্তু তারিণীবাবু চোখ টিপে বললেন, দাও দাও, বটুক যা চায় দাও—ও হিসেব দেবে পরে। বটুক খানিকটা ইতস্তত খেয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইলো। হিসেব দেবার মত কী গুরুতর অন্যায় সে করেছে তা সে কিছুতেই বুঝতে পারলো না। বটুকের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে বটুকের স্ত্রীর প্রবেশঃ বাবু দাড়ি কামাবার জন্যে ডাবের জল রইলো।

ঃ দাড়ি কামাবার জন্যে ডাবের জল? তারিণীবাবু ঘাবড়ে গেলেন।

ঃ হ্যাঁ। বাবু তো ডাবের জলেই দাড়ি কামান—তাই—

ঃ বেশ দাও—। বলে তারিণীবাবু তাকে বিদেয় দিলেন। এবং মেয়েটি চোখের আড়াল হতেই দাড়ি কামানের জল তার উদরস্থ হলো।

খাওয়া দাওয়া হলো রাত্র সমারোহে। আটটি ছেলেপুলে নিয়ে বটুক গেলো। সুরমা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন শুধু, আর ভাবলেন প্রথম দিন কি না তাই ওরা সবাই এখানেই খেলো। এর পর নিশ্চয় অন্য ব্যবস্থা হবে।

বেলা পড়ে এলো। মজুরদের কাজ হয়ে গেছে, বটুক এসে দাঁড়ালো।

ঃ বাবু ওদের কুড়িটা টাকা দিয়ে দিন। বিনা কথায়ই দিতে হলো টাকা কটা, উপায় ছিল না এ ছাড়া। আজই এসে তো আর ঝগড়া করা যায় না।

রাতে খেয়ে দেয়ে বিছানায় গিয়ে সুরমা বললেঃ হুড়কো তো হোলো কিন্তু জানালার যে গরাদ নেই পাল্লা নেই তা তো করালে না।

ঃ কাল করাব ওগুলো। কাঠ তো লাগবে—যা দাম কাঠের, কি যে করি?

ঃ আর করিয়ে দরকার নেই, চলো কালই চলে যাই আমরা। এমনি করে হোটেলের খরচ জোগাতে পারা যাবে না তো—এই গণ্ডগ্রামে।

ঃ আমিও তাই ভাবছি ব্রজবাবুর 'হ্যাপি ভিলায়' আর থেকে কাজ নেই।—এরপর প্রাণ নিয়ে পালান দায় হবে বলেই মনে হচ্ছে।

ঃ বাব্বা, এত কথা। এ কি আগে জানি—তাহলে আসতামই না এখানে।

ঃ যেতে গেলেও তো ওই বটুকের স্মরণই নিতে হবে—ওকে চটালেই বিপদ, যাওয়া বন্ধ—খাওয়া বন্ধ —সব বন্ধ।

ঃ চটাবে কেন? ভালো করে বুঝিয়ে বলবে যে আমাদের আর থাকা সম্ভব নয়।—

ঃ ও কি বুঝবে? ওর আকার-প্রকার দেখে তো তেমন বোধহয় না।

কথা বলতে বলতে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ মনে হলো মাঝ রাতে কি যেন ছবে জুতো পায়ে হাঁটছে। তারপর কিছুক্ষণ পর যেন সব থেমে গেল। নাঃ ভুল শুনেছেন সুরমা, কে আর আসতে যাবে। আবার ঘুমিয়ে গেলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর মনে হলো, কে যেন ওঁর কাপড় ধরে টানছে, চোরই হবে তা হলে।—সুরমা ডাকলেনঃ ওগো চোর, কাপড় টানছে যে।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো—আর একটা কেমন গন্ধ।

ঃ ওগো চোর ঘরে ঢুকেছে—ওঠ। সুরমার গলা যেন ভয়ে চেপে আসছেঃ ওগো চোরটা নিশ্চয়ই পাকা চোর—স্নানটান করে না। গায়ে গন্ধ।

ঃ ওগো—ওঠো।—এবার সাড়ীতে সজোরে টান এবং এক গুতো সুরমার পায়ে। চোরের প্রথম সম্ভাষণ।

চিৎকার করে টর্চ ফেলতেই তারিণী দেখলেন, বটুকের কালীবাড়ীতে মানত করা পাঁঠাটা সুরমার সাড়ীর অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেছে, তারপর তারিণীবাবুর দিকে শিং নেড়ে তেড়ে আসছে কিন্তু ধুর্জটির প্রায় তরঙ্গহ ডম্বরু বাজিয়ে।

এক্সলাফে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা থেকে একটা বাঁশ তুলে নিয়ে আত্মরক্ষা করলেন তারিণীবাবু। কিন্তু এতদিনের সুখস্বর্গ যারা স্থল করেছে তাদের কিছুতেই ক্ষমা করবে না মনে করে— বোঁ বোঁ শব্দে ধিক্কার দিয়ে ছাগল বেয়োনেটের মত শিং নেড়ে ছুটতে চাইলে কিন্তু তার পরবোধ করলো সুরমা হাতে এক ঝাঁটা। দুদিকের প্রহারে ছাগল রণে ভঙ্গ দিলে, যাবার সময় বোধ হয় ব্যা-ব্যা স্বরে বলে গেল, 'কাপুরুষ! দুজনে মিলে একজনকে—ছ্যাঃ।'

বাকী রাত আর ঘুম হলো না। ছাগল চলে গেল কিন্তু পাগল চাপলো সুরমার ঘাড়েঃ কাল সকালেই চলে যাব। আর থাকবো না। কখন সাপে কামড়াবে, কখন বাঘে ধরবে এ পোড়া দেশে। কিছুতেই থাকবো না আর।

ঃ আরে অত রাগ করলে চলে। আজকের রাতটা যাক, কাল সব ব্যবস্থা করবো।

ঃ তোমার তো কিছুতেই কিছু হয় না। আমি তো তখনই বলেছি যে চলে যাই—তুমিই জোর করে থাকলে।

ঃ লক্ষ্মীটি, ঘুমোও একটু। সকালেই আমি ব্যবস্থা করবো—

ঃ আমার ঘুম কিছুতেই আসবে না—

ঃ আমি তোমাকে থাবড়াই—তুমি ঘুমোও।

সারা গায়ের ওপর কে থাবড়াচ্ছে মনে হলো। বেশ জোরে জোরে, আর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাত দিয়ে—

ঘুমের মধ্যে স্বামীর হাত বলে ধরতে গিয়েই ঘুম ভেঙ্গে গেল—। বিরাট এক কোলা ব্যাঙ। এতক্ষণ সর্বাঙ্গে লাফাচ্ছিল, এখন সে সুরমার করায়ত্ত। উভয়ে উভয়ের দিকে প্রথম প্রণয়ের দৃষ্টি বিনিময় করলো।

উঠেই সুরমা বিছানা-পত্র গোছাতে লাগলো। বটুক এসে দাঁড়ালোঃ মাঠাকরুণ, পঞ্চাশটা টাকা দিন।

ঃ কেন?—কণ্ঠে মেঘমন্দ্র ধ্বনি শোনা গেল।

ঃ বাবু কতকগুলো দামি গাছের অর্ডার দিয়েছিলেন। বাড়ী জঙ্গল ছিল বলে আর আমি ওগুলো ছাড়াই নি। কাল যখন দেখলাম বাড়ীও পরিষ্কার হয়ে গেছে আর আপনারাও এসে পড়েছেন তখন নিয়েই এলাম ভি-পি-টা।

পঞ্চাশটা টাকার পাঁচটা নোট ছুঁড়ে ফেলে সুরমা বললে গাড়ী ঠিক কর বটুক—আমি সব গুছিয়ে নিচ্ছি। খাব না—এখুনি রওনা হবো।

ঃ আজ তো যাওয়া হতে পারে না মা—

ঃ কেন?—সুরমা যুদ্ধের ঘোড়ার মত ঘুরে দাঁড়ালো।

ঃ আজ আমার গাড়ী বালি সিমেণ্ট আনতে গেছে।—না এলে তো—

ঃ বালি সিমেন্ট—? কি হবে? সুরমার চোখ ছানাবড়া।

ঃ ওই ঘরটা শেষ হয়নি দেখছেন তো—ওটা ত্রিশজন মিস্ত্রী কুলিকে লাগিয়ে সাত দিনের মধ্যে শেষ করে দেব। ওতে আপনারা থাকবেন—তাই শ তিনেকের মধ্যেই হয়ে যাবে—কিছু কমও লাগতে পারে—

ঃ আমি হেঁটেই যাব—আর এক মুহূর্তও না—

ঃ তারিণীবাবু অসহায়ের মত বসে আছেন বারান্দায়ঃ সুরমা বৃথা চেষ্টা—ওই যে অদূরে ত্রিশজন কুলি মিস্ত্রী কাজ করছে ওরা জানে আমরাই ওদের কাজ করাচ্ছি।—টাকা না দিয়ে পালানো আর মরদেহে যেতে হবে না—আধ্যাত্মিকভাবে যেতে হবে।—

সুরমা যেন ভিরমি খেয়ে পড়লেন বিছানার ওপর।—

বিকেলে বাইরে মেলে দেওয়া একখানা নূতন ঢাকাই সাড়ী ভাঁজ করতে করতে বটুকের স্ত্রী বললেঃ মা—এই সাড়ীটা আমি নিই—কতদিন এমন সাড়ী পরি না। মালক্ষ্মী এলে এমনি একখানা পাব আমি জানতাম, আজ

(শেষাংশ ১৭ পৃষ্ঠায়)

= শারদীয় অভিনন্দন =
শীল ট্রেডিং কোং
সর্বপ্রকার লৌহ, হার্ডওয়ার ও মেটাল দ্রব্য
বিক্রেতা এবং অর্ডার সরবরাহক
২০/১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭
ফোনঃ ৩৩৫২৬৮

এক

স্নেহের অনন্ত,

তোমার চিঠি যথাসময়েই পেয়েছিলাম, কিন্তু নানা কাজের ব্যস্ততায় উত্তর দিতে পারি নি। তোমরা জানো আমি ঠিকাদার মানুষ, ইঁট-সুরকি নিয়ে বাস করি। কিন্তু আমাদের গ্রামটির কথা, আমার মন থেকে কখনো দূর হতে পারে না। শহরে বড় বড় বাড়ি বানানো আমার কাজ হলেও খেলাই গ্রামের সেই মাটির ঘরের স্মৃতি কোনদিনই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। একটু অবসর পেলেই ওখানে ছুটে যাওয়ার জন্যে মন হাঁস-ফাঁস করে। তোমার পরের চিঠিতে জানলাম, একটা হাসপাতাল গড়ে তোলার কাজে তোমরা অনেকখানি এগিয়েছো। আমার কাছে দশ হাজার টাকা চেয়েছো, কিন্তু হয়তো বিশ্বাস করবে না, খরচ করার মত দশটা পয়সাও আমাদের কন্ট্রাক্টরদের হাতে থাকে না। তবে যথাসাধ্য আমি নিশ্চয়ই সাহায্য করবো। কিন্তু গ্রামের ও আশেপাশের বড় জোতদার বা ব্যবসাদারদের দানে কোন কিছু গড়ে তোলার দিন কি এখন আর আছে? সে সব এখন আর সম্ভব নয়। সরকার যদি এদিকে মন না দেয়, তা হলে কিছুই হবার নয়। তোমরা বরং মন্ত্রী ধরো, চারপাশের গ্রামের লোকদের দিয়ে দরখাস্ত করাও। চেষ্টা করলে সরকারী টাকায় বেশ বড় একটা হাসপাতাল ওখানে হতে পারে। তারপর আমি তো আছিই। ইতি

গুণময়দা

দুই

নুটুদা,

বারাসতের সেই ব্যাপারটা নিয়ে টেলি-ফোনে আপনার সঙ্গে কথা হওয়ার পর এক-দিন যাবো যাবো করেও যেতে পারলাম না। তাই খেলাই গাঁয়ের এই ছেলে কাঁটিকে আপনার কাছে পাঠালাম। ওরা ওখানে একটা হাসপাতালের জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে, আমি বলেছি আমিও যথাসাধ্য সাহায্য করবো। স্বাধীনতার পর কত জায়গায় কত ইস্কুল-কলেজ-হাসপাতাল হোল, অথচ আপনার গ্রাম কালিকাপুরের জন্যে কিছুই হলো না। আপনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, তার ওপর মন্ত্রী, আপনার পক্ষে, নিজের গ্রামের পক্ষে কিছু করলে পক্ষপাতিত্ব মনে হবার সম্ভাবনা বলেই আপনি এদিকে নজর দেন নি, একদিন বলে-ছিলেন। কিন্তু গ্রামের লোকদেরও তো একটা দাবী আছে। আপনি এদের কথা একটু ধৈর্য ধরে শুনবেন আশা করছি। আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানবেন। ইতি

গুণময়

তিন

অনন্ত,

নুটুদার সঙ্গে তোমরা দেখা করার পর আমার কথাবার্তা হয়েছে। তোমরা হাজার পনেরো টাকা চাঁদা তুলতে পারলে বোধ হয় একটা সুরাহা হবে।

খবর দিও-মাঝে মাঝে। ইতি

গুণময়দা

চার

অনন্ত,

অনেকদিন তোমাদের চিঠি না পেয়ে ভেবেছিলাম তোমরা আশা ছেড়ে দিয়েছো। যাই হোক, টাকার প্রতিশ্রুতি যখন পেয়েছো তখন বাকী টাকাটা গভর্নমেন্ট থেকে পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। নুটুদাদের কালিকাপুর থেকে আমাদের খেলাই পর্যন্ত বারো মাইলের মধ্যে একটাও হাসপাতাল নেই, গ্রামের লোক-দের দুঃখকষ্ট ইত্যাদি জানিয়ে তোমরা খবরের কাগজে কয়েকখানা চিঠি ছাপানোর ব্যবস্থা করো। রমেশ নন্দীর ছেলে খবরের কাগজের লোক, তাকে গিয়ে ধরতে পারো। ইতি

গুণময়দা

পাঁচ

অনন্ত,

খবরের কাগজের কাটিংগুলি পেলাম। আমাকে পাঠানোর দরকার ছিল না, আমি আগেই দেখেছি। তাই ফেরত পাঠালাম। এগুলি নিয়ে জগৎপুরের নিশা ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করো। উনি যদিও আমাদের পাশের নির্বাচনকেন্দ্র থেকে বিধানসভায় এসে-

ছেন, তবু খেলাইয়ের প্রতিবেশী গ্রামের লোক তো উনি। তা ছাড়া বিরোধী পক্ষের সদস্য হিসেবে ওঁর পক্ষে হাসপাতালের অভাবের কথাটা তোলা অনেক সহজ। নিশাবাবুকে আমিও চিঠি দিলাম। ইতি

গুণময়দা

ছয়

অনন্ত,

কাল নুটুদার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হলো। নিশাবাবু বিধানসভায় আলোচনার সময় বেশ বুদ্ধি করে বলে নিয়েছেন। নুটুদার উত্তরটাও আশাপ্রদ। তোমরা দু'একজন চিঠি পেয়েই নুটুদার সঙ্গে দেখা করো। আর নিশাবাবুকে ধন্যবাদ দিয়ে এসো। আমিও তাঁকে টেলিফোনে ধন্যবাদ জানিয়েছি। ইতি

গুণময়দা

সাত

নুটুদা,

শেষ পর্যন্ত যে ব্যবস্থা হলো, তার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। আমরা সত্যিই আপনার জন্যে এতকাল গর্ববোধ করে এসেছি। এখন আরো কৃতজ্ঞ রইলাম। আমার কর্মচারী শিবেনবাবু চিঠি নিয়ে যাচ্ছে, ওর কাছে সব শুনবেন। আপনার লিভারের ব্যথাটা এখন কমেছে কিনা জানাবেন। প্রতিদিন এক চামচ করে কালমেঘের রস খেয়ে দেখলে পারতেন। আমি উপকার পেয়েছিলাম। যদি না পান, আমাকে জানাবেন, প্রতিদিন টাটকা কালমেঘ পাঠানোর ব্যবস্থা করবো। পরের সপ্তাহেই দেখা করছি। ইতি

গুণময়

আট

প্রিয় শিবেন,

আমি রাঁচি থেকে এ সপ্তাহে ফিরতে পারবো না। খারাসভের কাজ কতদূর এগিয়েছে, সিমেন্ট রাখার কি ব্যবস্থা করলে, যতীনবাবু ইস্কুলবাড়ির প্ল্যান সাবমিট করেছেন কিনা—সব জানাবে। আর নুটুদার সেক্রেটারী ভদ্রলোক—নামটা ভুলে গেছি, তাঁর সঙ্গে দেখা করে খেলাইয়ের হাসপাতালের অর্ডার ইস্যু করার জন্যে তাগাদা দেবে। একটু চা-টা খাইয়ো। ইতি

গুণময় সেন

নয়

যতীনবাবু,

আমার ফিরতে আরো তিন-চারদিন লাগবে। এখানকার বিলটা আদায় হলেই যাবো। কাজ করে টাকা আদায় করা এক সমস্যা। বারসাপত্র গুটিয়ে ফেলতে ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে। যাই হোক, আপনার ইস্কুলবাড়ির প্ল্যানটা ওদের খুব পছন্দ হয়েছে শুনলাম।

আমাদের খেলাই গ্রামের মাঠে বড় রাস্তার ধারে একটা বড় হাসপাতাল হবার সম্ভাবনা আছে। সরকারী আপিসের কাজ তো জানেন, কত টাকা মোট খরচ হবে ঠিক করতেই আঠারো মাস লাগবে। অতএব আপনি একটা প্ল্যান এঁকে রেডি করে রাখুন, লাখ দেড়েক টাকার মত খরচ করাতে চাই। হাতের কাছে প্ল্যানটা ফেলে দিয়ে অর্ডার পাস করানো সহজ হবে।

আজ সকালে শিবেন ট্রাংক কল করেছিল, তাকেও বুঝিয়ে দিয়েছি। ইতি

গুণময় সেন

দশ

নুটুদা,

শিবেনকে আপনার কাছে হাসপাতালের প্ল্যানসমেত পাঠালাম। আপনি একটু দেখবেন। আপনাদের ইঞ্জিনীয়ারদের দিয়ে প্ল্যান করাতে গেলে আমরা আর হাসপাতাল দেখে যেতে পারবো না। তাই নিজের খরচেই করালাম। প্রায় পঞ্চাশটি গ্রাম যখন উপকৃত হবে, তখন প্ল্যানের খরচ না হয় আমিই দিলাম।

আমি কাল রাঁচি থেকে ফিরেছি। আজ রিষড়া যাচ্ছি। দুদিন থাকবো।

ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে আপনি একটু বলে দেবেন এ বিশ্বাস আমার আছে। আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানবেন। ইতি

গুণময়

পুঃ আপনার নির্দেশ মত শঙ্করের চাকরির কথা কলিন সাহেবকে বলেছি। বোধ করি হয়ে যাবে।

এগার

শিবেন,

আমাদের করা হাসপাতালের প্ল্যানটা একটু অদলবদল করে অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে জেনে খুশী হলাম। টেন্ডার ইনভাইট করে কবে বিজ্ঞাপন বের হবে আগে থেকে জেনে নিও। অদলবদল হওয়ার ফলে এস্টিমেট কি দাঁড়াবে যতীনবাবুকে ভালো করে হিসেব করতে বলবে। খাঁকতি আজকাল সবই বেড়ে যাচ্ছে, সেদিকটা মনে রাখতে বলবে। বসন্তবাবু লোকটাকে না ট্রান্সফার করাতে পারলে চলছে না। সামান্য এটুকু কাজের জন্যে এত টাকা? ইতি

গুণময়

বারো

বসন্তবাবু,

শিবেনবাবুকে আপনার কাছে পাঠালাম। শুনবেন। আপনি চিরকালই আমার উপকারী বন্ধু, কৃতজ্ঞচিত্তে সে কথা আমি চিরকাল মনে রাখবো। কে কে টেন্ডার দেবে আন্দাজ পেলে অনুগ্রহ করে জানাবেন। আর চিনি চাই? ইতি

গুণময়বাবু

তেরো

শিবেন,

পরশুদিন দুর্গাপুর থেকে ফিরছে পারবো আশা করছি। কিন্তু তার আগেই খেলাইয়ের হাসপাতালের টেন্ডার সাবমিট করতে হবে। বসন্তবাবুর সঙ্গে ভিতরের খবর পেয়ে যতীনবাবুকে ফ্রেস এস্টিমেট দিতে বলবে।

রিষড়ার বিলটা পাশ করাতে একবার যেতে হবে তোমাকে। আমি সেবার টু পারসেন্টের বেশি রাজি হই নি। তুমি দরকার হলে একটু বাড়িও। ইতি

গুণময় সেন

চোদ্দ

শিবেন,

টেন্ডার অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে জেনে খুশী হলাম। নুটুদা কি কিছু বলে দিয়েছিলেন? ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার দাশগুপ্তর সঙ্গে তুমি এখনো আলাপ করে উঠতে পারো নি কেন বুঝলাম না। অত্যন্ত অন্যায় করেছো। কাজটা হাতে পাওয়ার আগেই আলাপ জমিয়ে রাখতে হতো। এখন গেলে তো শুধুই টাকা-পয়সার সম্পর্ক। ইতি

গুণময় সেন

পনের

অনন্ত,

অনেকদিন তোমাদের কোন খবরাখবর নেই। তোমরা কি আমাকে ভুলে গেলে? অথচ তোমাদের উৎসাহ দেখেই হাসপাতালের জন্যে আমি আজ ন'মাস ধরে কি পরিশ্রম করেছি ভাবতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত হাসপাতাল হচ্ছে। যদিও গ্রামের হাসপাতালের বাড়িটা বানিয়ে ব্যবসায় বিশেষ কোন লাভই হবে না, তবু এ কাজটা আমি নিজে হাতে নিয়েছি। ঠিকাদারদের কোন বিশ্বাস নেই, জানো তো। শেষে এত্ত-চেষ্টার একটা হাসপাতাল স্যাংশন করিয়ে দু'দিনে ধ্বসে পড়বে এ আমি চাই নি। তাই কাজটা নিজেই নিয়েছি।

তোমরা একটু সহযোগিতা করো। ইতি

গুণময়দা

ষোল

শ্রদ্ধেয় নিশাবাবু,

অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি। সাত-কাজে এত ব্যস্ত থাকি যে সময় করে উঠতে পারি না। আজকাল কন্ট্রাক্টরদের অবস্থা তো জানেন, সরকারী

আপিসের পেয়াদা থেকে মন্ত্রী অবধি সবাই ধমক দেয়। আর পদে পদে হাত বাড়িয়েই আছে। আপনারা তবু মাঝে মাঝে দু-একটা সত্যি কথা মুখের ওপর বলেন।

খেলাইয়ের হাসপাতালের কাজটা আমি নিয়েছি। লাভ হবে না, লাভ একমাত্র আমাদের ও তল্লাটে একটা বড় হাসপাতাল হবে। বুড়ো বয়সে ওখানে গিয়েই থাকবো, আমার সাধ, তাই হাসপাতালটা যাতে ভালো হয় তার চেষ্টা করছি। তবে, জানেন তো, সব সময়ে সব কাজ নিজে দেখতে পারি না। কর্মচারীদের ওপর নির্ভর করতে হয়। যদি হাসপাতালের কাজে কোন ভুলভ্রান্তি দেখেন, দয়া করে কোন হৈ-চৈ করবেন না। আমাকে জানাবেন, আমি ঠিক করে দেবো।

সেদিন হঠাৎ কিছু গলদা চিংড়ি পেয়ে গেলাম, আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। খারাপ হয়ে যায় নি তো? ইতি

গুণময় সেন

সতেরো

শিবেন,

ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার দাশগুপ্ত দিনকয়েক কোলকাতায় থাকবেন, ওঁকে কারনানি ম্যানশনের ফ্ল্যাটটা খুলে দিও, বগলাকে কাজকর্ম করে দিতে বলো। আর সব আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা করে দিও। ইতি

গুণময় সেন

আঠারো

অনন্ত,

তুমি খেলাইয়ের ছেলে আমিও খেলাইয়ের ছেলে। তোমার বাবা ও আমার বাবার মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল, আমি আজো ভুলি নি। তা ছাড়া এই হাসপাতালের জন্যে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তুমি জানো না। সরকারী আপিসে এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে একটা চিঠি সরতে তিন মাস লাগে। আমরা কন্ট্রাক্টররা চেষ্টা করি বলেই সেগুলো নড়াচড়া করে। এদেশে যদি কিছু কাজ হয়ে থাকে তা আমাদেরই চেষ্টায়। এর জন্যে এরই মধ্যে কত টাকা জলে গেছে তার হিসেবও জানি না। তবে সে টাকা জলে যায় নি বলে মনে করি, কারণ নিজের গ্রামের কাছে একটা এত বড় হাসপাতাল হচ্ছে এইটুকুই আনন্দ। অন্তত পাশাপাশি পঞ্চাশটা গ্রাম এ থেকে উপকার পাবে।

শুনলাম ছেলেদের দল নাকি আমার রাজমিস্ত্রী ও ওভারসিয়ারদের নানাভাবে উত্যক্ত করছে। তোমরা এর বিহিত করো। আর ইঁটের কোয়ালিটি, দরজা জানলার কাঠ ইত্যাদি নিয়ে তাদের বাজে প্রশ্ন করার কোন মানে হয় না। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, মিস্ত্রীরাই যদি জানতো, তা হলে তারাই তো কন্ট্রাক্টর হয়ে যেতো।

বিশ্বাস রেখো, আমার গ্রামকে অন্তত আমি ঠকাবো না। তা ছাড়া ইঞ্জিনীয়ার দাশগুপ্ত নিয়মিত ইন্সপেকশনে যাচ্ছেন।

তোমাদের সহযোগিতা কামনা করি। ইতি

গুণময়দা

পুঃ হাসপাতাল সম্পূর্ণ হতে দাও, তখন দেখলে তোমরাও খুশী হবে। এখন খুঁটিনাটি ব্যাপারে বাধা দিলে শেষ অবধি হয়তো হাসপাতাল হওয়াই বন্ধ হয়ে যাবে।

উনিশ

শিবেন,

ইঞ্জিনীয়ার দাশগুপ্তের জন্যে চারখানা ক্রিকেটের টিকিট যেভাবে পারো জোগাড় করে তাঁকে পৌঁছে দেবে।

গুণময় সেন

বিশ

অনন্ত,

তোমার চিঠি পেলাম, ও তুমি যে আমার কথা বুঝতে পেরেছো জেনে খুশী হলাম। আমার চিঠিতে আমি কি তোমার ওপর দোষারোপ করেছিলাম? আসলে আমার সন্দেহ, বিরোধী পক্ষের সদস্য নিশ্চয় ভটচায কয়েকটি ছেলেকে নাচিয়েছিল। গভর্নমেন্ট কোন ভাল কাজ করে এ তো ওরা সহ্য করতে পারে না, যে কোন প্রকারে বাধা দিতে চায়। তোমরা তাদের বোঝাবার চেষ্টা করো। ইতি

গুণময়দা

একুশ

শ্রদ্ধেয় নিশাবাবু,

কাল আপনার বাড়ি থেকে ফেরার পর আপনার কথাগুলি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। সত্যি, এ-ভাবে চললে এ দেশের কোন উপকার হওয়া সম্ভবই নয়। আপনাদের পার্টির ফাণ্ডে পাঁচ শো টাকা দিতে বলেছিলেন, আমি আজ শিবেনের হাতে এক হাজার টাকা পাঠালাম। আমার পক্ষে যেটুকু সাধ্য সেটুকুই বা করবো না কেন। আপনারা হয়তো ভাবেন আমরা অনেক লাভ করি। কিন্তু ধারণাটা ভুল। একদিকে ট্যাক্স সতেরো রকমের, অন্যদিকে পদে পদে ঘুষ। ব্যবসা করতে ইচ্ছে হয় না। আর দিশি জিনিসের যা হাল হচ্ছে আজকাল, আমরা নিরুপায় বলে ব্যবহার করি, লোকে দোষ দেয়।

আগামী ইলেকশনে আপনি আর দাঁড়াবেন না বলছিলেন। কিন্তু হাজার হাজার মানুষ যে আপনার মুখ চেয়ে আছে এ-কথাটা ভুলবেন না। সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন। ইতি

গুণময় সেন

বাইশ

মাই ডিয়ার দাশগুপ্ত,

লঞ্চে করে দিনকয়েক সুন্দরবনের দিকে বেড়াতে যাচ্ছি, পাখি শিকার করা যাবে। ইট কাঠের জগৎ কি আপনারই ভাল লাগে না আমার ভাল লাগে। মিসেস ও বাচ্চাদের নিয়ে চলুন না, ঘুরে আসি। খুব ভাল লাগবে।

মিসেসকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাবেন, বাচ্চাদের আমার স্নেহ। ইতি

সেন

পুঃ বেনারসীখানা মিসেসের পছন্দ হয়েছে কিনা জানাবেন।

তেইশ

নটুদা,

খেলাই-কালিকাপুর হাসপাতালের কাজ অনেক দূর এগিয়েছে, কিন্তু এবার বোধ হয় কাজ বন্ধ রাখতে হবে। প্রথম কিস্তির বিলটার এখনো পেমেন্ট পেলাম না। অনেক চেষ্টা করেছি। মুকুজ্যে সাহেবকে একটু ফোনে বলে দিন না দয়া করে।

সেদিন আপনার ওখান থেকে আসার পর ভীষণ সর্দিকাশিতে কাহিল ছিলাম। আপনি কেমন আছেন? ইতি

গুণময়

পুঃ জমিটা কিনে ফেলুন। বাড়ির জন্যে ভাববেন না।

চব্বিশ

শিবেন,

মুকুজ্যে সাহেব কি চায় স্পষ্টাস্পষ্টি জেনে নাও ক্লার্কটার কাছে। এইজন্যেই বলেছিলাম যতীনবাবুকে এস্টিমেট বাড়িয়ে করতে।

পাঁচের ব্যাপারটা আই টি ও মুক্ত এটা কি করলো? হাতে মাথা কাটতে শুধু বাকি।

গুণময় সেন

পঁচিশ

শিবেন

প্রথম কিস্তির টাকাটা পেমেন্ট পেয়েছো জেনে খুশী হলাম। দাশগুপ্ত আবার পার্সেন্টেজ বাড়াতে চায়। দিবে দিও, উপায় তো নেই। যত ঝামেলা আমরা পোয়াবো আর লাভের ভাগ ওরাই পাঁচ ভূতে লুটেপুটে নেবে।

যোগসাধনার নিগূঢ় রহস্য সুপ্রকাশ—যোগসাধনায় দীর্ঘজীবন লাভের নির্দেশ

যোগশাস্ত্র

সিদ্ধযোগিগণপ্রদত্ত পুঁথিদৃষ্টে সুসংস্কৃত বড় অক্ষরে, মূল—সরল বিশদ বঙ্গানুবাদ সংযুক্ত পরিবর্ধিত প্রামাণ্য অষ্টম সংস্করণ দীর্ঘকাল পরে বহু সাধনায় প্রকাশিত। ১। শিবসংহিতা, ২। ঘেরণ্ডসংহিতা, ৩। ব্রহ্মসংহিতা, ৪। অষ্টাবক্রসংহিতা, ৫। ষটচক্রনিরূপণম্, ৬। দত্তাত্রেয় যোগরহস্যম্, ৭। পরাশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ। অতি দুষ্প্রাপ্য সাতখানি যোগগ্রন্থের অভাবনীয় সমাবেশ। যে সকল গুহ্য সাধনতত্ত্ব এতদিন হিমালয়ের নিভৃত গুহায় নিহিত ছিল—যে সকল মহাপুরুষের উপদেশ—সাধন নির্দেশ উপেক্ষা—অবহেলা করিয়া আমরা দিন দিন ক্ষীণ, নানা রোগাক্রান্ত স্বল্পজীবী, অল্পভোগী হইতেছি, একমাত্র যোগশাস্ত্র পাঠে—অনুশীলনে—সাধনায় তাহার প্রতিকার সম্ভব। হিন্দু সন্তান আবার আর্যগণের বলবীর্য, প্রতিভা-দীর্ঘায়ুর অধিকারী হইয়া নীরোগ, সুস্থ শরীরে জীবন-সংগ্রামে সাফল্য লাভ করিয়া মোক্ষসাধনায় আত্মনিবেদন করিবে। যোগের প্রভাবে মানুষ দেবতা হয়। প্রথমে সহজ ক্রিয়া, সংযম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম; প্রত্যাহার, ধ্যানধারণা, ধৃতি, শুদ্ধি, শৌচাচার, দেহতত্ত্ব অবগতি, মনঃশুদ্ধি, বাহ্য ও অন্তরশুদ্ধি প্রভৃতি সকল প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানের পর জ্যোতিঃ ধ্যানে—দর্শনে আত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ সাধনে সিদ্ধিলাভ সুনিশ্চিত। অশেষ মঙ্গলনিলয় দেবাদিদেব মহাদেব উপদিষ্ট—সিদ্ধঋষিগণ অনুষ্ঠিত যোগশাস্ত্র অনুশীলনে—সাধনায় যোগের অতল বিভূতিলাভ সম্ভব হইবে। তুলট কাগজে সুন্দর নির্ভুলভাবে মুদ্রিত প্রামাণ্য অষ্টম সংস্করণ। মূল্য : তিন টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

হাসপাতালের অ্যাকাউন্টের একশো টন কপারকে দেবে। নগদ।

গুণময় সেন

ছাব্বিশ

শিবেন,

হাসপাতালের কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে। আরো মিস্ত্রী লাগাও। দুর্গাপুরে আরেকটা টেন্ডার অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে। লেক পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে সব বেকার বেকার বলে, অথচ কেউ কাজ করতে চায় না। লেক পেলেই নিয়ে নিও।

হাসপাতালের জানলা দরজাগুলো তাড়াতাড়ি রঙ করিয়ে দিও, আর চুনকাম। কে কখন এসে দেখে যাবে, শেষে কাঠের কোয়ালিটি নিয়ে গোলমাল করবে।

গুণময় সেন

সাতাশ

অনন্ত,

তোমার চিঠি পেলাম। চারপাশের গ্রামের লোকে হাসপাতাল বাড়িটা দেখে খুশী হয়েছে জেনে আমিও খুশী হলাম।

আমার যেটুকু কর্তব্য সেটুকুই করেছি। শুভেচ্ছা জেনো। ইতি

গুণময়দা

আটাশ

শিবেন,

বসিরহাটের টেন্ডার দেবার ব্যবস্থা ক'রো। যতীনবাবুকে বলো মার্জিন বেশি রাখতে। খেলাইয়ের ব্যাপারে দেখলে তো এস্টিমেটের চেয়ে কত বেশী 'উপরি' খরচ হয়ে গেল। এদিকে আবার ইনকাম ট্যাক্সের খাঁড়া ঝুলছে। ওদের তো ধারণা হাতে যা পাই সবই লাভ।

যাক্, খেলাইয়ের দ্বিতীয় রিলটার পেমেন্ট পেয়েছো এই সান্ত্বনা। ইতি

গুণময় সেন

ঊনত্রিশ

ভাই অনন্ত,

তোমার তিনখানি চিঠিই পেয়েছিলাম। এই একমাস নানা কাজে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে উত্তর দিতে পারি নি। খেলাইয়ের হাসপাতালের যে কথা লিখেছো তা শুনে সত্যিই খারাপ লাগছে। কিন্তু আমি আর কি করতে পারি বলো। যেটুকু ভার নিয়েছিলাম তা আমি করে দিয়েছি। শুনে আশ্চর্য হবে, এখনো তার সব টাকা পাইনি। তোমরা নুটুদাকে ধরো। উনি যদি কিছু করতে পারেন। অবশ্য উনিই বা কি করবেন। সরকারী ব্যাপারই এমনি। কন্ট্রাক্টরদের সকলে গালাগাল দেয়, বলে গভর্নমেন্ট নিজে করলে নাকি অনেক ভালো হবে। দেখছো তা সরকারী আপিসের কাণ্ড। আমি হাসপাতালের বিল্ডিং তৈরীর দায়িত্ব নিয়েছিলাম, করে দিয়েছি। ডাক্তার, নার্স, ওষুধপত্র যন্ত্রপাতি—এসব তো আমার কাজ নয়। যন্ত্রপাতি আর ওষুধপত্র যদি আসে শেষ অবধি, সেও জেনো কোন্ কন্ট্রাক্টরের কল্যাণে। এখন তো মনে হচ্ছে ডাক্তার নার্স জোগাড় করার কাজটার জন্যেও যদি টেন্ডার ইনভাইট করে তবেই কাজ হবে।

এ দেশে যেটুকু কাজ হয়েছে তা আমাদের চেষ্টায়। যেখানেই কন্ট্রাক্টর নেই, সেখানেই কাজ পড়ে থাকে। তোমরা নুটুদার সঙ্গেই দেখা করো। ইতি

গুণময় দা

তিরিশ

শিবেন,

খেলাই হাসপাতালের সব পেমেন্ট পেয়ে গেছো শুনে খুশী হলাম। বসিরহাটের টেন্ডার অ্যাকসেপ্টেড হলো কিনা জানাবে।

আমি এখন দুর্গাপুরেই থাকবো। ইতি

গুণময় সেন

একত্রিশ

অনন্ত,

তোমার কয়েকখানা চিঠিই পর পর পেয়েছি। আমার যা বলার তা তোমাকে আগেই জানিয়েছি। ডাক্তার-নার্সের ব্যাপারে আমার কিছুই করার নেই।

লিখেছো, হাসপাতাল বিল্ডিংয়ের একটা দেয়াল ধ্বসে পড়েছে। এ ব্যাপারেও আমাদের কিছু করার নেই। যথারীতি ইনস্পেকশন হয়েছিল, তখন কেউ কোন ত্রুটি পায় নি। বাড়ির যত্ন না নিলে বাড়ি তো ধ্বসে পড়বেই।

ইতি

গুণময়দা

বত্রিশ

অনন্ত,

তুমি বারবার আমাকে বিরক্ত করছো কেন বুঝলাম না। এ ব্যাপারে আমার কিছুই করার নেই।

গুণময়দা

তেত্রিশ

শিবেন,

অনন্তর চিঠি এলেই ছিঁড়ে ফেলে দিও। রিডাইরেক্ট করে আমাকে পাঠানোর প্রয়োজন নেই।

গুণময় সেন

দীর্ঘাঙ্গী

(৪১ পৃষ্ঠার পর)

বিয়ের আসরে পোঁতা চারটি কলা-গাছকে কেন্দ্র করে অগণ্য মেয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। সোহাগা সবার পিছনে একা দাঁড়িয়ে। একা দাঁড়িয়ে সে একক হয়ে গিয়েছে। সকলের মাথার উপর দিয়ে তার দৃষ্টি দূরে প্রসারিত।

নির্বিঘ্নে চুকে গেল বিয়ে। দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে আসর ত্যাগ করে চলে গেল সোহাগা।

বাসর-ঘরে নতুন বধূটিকে প্রথম সম্বোধন করল তার নবীন স্বামী। বলল, "ঐ মেয়েটি কে?"

চট করে কথা বলতে নেই, নতুন মানুষটির সঙ্গে কথা বলতে হয় অনেক সাধ্যসাধনার পর—মালতীর বন্ধুরা ও গুরুজনেরা মালতীকে শিখিয়ে দিয়েছে এই নিয়ম। মালতী তাই কোনো উত্তর দিল না। জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে রইল।

"ঐ মেয়েটির নাম কি বলো তো!"

বেন বিরক্ত হয়েছে মালতী, অনেক বার প্রশ্ন শোনার পর বলল—"কেন?"

"না। এমনি। দেখতে কিন্তু বেশ!"

"কখন দেখলেন?" প্রথম প্রথম নাকি আপনি সম্বোধন করতে হয়, মালতীকে এই রকম শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

"কখন দেখলাম? শুভদৃষ্টির সময়?"

কথাটা শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল মালতী। বলল, "খুব বুঝি ভালো লাগল দেখতে?"

উত্তর দিল না শ্রীমান ভগবান রক্ষিত। চুপ করে রইল কিছুক্ষণ, তার পর জিজ্ঞাসা করল, "ওর বিয়ে হয়ে গেছে নিশ্চয়?"

মালতী একটু একটু করে বলল সোহাগার সব কথা। কাটা কাটা কথায়, ছাড়া ছাড়া ভাবে।

ওতেই সব বুঝে নিতে পারল এই নতুন মানুষটি। বলল, "তোমার বুঝি বন্ধু? সকালবেলা ওকে ডেকে পাঠিয়ো।"

"কেন?"

"এমনি।"

মালতী একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমার কিছু খারাপ হয়ে যাবে না তো তাতে?"

হেসে উঠল নতুন মানুষটি, বলল, "তোমারও খারাপ হবে না, ওরও ভালো হবে।"

মালতী জানাল যে, সে ডেকে পাঠাবে।

হ্যাপি-ভিলা

(৯২ পৃষ্ঠার পর)

আর লোভ সামলাতে পারলাম না, বলেই ফেললাম—

কোন উত্তরের অপেক্ষা না করেই বটুকের স্ত্রী সেটি কাগজে জড়িয়ে নিলেন, সুরমা বেন জলে ডুবে যাচ্ছেন—হাবুডুবু খাচ্ছেন, কি যে করবেন বুঝতে পারছেন না। শুধু অসহায়-ভাবে আকাশে আশ্রয় খুঁজে বেন একটা কিছু ধরবার চেষ্টা করছেন।

বাবাজীর মোড়ার মত সৈনিকের মত উপবিষ্ট স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন: ওই যে ট্রাঙ্কের ওপর নতুন প্যান্ট, কোট, টাই আর টুপি আছে ওটাও নিয়ে যাও—তোমার স্বামী পরবেন।

বড়দিনের বেন উপহার পেলেন এমনি আত্মতৃপ্ত মুখে বটুকের স্ত্রী বিনা দ্বিধায় সাড়ীর সঙ্গে নতুন কোট, প্যান্ট, টাই দিয়ে বেঁধে তরকারি বুড়ির মত টুপির মধ্যে সেটাকে ভরে মিস্ ইউনিভারস্-এর মত চলে গেলেন।

সারা বিকেল সুরমা ছটফট করতে লাগলো। রাতে আমরা হেঁটেই পালাব সব থাক পড়ে—

বাইরে বেরোতে যাবে, দেখলো বটুক আজ বারান্দায় শুয়ে। ভয়ে হাতের লণ্ঠনটা পড়ে ভেঙে গেল সুরমার। কিন্তু এ বেন কুম্ভ-কর্ণের বড়দাদা লম্বকর্ণ। ঘুম ভাঙলো না ওর এ শব্দে। সুরমা বললেন, চল জানালা দিয়ে পালাই—। যদি ও দেখে ফেলে?

লাফ দিয়ে পড়তেই তারিণীবাবু বললেন, দেখ তো কিসে বেন আমার বুড়ো নখটা কামড়ে ধরলো—

পায়ে সজোরে একটা ঝাঁকি দিতেই সুরমা দেখলে একটা ঢোঁড়া সাপ—পায়ে তখনও রক্ত ঝরছে—। থাক রক্ত, সুরমা আর তারিণী তিন মাইল দৌড়ের প্রতি-যোগিতায় অবতীর্ণ হলেন। পেছনে ক্ষিপ্তা ব্যথিতা সর্পিণী তাঁদের সক্রোধে তাড়িয়ে নিয়ে চললো।

যা কখনও সম্ভব হতো না—এ ক্ষেত্রে তাই সম্ভব হলো। স্টেশনে একটা কলকাতাগামী মালগাড়ী দাঁড়াতে না দাঁড়াতে একটা কাটলে ভ্যানের মধ্যে দুজনে চড়ে বসলেন। দু-চারটে গরু সেখানে জাবর কাটছিল, তা হোক, তবু রমণীয় মনে হল তাদের।

এবার একটু হাঁফ ছাড়লেন দুজনে। তারিণী বললেন, সাপটা আমার ডানে পড়েছিল, সুরমা। আমড়ালে কি হবে, গাড়ীটা ধরিয়ে দিলো।

একটা গরু সুরমার পিঠটা ব্রাশের মত জিভ দিয়ে নিপুণভাবে চেটে যাচ্ছিল—সুরমা ওকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললেন: যাঃ—কি করিস; চেটে চেটে যে আমের আঁটির মত সাদা করে ফেললি। এবার ক্ষেমা দে—

গাড়ীর খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল হ্যাপি ভিলার একটি একটি পরিপূর্ণ সুখময় চিত্র। ছায়ার বেন ছায়ার মত চলে যাচ্ছে পেছনে সরে।

তারিণীবাবু মুক্তির আনন্দে গান ধরলেন: আমি বনফুল গো—

গরুটা কি বুঝলো জানি না, খানিকটা বুঝি-বুঝি মুখ করে গানটা শুনে নিয়ে, সুরমাকে ছেড়ে বনফুল খাবার জন্যেই বোধহয় তারিণীবাবুর গড়ের মাঠের মত প্রশস্ত টাকের দিকে জিভ বাড়িয়ে দিলো।

লোকবল

(৩৪ পৃষ্ঠার পর)

তরফ, তেমন সুবিধে করতে পারল না। দুর্ভাগ্য। আমার ছেলে পুজনের নাম শুনে থাকবে। ইস্কুল টিস্কুল করে, কোচিং হোম, টাইপের স্কুল, শিক্ষা প্রচারের জন্যেই জীবনটা দিলে। কিন্তু প্রমথ, তোমার চেহারাটা শুকনো শুকনো কেন? কি কাজেই বা যাচ্ছিলে?"

"আজ্ঞে সর্ষের তেল আনতে।"

"ওদিকে কেন?"

"লাইনে কে দাঁড়ায়? তেলের জন্যে, চিনির জন্যে, তাই..."

"এই দেখ। লোকবলই বল। সবাই যে এত সমালোচনা করে, আমি তো কোন অসুবিধে দেখি না। আটজন নাতিকে তেলের লাইনে দিয়ে, ছজনকে দিই রেশনের দোকানে দাঁড় করিয়ে। আমি জানতাম প্রমথ, একদিন আবার সব লাইনে দাঁড়িয়ে কিনতে হবে। লোকবল ছিল বলেই আমি আজ সব পাচ্ছি-টাচ্ছি। অন্যদের অবস্থা তোমার মতই। কি, তেল চাই?"

প্রমথ অভিভূত। তেলের টিন হাতে ধরিয়ে দিয়ে গৌরদাদু ড্রাইভারকে বললেন 'পৌঁছে দিয়ে আয়।'

গাড়ীটা নতুন।

'কবে কিনলেন?'

'এটি ছোটবউমা-র। বউমা ডাক্তার, গাড়ীতে কাগজ দেখছ না, ছোট পরিবার সুখী পরিবার? উনি প্ল্যানিং অফিসার। আমরা সবাই এ নিয়ে সোস্যাল ওয়ার্ক করে থাকি।'

প্রমথর হতভম্ব মুখ দেখে বললেন, 'আহা আমার একটা আদর্শ ছিল, তাই লোকবলই বল কথাটা আমার বেলায় খেটেছে। যাদের আদর্শ টাদর্শ নেই, তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ আছে কিছু? তাহলে বসুন্ধরা বীরভোগ্যা হবেন কি করে?'

প্রমথ চিন্তিত হয়ে পড়ল। গাড়ী ছেড়ে দিল হাতটি তুলে বরাভয় দিয়ে গৌরদাদু হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

প্রেমের সঙ্গে বক্তৃতার কোন সম্বন্ধ নেই। বরং একটা আড়ি আছে। প্রেমের রাজ্যে মুখের যে ভূমিকা তা শুধু ভণিতা, ভাষণ নয়।

অথচ এই প্রেম সম্বন্ধেই বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। ভারতীয় প্রেম। প্রেমের পটভূমিকা। ঋগ্‌বেদের মধ্যে উষার বুকের অরুণবরণ আঁচল-খানি খসিয়ে উদয় হওয়া রূপের মধ্যে কবি কোন্ প্রেমের ইশারা করেছিলেন, কোন্ রূপরসের সাড়া জাগিয়েছিলেন তারই বর্ণনা থেকে আরম্ভ করেছিলাম। লে গ্র্যান্ড ওরিয়েন্টের সবচেয়ে পুরানো ধর্মগ্রন্থের সূত্রেতেই এমন রসালো বর্ণনার অবতারণার কথা শুনে বোহেমিয়া ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীরা পুলকিত হয়ে উঠল। অনেক তরুণীর বুকেই বৈদিক বর্ণনার উষার মতন বসন। বিকশিত বিশ্ববাসনার তরঙ্গে টলমল রাঙা কমল ফুটে উঠতে চাচ্ছে।

আমার বক্তৃতার আবেগ কি ওদের বাসনার আবেশে শিহরিত হয়ে উঠবে? ছোঁয়া লাগবে না কি মর্ত্যের মাটির আমার আকাশ-চারী প্রেমের বিশ্লেষণে? সনাতন ভারতের চিরন্তন সাহিত্যে যে প্রেম যুগে যুগে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, যে প্রেম নিষ্কাম

নিকষিত হেম
কামগন্ধ নাহি তায়?

তাড়াতাড়ি সামনের ফুটফুটে ছাত্রীদের উপর থেকে নজর সরিয়ে নিলাম। নাঃ, দেবর লক্ষ্যণের মত পায়ের দিকে চোখ মেলে ধরলেও নিস্তার নেই। এ সব দেশে আবার সাচে অভ্যস্ত চরণের গড়নকে মেয়েরা বড় বেশি ফুটিয়ে তুলে ধরে। যেটুকু বসন পরে তাতে যৌবনদীপ্ত গড়নপেটনকে শাসনে রাখতে পারে না।

কোন্ দেশটা? আর কোন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এই বক্তৃতাটা দিচ্ছিলাম? নাম না-হয় না-ই বললাম। ঘটনাটা যে সত্যি।

ধরুন, 'প্রিজনার অব জেন্ডা' উপন্যাসের দেশেই না-হয় এটা ঘটেছিল। রুরিটানিয়ার নাম পৃথিবীর ম্যাপে পাবেন না। কিন্তু তার মতই একটা সুন্দর দেশের একটা সত্য ঘটনা।

আকাশের দিকে, মানে বিরাট বক্তৃতার দালানের সোনালী লতাপাতার কাজ-করা ছাদের দিকে তাকিয়ে ভারতীয় প্রেমের ইতিহাস বলে যেতে লাগলাম।

মাঝে মাঝে চোখ নামিয়ে আনি। ফুলে ফুলে ছাওয়া বাগানের মত মনে হচ্ছে সমস্তটা অডিটোরিয়ামটা। ছাত্রদের পরণে বেশির ভাগ কালো না হয় ঘন খয়েরী রঙের সুট। ছাত্রী-দের স্ল্যাকস্ বা ফ্রকের রঙের বাহারের অন্ত নেই। রমধনু ওদের বর্ণবৈচিত্র্য দেখে হার মেনে ওদের আকাশ থেকে বিদায় নিয়েছে। বাসা নিয়েছে বসনে। আর—আর মনে। যেন হরেক রঙের প্রাতাবাহারের তোড়ার উপর এক একটি সাদা গোলাপ হাসি মেলে ফুটে আছে।

তড়াতাড়ি বৈদিক যুগের উর্বশী আর রাজা পুরুরবার প্রেমের কথায় ইতি দিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য আর মৈত্রেয়ীর গল্পে এসে পড়বার চেষ্টা করলাম। উৎসুক হয়ে উর্বশীর কাহিনী শুনতে শুনতে ওরা অন্য গল্পে সরে আসতে চাইল না। একজন সোজাসুজি প্রশ্ন করল—স্যার, উর্বশীর জন্য যে বেদনা আর উর্বশীর রূপের যে বর্ণনা আমরা শুনলাম তা তো একেবারে আধুনিক যুগের প্রতিধ্বনি বলে মনে হচ্ছে? এটা কি সত্যি পুরাকালের মনের কথা?

চট করে আরেক জন প্রশ্ন করল,—এযুগে আমাদের তরুণ-তরুণীরা তো এমনভাবেই ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং আমরা জানি যে, এই ব্যাকুলতাকে প্রাচীন কবিরা যতই স্বর্গের অমৃতে মেয়ান দিক, আমাদের সাংসারিক কামনাটাই আসলে ভিতরের কথা। প্রেম প্ল্যাটনিক হবে কি করে?

পরম প্রসন্ন গোছের একটু হাসি প্রশ্ন-কর্তার দিকে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর সেটুকু যেন সমস্তটা হলঘরে বিলিয়ে দিলাম। পুরোপুরি বাঙ্গালী বেশে বক্তৃতা দিতে গিয়েছি। বেশী 'এফেক্ট' অর্থাৎ কি না প্রভাব হবে বলে। তার পর গায়ের উপর থেকে খসে-পড়া চাদরখানা আবার একটি কাঁধের উপর আধখানা সরিয়ে আনলাম। তার পর বললাম—ভারতীয় প্রেম কামনাকে অস্বীকার করে নি, কিন্তু সংযমকে স্বীকার করেছে। মস্তিষ্ক সেখানে রাজা, প্রয়োজনের মত সে দেহকে সাজা দিতে পেছপা হয় না। প্রাচীন ভারতে পুরুষার্থে বিক্রয়তে ভার্যা।

—অর্থাৎ?

অর্থাৎ সন্তান ছিল ভবিষ্যতের বিকাশের স্বপ্ন, শুধু দৈহিক বিলাসের পরিচয় নয়।

ছাত্র-ছাত্রীরা উসখুস করতে লাগল। ওদের মধ্যে একটা নতুন তথ্যের আবেদন এসে যাচ্ছে মনে হয়।

সেই সুযোগটা ছাড়লাম না। আরও ভাল করে, সবিস্তারে বৈদিক যুগের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ীর মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের উৎস আলোচনার কথায় চলে এলাম। স্বামী কেন

স্ত্রীকে ভালবাসে? সে কি শুধু এই দেহটার জন্য?

নতুন আখ্যান, প্রেমের নতুন ব্যাখ্যা শুনে ওরা সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। ভুলে গেল নিজেদের তরুণ বয়সের অরুণাভ মনের চঞ্চলতা। স্বাধীনচারিণীরা স্বপনচারিণীর আকর্ষণের উৎসে নতুন জগৎ দেখতে পেল।

ওদের বোঝালাম কালিদাসের প্রেমতত্ত্ব—গৃহিণী সচিবঃ সখা মিথ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ। শুধু গৃহিণী নয়, মন্ত্রী, সুখী, ললিতকলার ব্যাপারে প্রিয়শিষ্যা। আপনারা ভেবে দেখুন কথাটা। সুখসঙ্গিনীর কোন উল্লেখই নেই এখানে। অথচ দেহজ সুখকে বাদ দিয়ে তো সংসার চলে নি কখনও। তবু.....

ওদেরই মধ্যে সম্ভবত একটি বেশী সিনিয়র ছাত্রী মাথার সোনালী কেশের রাশি ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। যেন একটি সিংহ তার সোনালী কেশররাশি সঞ্চালিত করে উঠল। তার মুখে একটা অভিজ্ঞতার বাঁকা হাসি। সেই কেশররাশির পটভূমিকায় সেই হাসি যেন আর সব উপস্থিত শ্রোতাদের শুধু প্রাণহীন প্রচ্ছদপটে পরিণত করে দিল।

সিংহী প্রশ্ন করল—কিন্তু আপনাদের সাহিত্যে তো দেহবর্ণনা আর ভোগসুখের কোন কমতি নেই—আমি যতদূর জানি। এমন সব গরমাগরম বর্ণনা আছে যা এ-যুগের আমরাও হজম করতে পারব না।

হেসে জবাব দিলাম—সেকথা সম্পূর্ণ ঠিক। এই ধরুন একজন সংস্কৃত মহিলা কবির প্রেমিকের বর্ণনা 'কৌমার হর'—এক-কালে প্রেয়সীর সঙ্গে দৈহিক সম্বন্ধ যে স্থাপন করেছিল তার সম্বন্ধে কত সংযত, কত শোভন অথচ সঙ্গীতের ইঙ্গিতে ভরা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

সিংহী কেশর হেলিয়ে আবার আক্রমণ করল—আপনাদের সবচেয়ে নামকরা মন্দির-গুলিতে সবচেয়ে বেশী অশ্লীল যে সব মূর্তির ছবি দেখেছি সেগুলি কিসের প্রেম? কোন্ স্বর্গীয় প্রেম?

হেসে এবং বেশ সহানুভূতির সঙ্গে উত্তর দিলাম—স্বর্গের পথে যাবার প্রেম। প্রেম তো কৃত্রিমভাবে 'হট হাউসে' গজায় না। ধরুন, একটা বুনো চারা গজাল একটা শিশির-ভেজা রাতে বা বোদে জাগা প্রভাতে। জংলী একটা চারা, জংলী তার ফুল। সেটা যখন মানুষের বাগানে ঠাঁই পেল তখনি সেটা পেল নাম, পেল মান। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত সেটা শুধু বুনো ফুল, আদিম কামনার মতই স্বীকৃতিহীন, সম্মানহীন, সংগীতহীন। ঠিক তেমনি মন্দিরের নীচের তলায় নীচু ভাবনায় ভরা নীচু আকর্ষণে গড়া যে সব খেলা সেগুলিকে ভারতীয় সাহিত্য লীলা বলে মেনে নেয় নি। উপরে উঠতে উঠতে সে সব খেলা মিলিয়ে গেছে। সুন্দর সংযত হয়ে লীলায় মজে গেছে। দেহের নিঃশেষ বিলয় হয়েছে মনে।

সিংহী আরও ক্ষেপে গেল। চারদিকে অনুনয়ভরা চাহনি আর বসে পড়ার জন্য ইশারা। সম্মানিত অতিথিকে বেশি খোঁচাতে যাওয়া অসভ্যতা। কিন্তু সিংহী সব কিছু অগ্রাহ্য করল,—তার মানে হচ্ছে যে আপনাদের সাহিত্যে আসলে প্রেম হচ্ছে আত্মনিপীড়ন। জীবনভোর আনন্দে ভরা প্রতারণা? দেহ-বিলাসের উপর রঙীন বেশমী ঘোমটার ঢাকনা?

এবার আমি মোক্ষম একটা মওকা পেয়ে গেলাম। বললাম—জীবনভোর আনন্দ? সে যে হবে নরকযন্ত্রণার সামিল? প্রেমে মিলন আর বিরহ দুই-ই আছে। তবে তার আনন্দ দুরকমের। একটানা একঘেয়ে কিছু নয়।

এই পর্যন্ত বলেই মূল সংস্কৃত থেকে শুনিয়ে দিলাম—মিলন আর বিবহের মধ্যে —বিরহই বেশি সুন্দর। সঙ্গে যখন প্রিয়া থাকে, তখন সে তো শুধু একটি মানুষ, বিরহে কিন্তু সে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকে। কেন? কেন না, ভারতীয় সাহিত্যে প্রেম—

নিকষিত হেম
কাম গন্ধ নাহি তায়।

এর পর সিংহী বা অন্য কেউ আমার বক্তৃতার মধ্যে বাধা দিল না বা প্রশ্নের পর প্রশ্নের খোঁচা দিয়ে হাওয়া গরম করবার চেষ্টা করল না। অশরীরী আর ঐশ্বরিক প্রেম কোথায় যে জড়াজড়ি করে অঙ্গাঙ্গী হয়ে এক হয়ে গেল তার বিচার ঐ তরুণ-তরুণীর দলই একমনে নিঃশব্দে করতে থাকল।

আর সেই নিঃশব্দতা ভাঙ্গল বিপুল হাততালির মধ্যে। যেন ঢেউয়ে-ঢেউয়ে টুকরো-টুকরো হয়ে নিস্তব্ধ নিঃশব্দতা সকলের কানের কাছে এসে আছড়িয়ে পড়তে লাগল। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই ছিল যাকে বলে 'টীন-এজার' অর্থাৎ বয়স বিশের কোঠা ছাড়ায় নি। তাদের প্রশ্নবাণ আর করতালি-ধ্বনি দুই-ই সমান জোরালো। বিশেষ করে ওদের সাহিত্য-শাখার ছাত্র-সম্পাদকের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের বক্তৃতা। ভারতীয় প্রেমের আয়নায় না কি ওদের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের উদ্ভিন্ন যৌবনের নতুন ছবি এখন থেকে দেখতে পারে। পশ্চিমের অনাবরণ বাসনা নাকি প্রাচ্যের প্রেমের মরানে স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। এমনি আরও কত কি?

কিন্তু ঐসব অভিনন্দনের আর বাণীর মোহ ভেদ করে একটা প্রশ্ন বার বার আমার মনে জেগে উঠতে লাগল। সত্যিই কি আমাদের সাহিত্য, আমাদের সাধারণ মনোবৃত্তি, রোজকার জীবনে দেহবিলাসকে রেশমী ঘোমটার আড়ালে ঢেকে দিয়েছে? এত উদার, যুগে যুগে অনিবার প্রেমের আবাহন, এ কি শুধু মিছে ছলনা, আত্মপ্রতারণা? সিংহী যেরকম গরম ঝাঁজের সঙ্গে প্রশ্ন করেছিল তার পিছনে

নিশ্চয়ই সাত্যকারের কোন কারণ আছে। কি সে কারণ? কি?

ধন্যবাদের পালার পরে অ্যাপ্যায়নের ছোট ছোট গেলাস আর কুচোকুচি হরেক রকমের চুটকী খাবার হাতে সবাই অতিথির চারপাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। নানা আলোচনার অভিনন্দনে তাকে ব্যাপৃত রাখছে। কিন্তু আমি ক্ষণে ক্ষণে সিংহীর কেশর সঞ্চালন দেখতে পাচ্ছি।

এই একটিমাত্র শ্রোতা যার মন আমার ভাষণে সায় দেয় নি। যার মাথা সমর্থন জানিয়ে দোলে নি। ওর দিকে একটু নজর রাখলাম। আমি জানি যে, সে-ও আমায় নজরের বাইরে রাখে নি।

(২)

বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার অনেক পরে, বেশ সন্ধ্যা হয়ে যাবার পরে ছাড়া পেলাম। সঙ্গের মোটরকে বিদায় দিয়ে দিলাম। কেটে পড়লাম বিদায় নিতে এগিয়ে আসা অধ্যাপক আর গুণগ্রাহী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝখান থেকে। সিংহী কোথাও-না-কোথাও সবার অলক্ষ্যে সঙ্গ নেবে নিশ্চয়ই।

হের্ প ফেসার!

অনুমান মিথ্যে হয় নি।

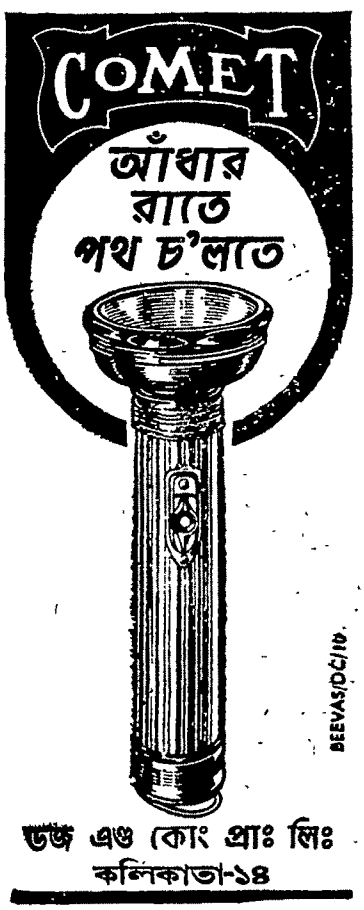

ডজ এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১৪

এমনি একটা কিছু প্রত্যাশা করছিলাম।

মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই দেখলাম—সিংহী। তার সোনালী কেশররাশির উদ্ধত ঝালরগুলি এখনও তেমনি আলুথালু হয়ে আছে। মুখ উত্তেজনায় আর বুক উদ্বেগে চঞ্চল।

স্নিগ্ধস্বরে আহ্বান করলাম,—আসুন না, একটুখানি পথ আমার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে।

—বেশ তো চলুন। কিন্তু আপনার হার্ট প্যালপিটেশন হবে না তো, হের্ প্রফেসার? হিয়া দুরুদুরু করবে না তো একজন যুবতীর সঙ্গে রাতে একা পথ চললে?

ওর ব্যঙ্গটা বেশ বুঝতে পারলাম।

সাহিত্যে নিরামিষ অর্থাৎ নিষ্কাম প্রেমের যে জয়গান এতক্ষণ করেছি তার ফল এখন এই মুখরার কাছে হজম করতে হবে ভয় হচ্ছে।

অধ্যাপকের উপযুক্ত গাম্ভীর্য বজায় রাখবার চেষ্টা করে বললাম,—আপনাকে একটি ছোট্ট সদুপদেশ দিতে চাই, ফ্রলাইন (কুমারী তরুণী)।

সিংহী কেশর দুলিয়ে মাথা ঝাঁকাল,—খবরদার, খবরদার, পার্টিতে পরে যাওয়া যায় না, এমন কোন জিনিস কোন মেয়েকে দিতে নেই।

অর্থাৎ যুদ্ধং দেহি।

চট করে জবাব দিলাম—আধুনিক তরুণীরা সব কিছুই চট করে বুঝতে পারে, দেখছি।

ধারালো তলোয়ারের মত হাসি মেয়েটির মুখে ঝকমক করে উঠল—হ্যাঁ, কেবল প্রেমিককে বাদে। প্রেমিককে কোন মেয়েই কোনদিন বুঝতে পারে না।

আমার আকাশচারী প্রেমের বক্তৃতা থেকে মাটিতে সোজা নেমে এলাম। বললাম—ভাগ্যিস, তা না হলে আর বিয়েও হত না, ঘরও গড়ত না।

হঠাৎ পাশের দিকে তাকিয়ে মার্কারি ভেপার ল্যাম্পের আলোতে মেয়েটির মুখের দিকে নজর দিলাম। সুন্দর সুঠাম মুখখানার উপর একটা অভিজ্ঞতার নীলাভ আলো এসে পড়েছে। দেখাচ্ছে কত করুণ, বেদনার্ত।

চুপ করে দুজনে পথ হাঁটতে লাগলাম। নিঃশব্দতা যেন আমাদের দুজনকে এই আলোকোজ্জ্বল প্রকাশ্য রাজপথের মাঝখানে আর সব কিছু থেকে আড়াল করে আলাদা করে ঘিরে নিয়ে চলেছে। ওর হৃদয়ের স্পন্দন যে পায়ের হাই হীলের খট খট আওয়াজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমার কানে এসে পৌঁছাচ্ছে, বুকে এসে বাজছে। কিসের সে প্রতিধ্বনি? কোন্ ব্যর্থ প্রণয়ের প্রথম পরিচ্ছেদের সার্থক প্রণয়কলার হাহাকারধ্বনি? কে সে পলাতক? কে দিয়েছিল আশা, জ্বেলেছিল আলো, দিয়েছিল আহ্বান?

নাঃ। এত নিস্তব্ধতা আমার সহ্য হয় না। বোবা কান্না আমি সইতে পারি না। তার চেয়ে কথা কওয়া, ব্যথা দেওয়া অনেক ভাল।

খুব নীচু স্বরে বললাম,—দেখুন, আমার রূঢ়তা মাপ করবেন। আপনি আমার প্রশ্ন সইতে না পারলে মনে করে নেবেন যে, আমি ভারতীয় গণৎকার। আপনার মুখ দেখেই জ্যোতিষবিদ্যার কেরামতি দেখাচ্ছি। আপনার জীবনে একটা সাত্যকারের দুঃখ আছে। বিয়োগান্ত দুঃখ।

সিংহী প্রায় ক্ষেপে উঠল—হ্যাঁ, এবার ঝাড়ুন একটা চটকদার সাহিত্যিক বুকনী। বলুন যে মেয়েদের জীবনের ট্রাজেডি হচ্ছে এই যে, তাদের প্রেমিক হচ্ছে অতীত আর স্বামী হচ্ছে ভবিষ্যৎ। অতএব আমি যেন ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করতে সুরু করি।

একটুও বিচলিত হলাম না। ধীরভাবে বললাম—তেমন মামুলী কথা আমি বলব না। তবে আমার নিকষিত মার্কা প্রেম সম্বন্ধে বক্তৃতা আপনার মনে যে দুঃখের ঢেউ তুলেছে তার জন্য আমি সত্যিই, সত্যিই খুব দুঃখিত। আর আপনি অধ্যাপকের বক্তৃতাকে যে শুধু বক্তৃতা হিসাবেই নিয়ে শেষ করতে পারছেন না, সেজন্য আমি আরও দুঃখিত.....।

সম্বোধন করতে যাচ্ছিলাম—বৎসে, বা ডিয়ার গার্ল বা ঐ ধরণের স্নেহমাখা কিছু। কিন্তু পারলাম না। ওর তরুণ হিয়ার দুঃখের পরশে আমাকে ওর সমবয়সে প্রায় নামিয়ে এনেছে। তাই তো বেচারী মন খুলে নিজের কথা বলে ফেলেছে। বিদ্যা আর বয়সের বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিই কেন?

তবু বললাম,—মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে আমারই দেশের কোন ছাত্র তেমায় দুঃখ দিয়েছে। এবং.....

আর বলতে হল না। তরুণী তার চলন দ্রুত করে নিল। তার বুকের দোলাও নিশ্চয়ই এমনি দ্রুত হয়ে উঠেছিল—তাই। চলতে চলতে সে বলে গেল,—হ্যাঁ, আপনারই নিকষিত প্রেমের দেশের যোগ্য প্রচারক। প্রতারক সে আপনার বক্তৃতার বুলিগুলির ঢঙেই আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তার লক্ষ্য যে কোথায় ছিল তা লক্ষ্য করবার আগেই দেখি, যে, সে কাজ হাসিল করে ফেলেছে। এই হচ্ছে আপনাদের দেশের নিকষিত প্রেম।

এমনি একটা ব্যাপার আমি নিজেও আন্দাজ করে নিয়েছিলাম। কিছু বলবার ছিল না আমার তরফ থেকে বা আমার দেশের তরফ থেকে। ওদের ঠাণ্ডা দেশে প্রেম এমনি একটা গরম রোম্যান্স, যার প্রথম অঙ্কেই স্বপ্নের হয়ে যায় অপমৃত্যু।

তার পর অঙ্কের পর অঙ্কে আবার যে নতুন গড়া, নতুন বোঝাপড়া সুরু হয় তা, হায়, আর কি সে স্বপ্নকে ফিরিয়ে আনতে পারে কখনও? স্বপ্নভাঙা রক্তরাঙা হৃদয় কেঁদে বেড়ায়। যতদিন না নতুন কোন প্রলেপে রক্ত ঝরা বন্ধ না হয়। তা-ও হয়ত শুধু বাইরের প্রলেপ, উপর থেকে রক্ত বন্ধ করা। আহা বেচারী!

ইচ্ছে করেই নিজের গতি কমিয়ে দিলাম। ও গেল এগিয়ে—একা, আপন মনে। শুধু সিংহীর সোনালী কেশরের উপর নীলাভ আলোর বিজলী ক্ষণেক খেলা করে ঝিলিক মেরে গেল।

মনমাতানো সুগন্ধি...

প্রিয়ার মধুর স্নিগ্ধ গন্ধ শরীরের
গ্লানি দূর করে মনে আনে
আনন্দের দোলা—আপনাকে
করে তোলে সজীব আর প্রফুল্ল

প্রিয়া
সেন্ট

বেঙ্গল কেমিক্যাল কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী

গুণে-গন্ধে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য...

বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন
হেয়ার অয়েল

চুলের কথা যাঁরা ভাবেন তাঁদের প্রথমেই মনে পড়ে বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্যান্থারাইডিনের কথা। প্রতিদিন এই তেল ব্যবহারে চুল চটচটে হয় না, চুলের গোড়া শক্ত হয়, দিনে দিনে চুলের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধি পায়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী

শহর কলকাতা ঃ দুর্গোৎসব

(৪৮ পৃষ্ঠার পর)

পারেন কেহ বা উভয়েই সমান আয়োজন করেন তন্মধ্যে কতক লোক ভবন মধ্যে কিরূপ করেন তাহা দুর্গাই জানেন কিন্তু বহির্দ্বারে সারজন সন্তরী স্থাপন করিয়া কিয়দ্ব্যক্তি নিমন্ত্রিত ব্যতীত দর্শনাকাঙ্ক্ষি লোকেরদিগকে ভবন প্রবেশে নিরাশ করেন কিন্তু দ্বারের সম্মুখবর্তি পথ হইয়া গমন করিলে বিহারের পরিবর্তে গাত্রে বেত্র প্রহার করিয়া থাকেন বোধহয় ভদগৃহপতিরা এই সকল আচরণকেই ভগবতীর সন্তোষের মূল কারণজ্ঞান করেন সে যাহা হউক এ বৎসর ৪-৫ স্থানে বৃহৎ সমারোহ হইয়াছিল বিশেষত মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের দুই বাটিতে নবমীর রাত্রে শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনারেল লার্ড বেন্টিক বাহাদুর ও প্রধান সেনাপতি শ্রীশ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর ও প্রধান ২ সাহেবলোক আগমন করিয়াছিলেন পরে দুই দণ্ড পর্যন্ত নানা আমোদ ও নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণকরত অবস্থিতি করিয়া প্রীত হইয়া গমন করিলেন। ইংরাজগণের গতিবিধি ঐ রাজার দুই বাটি ও রাজা রামচাঁদের বাটি ও দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের বাটি এই তিন বাটিতে প্রায় ছিল অন্যত্র অল্প। .....কস্যচিৎ দর্শকস্য।

চিঠিখানি পড়া শেষ হ'লে তীর্থপতি চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিলেন। খানিক জিরেন নিয়ে বললেন,—এবার 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে সম্পাদকীয় প'ড়ে শোনাচ্ছি। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের এক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন—

"নগরে মহামায়া মহেশ্বরীর মহা মহোৎসব অতি সমারোহপূর্বক নির্বাহ হইয়াছে, ধনাঢ্য পরিবারেরা অতি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, শোভাবাজারস্থ নৃপতিদিগের উভয় নিকেতনে নৃত্য গীতাদির মহাধুম হইয়াছিল, সাহেবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া সেই নাচের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, লোভ দেবের প্রিয় শিষ্য শ্বেতাঙ্গ ও আন্দু পিন্দু গোমিস ও গানসেল্বস প্রভৃতি কৃষ্ণাঙ্গগণ যাঁহারা মোদের বিলাত ও মোদের কুইন বলিয়া গর্ব পর্ব বৃদ্ধি করেন তাঁহারা এই পূজোপলক্ষে রাজভবনে উপস্থিত হইয়া বিলক্ষণরূপে উদর পূরণ করিয়াছেন।

যোড়াসাঁকো নিবাসী মিষ্টভাসি পরহিত তৎপর শ্রীযুত বাবু নবকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় স্বীয় কুলপ্রতিমা সিংহবাহিনী দেবীর পূজার পালা প্রাপ্ত হইয়া আপনারদিগের রম্য নিকেতন অমর ভবনের ন্যায় সুসজ্জিভূত করিয়াছিলেন, নাচের মজলিস দর্শনে দর্শক মাত্রেরই চিত্তক্ষেত্র পুলকালোকে পরিদীপ্ত হইয়াছিল, গাধিকাগণের তালমান শ্রবণ ও সুন্দর অঙ্গ ভঙ্গিমা দর্শনে অনেকেই মোহিত হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ মধ্যে মধ্যে রণবাদ্যবৎ চিত্ত প্রফুল্লকর ইংলন্ডীয় বাদ্য বাদন হইবায় সকলেই এক একবার মহা-আনন্দ অনুভব করিয়াছেন; যে দিবস ইংরাজদিগের সভা হইয়াছিল সেইদিবস অনেকানেক সম্ভ্রান্ত সাহেব তথায় সমাগত হইয়াছিলেন।"

আজকাল কলকাতার শহরে দুর্গাপূজার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ছয় লক্ষের স্থলে ত্রিশ লক্ষ বাসিন্দা হওয়ায় পূজোর সংখ্যাও যে বর্ধিত হবে, আশ্চর্য কি! কবির লড়াই, তরজা, বাঈনাচ এখন আর দেখতেই পাওয়া যায় না। পরিবর্তে দেখা যায়, পাড়ায় পাড়ায় ব্যান্ড পার্টি সৃষ্টি হয়েছে। মহামায়ার চোখের সমুখে পিল ইয়ার ছোকরার দল টুইস্ট নৃত্য শুরু করেছে। আপত্তি জানাবে, তেমন সাধ্য নেই কারও। কারণ হাতবোমাকে ভয় করেন না, এমন লোক অতি অল্পই আছেন। টুইস্ট নাচের আসরে যে টপলেসদের আনাগোনা চলবে, এটা যেন স্বতঃসিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েকজন রুচিশীল নাগরিকের আপত্তি সত্ত্বেও মাইক্রোফোনের আকাশফাটা চীৎকার থামবে না, জানা কথা। কেন না আমাদের সেকুলার স্টেটে কারও ধর্মেকর্মে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। আইনে সাজা দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে।

রবিবারের আড্ডা যখন ভঙ্গ হলো তখন প্রায় বেলা একটা বেজেছে। বৌদি পাশের ঘর থেকে বললেন,—হাঁড়ী আগলে আর কতক্ষণ ব'সে থাকবো তাই শুনি? আমার কি আর কোন কাজ নেই?

আমরা দেখতে পেলাম, বৌদি রান্নাঘরের সামনে ব'সে আছেন। পুরানো কাঁথা সেলাই করছেন। আমাদের দেখতে পেয়ে বললেন,—সামনেই শীত আসছে, তাই ভাই কাঁথাখানা পেড়ে বসেছি। দেখি যদি এ বছরটা চালিয়ে দিতে পারি।

বৌদির পাশেই কাশীপতি। অঙ্ক কষছে এক মনে। কোনদিকে তার দৃকপাত নেই। অদূরে ঘুপটি মেরে বসে আছে একটা কালো বেড়াল। কালো বাজারের প্রেসিডেন্ট যেন সে, এমনই তার গম্ভীর মুখাকৃতি।

আমরা কিছুতেই ভেবে পেলাম না, কলকাতায়, যেখানে ঠক বাছতে বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যায় সেখানে তীর্থপতির মত সৎ নিরহঙ্কারী, জ্ঞানী, গুণীর, অবস্থান কিরূপে সম্ভব হতে পারে? কাশীপতির মত পুত্ররত্ন! বৌদির মত সহনশীলা সহধর্মিণী!

সত্যি, কলকাতা এক বিচিত্র দেশ!

* গ্রন্থখানির নাম Sirajdaullah And The East India Company, 1756—1757. লেখক Brijen K. Gupta.

With Season's Compliments of

DAVIDSON OF INDIA PRIVATE LIMITED

(Leading manufacturers of Industrial Fan Blowers & Tea processing Machinery in India)

Trade Mark-"SIROCCO"

Works : KALYANI (WEST BENGAL)

ডিটেকটিভ

(৫৭ পৃষ্ঠার পর)

রঞ্জিত জানতাম সিঁড়ির ঘর মুহূর্তে চলে গেছে। তা নয়, হতভাগাটা ওত পেতে দাঁড়িয়েছিল, দোর ঠেলে হঠাৎ নাটকীয়ভাবে ঢুকল। বলে, এখন চলে গেলে সন্দেহ আসবে, সেই জন্যে আছি। নয়তো সেই চুরির দিনই বিদায় হয়ে যেতাম। গণ্ডগোল মিটে গেলে তারপরে একটা দিনও আর থাকব না, এই আমার বলা রইল।

শান্তা কটমট করে তাকাচ্ছে। বিগলিত কণ্ঠে আমি বলে উঠিঃ এটা কি হল বাবা রঞ্জিত, আমাদের দুজনের কথা-বার্তার মধ্যে ছেলে হয়ে তুমি কেন আড়ি পাতবে? শান্তা ধকাবকি করে সেই সঙ্গে তুমিও যদি লাগো, বাড়ি ছেড়ে আমি বেবিষে পড়ব। মায়ে ছেলে-মিলে চালাওগে তোমাদের সংসার।

তবু নড়ে না দেখে আচ্ছা এক তাড়া দিলামঃ যাও, দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। চেহারাখানা কি দাঁড়িয়েছে আয়না ধরে দেখ। চানটান করে খেতে বোসোগে এবার।

রঞ্জিতকে ঠাণ্ডা করলাম। তবু শান্তা ভ্রূকুটি করেঃ গোড়া কেটে আগায় জল, সবাই বুঝতে পাবে। মুখেই ছেলে-ছেলে করছ, বিশ্বাস কবো ওকে? তা যদি হত, লেখার ঘরে তালা দিযে বেরুতে না অমন।

সেটা বাচ্চুর অত্যাচারে। সেদিন দেখলাম, ঘরে ঢুকে টেবিল হাণ্ডুল পাণ্ডুল করছে।

বাচ্চু হল পাশের ফ্লাটের। আসে সে প্রায়ই, কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, জেঠা-জেঠা করে আমায়।

শান্তা তাই বলল, বাচ্চুর অত্যাচার তো নতুন নয়। কলম চুরি যাবার পর থেকেই তুমি তালার আঁটাআঁটি করছ। রঞ্জিত কি মানে বোঝে না এর?

তারপরে ঠাণ্ডা মাথায় আদ্যোপান্ত ভেবে নিয়ে পড়ার ঘরের চাবি রঞ্জিতকেই দিয়ে দিলামঃ দেখ বাবা, চাবি হারানো আমার রোগ। কত যে চাবি হারিয়েছি, গোণাগুণতি নেই। অথচ ঘর খুলে রাখবারও যো নেই—বাচ্চুটা ইদানীং বড্ড বাড়িয়েছে। তুমি রেখে দাও চাবি, আমি এলে খুলে দিও।

এই মাত্র নয়, ক'দিন পবে আলমারির চাবিও গুঁজে দিই তার হাতে। যে আলমারিতে আমার টাকাপয়সা থাকে।

এ ভাবটাও নিতে হবে বাবা। তোমার মা খরচে মানুষ, এক হপ্তায় খরচা করে ফেলে সারা মাস উপোস করাবে। আর আমিই বা লেখাপড়া ফেলে একটাকা দু-টাকা করে কাঁহাতক বের করে করে দিই। তোমাকেই সব দেখেশুনে বিলিব্যবস্থা করতে হবে। চাপটা বেশি হয়ে যাচ্ছে জানি, কিন্তু উপায় নেই বাবা।

চাবি হাতে নিয়ে রঞ্জিত কেমন এক আচ্ছন্ন ভাবে তাকিয়ে থাকে। চোখ ছলছল করে যেন তার।

শান্তাই তখন বলে, বাড়াবাড়ি তোমার। মিছে সন্দেহ করবে না, তা বলে কি অমনি ঢেলে বিশ্বাস কবতে হয়।

এমনি ব্যবস্থার ভিতরেও আবার চুরি হল। হাতঘড়ি আমার। সন্দেহ পাছে রঞ্জিতের উপব পড়ে, সেই শঙ্কায় আমিই শতকণ্ঠে নিজের দোষ বলছি।

ভুলো স্বভাব যে আমার ঘড়িটা হাতে করে নিয়ে বাইরের বেঞ্চিতে বসেছিলাম। কথায় কথায় পরতে আর মনে নেই, ঐখানে ফেলে চলে গিয়েছি। তারপর দফাদার এসেছে, ডাক পিওন এসে চিঠি দিয়ে গেছে—পেশাদারি চোরও হতে পারে। দুর্গাদাসকে ডাকি। বেঞ্চির ওদিকটা কেউ তোমরা যেও না—সে এসে হাতের ছাপ-টাপ নিয়ে তদন্ত করুক।

ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞা ভরে রঞ্জিত বলে, করবে কচু আর ঘেঁচু। ভাঁওতা দিবে গুচ্চের টাকা নেবার ফিকির।

তা বললে হবে কেন রঞ্জিত। কলমের চোর ওই তো ধরল। বাড়ি এনে দেখিয়েও গেল চোরটাকে।

রঞ্জিত বলে, কলম দিল কই?

আরো কঠিন ব্যাপার সেটা। চেষ্টা করছে। ভরসা দিল, এই মাসের ভিতরেই পাওয়া যাবে।

রঞ্জিত বলে, ঘোড়ার ডিম।

মুহূর্ত কাল ভেবে নিয়ে আমার পায়ের উপর আছড়ে পড়েঃ আমি নিয়েছি কলম। মারতে হয় মারুন, কাটতে হয় কাটুন। আমারই দোষে একটা লোক মিছামিছি মারগুতোন খেয়ে মোলো।

দু-চোখে জল পড়ছে তার, তুলে ধরে আমি হাসছি। রঞ্জিত বলে, বিষের জন্য ধরেছে তো সকলে—পনের টাকার দরকার। লোভে পড়ে নিয়েছিলাম। কলম আবার আমি বাড়ি এনে রেখেছি। আপনি ধরেছিলেন ঠিকই। ও লোক কিছু জানে না, ওকে আনা অনর্থক।

হাসতে হাসতে বলি, না, আনব না। ঘড়ি আমি নিজে নিয়েছি। এবারের চোর আমি।

শান্তা কখন এসে দাঁড়িয়েছে। তার দিকে চেয়ে বলি, শুনেছ সব? দুর্গাদাসের চেয়ে বড় ডিটেকটিভ তবে আমি—কি বলো?

খেলা ভাঙ্গার খেলা

(৬৪ পৃষ্ঠার পর)

উপদ্রব উপস্থিত হবে না। আট দশ বছর কলকাতায় অনেক চীফের সংগে কাজ করেছে সমীর সোম। আজ পর্যন্ত কোথাও তার আটকায় নি। এমন কি কোন কোন চীফকে সে শেষ পর্যন্ত চরিয়েছে। এখন দেখা যাক কৃষ্ণস্বামীজীকে নেড়ে চেড়ে।

সমীর সোমের চিন্তাসূত্রে বাধা পড়লো সিঁড়িতে সশব্দে ওঠা পায়ের আওয়াজে আর সেই সংগে কানে এল তরুণী কণ্ঠের কলকল শব্দ আর খোলা হাসি। অল্প পরে মিসেস মুখার্জীর গলাও শোনা গেল। আওয়াজটা ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে এল। সমীর বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। এখুনি হয়ত ডাক পড়বে তার। তার আগে যা-হোক সাজ-পোষাক করা দরকার।

যথাসময়ে চায়ের টেবিলে ডাক পড়লো। তপতী মুখার্জী নিজেই এসে সংগে করে নিয়ে গেলেন সমীরকে। পরিচয় করিয়ে দিলেন,—

—এই মুকুল মিশ্র আর এই হল সুধা, যাদের কথা সকালেই তোমাকে বলেছি। আর ইনি মিস্টার সমীর সোম,—এখন অবশ্য শুধু সমীর আমাদের কাছে।

মুকুল মিশ্র এগিয়ে এসে সমীরের হাত ধরে রীতিমত ঝাঁকানি দিয়ে অভিবাদন জানালো,—ওয়ান মোর ফেদার এ্যাডেড টু আওয়ার ক্যাপ,—কী বলো সুধা,—লঙ লিভ ওল্ড ইউনিয়ন ক্লাব।—সমীর মুকুলের থাবার চাপে মনে মনে বলছে হ্যাঁ টেনিস চ্যাম্পিয়নেরই কব্জি বটে।

মুকুলের ঝাঁকানি শেষ হতে না হতে এগিয়ে এল সুধা। সমীরকে ভাববার সময় না দিয়ে তার বাহুমূলে বসিয়ে দিলে সজোরে এক চিমটি। দিয়েই সমীরের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলে,—প্লীজ মিস্টার সোম, ডোণ্ট মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ড,—দ্যাটস্ ওনলি দি প্রীচিং ক্রম এ সিস্টার-বী,—এ্যাণ্ড নাথিং এলস্।

তপতী মুখার্জী ছুটে এসে সুধা মিশ্রকে ধমক দিলেন,—ছিঃ সুধা, তোমার দাস্যপনা আর গেল না। এটা কি তোমাদের ক্লাব যে এখানে ঐ বিদঘুটে কাণ্ড করে বসলে? তোমাকে নিয়ে আর পারি না।—সমীরের দিকে অসহায় দৃষ্টি হেনে বলেন,—দোষ আমারই সমীর, আগে থাকতে সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল আমার। ভাবতে পারি নি বাড়ির মধ্যেই দাসী মেয়েটা এই কাণ্ড করে বসবে।—

নিখিলেশ হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন সমীরকে। এদের ক্লাবের হরেক অলিখিত প্রথার মধ্যে এই একটা। কোন পুরুষ রাঁচি ইউনিয়ন ক্লাবে সভ্য হবার সময় সেখানে 'বী-হাইভের' কোন মহিলা-সভ্যা উপস্থিত থাকলে নবাগতকে এই বর্বরোচিত প্রথায় সম্ভাষণ জানাবার অধিকার থাকে সেই মহিলার। আক্রান্ত নবাগতরা

আর এই হল সুধা যাদের কথা সকালেই তোমাকে বলেছি।

প্রথমে এই উৎকট প্রথার বিরোধিতা প্রকাশ করলেও পরবর্তী সভ্যের লাঞ্ছনাটুকু উপভোগ করার লোভে এর বিরুদ্ধে কখনো উঠে দাঁড়ায় নি। সেই থেকে এ ধরণের র‍্যাগিং অব্যাহত চলে আসছে ক্লাবে।

সুধা মিশ্র এই অবসরে খাবারের প্লেট থেকে একটু করো কেক তুলে নিয়ে দাঁত দিয়ে কামড়াচ্ছে নির্বিকারভাবে। নিখিলেশ তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কৃত্রিম কঠোর স্বরে বললেন—

—আসামী সুধা মিশ্র, ইউনিয়ন ক্লাব তার অলিখিত আইন অনুযায়ী যে অধিকার তোমার হাতে অর্পণ করেছিল, বালিকাসুলভ চপলতায় তার অপব্যবহার করার অভিযোগে তুমি অভিযুক্ত। বাদী পক্ষের সওয়াল আরম্ভ হবার পূর্বে আদালত তোমাকে প্রশ্ন করছেন, তুমি কি তোমার এই অপরাধ স্বীকার করো?—

আদালতের ভূমিকাতে আসামী কিছুমাত্র শায়েস্তা হয়েছে বলে মনে হল না। সুধা মিশ্র চেয়ারে হেলান দিয়ে কেক-এ আর একটা কামড় দিয়ে পরম উদাসীনভাবে জবাব দেয়—

—মিস্টার সোমকে তার আগে জিগ্যেস করা হোক তার লেগেছে কিনা।—

জবাব শুনে সকলেই একসঙ্গে হেসে ওঠে। নিখিলেশ তার কপট গাম্ভীর্য বজায় রেখে সামনে আর কিছু না পেয়ে চায়ের চামচটা গ্যাভেলের মত ঠুকলেন টেবিলের ওপর,

—অর্ডার! অর্ডার! আদালত আসামীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, আসামী সুধা মিশ্র আদালতের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বাদীপক্ষকে অন্যায়ভাবে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করেছে। এটি তার দ্বিতীয় অপরাধ। এবং এর শাস্তিস্বরূপ আসামী এখন তার বিরুদ্ধে দায়ের নম্বর অভিযোগের জবাব দেবার অধিকার হারাল। এখন আসামী যথাযোগ্য দণ্ড গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হোক।—

চোখ থেকে চশমাটা খুলে তার কাঁচ মুছতে মুছতে নিখিলেশ আড়চোখে সকলের মুখের দিকে চেয়ে নিলেন। মুকুল আর সমীর চা খাওয়া ভুলে গিয়ে আদালতের বিচার শোনার আগ্রহে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। তপতী তাঁর স্বামীর এই ছেলে-মানুষীটুকু রীতিমত উপভোগ করছেন তা তাঁর উৎসাহপূর্ণ চাউনি দেখে বোঝা যায়। আসামী সুধা মিশ্রের মুখে চোখে অনুনয় মিশ্রিত আবেদন,—অর্থাৎ দণ্ডটা যেন সহনীয় হয়। দণ্ডাজ্ঞা শোনার উৎকণ্ঠায় আপাতত কেক চিবনো বন্ধ। নিখিলেশের রায় গুরু-গম্ভীর স্বরে উচ্চারিত হল—

—বাদীপক্ষ মিস্টার সোম ইউনিয়ন ক্লাবের প্রস্পেকটিভ মেম্বার মাত্র। এখনো তিনি মেম্বারশিপ গ্রহণ করেন নি। সে অবস্থায় আসামী সুধা মিশ্র স্থানকালপাত্র বিস্মৃত হয়ে যে বর্বর আচরণ দেখিয়েছে তা গুরুতর অপরাধ বলে আদালত গণ্য করছে। তবে গুরুতর হলেও আসামীর এই প্রথম অপরাধ এই বিবেচনায় আদালত আসামীকে লঘুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। জরিমানা হিসেবে এখানে উপস্থিত কজনকে আসামী আজ সন্ধ্যায় ক্লাব রোডের গে-লর্ড কাফিখানায় পেট ভরে ফ্রায়েড চিকেন আর আইসক্রীম খাওয়াবে।—

চামচটা আর একবার টেবিলে ঠুকে নিখিলেশ তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন,—দি কোর্ট মে রাইজ ফর দি ডে।—

আনন্দ কোলাহলের মধ্যে দিয়ে চা পর্ব শেষ হল। অল্প সময়ের মধ্যে সমীর মুকুল আর সুধা মিশ্রের সঙ্গে মিশে গিয়েছে লক্ষ্য করে মুখার্জী-দম্পতি পুলকিত। তাঁদের ভাবনা ছিল এরা পরস্পরকে কী ভাবে গ্রহণ করবে। সমীর সোমও বুঝতে সুরু করেছে যে, রাঁচিতে থাকতে হলে নিজেকে এদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।

নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে সমীর সোম মাসখানেকের মধ্যে। আপিসে গুছিয়ে বসতে এক সপ্তাহও লাগে নি। এখানে যে ধরণের কাজ তার চেয়ে অনেক জটিল কাজ সে কলকাতায় সুনামের সঙ্গে চালিয়ে এসেছে। নতুন চীফ সম্বন্ধে তার যেটুকু ভাবনা ছিল পরিচয়ের পর তাও আর নেই। এখানেও কলকাতার অভিজ্ঞতা তার প্রধান সহায়। কৃষ্ণস্বামী নিজে কাজের লোক, কাজ বোঝেন। মানুষটির নামের প্রথমার্ধের সঙ্গে গায়ের রঙের যথেষ্ট মিল। আবার "স্বামী"ত্ব সম্বন্ধেও তিনি বেজায় সচেতন। পুরো সাহেবী মেজাজ। তবে সাহেবীয়ানায় সমীর সোমও কিছু কম যায় না। সব দিক দিয়েই দুজনের মধ্যে বোঝাপড়া হতে বেশি সময় লাগল না।

আপিসমহলে যত সহজে সমীর নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছে আপিসের বাইরে যে বিস্তৃত সমাজ সেখানে তা পারে নি। এখানকার চালচলনের সঙ্গে তাকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এদের ওপর নিজের ইচ্ছে খাটান যেমন চলবে না তেমনি নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে গিয়ে এদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাই হৃদয়ের তাগিদে যতটা না হোক স্বার্থ বজায় রাখার জন্যে এদের সঙ্গে মিশে যেতে চেষ্টা করে সমীর সোম। এ মেলামেশায় তাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন তপতী আর নিখিলেশ। মুকুল আর সুধা মিশ্রের দান কম নয়, যদিও সমীরকে নিছক সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে এরা কিছু করে নি। এদের আসল উদ্দেশ্য ক্লাবে নিজেদের দল ভারী করা।

বলতে গেলে আপিসমহল বাদ দিলে একমাত্র এই ক্লাবের মাধ্যমেই যা কিছু আলাপ-পরিচয়। একথাও বলা যায়, পরিচিত মহলের গণ্ডী ইউনিয়ন ক্লাবের মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ। এর বাইরে যাবার দরকারও হয় না। ইউনিয়ন ক্লাব রাঁচির যাকে বলে কস্‌মোপলিটান ক্লাব। এ ক্লাবের সৃষ্টি হয়েছিল একসময় বিশেষ করে প্রবাসী বাঙালীর চেষ্টায়। দেশ স্বাধীন হবার পর এ অঞ্চলে ছোট বড় নানা রকম শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পত্তন হওয়ার ফলে নানা প্রদেশের মানুষ চাকরি বা কনট্র্যাক্ট নিয়ে এখানে আসতে সুরু করেছে। রাঁচি সহর আর তার আশপাশের চেহারা দিনে দিনে বদলে গিয়েছে। ভীড় বেড়ে চলেছে। কেনাবেচা বাড়ছে। ডোরাণ্ডা ধুরুয়া ইত্যাদি অঞ্চল থেকে সুরু করে বহুদূর বিস্তৃত এলাকা পর্যন্ত বড় বড় ফ্যাক্টরী আর ওয়ার্কশপ আর আপিসে ভরে গেছে। সহরের মধ্যে হালফ্যাশনের বাড়ি দোকান হোটেল গজিয়ে উঠছে পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। নতুন নতুন ক্লাবও তৈরি হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ নিয়ে। সেই সঙ্গে পুরানো ক্লাব যা ছিল সেগুলো স্ফীত হয়ে উঠেছে নতুন নতুন সভ্যের সমাগমে। রাঁচি ইউনিয়ন ক্লাব যেখানে একদা ছিল একটিমাত্র ঘর তাসপাশা খেলার জন্যে আর একটিমাত্র টেনিস কোর্ট আজ সেখানকার জাঁকজমক দেখলে অবাক হতে হয়। একটির জায়গায় তিনটে টেনিস কোর্ট, তা ছাড়া ব্যাডমিন্টন কোর্ট, কেয়ারী-করা বাগান, সুইমিং পুল ত' আছেই। ওদিকে একখানা ঘরের জায়গায় আজ বিলিয়ার্ড রুম, প্রশস্ত হলঘর যেখানে নাচগান থেকে আরম্ভ করে নাট্যাভিনয়, ফিল্ম-শো, গ্র্যাণ্ড ডিনার আর লাঞ্চ সব কিছুরই ব্যবস্থা হতে পারে—সব কিছুই তৈরি হয়েছে,—এ ছাড়া লাইব্রেরী, অফিস আর ক্যান্টিন। সভ্যদের সংখ্যাও দিনে দিনে বেড়েছে। যে ক্লাবের সভ্যসংখ্যা একসময় বড় জোর পঞ্চাশ আর যারা ছিল সামান্য কয়েকজন অবাঙালী ছাড়া সবাই প্রবাসী বাঙালী আর সকলেই পুরুষ, আজ তার সংখ্যা পুরুষ আর স্ত্রী মিলিয়ে প্রায় হাজারে পৌঁছেছে। বাঙালী আর বিহারী ছাড়াও এখানে ভীড় করে আছে সুদূর পাঞ্জাব আর মহারাষ্ট্র, তামিলনাদ, মালাবার আর সিন্ধের নারী-পুরুষ। স্থানীয় ফিবিঙ্গীসমাজে আলাদা ক্লাব না থাকায় কিছু ফিবিঙ্গী ছেলে

শেঠ এণ্ড সন্স (প্রাঃ) লিঃ

প্রসিদ্ধ লৌহ ব্যবসায়ী ও মার্চেন্টস

টাটা, ইস্কো এবং হিন্দুস্থান ষ্টীল

বি/৫, জগন্নাথ ঘাট লোহাপট্টী, কলিকাতা-৭

(অফিস) ৩৩৪১৪৬ঃ ফোনঃ ৬৭৩৩৭৪ (ইয়ার্ড)

মেয়েও এসেছে। ক্লাবের মেম্বারদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন পেশার পারিভর পেশার মানুষ। সরকারী আর বেসরকারী চাকুরে ছাড়াও রয়েছে নানা শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা আর কনট্রাক্টর, উকিল, ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার। রয়েছে অধ্যাপক আর বয়স্ক ছাত্রছাত্রীর দল, কিছু পেশাদার আর্টিস্ট আর কিছু নিখিলেশের মতো রিটায়ার্ড অফিসার। এ ছাড়া কিছু নারীসভ্যাও আছেন যাঁদের নিজেদের কোন পেশা নেই, এঁরা এসেছেন নিজের নিজের স্বামীর সংগে।

ক্লাবের পরিধি যত প্রসারিত হয়েছে সেই সংগে ক্লাবের মধ্যে ছোট ছোট পৃথক দলও তৈরি হয়েছে স্বাভাবিক নিয়মে। এখন আরও কর্মক্লান্ত দিনের পর নিরিবিলিতে অবসর যাপনই ক্লাবের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। কাজেই যারা নিরিবিলি চায় তারা তাদের আলাদা দল গড়ে নিয়েছে। এইভাবে যারা যা চায় সেইমত পৃথক গোষ্ঠী রচনা করেছে। ফলে দাঁড়িয়েছে ইউনিয়ন ক্লাবের বিশাল প্রাঙ্গণে অনেকগুলো ছোট ছোট বৃত্ত যাদের এক-একটিকে ক্লাব বলেও অভিহিত করা চলে। বছরে দু-চারবার এমন উপলক্ষ আসে—যেমন পুজো বা বড়দিন অথবা ক্লাবের ফাউণ্ডেশন ডে যখন ছোট ছোট বৃত্তগুলো পরস্পরের গা-ঘেঁসে বড়রকম উৎসবে মেতে ওঠে, আয়োজন চলে টেনিস ব্যাডমিণ্টন বিলিয়ার্ড কম্পিটিশনের, ফ্যান্সী ড্রেস আর ডিনার পার্টির, গান-বাজনা আর অভিনয়ের বিচিত্র অনুষ্ঠানের।

সমীর সোম মুখার্জী আর মিশ্র দম্পতির সংগে ইউনিয়ন ক্লাবের যে দলে গিয়ে মিশেছে তার সৌখীন নাম বী-হাইভ। এ দলের সকলে সময় সময় পরস্পরকে সম্বোধন করে 'বী' আখ্যায়। এখানে কেউ ব্রাদার বী, কেউ সিস্টার বী। আবার আংকল-বী আণ্টি-বীও আছেন। বী-হাইভ আকারে বড় নয়। এ দলে যারা নিয়মিত প্রতি সন্ধ্যায় হাজির থাকে তারা সংখ্যায় দশ-বারজনের বেশি নয়। ক্লাবে এসে প্রথম ঘণ্টাখানেক কাটে খেলাধুলোয় বা সাঁতারে। তার পর সবাই একসংগে বসে বাগানের এককোণে বা ঢাকা বারান্দায়। সেখানে চা-কফির সংগে চলতে থাকে খোসগল্প আর নতুন নাটক অভিনয়ের পরিকল্পনা। রাত নটার পর একে একে সবাই বিদায় নিতে থাকে।

খেলাধুলো আর গল্পগুজব ছাড়াও মধুচক্র আর একটি বিষয়ে উৎসাহী। বছরে বার দুই নাটকের অভিনয় হয় বী-হাইভের পরিচালনায়। অভিনয়ে অংশ নেয় মধুচক্রের নিয়মিত সভ্য-সভ্যারা। দরকার হলে ক্লাবের অন্য মেম্বারদেরও পার্ট দেওয়া হয়ে থাকে। কখনো হয় বাংলা সামাজিক নাটক বা প্রহসন কখনো হয় বিদেশী নাটকের অনুবাদ। অভিনয় ব্যাপারে তপতীর যথেষ্ট উৎসাহ। স্কুল-কলেজে বরাবরই তিনি অভিনয় করে সুনাম পেয়েছেন। এখন পার্ট বড় একটা নেন না, কিন্তু পার্ট শেখান আর পরিচালনার ভার তাঁকেই নিতে হয়। নাটিকা লেখায় বা বিদেশী নাটককে বাংলা ছাঁচে রূপ দেওয়ায় নিখিলেশের হাত আছে। মোটের ওপর অভিনয়কে কেন্দ্র করে গত কয়েক বছর থেকে মধুচক্র ইউনিয়ন ক্লাবের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছে।

মধুচক্রের এ বছরের পুজোর নাটক 'ঘূর্ণি'। বিলিতী সামাজিক একাঙ্কিকার অনুসরণে বাংলা নাটক,—এবারেও প্রস্তুত করেছেন নিখিলেশ মুখার্জী। সমীর সোম রীতিমত আসার কয়েকদিন পর থেকে নাটকের রিহার্সালের তোড়জোড় চলছে। কাকে কি পার্ট দেওয়া হবে ত নিয়ে তর্কবিতর্ক আরম্ভ হয়ে গেছে। সুধা মিশ্রকে বড় একটা নায়িকার পার্ট দেওয়া হয় না, এ নিয়ে তার নালিশ আছে মনে মনে। নেহাৎ মাসিমার সংগে এ নিয়ে তর্ক করতে ভয় পায় বলেই চুপ করে থাকে। গেল বছরে পার্ট বিতরণের সময় নায়িকার ভূমিকা নিয়ে একটু আক্ষেপ জানাতে না জানাতে তপতী ধমকের সুরে বলেছিলেন,—'তা আমি কী করতে পারি বাছা! তোমার মত বাঁশি খুকিকে নিয়ে নাট্যকার যতদিন নায়িকা না বানাচ্ছেন ততদিন একটু ধৈর্য ধরো। না-হয় তোমার মেসোকেই ধরো না যাতে ঠিক তোমার মত নায়িকাকে নিয়ে একখানা নাটক লেখেন।'

এবারের নাটকের যে নায়িকা তার চেহারা, বয়স আর চরিত্রের সংগেও সুধা মিশ্রের কোন মিল নেই তা সে জানে। নায়িকা অশ্রুমতী বিধবা বয়স তিরিশ ছাড়িয়ে গেছে, দেখতে সুন্দরী হলেও তার মত বেঁটেখাটো নয়, রীতিমত লম্বা। এবারেও নায়িকার পার্ট তনিমা সান্যালের কপালে নাচছে তাতে সন্দেহ নেই সুধা মিশ্রের।

তনিমার সংগে সুধা মিশ্রের জানাশোনা আজকের নয়। বলতে গেলে তনিমাকে সুধাই একদিন জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল নিজেদের ক্লাবে। সে প্রায় চার বছর আগেকার কথা, যখন তনিমা আর তার ধনকুবের স্বামী ধরণী সান্যালকে জড়িয়ে নানারকম রঙডাব খবরে রাঁচি সহর সরগরম। বিয়ের মাত্র দু-বছরের মধ্যেই এই ব্যাপার। কেউ বলছে বুড়ো মাতাল স্বামীর অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় তনিমা কোর্টের আশ্রয় নিতে যাচ্ছে আবার কারুর মতে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো—তারা বলছে স্ত্রীর চালচলন বরদাস্ত করতে না পেরে ধরণী সান্যাল ডিভোর্স নেবার ব্যবস্থা করছে। সুধা মিশ্র আসল ব্যাপারটা জানতো। দু-জনের মধ্যে অনেক মতান্তর জমে উঠলেও দু-জনের কেউই তখন আদালতে যাবার জন্যে তৈরি নয় বা এ নিয়ে বন্ধুবান্ধব কারো কাছেই তারা নালিশ করতে যায় নি। কিন্তু সুধা মিশ্রের সাধ্য নেই যে এই গুজবের বন্যা রোধ করে। ধরণী সান্যাল পুরুষ মানুষ, টাকার জোরও তার আছে। তাই এ নিয়ে গুজব তাকে বিশেষ জব্দ করতে পারে নি। সে তার নিজের ব্যবসা আর বন্ধুবান্ধব নিয়ে ইচ্ছেমত যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছে। অভিজাত শ্রেণীর 'ইস্ট-এণ্ড' ক্লাবেও তার অবারিত দ্বার। কিন্তু বিপদে পড়েছিল তনিমা সান্যাল। গুজবটা এমন জোরালো হয়ে ছড়িয়েছিল যে, ইস্ট-এণ্ড ক্লাব ত দূরের কথা রাস্তাঘাটেই একা গাড়ী নিয়ে বেরোন তার পক্ষে প্রায় অসাধ্য। সুধা আর মুকুল মিশ্র সেদিন এই সংকট থেকে টেনে তুলেছিল তনিমাকে। সুধা তনিমাকে সংগে করে এনেছিল তপতী মুখার্জীর বাড়িতে। সেখান থেকে সকলে মিলে এসেছিল ইউনিয়ন ক্লাবে। এদের সকলের চেষ্টায় তনিমাকে তখনি ক্লাবের মেম্বার করে নেওয়া হল। সুধা আর মুকুল সেখানেই থামে নি। এক সপ্তাহের মধ্যে ধনকুবের ধরণী সান্যালকেও আসতে হল ইউনিয়ন ক্লাবের প্রাংগণে। ঘটা করে বুফে ডিনার সম্পন্ন হল ইউনিয়ন ক্লাবের বাগানে।

চার বছর আগে সুধা, মুকুল আর মুখার্জী দম্পতির চেষ্টায় তনিমা আর ধরণী সান্যালকে জড়িয়ে কুৎসার ঢেউ সেই যে প্রতিহত হয়েছিল, সে ঢেউ আর ফিরে আসার সুযোগ পায় নি। এই সুযোগ না পাওয়ার পেছনে কাজ করেছে এই চারজনের নিবলস সতর্কতা আর আন্তরিক চেষ্টা। এই দীর্ঘ চার বছরে তনিমা আর ধরণী সান্যালের মাঝখানের ব্যবধান সংকুচিত না হলেও দু-জনেই পরস্পরকে সহ্য করে নিতে অভ্যস্ত হয়েছে। এ অভ্যাস কিছুটা এসেছে এদের নিজের নিজের গরজবোধ থেকে, আর বাকীটা সম্ভব হয়েছে তপতী আর সুধার চেষ্টায়। এখন ক্লাবের ও সহরের যে-কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে তনিমা আর ধরণী সান্যালকে একসংগে যেতে আসতে দেখা যায়। তনিমা অবশ্য সেই থেকে ইস্ট-এণ্ড ক্লাবের সংস্রব প্রায় ত্যাগ করেছে। সে এখন ইউনিয়ন ক্লাবের বী-হাইভ বৃত্তের অবিচ্ছেদ্য অংগ। ধরণী সান্যালও আসেন মাঝে মাঝে, যদিও তাঁর নিয়মিত গতিবিধি বজায় রেখেছেন তাঁর সাবেক ক্লাবেই।

তনিমা সান্যালকে সমীর প্রথম দেখল 'ঘূর্ণির' রিহার্সালে। তনিমা মাঝে কিছুদিন রাঁচিতে ছিল না। মুরির বাড়িতে মা বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়ায় মার পরিচর্যার জন্যে তাকে যেতে হয়েছিল। সেখানে মাসখানেক কাটিয়ে মাকে সুস্থ দেখে তনিমা সবে ফিরে এসেছে।

নাটক দেখার আগ্রহ সমীরের কোনদিনই নেই। কিন্তু এখানে আসার পর থেকে আগ্রহ না থাকলেও নানা বিষয়ে আগ্রহ দেখাতে হচ্ছে।

সেদিন সন্ধ্যের পর ঘূর্ণির প্রথম রিহার্সাল শুনতে সমীর সোম যখন ক্লাবের হল ঘরে পৌঁছল, তার আগেই রিহার্সাল আরম্ভ হয়ে গেছে। মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে কয়েকটি নতুন মুখ সমীরের চোখে পড়লো। অবশ্য সকলেই নাটকের পার্ট নিয়ে আসে নি—কেউ কেউ এসেছে দর্শক বা শ্রোতা হয়ে। তপতী মুখার্জী এসেছেন অনেক আগে তদারকের ভার নিয়ে। তিনি একে একে পার্ট বুঝিয়ে দিচ্ছেন। নিখিলেশ বা মুকুলকে দেখা যাচ্ছে না। সুধা মিশ্র কিছু দূরে বসে নীচু গলায় পাশের একটি মেয়ের সংগে কথা বলছে।

সমীরের চোখে চোখ পড়তে দুষ্টুমির হাসি হেসে আবার মেয়েটির সঙ্গে আলাপ সুরু করলো। কিন্তু আলাপের মাঝে মাঝে যে-ভাবে সমীরের দিকে চাইছে, তাতে মনে হয় সমীরকে নিয়েই কিছু বলছে। সমীর ইতি-মধ্যে সামনের চেয়ারে বসে পড়েছে। একবার ঘাড় ফিরিয়ে ভালো করে দেখে নিল মেয়ে-টিকে। একে আগে কোনদিন দেখেছে বলে মনে পড়ে না। অতি সাধারণ মুখ। আগে কখনো দেখলেও মনে থাকবে এমন কিছু নেই সে মুখে। বেশ-বিন্যাসও মামুলি।

দু'তিনজনকে পার্ট দেখান হয়ে গেলে ডাক পড়লো তনিমা সান্যালের। তপতীর ডাক শুনে যে মেয়েটি উঠে দাঁড়াল সমীর চেয়ে দেখে এ সুধার পাশে বসা সেই মেয়েটি, যার সঙ্গে সুধা কথা বলছিল। বসে থাকা অবস্থায় তাকে যেমন দেখাচ্ছিল দাঁড়িয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ গেছে বদলে। প্রথম নজরেই চোখে পড়ে মেয়েটির শরীরের দৈর্ঘ্য। ঋজু হয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গীটিও দেখবার মত। শুধু সমীরের নয়, সকলের দৃষ্টি একসঙ্গে গিয়ে পড়লো মেয়েটির ওপর। বেশবাসের মধ্যে বাহুল্য কোথাও নেই, অথচ তারই মধ্যে একটা স্বকীয়তার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেহ-টিতে ঘিরে, এই তনিমা সান্যাল! এ নাম সমীর কয়েকবার শুনেছে তপতী আর সুধার মুখে ক্লাবের অভিনয় প্রসঙ্গে। সমীরের ধারণা ছিল তনিমা সান্যালকে দেখবে সম্পূর্ণ অন্য বেশে, অন্য ভঙ্গীতে, যেমন সচরাচর দেখা যায় নাম করা অভিনেত্রী বা শিল্পীকে। কিন্তু এখনি যাকে দেখলো সে একেবারে অন্য মানুষ।

তপতী ডাকলেন,—তনিমা, এবার তোমার পার্টটা দেখে নাও। কিন্তু অতো দূরে বসলে হবে না, এগিয়ে এস।—তারপর চার-দিকে দেখে নিয়ে বলেন,—কিন্তু প্রবীরের 'ভ' এখনো দেখা নেই। কী অন্যায় কথা! সাড়ে ছটায় রিহার্সাল আরম্ভ হবার কথা—আর এখন সাড়ে সাতটা বাজতে চলেছে। 'বাদলের' বোল সবচেয়ে ইম্‌পর্ট্যান্ট, অথচ সেই বাদলেরই দেখা নেই। থাকলে 'বাদল' আর 'অশ্রুমতী' দুজনেরই পার্ট আজ খানিকটা তৈরি হয়ে যাবার কথা। গোড়া থেকেই যদি অনিয়ম চলে কাজ এগুবে কি করে জানি না। —যাক্ আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। তনিমা ততক্ষণ তুমি স্ক্রিপ্ট্-খানা ভালো করে পড়ে নাও।

এমন সময় নিখিলেশ আর মুকুল মিশ্রকে ঢুকতে দেখে তপতী অনুযোগ জানালেন,—প্রথম দিন থেকেই তোমরা সবাই মিলে যে ভাব দেখাচ্ছ, তাতে মনে হচ্ছে এবার থিয়েটার বন্ধ রাখলেই ভালো ছিল।

নিখিলেশ আর মুকুলের জিজ্ঞাসু চাউনি লক্ষ্য করে তপতী আবার বললেন,—এ দিকের কাজ আজকের মত শেষ করে বসে আছি। কিন্তু আসল প্রবীর চৌধুরীরই দেখা নেই। সে না এসে দাঁড়ালে তনিমাও রিহার্স করতে পারছে না। অথচ এদেরই যেন পার্ট।

মুকুল জিগ্যেস করলো,—বমলা? সেও আসে নি নাকি?—

সুধা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়,—রমলা ত্রিপাঠি এলে কি প্রবীর চৌধুরী না এসে থাকতে পারত?—

সমবেত কণ্ঠের হাসির আওয়াজ ছাপিয়ে তপতী মুখার্জির ধমক শোনা গেল,—আঃ সুধা! সবতাতে তোমার কথা না বললেই কি

ঋজু হয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গিটি দেখবার মত.....সকলের দৃষ্টি একসঙ্গে গিয়ে পড়ল মেয়েটির ওপর।

পর?—এই গুলো [illegible] সহজ করে নেবার চেষ্টায় বলেন,—'লোব ত' ছোট্ট একটুকু পার্ট, সে আজ না এ ও ক্ষতি নেই। মুকুল, তুমি বরং অফিস রুম থেকে প্রবীরকে একটা টেলিফোন করে খোঁজ নাও সে আজ আসছে কি না।—

মুকুল বেরোতে যাচ্ছে, এমন সময় সুধা পেছন থেকে বলে ওঠে,—প্রবীরকে তার বাড়িতে না পেলে শ্যামলাল ত্রিপাঠীর ওখানে খোঁজ করতে বলে দাও মাসিমা। প্রবীর রমলা দুজনকেই পাওয়া যাবার সম্ভাবনা ওখানে।—

মুকুল টেলিফোন করতে বেরিয়ে গেল।

তপতী তনিমার দিকে তাকিয়ে বললেন, —স্ক্রিপ্ট দেখা হল, তনিমা?

—একরকম হল। কিউগুলো পেলে মন্দ হতো না। কাজটা আজই খানিকটা বুঝে নেওয়া যেত।—সংক্ষেপে জবাব দিল তনিমা সান্যাল।

তনিমার গলার স্বর এই প্রথম শুনল সমীর সোম। কেন সে ভেবেছিল ওর কণ্ঠস্বর হবে ঝন্‌ঝনে আর ও কথা কইবে উচ্চগ্রামে, তা সমীর ভেবে পেল না। তার পরিবর্তে শুনল খসখসে ধরা গলায় কয়েকটা কথা। স্বরের মধ্যে না আছে প্রাণ, না আছে ওঠানামা। এই গলা নিয়ে অভিনয়,—তাও আবার নায়িকার ভূমিকায়! হতাশ হল সমীর সোম।

তনিমার উত্তর শুনে সুধা উঠে এসে তপতীর কানে কানে কী যেন বলে আবার নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলো। বসে মুখ নীচু করে হাসি চাপবার চেষ্টা করছে।

তপতী নিখিলেশের দিকে চেয়ে বললেন, —সুধার আইডিয়াটা মন্দ নয়, শুনছ?— নিখিলেশ সাগ্রহে তপতীর দিকে চাইতে তপতী নিখিলেশকে কিছু না বলে সমীরকে লক্ষ্য করে বলেন,—সমীর, একটা উপকার করবে ভাই? তুমি যদি উঠে এসে কিউগুলো দিয়ে যাও, তনিমার কাজটা এগিয়ে যায়। আসবে?

সমীর সোম যেন আকাশ থেকে পড়ল। তাকে দিতে হবে রিহার্সালের কিউ! তপতীদির মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

সমীরকে ভাববার সময় না দিয়ে নিখিলেশ উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন,—দ্যাটস্ এ ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া। কিউ দেওয়াও হোক আর সেই সঙ্গে সমীরের হিস্ট্রিয়নিক পার্সিবিলিটিজেরও একটা টেস্ট হয়ে যাক। চলে এসো সোম।—

সুধা মিশ্র আর খুশি চাপতে না পেরে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল,—ও! হাউ নাইস এ্যান্ড ক্লেভার অফ ইউ, আঙ্কল-বাবী! এ স্পোর্ট সমীর এ্যান্ড হারি আপ,—হিয়ার ইজ এ চান্স ইন এ মিলিয়ন।

ষড়যন্ত্রের পেছনে যে সুধা তা বুঝতে পারা যাচ্ছে এইমাত্র তপতীর কানে সুধার মন্ত্র দেওয়া দেখে। মনে মনে জ্বলে উঠেছে সমীর। কিন্তু এত লোকের সামনে তপতী আর নিখিলেশের আহ্বানকেও উপেক্ষা করা চলে না। সুধার উদ্দেশে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে সমীর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

—কী আশ্চর্য দেখ! তোমাদের ত' এখনো ইনট্রোডাকশানই হয় নি,—তপতী মুখার্জি বলে উঠলেন।—এসো পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হলেন মিসেস তনিমা সান্যাল। আর ইনি মিস্টার সমীর সোম, আমাদের নতুন মেম্বার। আচ্ছা সমীর, এই নাও তোমার স্ক্রিপ্ট। এখানে তনিমার সামনে এসে দাঁড়াও। নাও, এবার আরম্ভ করো।—

যেমন কয়েক লাইন পড়তে গিয়ে সমীরের মনে হয় গলা আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কথা যাচ্ছে জড়িয়ে। কিন্তু হার মানা চলবে না। সুধা মিশ্রর রসিকতার জবাব সে দেবে। সেই সঙ্গে এক অজানা আকর্ষণ অনুভব করে সমীর সোম। কিছুক্ষণ আগে তপতীর কথার জবাব দেবার সময় তনিমার যে কণ্ঠস্বর আর কথা বলার ধরণ শুনে সে হতাশ বোধ করেছিল এরি মধ্যে তার এত পরিবর্তন হল কোন্ মন্ত্রবলে? তনিমার সে কণ্ঠে যেন অন্য কেউ ভর করেছে রিহার্সাল সুরু হতে না হতে।—নাটকের যে দৃশ্যের মহলা চলেছে সেখানে না আছে বোন উত্তেজনা, না আছে আবেগ। দৃশ্যটা একেবারেই ঘরোয়া। অশ্রুমতীর বাড়ির নীচের তলার নতুন ভাড়াটে হয়ে এসেছে বাদল। এ দৃশ্যের সংলাপে শোনা যাবে অশ্রুমতী আর বাদলের প্রথম আলাপ। পরস্পরের খোঁজখবর নেওয়া। কোনরকম অন্তরঙ্গতার লেশমাত্র নেই। অথচ এই সাদামাটা সংসাপের মধ্যেও সমীরের অনভ্যস্ত জড়ান কথার পিঠে পিঠে ঐ অতিসাধারণ কথাগুলো এমন অনায়াস ভংগীতে তনিমা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে যার বৈশিষ্ট্য কারো কান এড়িয়ে যাবার নয়। প্রত্যেকটি শব্দ যেন ওজন করা, কোথাও উঠছে কোথাও নামছে। শব্দের মাঝে মাঝে বিরতি, যেন মাপ করা। তনিমার অভিনয়ভংগী কেবল তার নিজের বাচনের মধ্যেই শেষ নয়। সংলাপের অদৃশ্য সূত্র ধরে সে প্রভাব বিস্তার করছে তার পার্টনারের ওপর, মাতিয়ে তুলেছে তাকেও, টেনে নিয়ে যাচ্ছে নাটকের প্রাণকেন্দ্রে। তনিমার অভিনয়ের গুণে সমীরও ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস খুঁজে পাচ্ছে। তনিমা যেন তার হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে তাকে।

যে দৃশ্যের পর আরো দুটো দৃশ্যের মহলা চললো। এ দৃশ্যের যে সংলাপ তা এখন আগের মত সহজ সরল নয়। এখানে অশ্রুমতীর কথায় প্রচ্ছন্ন আবেগ, কখনো অভিমান, আবার কোথাও আত্মনিবেদনের প্রকাশ, যার উত্তরে শোনা যাবে বাদলের বিদ্রূপ আর শ্লেষ-মেশান কশাঘাত। অভিনয়ের নৈপুণ্যের পরীক্ষা এখানে। সমীর বুঝতে পারছে অভিনয় তার কিছুই হচ্ছে না। অভিনয়ের পরীক্ষা দিতে সে অবশ্যই আসে নি। তার কাজ কিউ ধরিয়ে দিয়ে তনিমার রিহার্সালের সাহায্য করা। তবু ওরি মধ্যে মনের কোণে কোথায় একটু আত্মপ্রসাদ উঁকি দিয়ে যায়।

মুকুল মিশ্র অনেক আগেই টেলিফোন শেষ করে ফিরে এসে সুধার পাশের চেয়ারে বসেছিল। দৃশ্যটা শেষ হতে মুকুল আর সুধা একসঙ্গে হাততালি দিয়ে ওঠে। নিখিলেশ মুখার্জিও। মুকুল এগিয়ে এসে সমীরের পিঠে চাপড় মেরে বলে,—হোয়াট এ ডেঞ্জারাস বোগ ইউ আর, সোম! ডুবে ডুবে এত জল খাও তুমি!—

নিখিলেশ চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে একরাশ ধোঁওয়া ছেড়ে বললেন,—ওয়েল ডান সোম। পার্সুড্ উইথ অনার্স!—

তপতী এগিয়ে এলেন,—তোমরা এত বেশী বললে সমীর হয়ত ভাববে ওর লেগ পুল করা হচ্ছে।—সমীরের দিকে চেয়ে বললেন,—আমি যেন ক্রিটিক নই, সমীর, তবু এটুকু বলতে পারি চেষ্টা করলে তুমি ভালোই প্লে করতে পারবে।

সুধা মিশ্র তনিমার সঙ্গে কথা বলছিল। দূর থেকে দুষ্টুমির সুরে বলে উঠল,—হিয়ার, সোম! ডু ইউ নীড এনি মোর প্যাট অন ইওর ব্যাক? অর ইজ দ্যাট এনাফ্?—

সমীর সোম তার দিকে কিল দেখিয়ে জবাব দেয়,—টেল ইউ লেটার—ইউ!—

এমন সময় দরজার কাছে মেয়েলি গলার হাসির আওয়াজ শোনা গেল। সকলের সঙ্গে সমীরও ঘাড় ফেরাল সেদিকে। তপতী নালিশের সুরে বলে উঠলেন,—তোমরা ভেবেছ কী বলতে পার, রমলা? আর তুমিই বা কী দায়িত্ববান ছেলে, প্রবীর? আজ প্রথম রিহার্সাল, আর আজই রাত ভোর করে তোমাদের আসার সময় হল?—

রমলা প্রায় ছুটে এসে তপতীকে জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বললে,—আমাদের কী দোষ আন্টি! মা হঠাৎ একপাল বন্ধু নিয়ে পার্টিতে বসেছে। কিছুতেই ছাড়তে চায় না আমায়, প্রবীরকেও নয়। অনেক কষ্টে রাত আটটায় ছাড়া পেলাম। তারপর এতখানি পথ, বুঝতেই পার।—

তপতী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সস্নেহে রমলার গাল টিপে দেন,—তোরা দুজনে ত' ক্লাবে আসাই ছেড়ে দিয়েছিস। এদিকে দেখ কি রকম নতুন মেম্বার ধরে এনেছি: তোদের মতই পাক্কা সাহেব। সমীর এদিকে এসো,—ইনি আমাদের রমলা ত্রিপাঠী। এর বাবা শ্যামলাল ত্রিপাঠীর নাম এখানে নিশ্চয় শুনে থাকবে, যিনি রাঁচির বিড়লা নামেই এখানে বিখ্যাত।—আর ইনি মিস্টার প্রবীর চৌধুরী, রাঁচিতে এঁর বাবা প্রশান্ত চৌধুরীর খ্যাতি বিড়লা পর্যায়ে না গেলেও ডালমিয়া পর্যায়ে পৌঁছেছে। আর ইনি মিস্টার সমীর সোম। এঁর ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে অচিরে ইনিও তোমাদের দলভুক্ত হবেন।—

দুজনেরই চেয়ে দেখবার মত। রমলাকে এক কথায় ডল বলা যায়। একটু অসাবধানে নাড়াচাড়া করলেই যেন ভেঙ্গে যাবে। সোনালী রঙের কোঁকড়ান চুল মাথা থেকে ঢেউ খেলিয়ে নেমে আইভরির মত খোলা কাঁধের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। হাল্কা নীল জর্জেট শাড়ির আবরণ ভেদ করে অংগের যে সৌষ্ঠব দেখা যায় তা থেকে চোখ ফেরানো বড় সহজ নয়।

মনে হয় ফিনফিনে পাতলা জর্জেটের স্বচ্ছতা বুঝি এইখানেই সার্থক হয়ে উঠল। দেহের কোথাও এতটুকু খুঁত চোখে পড়ে না, ওটা যেন দক্ষ শিল্পীর সযত্ন হাতের তৈরি এক কাল্পনিক মূর্তি। মুখে শিশুর সরলতা আর কোমলতা একসঙ্গে মিশে আছে। বয়স চব্বিশ পঁচিশের বেশী হবে না। বাংলা বলে প্রায় বাঙালীর মত।

প্রবীর চৌধুরীকে কন্দর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়ত ভুল হবে। কিন্তু এমন সুপুরুষ এদেশে ক্বচিৎ দেখা যাবে। মাথায় সমীর সোমের চেয়ে এক-আধ ইঞ্চি হয়ত কম। গায়ের রঙ রমলার মত আইভরী না হলেও রীতিমত ফর্সা। গায়ের রঙটুকু বাদ দিলে লম্বা-চওড়া শরীরখানা সমীর সোমেরই মত নিরেট নিটোল। বয়সেও প্রায় সমান। মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। চাউনি আর চলাফেরার মধ্যে আভিজাত্যের ছাপ আছে, কিন্তু ব্যবহার অহংকারশূন্য। সাজ-পোষাক নিখুঁত ও সুরুচিসম্পন্ন, কিন্তু তাতে আড়ম্বর নেই। ধনী শিল্পপতির বংশধর হয়েও প্রবীর চৌধুরী আদর্শ মানুষ হতে চলেছে। কৃতী ছাত্র হিসেবে দেশে ও বিদেশে সুনাম অর্জন করেছে। দক্ষ ইঞ্জিনীয়ার হয়ে দেশে ফিরে এসে বাবার বিরাট কারবারে যোগ দিয়েছে। আর একবার কিছুদিনের জন্যে বিদেশে যাবার কথা আছে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট শিখতে।

রমলা ত্রিপাঠি আর প্রবীর চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ বেশীদূর এগুবার আগেই তপতী মুখার্জি বাকী রিহার্সালটুকু শেষ করবার তাগাদা দিলেন। এ রিহার্সাল সুধা, মুকুল আর রমলাকে নিয়ে। প্রবীরকেও দরকার। তবে প্রবীরের আসল পার্ট তনিমার সঙ্গে। তনিমা কি আজ আর রিহার্সাল দেবে? মনে হয় না। কারণ, তনিমা তার চেয়ার থেকে উঠে পড়েছে। সংক্ষেপে প্রবীর আর রমলার সঙ্গে দু-চার কথা বলে সে তপতীর দিকে চেয়ে বললে,—আমাকে এবার যেতে হবে, তপতীদি। সাড়ে আটটায় দোকান থেকে একটা জিনিস ডেলিভারি নেবার কথা, আর দেরী করা চলে না।—

—সে কি! মিস্টার সান্যাল তোমায় নিতে আসছেন না। কার সঙ্গে যাবে?—তপতী প্রশ্ন করেন।

—একাই যাব। উনি আজ আসতে পারবেন না। আমি আমার ছোট গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছি।—

তপতী মুখার্জি চিন্তিত হলেন,—কিন্তু রাত হয়ে গেছে যে। তার ওপর আবার মার্কেটে যাবে। একটা কাজ করলে ত' হয়। সমীর সঙ্গে যাক না হয়। এখানে ত' তোমাদের আলাপই ভালো হল না, কেবল রিহার্সালই করলে।—সমীরের দিকে চেয়ে বললেন,—কি বলো সমীর, তোমার কোন অসুবিধে আছে?—

—না আমার আর অসুবিধে কী? ওঁকে পৌঁছে দিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে একেবারে বাড়ী ফিরতে পারি।—সাগ্রহে উত্তর দেয় সমীর। এ অপ্রত্যাশিত সুযোগে সে পুলকিত। কিন্তু তনিমা রাজী হবে কি? এখনো ত' ঠিকমত পরিচয়ই হয় নি। হয়ত সৌজন্য আর বিনয়ের আড়ালে সে পাশ কাটিয়েই যাবে, হয়ত বলবে,—না না, ওঁকে আর কষ্ট দেওয়া কেন। আমি একাই যেতে পারবো।

কিন্তু সমীরকে বিস্মিত করে তনিমা সান্যাল রাজী হয়ে গেল,—ওঃ তা হলে ত ভালোই হয়। আমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবার দরকারও হবে না। ক্লাব রোডের মোড় থেকে ট্যাক্সি নিয়ে উনি বাড়ি ফিরতে পারবেন।—

সকলের কাছে বিদায় নিয়ে তনিমা আর সমীর বেরিয়ে এল। বাইরে গ্যারাজের ধারে সারি সারি নানা আকারের গাড়ী অপেক্ষা করছে। কোনটায় রয়েছে ড্রাইভার কেউ এসেছে নিজে চালিয়ে। একখানা হাল ফ্যাশনের সুদৃশ্য গাড়ীর দিকে তনিমাকে এগুতে দেখে সমীর ভাবলো ঐটেই তনিমার। তাড়াতাড়ি এগিয়ে দরজা খোলার জন্যে হাত বাড়াল সমীর। তনিমা ইশারা করে পাশের গাড়ীখানা দেখাল—ছাই রঙের একখানা সিংগার টু-সীটার।

—এই আমার গাড়ী, দাঁড়ান চাবিটা বার করি।—বলে তনিমা ব্যাগের মধ্যে হাত ঢোকাল। ধারে কাছে কোন ড্রাইভার দেখা যাচ্ছে না। তনিমা তা হলে নিজেই গাড়ী হাঁকিয়ে এসেছে! ইতিমধ্যে তনিমা স্টিয়ারিং-এর সামনে বসে বাঁ হাত দিয়ে এ পাশের দরজাটা খুলে দিলে,—আসুন মিস্টার সোম।

* * *

সেদিন সন্ধ্যায় সমীর সোম যখন ক্লাবে এসেছিল সৌখিন নাটক রিহার্সালের একজন দর্শক হয়ে ঠিক সেই মুহূর্তে তারই জীবন-নাট্য-রংগমঞ্চের ওপর সকলের অলক্ষ্যে যে পট-পরিবর্তন হয়ে গেল সে কথা সে কেমন করে জানবে? এই পট-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে বিচিত্র ঘটনাবলীর সুরু তার ঘাত-প্রতিঘাত দেখতে দেখতে সমীরকে এনে ফেলেছে তার জীবনের এক চরম পরীক্ষার সামনে। এর ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। পরিণতিও এমন কিছু অভাবনীয় বা চমকপ্রদ নয়। সংসারে এমন ঘটনা অনেক ঘটেছে। আরো অনেক ঘটবে।

* * *

সেদিন সমীর সোম কথা মত তনিমাকে লালপুরে তাদের প্রাসাদোপম বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল ঠিকই। তবে যে পথ দিয়ে যে ভাবে তাদের যাবার কথা ছিল তা হয় নি। আর এই ব্যতিক্রম ঘটলো একটু নাটকীয় ভাবেই। ক্লাব থেকে বেরিয়ে কিছু দূর এগিয়ে আসার পর গাড়ীর স্পীড কমিয়ে দিয়ে প্রথমে তনিমাই কথা কইল,—আপনার খুব তাড়া নেই ত'?

সমীর ভাবলে মার্কেট ঘুরে তনিমার বাড়ি ফিরতে কিছু দেরী হতে পারে এবং ততক্ষণ সমীরকে আটক রাখতে তনিমা স্বভাবতই সংকোচ বোধ করছে। তাই তনিমাকে আশ্বস্ত করার জন্যে বলে,—মোটেই না। চলুন না কোথায় যেতে চান।

গাড়ী এগোচ্ছিল মার্কেটের দিকে। তনিমা হঠাৎ গাড়ী ঘুরিয়ে অন্য পথে ঢোকাল। এ পথ সমীরের পরিচিত নয়। তাই কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে,—এ দিক দিয়ে কি মার্কেটের শর্টকাট বুঝি?—

তনিমা গাড়ীর স্পীড বাড়াতে বাড়াতে নির্বিকারভাবে জবাব দেয়,—মোটেই না। মার্কেটে এখন যাচ্ছে কে?

—এই যে বললেন মার্কেটে কিছু জিনিস ডেলিভারি নেবার আছে!

—আপনিও ত' এইমাত্র বললেন, 'চলুন কোথায় যেতে চান'। ভুলে গেলেন এরি মধ্যে? যাক, পরিহাস পরে হবে। মার্কেটে যাওয়া আমার দরকার সত্যিই ছিল। কিন্তু আপাতত তার চেয়েও জরুরী কাজ পড়েছে। ভয় নেই খুব বেশী সময় আপনার নষ্ট করবো না। একটু ধৈর্য ধরুন। সামনেই হোরাপ—ওখানে রাস্তায় ভীড় নেই। গাড়ীখানা রেখে কথা বলা যাবে।—গাড়ীর গতি আরো বাড়িয়ে দেয় তনিমা।

জীবনে এমন অবস্থায় কখনো পড়ে নি সমীর সোম। আজই সন্ধ্যায় তনিমাকে প্রথম দেখেছে নিতান্ত সাধারণ নিরীহ মেয়ের মত। পরে রিহার্সালের মাঝখানে তার ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়েছে। আর এখন সমীরের প্রাণটুকু তার হাতের মুঠোর মধ্যে। হাল্কা গাড়ীখানা তনিমা যেভাবে ছোটাচ্ছে তাতে একটা অঘটন ঘটতে কতক্ষণ! এ সে কার হাতে পড়লো?

তনিমার টু-সীটার অচিরে হোরাপে এসে থামতে সমীর স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। জায়গাটা একেবারে নির্জন এবং মনোরম। দূরে একটা শীর্ণ জলরেখা দেখা যাচ্ছে, নদীই হবে। সমীর মুগ্ধকণ্ঠে বললে,—বাঃ সুন্দর জায়গাটা ত'!

—হ্যাঁ, এটা রাঁচির এ অঞ্চলের একটা প্লেজার স্পট। অবশ্য প্লেজার খুঁজতে এখন আসি নি বুঝতেই পারছেন। ক'টা কথা আমার এখুনি জেনে নেওয়া দরকার। আপনি ভাবছেন ক'টা কথা জানবার জন্যে এতদূর আসবার কী দরকার। তাই না?

কিছুক্ষণ থেকে তনিমার কথাবার্তা,

অমর ওয়েলডিং ওয়ার্কস

গ্যাস ওয়েল্ডিং এবং কাটিং কণ্ট্রাক্টর

30, ফোরশোর রোড, হাওড়া

শালিমার (কমলা ডিপো)

আচরণ হেঁয়ালির মত লাগছে সমীরের। সে কোন জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইল তনিমার দিকে। তনিমা আবার বলতে থাকে,—রাঁচিতে এসে কী কী শুনেছেন আমার সম্বন্ধে তা জানি না। তবে এটুকু নিশ্চয় জেনেছেন যে শহরের মধ্যে বাস্তবে গাড়ীতে একা আমার পাশে বসে গল্প করাটা খুব নিরাপদ নয়? নাকি, তা-ও জানেন না?—

সমীরের কাছে ব্যাপারটা এখনো দুর্বোধ্য থেকে যাচ্ছে। রাঁচিতে এসে পর্যন্ত সে যে সমাজে ঘোরাফেরা করেছে ও যা কিছু দেখেছে তাতে দিনে বা রাত্রিতে রাস্তার ওপর কোন মহিলার সঙ্গে আলাপ করা বা একসঙ্গে গাড়ীতে বসা কিছু অসামাজিক কাজ বলে মনে হবার কথা নয়। তথচ তনিমা যে তার সঙ্গে এ ভাবে রসিকতা করছে না তাতেও সমীরের সন্দেহ নেই। যাই হোক আসল ব্যাপারটা তার জানা দরকার। এমনও হতে পারে কোনরকম বিপদে পড়ে তনিমা তার শরণাপন্ন হয়েছে। সমীর সহজ ভাবে বললে, —মিসেস সান্যাল, বিশ্বাস করুন আমি আপনার সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত এমন কিছুই শুনি নি যাতে আমার ভয় পাবার বা অহেতুক সাবধান হবার কোন কারণ থাকতে পারে। যেটুকু শুনেছি তা হল আপনার অসামান্য অভিনয় নৈপুণ্যের কথা,—তার প্রমাণও আজ নিজেই পেয়েছি ক্লাবে। আমার মনে হচ্ছে যে-কোন কারণেই হোক আজ আপনার মন ভালো নেই। আপনি মন শান্ত করুন, মিসেস সান্যাল।—

সমীরের মুখে এই সান্ত্বনার কথা শুনে তনিমা ধীরে ধীরে মাথাটা সীটের পেছনদিকে হেলিয়ে দিলে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক থেকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, —আমাকে ক্ষমা করুন মিস্টার সোম। মিথ্যে সন্দেহ করে কী বিশ্রী কাণ্ডটা করে বসলুম দেখুন। এখনো ভালো করে পরিচয়ই হয় নি আপনার সঙ্গে। বড় লজ্জা পেলুম আজ।—

তনিমার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যা শুনে চুপ করে থাকা যায় না। তনিমাকে আশ্বাস দেবার জন্যে বলে,—মত অপরিচিতই হই, এটুকু ত' বুঝি যে বিনা কারণে আপনি উত্তেজিত হন নি। সে কারণ কী তা আমি জানতে চাই না। তবে এটুকু জেনে রাখুন লজ্জা পাবার মত কোন কাজ আপনি করেন নি, অন্তত আমি তা মনে করি না। আশা করি এটুকু বিশ্বাস রাখবেন আমার ওপর।—

তনিমা সোজা হয়ে বসে বললে,—বিশ্বাসের কথা বলছেন মিস্টার সোম! একটু বিশ্বাস, একটু নির্ভর করবার মত—থাক ওসব কথা। আপনি বলছেন বিশ্বাস রাখতে—তা রাখব, নিশ্চয় রাখব। কিন্তু কি জানেন?—অদ্ভুত হাসি হেসে তনিমা বললে,—ওটা ঠিক সয় না আমার কপালে।—

সমীর অন্য ধাতের মানুষ। কথায় কথায় কপাল আর ভাগ্যের দোহাই তার সয় না। একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠেই বলে উঠল,— হতাশ—এই বয়সে—ওটা কোন কাজের কথাই নয়। জীবনটাকে একটু অন্যভাবে দেখা দরকার, জানলেন? জীবনে বাধা-বিপত্তি ত থাকবেই। তাই বলে কি হাল ছেড়ে দিতে হবে? জীবন ত' একটা কন্টিনিউয়াস স্ট্রাগল।

তনিমা এবার জোরে হেসে ওঠে,—তাই নাকি? বেশ তাই স্বীকার করে নিচ্ছি মাস্টার মশাই! কিন্তু এবারে যে আপনি উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। চলুন রাত অনেক হল, এবার ফেরা যাক।—তনিমা গাড়ীতে স্টার্ট দিলে।

সমীর অপ্রস্তুত হয়ে বললে,—সত্যিই ত' দেরী হয়ে গেছে। কথায় কথায় এতক্ষণ খেয়াল হয় নি। তারই দোষ। মিস্টার সান্যাল হয়ত ভাবছেন আপনার দেরী দেখে।

গাড়ী চলতে সুরু করেছে ফিরতি পথে। গিয়ার বদল করে নিয়ে তনিমা আবার অদ্ভুত হাসি হেসে বললে—কী বললেন? মিস্টার সান্যাল ভাবছেন আমার জন্যে?—জানেন না বুঝি সান্যাল সাহেব ভোর হবার আগে বড় একটা বাড়ী ফেরেন না?—হার্ড স্ট্রাগল, মিস্টার সোম, প্রিটি হার্ড—ইজ্‌ন্ট ইট্?

তনিমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে বাসায় ফেরার পথে সমীরের কেবলই মনে হয়েছে কোথায় যেন বড়রকমের পরিবর্তন ঘটে গেছে। মনের স্বচ্ছন্দতা আগের মত আর সে খুঁজে পাচ্ছে না। একটা কিছু ঘটেছে, যা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার আর যেন উপায় নেই।

মনের এ রকম অবস্থা সমীর সোমের স্বভাববিরুদ্ধ। রাঁচিতে আসার পর থেকে একা থাকার স্বাধীনতা সে হারিয়েছে। সন্ধ্যের পর দু-তিন ঘণ্টা সঙ্গীদের নিয়ে ক্লাবে কটানই তার অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে। তবু এই সময়টা বোজই তার কার্টে হাল্কা গল্প-গুজবে বা তর্ক-বিতর্কে। কোন কোন দিন তর্কটা অপ্রিয় বাদানুবাদে গিয়ে পৌঁছলেও তা নিয়ে সমীর মাথা ঘামায় না। বাসায় ফিরে আসার অনেক আগেই সেসব প্রসঙ্গ সে ভুলে যায়। তেমনি সঙ্গীদের সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে কোথাও কোন বাঁধন বা দায়িত্বদায়ত্বের ধার সে ধারে না।

কিন্তু আজ সমীরের অন্যরকম লাগছে। আজ সন্ধ্যে থেকে ক্লাবের রিহার্সাল আর তার পরের ঘটনাগুলো অবশ্যই নিত্য-নৈমিত্তিক নয় সমীরের কাছে। এর মধ্যে ছোটখাটো মানসিক চাঞ্চল্যের খোরাক নিশ্চয়ই আছে। মনে-মনে তার একটা হিসেবও নিয়েছে সমীর। কিন্তু তাও সব নয়। তনিমাকে জড়িয়ে একটা হীংগত তার মনের গভীরে যে ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করেছে তাকে অস্বীকার করার কোন উপায় এখন আর নেই। মনকে আর আয়ত্বে রাখা যায় না বুঝি।

সহজে গলে যাবার মত মন সমীর সোমের নয়। জীবনে তার লক্ষ্য একটাই। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে যখন যা দরকার তা সবসময় নিজের পছন্দমত না হলেও শেষলক্ষ্যের কথা মনে করে নিজেকে সেই অনুযায়ী অল্পবিস্তর সাজিয়ে নিতে সে প্রস্তুত। এর মধ্যে মনের কারবার অতি অল্পই সমীর সোম তা ভালো-রকম বোঝে। হঠাৎ প্রেমে পড়ার বয়স সে অনেকদিন পার হয়ে এসেছে। অন্য দিক দিয়ে দেখলে তনিমা বয়সে তার চেয়ে বড় না হলেও খুব ছোট বলে মনে হয় না। সব চেয়ে বড় কথা তনিমা পরস্ত্রী। আজ তনিমার সঙ্গে সমীরের যেটুকু পরিচয় হল তা থেকে এমন মনে করার কারণ নেই যে, অর্থ-সম্পদের দিক দিয়ে স্বামীকে বাদ দিয়ে দাঁড়াবার মত তনিমার নিজের কিছু আছে। অতএব ব্যাপারটা ঘোরতর জটিল। সব কিছু ভেবে দেখলে সমীর সোমের বর্তমান মানসিক চাঞ্চল্যের সঠিক কারণটি বোঝা যায়।

সমীরের আবাল্য বন্ধু শিবনাথ আজ পাশে থাকলে গল্পটা হয়ত অন্যরকম হত। অন্তত ঘটনাটা এত অল্প সময়ের মধ্যে এভাবে ঘটে যেতে না। দুই বন্ধুর মধ্যে সম্পর্কটা এমন যে, একের প্রয়োজন ব্যক্ত হবার আগেই অপরজন তা বুঝে নেয়, বলার প্রয়োজন হয় না। সমীর বরাবর এইভাবেই শিবনাথের সহ-যোগিতা পেয়ে এসেছে। অবশ্য আজকের প্রয়োজনের কারণটা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। এ পর্যন্ত শিবনাথ নানা কাজেকর্মেই সমীরকে পথ দেখিয়ে দিয়েছে। সমীরের রাঁচি আসার পেছনেও শিবনাথ। কিন্তু আজ মন দেওয়া-নেওয়ার কারবারে বুদ্ধি যোগানর প্রয়োজন যখন উপস্থিত, শিবনাথ তখন পাশে নেই।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে সমীর সোম। জীবনে তার প্রথম স্খলন। হিসেবের গণ্ডী এই প্রথম তাকে ধরে রাখতে পারলে না। সমীর বেহিসেবী হয়ে পড়েছে।

কিছুদিন তনিমা আর সমীরকে ক্লাবের আড্ডা জমাবার পর দেখা যেতে লাগল হোয়াপের নদীর ধারে কিম্বা ওদিকে ধুরুয়ার নির্জন প্রান্তরে। প্রথম দিকে কোন-না-কোন অজুহাত দেখিয়ে সমীর ক্লাব থেকে বেরিয়ে এসে নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করেছে। ক্রমে তার আর দরকার হয় নি। ওদের দুজনের ঘনিষ্ঠতা চাপা থাকে নি বেশীদিন। কখনো তনিমা একা সমীরকে কখনো দলসুদ্ধ সবাইকে ডেকে নিয়ে গেছে তার বাড়িতে। এ নিয়ে কোন মন্তব্য বা আলোচনা ওদের কানে আসে নি।

প্রবীর চৌধুরী আর কমলা ত্রিপাঠির সঙ্গে ইতিমধ্যে সমীরের হৃদ্যতা না হলেও রীতিমত আলাপ-পরিচয় হয়ে গেছে। ওদের ক্লাবে আসার কোন নিয়ম নেই। কমলা কখনো আসে প্রবীরের সঙ্গে, কখনো তার সঙ্গে আসেন তার বাবা-মা,—শ্যামলাল ত্রিপাঠি আর মৃদুলা ত্রিপাঠি। মৃদুলা ত্রিপাঠিকে দেখে মনে হয় এককালে কমলার মতই সুন্দরী ছিলেন। এখন দেহের জলুস যেটুকু ম্লান হয়েছে পোশাকে আর প্রসাধনে তা পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন। স্বামী ক্রোড়পতি একথা তাঁর আচার-ব্যবহারে সর্বদাই প্রকাশ। সমীরের

(শেষাংশ ১৬১ পৃষ্ঠায়)

সোনালী দিনের মন

(৭৫ পৃষ্ঠার পর)

বাবা মৃদু হেসে বলেন, 'তারা না হয় প্রস্তুত আমি যে অ-প্রস্তুত। এই একটা মেয়ের বিয়ে দিলাম!'

মা রেগে উঠলেন। বললেন, 'একটা দিয়েছ বলেই আর একটার বিয়ে দেওয়া হবে না?'

'হবে না কেন? রয়ে সয়ে হবে।'

'রইতে সইতে ছেলেকে বসিয়ে রাখবে তারা?'

'বাংলা দেশে আর ছেলে নেই?'

মা আরো রেগে উঠলেন।

'থাকবে না কেন? সত্যিকার ভাল ছেলে রাস্তায় পড়ে থাকে না। নির্মলা নিজে থেকে বলেছে যখন—'

'কিন্তু দেব কোথা থেকে? ওই দেনা শুধতেই তো জীবন যাচ্ছে।'

'ওরা কিছু নেবে না—' মা কেঁদে ওঠেন। 'বলেছে লাল শাঁখা দিয়ে বেবে।'

বাবা হেসে ওঠেন। 'হঠাৎ এত উদার হলো যে? নির্মলির বিয়েতে তো আমাকে—!'

'আহা ওরা তো আর এরা নয়? বললাম না দূর সম্পর্কের!'

কিছুই যখন নেবে না, তখন আর বাধা কি?

দুচার দিনের মধ্যেই শুনতে পেল অমলা তাকে 'দেখতে আসবে।'

'দেখতে আসবে—'

এ শব্দ বাঙলীর ঘরে নতুন শব্দ নয়। কারণ, বড় মেজ সেজ তিন দিদির কল্যাণে ওই 'দেখতে আসা' কথাটা বহুবার শুনেছে। অনেকবার দেখেছে।

তবু নিজের ব্যাপারে অমলার মনে হয়েছিল এরকম নতুন শব্দ বুঝি জীবনে শোনেনি কখনো।

ভয়ানক একটা চাঞ্চল্যবোধ করেছিল অমলা। ওই দেখতে আসা শব্দটাকে কেন্দ্র করে বহুভাবের তরঙ্গ ওঠা পড়া করেছিল।

দেখতে আসবে।

আর কেউ, অন্যদের কেউ।

তার মানে তার সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রশ্ন শেষ, চিরকালের মত ফিনিস।—

আশ্চর্য! অমলা ছাড়া কি আর মেয়ে ছিল না তাদের সুপাত্রের উপযুক্ত। সেজদিরই বা সাত তাড়াতাড়ি এত গিন্নীপনার দরকার কি ছিল? কোথাকার কে এক দূর সম্পর্কের দ্যাওর। তার জন্যে তোর এত মাথাব্যথা কেন বাপু?

সেজদি অবশ্য জানিয়েছিল কেন মাথাব্যথা। বলেছিল, 'আমার বৌভাতে ওই ছেলের বৌদি অমলিকে দেখেছিল। বেদম পছন্দ হয়ে গেছে, তাই আমায় বলেছিল—'

বৌদিটা'কে ভাবতে চেষ্টা করেছে অমলা। ভেবে পায়নি বিশেষ করে সে অমলাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল।

একটা হাতীর মত মোটা গিন্নী তো অমলাকে ডেকে নানা কথা কইছিল, যত রাজ্যের বোকাবোকা কথা।

তার মানে এই সব বোকাদের পাল্লায় পড়তে হবে অমলাকে!

অথচ যার রূপ আছে, গুণ আছে, বুদ্ধি আছে, সে একবার উদ্দেশও করল না।

ভেবে ভারী দুঃখ হল অমলার।

কী দরকার ছিল তবে তার ডেকে কথা বলবার। আগ্রহ দেখাবার?

কেন। সেদিন লাইনের শেষে না পড়লে চলছিল না তোমার? জানলার দিকে না তাকালেও চলছিল না? লাভটা কী হল?

তারপর ভাবল, কী কথা বলেছিল ও? মনে পড়ল পানের কথা। নিছক ব্যঙ্গ! তার মানে ব্যঙ্গ করবার জন্যেই ওর এই চেষ্টা ওই যে অমলা ওকে পান না দিয়ে পালিয়ে এসেছিল।

অমলাকে অপদস্ত করতে এল তাই।

আশ্চর্য। অত সুন্দর মুখ। আর এত নিষ্ঠুর মন?

অমলার চোদ্দ বছরের মনটুকু অদৃশ্য এক প্রতিপক্ষ খাড়া করে তার সঙ্গে ঝগড়া করে, ভাব করে, অভিমান করে।

আবার এক সময় ভাবে, 'আমি যেমন বোকা, ও যদি জামাইবাবুর বন্ধুই হয়? যদি অন্য জাত হয়?'

অন্য জাত!

নির্ঘাৎ অন্য জাত।

অথচ অমলা তার ওপর রাগ করছে! অন্য জাত হলে কী বা করবে বেচারা?

অন্য জাতের সম্পর্কে একটুকরো বিষণ্ণ ভালবাসা উৎসর্গ করে রেখে অন্য দিকে মুখ ফেরাল অমলা।

যারা দেখতে আসবে কে জানে তাদের সেই ছেলেটা কেমন! সেজদি অবশ্যই দেখেছে, কিন্তু জিগ্যেস করা তো যায় না। যতই সেজদি দেড় বছরের বড় দিদি হোক, এ কথা জিগ্যেস করা যায় না। বিয়ের পরদিন সকালে সেজদি বলেছিল, 'কেমন দেখলি রে?' কই আগে তো কোনো ছেলে বলে নি।

আচ্ছা, যদি দেখতে সেজজামাইবাবুর মতই হয়?

না, না, তাহলে মরে গেলেও আমি তাকে বিয়ে করতে পারবো না। সেজদির মত 'যা তা' নই আমি। সেজদিটা কি! ছিঃ! বিয়ের পরদিন বর কালো বলে সেজদির কাছে কী কান্না কী কান্না! শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার কান্নাটা চতুর্গুণ বেড়ে গেল বরের রঙের দোষে। অক্ষ এখন?

এখন ওই বরের জন্যেই হাঁ করে থাকে। হ্যাংলা!

অমলাকে অবশ্য সেজদির মত হ্যাংলা হতে হয় নি। 'অমলার বিয়ে' বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল অমলাদের আত্মীয়মহলে।

অমলার এতটা ভাগ্য পছন্দ হয় নি অমলার হিতৈষিণীদের। তাই অমলার কনে দেখা আর অমলার বিয়ে নিয়ে অনেক দিন ধরে আলোচনা চলেছিল।

বলেছিল সবাই, 'বাবা, পাতাচাপা কপাল' আর অমলার বাবা বলেছিলেন, 'হ্যাঁ পাতাচাপা কপালটি না হলে, আমার মাথায় পাথর পড়তো! এই সেদিন নির্মলার বিয়ে দিয়ে ফতুর হলাম! ওদেরই কুটুম্ব, কিন্তু কী উদার! শুধু শাঁখা-হাতে মেয়ে নেবে। দেখে পছন্দ হয়েছে বলেই—'

দেখে পছন্দ হয়েছে, তবু দেখতে এসেছিল ওরা অমলাকে।

একসঙ্গে একঝাঁক।

সেদিন সকাল থেকে মেঘলা করেছিল।

আর অমলার মনটা অকারণ বিষণ্ণতায় যেন স্যাঁৎসেতে হয়ে পড়েছিল। ওরা বিকেলে দেখতে আসবে, অতএব সকালে কোনো কাজ নেই, আর অমলাকে কোনো কাজ করতেও দেন নি সেদিন মা।

মেয়ে দেখতে আসার দিন দিতেন না কাউকেই। বড় মেজ সেজ—দেখলো তো অমলা সবাইয়ের ব্যাপার! মা সেদিন সকাল বেলা পান সাজতে দেন নি, হাতে খয়েরের দাগ হবে বলে। সুপুরি কাটতে দেন নি পাছে হাত কাটে বলে। ঘরের ধুলো ঝাড়তে দেন নি-হাত খসখসে হয়ে যাবে বলে।

তা ছাড়া সেদিন ছাতে ওঠা বারণ হল, যদি সিঁড়িতে পা ফসকায়, চা তৈরি করা বারণ, যদি হাতে ফোস্কা পড়ায়, আয় টক খাওয়া বারণ, পাছে স্বরভঙ্গ হয়।

এত সব বিধি-নিষেধের মধ্যে পুরো একটা দিন থাকতে হচ্ছে অমলাকে, মা বলেছেন, 'শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়, বাইরে ঘুরে ঘুরে জোলো হাওয়া লাগাস নি—।'

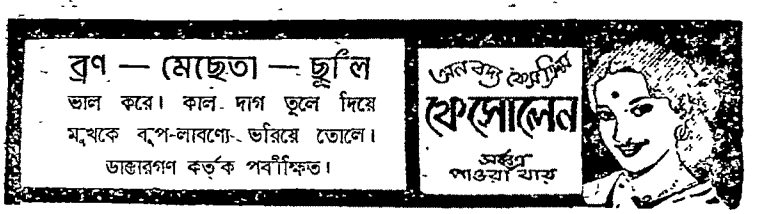

অমলা তাই এই অপূর্ব সুখ উপভোগ করতে একখানা বই নিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু অমলার বইয়ের গল্পে মন বসল না। ওই দেখতে আসা'র চাঞ্চল্যটা স্নায়ুদের হাল্কা করে রাখল, গভীর হতে দিল না।

এ যুগে চোদ্দ বছর বয়সটা না কি প্রেমের পক্ষে হাস্যকর, নায়িকা হবার অযোগ্য, কিন্তু অমলা কি বিয়ে আর বর এই দুটি শব্দকে নিয়ে কম কথা ভেবেছে?

ভাবী শ্বশুরবাড়ির কথা, বাড়িতে কত লোক আছে তার কথা। আর সব শেষে ভেবেছে, জীবনটা তো কই নাটক নভেলের মত হয় না? এটা যদি গল্পের বইয়ের গল্প হতো, ঠিক এই বিয়েটায়, ওই ছেলেটাই বর হয়ে এসে জুটতো। শুভদৃষ্টির সময় চমকে যেতাম আমি। তার পর—

জীবনটা নাটক নভেল নয়, তবু সেই চমকে যাওয়া'র ছবিটা আঁকতে থাকে অমলা নানা রং দিয়ে।

মেঘলা দুপুরটা অন্ধকার বিকেল হয়ে এসেছিল। মা নিজমনে বকবক করছিলেন, আকাশের আর ছিচ্‌কাঁদুনে কান্না কাঁদবার দিন ছিল না। এই ঘোলাটে আলোয় মেয়ে দেখবে? নির্ঘাৎ অপছন্দ করে চলে যাবে। বৌদির পছন্দ হলেই তো হবে না. মা বাপের হওয়া চাই তো? এ দিনে আর সাজিয়ে কী হবে? লোকে কথায় বলে কনে দেখা আলো।'

তবু ওর মধ্যেই মেয়েকে টেনে তুলে সাজাতেও বসেছিলেন অমলার মা।

আর যখন সাজানো শেষ না হতেই তারা এসে পড়েছিল, আর দেখার আগেই কথা দিয়ে বসেছিল। তখন টের পেয়েছিল অমলা, জীবনটা নাটক নভেল না হলেও, মাঝে মাঝে নাটক নভেলের গল্পের থেকে অধিক হয়ে ওঠে। এই পাত্রই সেই ছেলে।

বৌদিকে মুগ্ধ করানো তার একটা কারসাজি।

পাকা কথাই দিতে এসেছে তারা, শুধু শোভনতার খাতিরে মা-বাপের একবার দেখতে আসা। আর মা যদি তাঁর জা-ননদকে না নিয়ে আসেন সেটাও অশোভন।

মেঘলা দিনের জন্যে আটকালো না।

পছন্দ করে পাকা কথা দিয়ে গেলেন তাঁরা অমলাকে প্রায় মূর্ছাহত করে রেখে।

এ সুখের ভার কেমন করে বইবে অমলা? অমলার সেই একদিনের দেখা ভাল-লাগার কুঁড়ি কল্পনার বাতাসে বাতাসে ভালবাসার ফুল হয়ে উঠতে থাকে।

অমলার মিনিটে মিনিটে বয়েস বাড়তে থাকে।

সেজদি বলেছিল 'আমার কাজগুলি করিস।'

কী সেই কাজ?

সবগুলো মনে করতে পারে না অমলা। পান সাজা? বাবার জামাকাপড় গুছিয়ে রাখা? কুঁজোয় জলভরা? মায়ের রান্নাঘরে সাহায্য করা?

হবে হয়তো এই সব

কিন্তু মা তাঁর ছোট মেয়েকে ওসব আর করতে দিচ্ছিলেন না। মা তিন-তিনটে মেয়েকে শক্ত মনে বিদায় দিয়েছেন, কিন্তু ছোটমেয়েটার বেলায় যেন হার মানছেন।

মা হরদম চোখ মুছছেন।

বিয়ের কথা হয়ে ইস্তক।

এই মেয়েটাকে সাত সকালে বিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল না অমলার মা-বাপের। কিন্তু ওই আশাতীত পাত্র কি জীবনে দুবার মিলবে?

তাই অমলার অ-প্রস্তুত বাবা, আর অবুঝ মা, এঁরা নিজের হাতেই নিজেরা কবর কাটলেন। নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারলেন। অথচ হা-হুতাশ আর আক্ষেপ চালিয়ে গেলেন সমানেই।

অমলা সুদ্ধু শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে কী করে তাঁরা টিকবেন, এত শীগগির যে অমলার বিয়ে দিতে হবে তা' তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেন নি। একটি একটি করে মেয়ে বড় করে তুলছেন আর পরের ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, শেষ পর্যন্ত শূন্য ঘরে দুই বুড়োবুড়ি পড়ে থাকা ইতরদি আক্ষেপ ভিতর থেকে উথলে ওঠে তাঁদের—তাই প্রকাশ পেয়ে যায়।

অমলার মুখ ঝাপসা হয়ে আসে। নিজেকে ভারী স্বার্থপর মনে হয় অমলার।

বাবার কাজগুলি করতে বারে বারে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। মায়ের কাছে বসতে আসতে সাহস হয় না কেঁদে ভাসিয়ে দেবার ভয়ে। অল্প মনে হয় এত সবের কিছুই যদি না হতো!

কিন্তু এসব হয়েছে, অতএব বিয়েটাও হল। সেজদি-সেজদির মতই অমলার বিয়েতেও হাতে ত্রিপল খাটানো হল, আর বড় বড় উনুন পাতা হল, চিলেকোঠায় মিষ্টি রাখা হল, আর ছাতে পুরুতরা আর দোতলার ঘরে মেয়েদের খাবার ব্যবস্থা হল।

ওদের বিয়ের মতই 'বামুন মেয়ের' বাড়িতে কল্পনা দেবার পীড়ি আর শ্রী গড়বার চাল পাঠানো হল। আর যে যে আত্মীয়-কুটুম্বের দল এসে থাকেন, তাঁরা এসে পড়লেন।

কাজের লোকগুলোর প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে ওদের বাড়ির মেয়ের বিয়ের কাজের।

তবু অমলার মনে হচ্ছিল, এসব বুঝি এ বাড়িতে এই প্রথম একা অমলার জন্যেই হল।

আর শুভদৃষ্টি?

সে বুঝি পৃথিবীতে এই প্রথম।

ঠানদি আর বৌদিদের দল 'জল মাপাতে' এসেছিল। মাটির একটা হাঁড়িতে সেই ভোরবেলার 'আভাঙা' জল তুলে রাখা ছিল, সেই জলটা অমলার সামনে এগিয়ে দিয়ে হি-হি করতে করতে বলল ওরা, 'বল সুধা-নন্দর জল মাপছি।'

অমলার বুকের মধ্যেকার সেই হাতুড়িটা আবার জেগে উঠল। ঘা মারতে লাগল।

জ্ঞান হয়ে ইস্তক তো এই কথাটা শুনে আসছে অমলা; কই একবারও তো মনে হয় নি কথাটা এমন অদ্ভুত রহস্যে ভরা! আর একটা নাম এমন রোমাঞ্চময় হতে পারে। মেজদি-সেজদিরও কি ঠিক এমনি হয়েছিল? নাকি এ শুধু একা অমলারই?

বোধহয় তাই, শুধু অমলারই। অমলার বিয়ে যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা।

ঠানদিরা আবার তাড়া দিলেন। বললেন, 'কই বল? এইবেলা নাম করে নে! এরপর তো আর করতে পাবি না।'

তাই বলেছিলেন তাঁরা। জানতেন না বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে সমাজের অবস্থা এমন হয়ে উঠবে যে বরের নাম ধরে ডাকবে মেয়েরা।

ঠানদি জানতেন না। তাই বলে উঠলেন, 'নাম করে বল। বলে নে এইবেলা!'

'বলেছি বাবা বলেছি!'

বলে উঠলো অমলা।

এরা হি-হি করে হাসলো, 'ও বাবা এ যে দেখি বিয়ের পীড়িতে বসে ঝঙ্কার দেয়! বেচারা সুধানন্দ রূপ দেখে মজেছেন। এরপর বুঝবে ঠেলা।'

অমলার ভারি হাসি পেল।

অমলা কি তার বরকে ঝঙ্কার দেবে? যার নাম শুনলে বুকের মধ্যে হিম হয়ে যায়, যার কথা ভাবতে গেলে খেই হারিয়ে যায়, যার মুখটা দেখা হলেও, কিছুতেই আর মনে পড়ানো যায় না, তাকে দেবে অমলা ঝঙ্কার?

অমলা তো শুধু চেয়ে থাকবে। অথবা চাইতেও পারবে না।

পারলো না।

চোখে চোখে চাইতে পারলো না।

যে অমলা একদা শুধু একবার চোখে চোখ পড়বার আশায় ঘণ্টাখানেক ধরে ভাঁড়ার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে মশার কামড় খেয়েছিল, সেই অমলাকে পাঁচজনে মিলে সাধ্যসাধনা করতে হয় 'তাকা, একবার তাকা। চোখ বুজে থাকলে শুভদৃষ্টিটা হবে কি করে রে?'

অনেকক্ষণের পর, যখন পরামাণিকের গালির ছড়া সুরু হয়ে গেছে, এবং যারা শুভদৃষ্টির চাঁদোয়া ধরে থেকে অধীর হয়ে

Puja Greetings—

Phone : 66-2925

Oriental Electric & Engineering Works

Govt. Authorised Electrical Contractors.

157/1, Narasingha Dutta Road, Howrah.

ফেমিলা স্নো

সহজ সৌন্দর্য আর স্বাভাবিক
লাবণ্য ফুটিয়ে তোলার কাজে
তার জুড়ি নেই।

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

একদা শুধু একবার চোখে চোখ পড়বার আশায়.....মশার কামড় খেয়েছিল।

উঠে তাড়া লাগাচ্ছে, তখন একবার চকিত দৃষ্টি তুলে দেখল।

কিন্তু অমলা কি দেখতে পেল?

এ মুখ যে আগে দেখা, সেটা কি অনুভবে আনতে পারলো অমলা?

না কি ঠিক সেই চাওয়ার মুহূর্তে তার চোখের সামনে পৃথিবীটা দুলে উঠল?

আর অমলার কানের মধ্যে একটা শব্দের রোল উঠতে লাগল।

সে শব্দ ক্রমশ আচ্ছন্ন করে দিল পৃথিবী।

অমলা বুঝতে পারল না, তাদের শুভ-দৃষ্টি হল কিনা।

অমলা কি দেখতে পেয়েছিল কিছু?

বাসরে, যখন বড়রা এদিক-ওদিক গেছে, আর ছোটরা সেই ডেকরেটারদের কাছে ভাড়া করা বিছানায় রণক্ষেত্রে কাটা সৈনিকের মত যথেচ্ছ পড়ে ঘুমোচ্ছে, সহসা এক সময় বর বলে উঠলো, 'শুভদৃষ্টিই হল না! দূর!'

অমলা চকিত হল।

একবার তাকিয়ে ফেলল।

পরক্ষণেই চোখ নামাল।

বাসরে বরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে অমলা। এটা কারুর চোখে পড়লে কী ঢেউই না উঠবে!

বাবাঃ এই একবাড়ি লোক!

বর ওর ওই চোখ তুলে চোখ নামানো দেখে বলল, 'যাক্ তবু একটু দৃষ্টিপাত হলো। এখন যে বড্ড লজ্জা দেখছি!'

অমলা আরো লজ্জা পেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো লোকটা তো ভারী বেহায়া!

ওর ওই কথাটা কি আর শুনতে ভাল লাগে নি? খুবই ভাল লেগেছে। ওই যে মানুষটা, একদিন যাকে একটু দেখবার জন্যে কত আবেগ আগ্রহ, আজ সে অমলার আঁচলে বাঁধা পড়ে এক বিছানায় বসে আছে। এ কী সুখ! কী সৌভাগ্য!

আমি ওর হয়ে গেলাম, ও আমার হয়ে গেল, এ যেন একটা অবিশ্বাস্য অলৌকিক! তবু—

তবু অমলা ভাবল লোকটা কী বেহায়া!

আর কী বুকের পাটা!

বাসরে কথা বলছে।

সেদিন যে কয়েছিল সে অন্যরকম কথা। সে এমনি দিদির বিয়েব বরযাত্রী! কিন্তু আজ কী বলে?

তবু ওই মৃদু সতর্ক কণ্ঠ একটি কিশোরী মনের তারে তারে যেন জলতরঙ্গের তরঙ্গ ছড়িয়ে দিল।

কিন্তু কথা সে কইবে না—বাবা!

কে কোনখান থেকে শুনে ফেলুক আর কি! ও না হয় অন্য লোকেদের বাড়ির ছেলে, অমলা তো তা' নয়।

অমলা এ বাড়ির ভব্যতা সভ্যতা জানে না?

অতএব বর দু'চারটে কথা বলে ব্যর্থ হয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'এত অপছন্দ সে কথা জানালে আর বিয়েটা ঘাটতে কষ্ট দিতাম না!'

এবার অমলা ব্যাকুল হলো, কিছু একটা উত্তর দিতে গেল। কিন্তু তখন মহিলার দল খাওয়াদাওয়া সেরে বাসরে বসতে এলেন।

আমলার তবে কী দোষ?

ঠানদি বলে উঠলেন, 'কী গো নাতজামাই, সুযোগ পেয়ে কতটি করে উঠতে পারলে? প্রেমালাপটি মিটিয়ে নিয়েছ তো?'

অমলা অবাক হয়ে আর একবার ভাবল, উঃ কী বেহায়া!

কারণ বর দিব্যি হেসে উঠে বললো, 'ওটা কি মিটিয়ে ফেলবার জিনিস ঠানদি? আপনাদের মিটে গেছে?'

হাসির ধুম পড়ে গেল বাসরে।

আর আশ্চর্য এই এখন প্রথম বিয়ের একটা ব্যাপারে অমলার মনে হল, 'বাবা চিরকাল ধরে একই রকম করছে এরা, তবু এসব এদের পুরনো হয় না?'

তা' শুধু অমলা কেন, আশ্চর্য আরো সকলেরই হওয়া উচিত বৈকি। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে যারা পৃথিবীতে এসেছে, কত

দেখছে আর কত রঙ্গ করছে। তবু তাদের কাছে সে সব পুরনো হয়ে যায় না? তবু সেই কড়িখেলার সময় বলতে ইচ্ছে করে ওদের, 'আস্তে ভাই বর আস্তে। কড়ি-খেলায় ঠোকাঠুকি হলে, তোমাদেরও ভবিষ্যতে ঠোকাঠুকি হবে!'...এখনো বলতে ইচ্ছে করে, 'বল ভাই বল, আজ থেকে যা রোজগার করবো তোমায় দেব। কোঁচার কাপড়ে দোষ-গুণ ঢাকো ভাই কিন্তু দোষটি ঢেকো গুণটি ছড়িও।'

অমলা যখন এতটুকু মেয়ে তখন থেকেই তো শুনে আসছে এসব কথা। বুড়িরা অবশ্যই চিরকাল ধরে বলছে।

চিরকাল ধরে ওই একই কথা বলতে ভালই বা লাগে।

কিন্তু শুধুই কি অমলার নিজেদের বাড়ির ওই ঠানদিরা?

শ্বশুরবাড়ির লোকেরা?

সুধানন্দর দিদি বৌদি ঠানদিরা?

তাবাও কি ওই একই কৌতুকে মুখর হয়ে ওঠে না?

অমলার জ্ঞান থেকে অমলা এই সবই শুনে আসছে।

অথচ সুধানন্দর কথাগুলি তো বেশ সভ্য মার্জিত। এ বাড়ি এসে কুশণ্ডিকা হলো, ধোঁয়ায় চোখ দিয়ে জল ঝরছে, চিরদিনের সংসার থেকে বিদায় নিয়ে আসা মন বিচ্ছেদ বিরহে উদভ্রান্ত, তখন, সেই মনের ওপর ধাক্কা লাগানো ওই একই ঠাট্টার বহর।

সেই কড়ি খেলা নিয়ে একঘেয়ে মন্তব্য, সেই বরকে রূপোর জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটানোর চেষ্টায় ঠকানো, আর সেই তাকে বহুবিধ প্রতিশ্রুতির পাকে জড়িয়ে রাখা।

আর চিরাচরিত কৃশ্রীতায়—কনেটাকে পাঁচজনে মিলে তুলে ধরে বরের কোলে বসিয়ে দেওয়া।

বিশ্রী!

শ্বশুরবাড়ি এসে প্রথম নম্বর সবই বিশ্রী লেগেছিল অমলার।

বরণপর্বের শেষে হঠাৎ বর বলে উঠল, যেন দেয়ালকে শুনিয়ে বলল, 'এই আমি চললাম। এবার নিশ্চিন্তে ঘুমোও। ঢের জ্বালাতন করে ফেলেছি, এবার ছুটি পাবে।'

রীতিমত অভিমানের কথা!

এরপর কিছু বলা দরকার।

একেবারে নীরব—

নিষ্করুণ থাকা সম্ভব নয়। তা ছাড়া—নেহাৎ বড়রা কেউ ছিল না সেখানে। কয়েকটা ছোট ছেলেমেয়ে ঘুরছিল।

অমলা তবু গলা নামিয়ে বলল, 'আহা!'

বিয়ের পর এই প্রথম কথা!

আহা!'

বর বলল, 'আহা' কেন ঠিকই বলেছি! আমিই তো মুখুমী করে তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি।'

অমলা মরীয়া হয়ে বলে ফেলে, 'কে বলেছে কষ্ট? নিজেই ভাঙা হচ্ছে তো নিজেই গড়া হচ্ছে!'

'আরে এই তো কথা বেরিয়েছে!'

বর হঠাৎ একটা অসমসাহসিক কাজ করে বসে। হাত বাড়িয়ে অমলার গালটা একটু টিপে দিয়ে বলে, 'যতটা ভালমানুষ ভেবেছিলাম, ততটা নয়তো! আচ্ছা, এর শোধ কাল রাত্তিরে নেওয়া যাবে।'

কাল রাত্তিরে মানে ফুলশয্যার রাত।

চলে গেল বর।

মধুর একটি সম্ভাবনার ইশারা দিয়ে।

চোদ্দ বছরের মেয়ের 'ফুলশয্যা রাত্রি', তার আবার স্মৃতি! শুনলে এ যুগের বাবলিরা বোধ করি হেসে মাথা ধরিয়ে ফেলবে, তবু সে স্মৃতি অমলার মনে চিরজাগরূক আছে একটুখানি মধুর নির্বুদ্ধিতার ইতিহাস বহন করে।

যথারীতি আড়িপাতা'র সুব্যবস্থা করা হয়েছিল মহিলাকুলেদের মধ্যে এবং যথারীতিই তাঁরা সুধানন্দকে জানিয়ে দিয়েছিলেন ফুল-শয্যার ঘরের আলো নিভোনো অবিধি। তথাপি দুঃসাহসী সুধানন্দ ওর সেই বৌদি আর বোনেদের প্রায় তাড়িয়ে নিয়ে ঘরের বার করে দিয়ে বলেছিল, 'আলো জেবলে রাখা যদি বিধি হয়, আর কাউকে এ ঘর পাহারা দিতে বল, আমি চললাম নীচে বৈঠকখানায়।'

'নীচে বৈঠকখানায়!'

'তার মানে?'

বড়বৌদি ধমক লাগিয়েছিলেন, 'আহা রে ন্যাকা! শুয়ে পড়, এবং আলো থাক!'

সুধানন্দ দরজায় হাত রেখে ওর বৌদিকে বলেছিল, 'আলোর মাত্রা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তোমাদের শাস্ত্রে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে দেওয়া নেই?'

'কি বলছ?'

'বলছি—সেকালে মৃৎ প্রদীপে কাজ চলতো, কাজেই এতেই চলবে' বলে সুধানন্দ ছোট্ট একটা মোমবাতি পকেট থেকে বার করে জেবলে নিয়েই ফস্ করে ঘরের সুইচটা নিভিয়ে দেয়। এবং দরজাটা প্রায় তাদের মুখের সামনেই বন্ধ করে দেয়।

'আড়িপাতা' মহিলাকুল হৈ চৈ করে আর হি হি করে হাসতে হাসতে ঠেলাঠেলি করে পালায়। সুধানন্দ মৃদু হেসে খাটের উপর এসে বসে। আর সহসাই যেন বিশ্বের সমস্ত ভয় ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে এই ঘরের মধ্যে।।

অমলা জানে না কিসের সেই ভয়।

অমলার শুধু সহসা ওই দরজায় খিল লাগানোর শব্দে বুক ধড়াস করে উঠেছিল।

অমলা তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে পড়ে বলে উঠেছিল, 'আমি ওদের সঙ্গে যাব।'

'ওদের সঙ্গে যাবে?'

সুধানন্দ অনুচ্চস্বরে একটু হেসে ফেলে বলেছিল, 'এত কাণ্ড, এত ছলচাতুরী করে বিয়ে করলাম তাহলে তোমাকে ওদের সঙ্গে ও ঘরে পাঠিয়ে দেবার জন্যে?'

মোমবাতির সেই ক্ষীণ আলোয় অমলা দেখছিল তার বর সিল্কের পাঞ্জাবী আর ফুলের মালাটা খুলে রাখলো। আস্তে খাটের উপর এসে বসলো তার পর হাত বাড়িয়ে আলতো একটু হাতের ছোঁয়া দিল অমলার হাতের উপর।

কী অনির্বচনীয়তা এই স্পর্শে!

কি অনাস্বাদিত সুধালোকের ইশারা। অমলার সর্বশরীর যেন অবশ হয়ে আসে ওই মৃদু করস্পর্শে।

বিবাহ অনুষ্ঠানে বহুবার হাতে হাত ঠেকেছে, সে স্পর্শে এমন অবশ করে দেয় নি। এই স্বল্পালোকিত দরজা বন্ধ ঘর আর কিছু শোনা আর কিছু না শোনা একটা ছায়াময় জগতের ইঙ্গিতের সঙ্গে এই স্পর্শ শিহরিত করে তোলে অমলাকে।

অমলা ভয় পায়। যদিও বুঝতে পারে না কেন ভয়।

অমলা রুদ্ধকণ্ঠে সে কথা ব্যক্ত করে।

'ভয় করছে!'

সুধানন্দ ঈষৎ গম্ভীর হয় এবার। মৃদু গম্ভীর গলায় বলে, 'ভয় কিসের?'

অমলা ভেবে চিন্তে বলে ফেলে, 'অন্ধকারে শুতে ভয় করে আমার।'

'ও-হো-হো!' হেসে ফেলে সুধানন্দ। তারপর বলে, 'খুব ভূতের ভয় আছে বুঝি?'

'মোটেই না! কোনোদিনও না! আজই শুধু—'

সুধানন্দ হাসে, 'আজ বোধহয় ঘরের মধ্যে জলজ্যান্ত একটা ভূত দেখে—কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রিটা ভাব করবার জন্য—জানো না সে কথা?'

অমলার মনে পড়েছিল বাইরে সেই আড়িপাতার দল এখনো বিরাজমান. তাই অমলা বলে উঠেছিল, 'আহারে! ওরা সব আড়ি পাতছে না?'

'পাতুক না।'

'হ্যাঁ, তারপর কাল সকালে ঠাট্টার চোটে মাথা খারাপ করে দেবে—।' অমলা

পূজায় নতুন পোষাক চাই-ই

ন্যাশন্যাল ট্রেডার্স

আধুনিক জনপ্রিয় পোষাক শিল্পী

১০০, বিধান সরণী, কলিকাতা-৪

অন্যমনস্ক তার স্বভাবগত বাক্‌পটুত্বে এসে যায়। বলে, 'দেখছি তো জীবনভোর সবালে বে ঠাট্টা করে।'

'আহা তা' পাক্ না একটু আমোদ?'

আস্তে আস্তে ভয় কেটে যাচ্ছিল অমলার ইচ্ছা হচ্ছিল নিজেও সে বরের হাতটাতে একটু হাত ছোঁওয়ায়, খুব কাছা-কাছি হয়ে বসে কিন্তু ছিঃ! লজ্জা বলে একটা জিনিস তো থাকবেই! সেই লজ্জার বশেই দূরত্ব বজায় রেখেই বলেছিল অমলা, 'কী বুদ্ধিরে! লোকে যাতে আমোদ পাবে, আমরা তাই করবো? আমরা যেন ভালুক নাচের ভালুক!'

বলেই শুয়ে পড়েছিল অমলা 'ভীষণ ঘুম পাচ্ছে বলে।'

ঘুমটাকে আটকাতে পারে না অমলা।

ওই ঘুমের জন্যেই সেজদির বিয়ের বাসর' দেখা হয় নি। নিজের বিয়ের ফুলশয্যাও দেখা হল না।

তবু তার বর যে তার পাশের বালিশটায় শুয়ে পড়েছিল, আর একখানা হাত বাড়িয়ে অমলার গায়ের উপর রেখেছিল সেই মাদকতা ঘুমের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে ফিরছিল, ফুলের মালার আর সেন্টের গন্ধের সংগে একাকার হয়ে।

সেই যে তন্দ্রার মধ্যে ওই ঈষৎ মাদকতার অনুভূতি, ওটা কি কম মূল্যের?

এক ঘুমে রাত কাবার!

ওই ফুলশয্যা!

শুধু এক টুকরো নিবুদ্ধিতা!

কিন্তু ওর বদলে একখণ্ড অসহিষ্ণুতার স্মৃতিই কি খুব মনোরম হতো?

তারপর সাতদিন শ্বশুরবাড়িতে ছিল অমলা। আস্তে আস্তে ভাব-হয়ে গিয়েছিল। এবং ঘুমের ভাগটাও যেন কমে আসছিল। তবু—অমলা মনে মনে হাসে, 'রাত জেগে' কী বা সেই গল্প? স্কুলের মোটা দিদিমণির গল্প নিয়েই তো একটা পরম দামী রাত কেটে গিয়েছিল। আর একটা রাত কেটে-ছিল—মামার বাড়ির কুকুরের গল্পে।

সুধানন্দদের 'জোড়ে' আসা নিয়ম নেই।

চলে আসার আগের দিন সুধানন্দর সে কী হতাশ কাতর বিরহ ব্যাকুলতা! অমলারও কি মন কেমন করে নি? খুবই করেছিল, তবু অমলার সমস্ত হৃদয়তন্ত্রী জুড়ে বাজছিল আসন্ন মুক্তির উত্তাল আশ্বাস।

কিন্তু শুধুই কি সেই প্রথমবার?

বরে বারে, প্রতিবারে এখনো কি সেই একই অনুভবের পুনরাবৃত্তি ঘটে না। শ্বশুরবাড়ি থেকে যাবার সময় 'মার কাছে যাচ্ছির সুখটা ব্যাহত হয় বরের জন্যে মন কেমন করে, আর বাপের বাড়ি থেকে আসার সময় 'বরের কাছে যাচ্ছির সুখটা ব্যাহত হয় মা-বাবার জন্যে মন কেমন করে।

আনন্দ আর বেদনা, চিরদিন পাশাপাশি বয়ে চলেছে দুটি সমান্তরাল নদীর মত।

হয়তো বা সকলের এমন হয় না। হয় তো মা এটা অমলারই প্রকৃতির দোষ।

তাই বাবলির এই আনন্দের দিনে, যখন বাবলি সুখের সাগরে ভাসছে, তখন কিনা বাবলির মার মন বেদনায় বিষণ্ণ হয়ে উঠছে বাবলি নতুন বরের চিঠি পেল না বলে!

পেল না।

পাবেও না।

হয়তো প্রতিদিনই 'বাবলি বাবলি' ডাক পেড়ে এসে হাজির হবে সরোজ, হয়তো প্রতি-দিনই টেনে বার করে নিয়ে যাবে তাকে হাটে-বাজারে, পথে-ফুটপাথে আনন্দ আহরণ করে বেড়াতে।

ওদের নিজের উঠোনে ফুল নেই, শূন্য সাজি হাতে নিয়ে ছুটে ছুটে ফুল পাড়তে যাবে ওরা পরের বাগানে।

প্রথম মিলনের পর প্রথম বিচ্ছেদের চিঠির স্বাদ পেল না বাবলি। ওর বিরহী বর নিভৃতে নির্জনে তার বিরহ বেদনাকে ভাষা দিয়ে পাঠিয়ে দিল না। কিনে নিয়ে এল সিনেমার টিকিট, দু'জনে পাঁচশো লোকের সংগে গিয়ে বসবে বলে।

বাবলি বরের চিঠির আশায় ব্যাকুল আবেগে প্রতীক্ষায় প্রহর গোণবার সুখ পাবে না।

হয়তো বা বাবলিকে সেই লোকসানের কথা শোনাতে গেলে, হেসেই অকুল হয়ে বলবে, মানুষটাকেই যদি পেলাম, তো চিঠি-টায় কী কাজ?'

কিন্তু 'মানুষটা'কে কি মানুষটার মধ্যেই সবটা পাওয়া যায়? যে 'মানুষটা' তার নিজের কাছেও অনাবিষ্কৃত ছিল, সেই মানুষটার সন্ধান এনে দেয় না-কি চিঠি?

ভালবাসার চিঠি তো শুধু ভালবাসাকে প্রকাশই করে না, ভালবাসাকে গড়ে। আর সেই সৃষ্টিমাকে সুষমা দেয়, সৌন্দর্য দেয়, মার্জনা দেয়।.....

চিঠি নিজেকে আবিষ্কার করার আশ্চর্য বিস্ময়ের অনুভূতি এনে দেয়।

সেই অনুভূতি অমলা নামের সেই মেয়েটা প্রথম অনুভব করেছিল, তার বাপের বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে বসে।

চিঠিটা এসে প্রথম পড়েছিল বাবার হাতে। কারণ অমলার বাবার বৈঠকখানা ঘরের দেওয়ালে একটা লেটার বক্স থাকতো, আর সে বাক্সের চাবি অমলার বাবার কাছে থাকতো।

অতএব চিঠি পড়ল বাবার হাতে। আধুনিক বাপ হলে সে চিঠি সরাসরি এনে ধরে দিয়ে বলতে পারতেন, 'এই নাও তোমার বরের চিঠি, বাবাজীর দেখছি দেরী সয় নি।'

কিন্তু অমলাদের বাড়ি 'পৌরাণিক'! তাই ভদ্রলোক সে চিঠি এনে চুপি চুপি স্ত্রীর কাছে জমা দিয়েছিলেন, আর স্ত্রী হঠাৎ এক-সময় মেয়েকে দিয়েছিলেন। কথা বলতে বলতে খুব আলগা গলায় বলেছিলেন 'ওরে তোর ঘরের টেবিলে তোর একটা চিঠি আছে।'

চিঠি!

সেজদি, মেজদির মত অমলারও চিঠি এল।

চিঠির প্রত্যাশায় মেজদির সেই মুহু-র্মুহু জানলায় দাঁড়ানো, আর যখন-তখন একটা ছুতো সৃষ্টি করে বাবার বাইরের ঘরে ঢুকে পড়ে লেটার বক্সটা দেখে আসার ছলনা, এই তো সেদিন দেখেছে অমলা।

দেখেছে, মর্ম বোঝে নি, ভেবেছে 'সেজদিটা কী হ্যাংলা!'

এখন সেজদি শ্বশুরবাড়ী গেছে।

ভাগ্যিস গেছে!

নইলে সে আবার অমলার হ্যাংলামির সাক্ষী হয়ে বসতো! হয়তো বা মার কাছে গিয়ে হেসে হেসে বলতো, 'তোমার ছোট মেয়েটি বুঝলে মা, দেখতে ন্যাকা, ভেতরে ভেতরে বেশ পাকা! বরের চিঠির ওজন দেখ?'

হ্যাঁ, সেই নীলাভ খামে ভরা চিঠিখানি বেশ ওজনে ভারী ছিল। আর তার অর্থ হৃদয়ংগম করতে বার পাঁচ-ছয় পড়তে হয়ে-ছিল অমলাকে।

প্রথমটায় তো হাত কাঁপা আর চোখে ঝাপসা দেখার দরুণ বলতে গেলে পড়াই হয় নি। শুধু যেন একটা অজানা অক্ষরের শিলা-লিপির উপর চোখ বুলোনো। তারপর কিছুটা পড়া, কিছুটা না পড়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাওয়া, এবং তারপর আস্তে আস্তে পড়া আর মানে বোঝা!

লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বাহ্যজ্ঞান। লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বিশ্বচরাচর।

অমলার হৃদ্‌স্পন্দন ছাড়া আর কোনো স্পন্দন ছিল না কোথাও।

চমক ভাঙলো বাবার হঠাৎ গলার আওয়াজে। বিস্মিত-চকিত দ্রুত উচ্চারিত সেই কথাটি ছিল, 'সে কি? এখনো ছাতে? কি করছে? ডেকে আনো, ডেকে আনো।'

তখন মার উত্তর শোনা যায় নি।

তারপর মার ডাক শোনা গিয়েছিল, 'ওরে অমু নাম। নামার সময় ছাতে আমার যে শাড়ীটা শুকোচ্ছে নিয়ে আসিস।'

অমলা বুঝতে পেরেছিল মা বাবার কাছে বলেছেন ছাতে কাপড় শুকোতে দিতে গেছে অমলা।

অমলা নেমে এসে চট করে মা বাবার সামনে বেরোতে পারে নি। অমলার মনে হয়েছিল চিঠির সেই ভয়ংকর সুন্দর কথাগুলো

শারদীয় অভিনন্দন

বক্সী ব্রাদার্স

সর্বপ্রকার লোহ বিক্রেতা

১৮, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

ফোনঃ ৩৩৭৫৮৮

বুঝি অমলার গায়ে লে'টে রয়েছে। অমলাকে দেখলেই দেখতে পাওয়া যাবে সেইগুলো।.....

আর অমলা মনে মনে যে উত্তর রচনা করছে তা ধরা পড়ে যাবে তার মুখের রেখায়।

অমলা তাই বাবার সামনে বেরোয় না, পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

তারপর যখন বাবা কাজে গেলেন, মা গেলেন দিবানিদ্রার মধুর সুখে ধরা দিতে, অমলা কাগজ-কলম নিয়ে বসলো।

বিয়ের সময় অধিবাসের তত্ত্বে পাওয়া যে দামী বেগুনে আভা লেটার প্যাড আর খাম পেয়েছিল, সেইটা কাজে লাগবে এবার।

কিন্তু প্রথম চিঠি লেখার সেই মুস্কিলের কথা মনে পড়তেই মনে মনে হেসে উঠলো। একালের এরা বোধ হয় চিঠি লেখার থেকে অনেক সোজা মনে করে পাঁচ-দশ মাইল পথ ভেঙে চলে আসা।

চিঠি লেখা কম শক্ত নয়।

ওকে একটা আর্ট বলা চলে। ও আর্টটা যার আয়ত্ত, সে চট করেই কাজ মেটাতে পারে, কিন্তু যার অনায়ত্ত? তার ওই সেই 'অমলি' নামের মেয়েটার দশা ঘটে—হেসে উঠে ভাবল অমলা।

প্যাডের পাতা গুণে দেখবার কোনো লোক যদি থাকতো, সে বোধ করি অমলার দু'পাতা চিঠি এবং পাতা ছেঁড়া প্যাডটা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গালে হাত দিত।

একটা দুটো লাইন লিখছে আর পাতা ছিঁড়ছে, লিখতে লিখতে আর ছিঁড়তে ছিঁড়তে গলদঘর্ম হয়ে ওঠে, এমনি করে সারা দুপুর কেটে যায়।

আশ্চর্য! কী অনায়াসে, কী সুন্দর করে এই ছ'পাতা চিঠিটা লিখেছে সুধানন্দ! কথা-গুলো এমন চমৎকার ভাবে গোছালো কি করে? বিদ্যেটা না হয় ক্লাশ নাইন অবধি, কিন্তু গল্প-উপন্যাস তো প্রায় মাঠ সাফ করে দেবার মত গোগ্রাসে গিলছে সেই দশ-এগারো বছর বয়েস থেকে, এবং প্রেম-ভালবাসার কথাও যে তাতে না থাকে তা নয়, অথচ দু লাইন একটু সৌখিন করে লিখতে ঘাম ছুটে যাচ্ছে। একটু যে 'কোটেসান' দেবে, তাই কি কিছু মনে পড়ছে?

খাতা-কলম বিছানার তলায় লুকিয়ে রেখে বাবার ঘরের সেলফ হাতড়ায় অমলা গল্পের বই, কবিতার বই। বইয়ের সখ আছে অমলার বাবার। তাই পাছে কেউ চেয়ে নিয়ে গিয়ে পড়ে আর ফেরৎ না দেয় তাই নিজের ঘরে রেখে দিয়েছেন।

অবশ্য অমলার গতিবিধি সর্বত্রই ছিল। আর তিন মেয়ের থেকে অমলা একটু আদরিণী বেশী! হয়তো কোলের মেয়ে বলে, হয়তো ছোট থেকে একটু বাক্যবাগীশ বলে।

বাবার ঘরে এসে বই নিয়ে যাওয়া অমলার নতুন নয়, কিন্তু আজ এই ঘুঘুডাকা নির্জন দুপুরে বাড়িতে যখন আর কোনো সাড়াশব্দ নেই, তখন এই বরের চিঠিতে ভালো ভালো লাইন সন্নিবিষ্ট করতে বই দেখতে আসায় যেন চুরির পাপ বোধ এসে লাগছিল অমলার মনে।

কিন্তু জানাই গেল, পেট ভরল কই?

কোথায় সেই চমৎকার সুন্দর দু'চারটি লাইন, যা অমলার মনকে ব্যক্ত করবার ভূমিকা নিতে পারবে?

কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেই দুর্লভ দুটি চরণ, যা অমলার প্রাণের দেবতার চরণে পাঠানো যায়।

পাওয়া যায় নি।

পরে ওকর্ম অনেক করেছে অমলা, কিন্তু সেই প্রথম চিঠিতে কিছুই পেরে ওঠে নি। পারে নি, আর সুধানন্দর ওপর রাগ এসেছে, এত সব লেখবার কী দরকার ছিল শুনি? সোজাসুজি লিখলে তো অমলার কাজটা সহজ হতো।

নিজের স্বার কি, নিজে দিব্যি সব করে দিলেন 'আদরের অনামী' বলে, অমলা কী করবে শুনি?

অমলা চলে এসেছে, অমলাকে দিব্যি খোঁটা

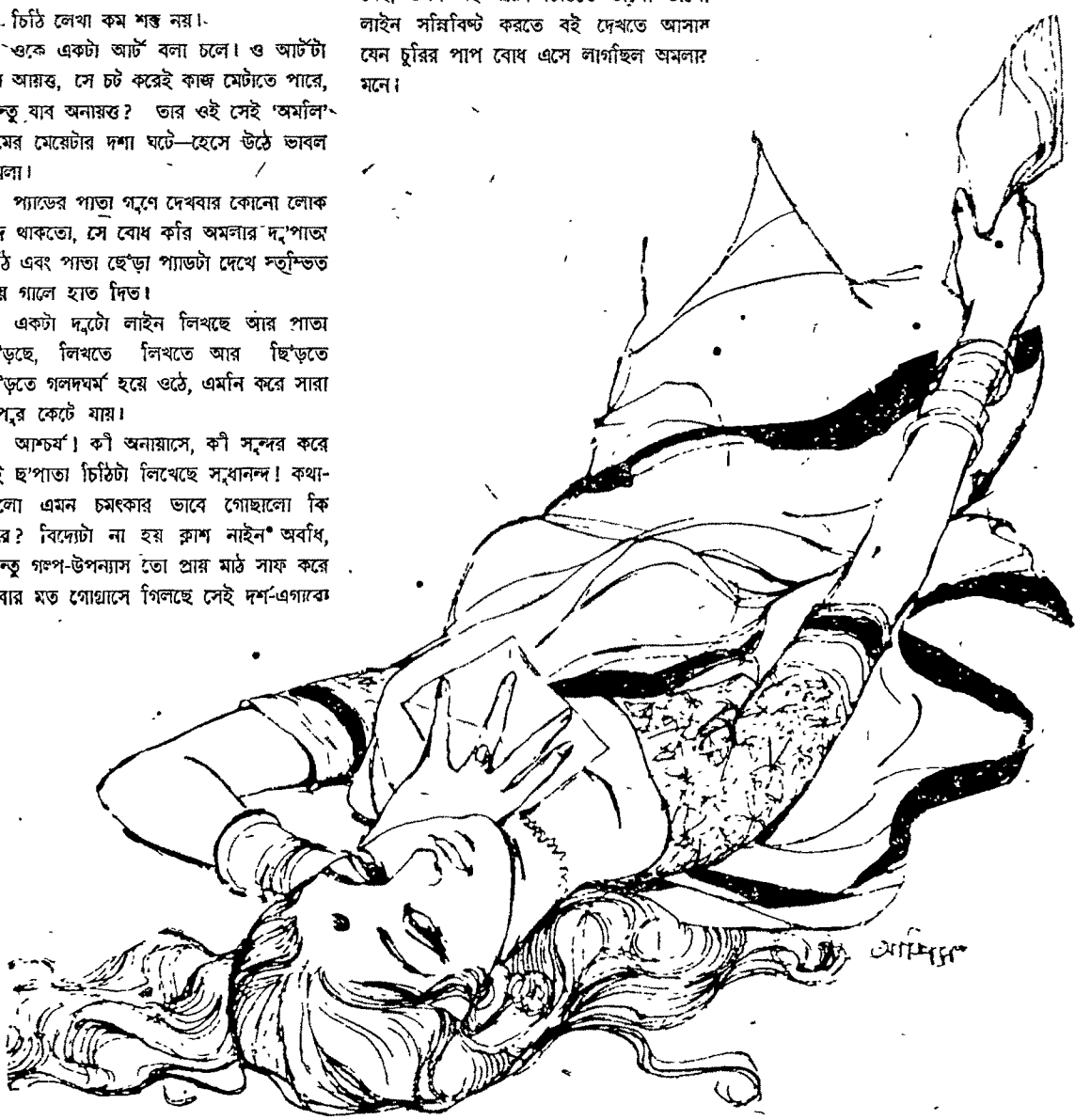

লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বাহ্যজ্ঞান। লুপ্ত হয়েছিল বিশ্বচরাচর

দেওয়া যায় 'বাপের বাড়ি গিয়ে নির্ঘাৎ এই হতভাগাটাকে ভুলে বসে আছো? মনের আনন্দে আহ্লাদ করছো'—ইত্যাদি ইত্যাদি। ওই খোঁটাতেই দু'পৃষ্ঠা ভরিয়েছেন বাবু।

অমলার কী বলবার আছে?

অমলা রোদে ঝকঝকে দুপুরের আকাশটার দিকে তাকিয়ে দেখে, এই আকাশটার নীচে সুধানন্দও আছে, ভেবে হঠাৎ ভারী ভাল লেগে যায় অমলাবৌ।

আর এখন সেই ছেলেমানুষী সুখ-দুঃখের কথাগুলো ভাবতে ভাবতে সহসাই সুধানন্দর জন্যে মনটা কেমন করে ওঠে। কোন্ সকালে চলে গেছে, এখনও ফিরল না, ক্ষতক্ষণ যেন দেখা হয় নি। নিত্যই যে কিসের এত মীটিং অফিসে?

মেয়ের বিয়ে বিয়ে করে কিছুকাল ধরেই যেন তাকিয়ে দেখা হচ্ছে না মানুষটাকে। সম্পর্কটা এসে ঠেকেছে যেন, শুধু 'চাই আর দাওতে।

তাকিয়ে দেখি না ওর অসুবিধা হচ্ছে কিনা, লোক-লৌকিকতা শোভা সৌষ্ঠব এই নিয়েই মশগুল আছি। না পেলে কুরুক্ষেত্র করছি।

উপায়ও নেই, ওকে ছাড়া কাকে বলতে যাব! কিন্তু তখন ছিল না এসব চাহিদা। তখন শুধু চিঠি পাওয়া আর চিঠি না পাওয়া, এই ছিল সুখ-দুঃখ।

একবার সেই ও রাগ করে দশদিন চিঠি দিল না! উঃ কী যন্ত্রণায় গেছে সেই দিনগুলো! অথচ রাগটা প্রেফ একটা ছেলেমানুষী ব্যাপার নিয়ে।

তা তখন যা কিছু 'ব্যাপার' সবই তো ছিল অহেতুকের লীলা।

নতুন নতুন নেমন্তন্ন ব্যতীত শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে আসার রেওয়াজ অমলাদের বাড়িতেও ছিল না, সুধানন্দদের বাড়িতেও ছিল না। দুটি গোঁড়া বাড়িতে পারিবারিক বন্ধনটা ভালই গাঁটছড়া বেঁধেছিল। কিন্তু দেখা হওয়া তো চাই।

সপ্তাহে একটি শনিবারের নেমন্তন্নে আশা মেটে না। ওদিকে সুধানন্দর বাবার নির্দেশ, এক বছর বৌ বাপের বাড়িতেই থাকবে। তাঁর নিজের আমলের প্রথাটাকে চালু রেখেছিলেন তিনি।

সুধানন্দ বলে রেখেছিল প্রতি বুধবারে সুধানন্দ সন্ধ্যার দিকে ওই মোড়ের রাস্তায় পায়চারি করবে, এবং অমলা দোতলার বারান্দায় যেন দাঁড়িয়ে শুধু 'অলস কৌতূহলে' রাস্তার দিকে চেয়ে থাকবে! এই পরিকল্পনায় দুজনেই পরম উৎসাহবোধ করেছিল। ব্যাপারটাকে ওরা প্রায় 'হামলেট ওফেলিয়ার' পর্যায়ভুক্ত করে ফেলেছিল।

দুটো সপ্তাহ পরিকল্পনাটার রীতিমত সার্থক রূপও দেখা গিয়েছিল, কিন্তু মেয়েমানুষ তো আর সব সময় নিজের তালে চলতে পারে না? তাকে সব দিকের তালই দিতে হয়!

সমাজ সংসার, অভিভাবকের সন্দেহ দৃষ্টি এবং বহিরাগতের কৌতূহল দৃষ্টি; তা ছাড়া কাজকর্ম, সব কিছুকে ম্যানেজ করে তবে তো অভিসারে যেতে হবে তাকে?

শ্রীরাধিকাকেই যে রান্নাবান্না সেরে তবে অভিসারে যেতে হতো।

একদিন বুধবার অমলার মার জ্বর, অমলা রান্না করছে, ঠিক নির্দিষ্ট সময় অমলার মাসি এসে হাজির হলেন। মাসি আসা মাত্রই তো তাঁর সামনে থেকে উধাও হয়ে গিয়ে বারান্দায় উঠে অলস কৌতূহলের পোজ নেওয়া যায় না। মাসির সঙ্গে কথা বলতে হয় দাঁড়িয়ে।

মার শরীর ভাল থাকলে কেটে পড়া যেত, গেল না।

অতএব 'হ্যামলেট' সেকেন্ড কয়েক আবেগময় প্রতীক্ষায়, তারপর মিনিট কয়েক অভিমানে ক্ষুব্ধ দ্রুত পদচারণায়, এবং প্রায় ঘণ্টার অর্ধেকটা সময়—যদি এখনো আসে কী ভেবে শুধু পদক্ষেপের গতিভঙ্গীতেই ক্রোধ ক্ষোভ অপমানের জ্বালা ইত্যাদি ফুটিয়ে তুলবে, তারই রিহার্সাল দিতে দিতে কাটিয়ে, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গিয়েছিল।

অমলা একবারের জন্যেও দোতলায় উঠে এসে অকারণ দাঁড়ানোর পোজ দেবার সুবিধে করে উঠতে পারে নি। অমলা শুধু নিরুপায় হতাশায় ছটফট করেছে।

একবার যদি যেতে পেত!

কিন্তু পাবে কি করে? মাসি যে একেবারে ফাঁসির দড়ির মত গলায় চেপে বসে আছেন তখনও।

তাঁর কাছ থেকে হঠাৎ উঠে যাওয়ার যুক্তি কি?

এদিক-ওদিক দু'দিক গেল। সুধানন্দ ফিরে গেল আর যাবার সময় মাসি তার বোনকে বলে গেলেন 'আজকাল আবার বিয়ের পর এক-বছর কে রাখে? তোর বেহাইয়ের সৃষ্টিছাড়া মেয়ে তোর উচাটন হয়ে উঠেছে বাপু, এই বলে দিলুম!'

মাসির দেওয়া এই কলঙ্ককালি গায়ে মেখে জলভরা চোখ নিয়ে মায়ের কাজগুলো সেরে তুললো অমলা, তারপর বাবা এলে খাইয়ে এবং খেয়ে চিঠি লিখতে বসলো।

এখন আর চিঠি লিখতে আগের মত হয় না। এখন যথেষ্ট মুন্সীবিদা শিখে ফেলেছে অমলা। আর জ্বর, সকাল থেকে কোন প্রাণ নিয়ে সে দিনের কাজ সারছিল, আর তার পর কী ভাবে সেই আকুল সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, সবই লিখল অনেক করুণ রসের প্রস্রবণ বইয়ে। অবশ্য সে রস মিথ্যা রসও নয়, প্রাণ তো কেটেই যাচ্ছিল তার।

কিন্তু সেই সাত পৃষ্ঠা চিঠিও কোনো কাজে লাগলো না। সুধানন্দর তরফে পূর্ণ নীরবতা বিরাজমান রইল।

চিঠির উপর চিঠি লিখছে, উত্তর নেই। কলকাতারই এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ইতিপূর্বে একই দিনে চিঠির লেনদেন করে রেকর্ড স্থাপন করেছে তারা। কাজেই সাত দিনে আটখানা চিঠি লিখল অমলা।

তবু নিষ্ঠুরের মান ভাঙে না।

পরের বুধবার সন্ধ্যার কত আগে থেকেই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অমলা, যেন 'অলস কৌতূহলের' আর শেষ হচ্ছে না তার।

ব্যর্থ হল সে অভিসার।

ক্রমশ ভয় শুরু হল।

আমি তো ভাবছি ও রাগ করেছে, যদি কোনো অসুখ করে থাকে? এমন তো হতে পারে? হয়তো সেই জন্যেই চিঠি দিচ্ছে না। অবশ্য অমলা বোকা নয়, সে চিন্তা বেশীক্ষণ স্থায়ী রইল না। যেমন অসুখে চিঠি লেখা যায় না, তেমন অসুখে কি খবর দেবে না বাড়ির লোকে তার বৌকে?

ইস্ অমলা যদি অলক্ষ্যে গিয়ে দেখে আসতে পারতো! অমলা একবার ও বাড়িতে গিয়ে পড়তে পারে, এমন কোনো ঘটনা কি দিতে পারে না ভগবান? ঘটাতে পারে না বইয়ের গল্পের মত কোনো যোগাযোগ?

জীবন নাটকও নয়, নভেলও নয়, অথবা গল্পের বইয়ের গল্পও নয়। জীবন সোজাসুজি কাঠখোট্টা, তবু অমলার জীবনে বারে বারে গল্পের যোগাযোগ এসে পড়ে। অবিশ্বাসের মতই সেই ঘটনাটা!

যে সন্ধ্যায় অমলার পাখী হয়ে উড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল, সেই সন্ধ্যার প্রান্তে অমলার শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক এল। এল নেমন্তন্ন করতে।

আগামী কাল মেয়েকে নিয়ে বেয়ানকে একটু যেতে হবে।

কারণ?

কারণ একটু মাছ ভাত মুখে দেওয়া।

তবে তারও যদি কারণ খুঁজতে হয়, মেজগিন্নীর মেজ মেয়ের 'সাধ'। অতএব ও পক্ষের বেয়ানদের সাধ যে এ পক্ষের বেয়ান ও তার মেয়ে তাঁদের সঙ্গে মাছ ভাত খাবেন।

বাড়ির বহুদিনকার পুরনো চাকর বড়গিন্নীর লেখা চিঠি নিয়ে এল, এবং সবিনয়ে জানাল, কাল বাড়ির কোনো ছেলে অথবা সে এসে নিয়ে যাবে।

লোকটা চলে গেল, অমলার মা বললেন, 'হঠাৎ নেমন্তন্নটা করলেন, একখানি শাড়ী যে কিনে নেব, সেটা কখন! যা দেখছি যেতে যেতে পথেই গাড়ী দাঁড় করিয়ে—

অমলার এসব কথা মাথায় ঢোকে না। অমলার মনে হতে থাকে সে যেন স্বপ্ন দেখছে। নইলে এ-ও কি সম্ভব, অমলা যখন পাখী হয়ে উড়ে ও বাড়িতে যাবার ভাবনা করছিল, অথবা কোনো দিকেই কোন আশার আলো দেখছিল না, তখন হঠাৎ বিধাতা নিজে হাতে 'বর' নিয়ে এসে দাঁড়ালেন।

সত্যি সেই বাড়িটায় যেতে পাবে অমলা কাল? মান খুইয়ে নয়, মানের উপর? রীতিমত নিমন্ত্রিত হয়ে! এ আনন্দের ভার রাখবে কোথায় অমলা?

আচ্ছা—

সারারাত ভাল করে ঘুম হয় না অমলার, একটা অচিন্তনীয় সৌভাগ্যের ঢেউ যেন ফুলে

ফুলে উঠতে থাকে, আছড়াআছড়ি করতে চায়।

আচ্ছা—

শুধুই কি মার সঙ্গে গিয়ে মার সঙ্গেই ফিরে আসা? নীচের তলার বিরাট দালানটায় শতরঞ্চের ওপর বসে গল্প করে আর পীড়িতে বসে খেয়ে চলে আসবে অমলা?

তিনতলার সেই যে একটা ঘরে অমলা সাতদিন বাস করে এসেছে, সে ঘরটার প্রবেশ-পত্র মিলবে না একবার?

সুধানন্দ অবশ্যই দুপুরবেলা থাকবে না, কিন্তু শুধু ঘরটা দেখতেও তো নিয়ে যেতে পারে কেউ? কোনো ভাসুরঝি কি কোনো জ্ঞাতি ননদ? বিয়ের সময় তো কত ছিল।

অমলা তা হলে ওই ঘরটায় নিজের এমন কোনো উপস্থিতির স্বাক্ষর রেখে আসবে যে, দুঃখের অবধি থাকবে না সুধানন্দর।

রাত্রে ঘুম না হওয়া মন কিন্তু সকাল থেকে যেন শতদলে বিকশিত হতে থাকে। শ্বশুরবাড়ী থেকে চলে আসবার সময় মনে হয়েছিল অমলার, বুঝি কারাগার থেকে ছাড়া পেল। কিন্তু সেই কারাগারই এমন সহস্র বাহু মেলে টানতে পারে?

আজকের আকাশটা এত বেশী নীল কেন? আজকের রোদ্দুরটা এত বেশী শাদা কেন? আজকের পৃথিবীটা স্বর্গের স্বাদে ভরা কেন?

বাড়ীতে একটা বেড়াল আসা যাওয়া করতো এবং 'চুরি'র অপরাধে 'দ্যাখমার' করা হতো তাকে। অমলা আজ সকালবেলা চায়ের দুধ থেকে এক প্লেট দুধ বাড়িয়ে ধরলো তার দিকে, মা বললেন, 'ও কি রে?' ওটা কি হচ্ছে?'

অমলা বলল, 'রোজ মার খেয়ে মরে মা আজ একটু দুধ খাক্। আমরা নেমন্তন্ন খাবো।'

'নেমতন্ন' কথাটা উচ্চারণ করেই লজ্জায় নীল হয়ে গেল সে। ছি ছি কী বেহায়া সে! শ্বশুরবাড়ী বিষয়ক কথা বলছে! মা যদি বুঝে ফেলেন অমলার যেতে খুব ভাল লাগছে!

অমলাকে অতএব অন্য অভিনয় করতে হয়। বলতে হয়, 'কী যে এক নেমতন্নর ঢেউ উঠলো, জানি না বাবা!'

মা হেসে বলেন, 'তাতে কি? তোকে তো আর আটকে ফেলবে না? আমার সঙ্গেই চলে আসবি।'

'সে তো আসবোই। তবে ওই সব কত লোকজন, ভাল লাগে না!'

মা কি অমলার এই অভিনয়-চাতুর্য ধরে ফেলেছিলেন? না বোকাই বলেছিলেন? মাদের কি বোকা বানানো যায়? ছেলেবেলায় অবশ্য মনে হতো, এই অভিনয়, এই ছলচাতুরী ওরা কিছু ধরতে পারছে না। কিন্তু এখন নিজে মা হয়ে তো বুঝতে পারছে অমলা, কোনটা ছলনা, কোনটা খাঁটি।

বাবলিটা তো সেই কোন কাল থেকে দিব্যি ন্যাকা সেজে পাকামী চালিয়ে এল। লোকের বাড়ির কতটুকু ইট আর কতটুকু মাটি তা যদি জানা যেত।

যদি জানা যেত, নাটকটি কোন অবস্থায় রয়েছে তাহলেও বা বোঝা যেত।

কিন্তু ব্যাপারটা যে নাটক, তাতে আর সন্দেহ নেই। বুঝে আসছে অমলা, তবু সেটা প্রকাশ করে নি কখনো।

প্রকাশ করা মানেই তো সাহস বাড়িয়ে দেওয়া। প্রকাশ করা মানেই তার লাজলজ্জা ঘুচিয়ে দেওয়া।

একবার যদি সন্দেহ প্রকাশ করে বসো তোমার অভিনয় আমি ধরে ফেলেছি, তাহলেই সে খেপরোয়া হয়ে উঠবে। সেটা যেন ইচ্ছে করে আবরণ উন্মোচন করে দেওয়া।

অমলা মেয়ের অভিনয় ধরতে না পারার ভাণ করেছে। অমলার মাও হয়তো তাই করতেন।

তাই মা বলেছিলেন, 'কেন বাপু, ওরা তো সবাই লোক খুব ভালো।'

ওরা যে সবাই লোক খুব ভালো, সেটা অস্বীকার করে না অমলা। শুধু একজন বাদে।

বিনা অপরাধে কী কষ্টটাই দিচ্ছে!

ওবাড়ি গিয়ে পৌঁছতেই সুধানন্দর মা পিসি জ্যেঠি খুড়ি বেয়ান বেয়ান করে অমলার মাকে খুব আপ্যায়িত করে উঠলেন, অমলাকেও তো বটেই।

পিসশাশুড়ী 'সেজপিসি' হাত ধরে বললেন, 'মেয়ের রং কেন কালো করে ফেলেছ বেয়ান? বৌমা তো আরো ফর্সা ছিল!'

অমলা তো কথা শুনে অবাক।

ওর মুখে আসছিল বলে ফেলে 'তা' ফর্সা বৌটি আপনারা পেয়েছিলেন কোথায়? আমার মার কাছে যদি ময়লা হয়ে যাই?'

সাহস হল না।

মুখে মুখে কথা বলা, সঙ্গে সঙ্গে জবাব, এ প্রথা তখনও এখনকার মত এমন চালু হয় নি।

অমলার মাও বললেন না।

বরং বললেন, 'আপনাদের জিনিস আপনাদের কাছে এলেই রূপ গুণ বেরোবে।'

তারপর গল্পের স্রোতে ভেসে গেলেন ওঁরা।

আর—?

আর অমলা যা চেয়েছিল তা হল।

সাধ উপলক্ষে যে ক'জন মেয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে মামাতো ননদ সীমা স্বয়ং ভগবানের রূপ ধরে অসীমের সন্ধান এনে দিল তাকে। সীমার বিয়ে হয় নি, তবে অমলার থেকে বয়সে বড়।

বলল, 'এই বৌদি খাওয়া দাওয়ার দেরী রয়েছে। এই ফাঁকে তোর নিজের ঘরটায় ঘুরে আয় না একবার!'

ছলাৎ করে ওঠা বুকের রক্তকে সামলে নিয়ে অমলা অগ্রাহ্য ভরে বলল, 'আমার নিজের ঘর আবার কি? ধ্যাৎ!'

সীমা অবাক হয়ে বলল, 'ওমা এ বৌটা বলে কি গো? তোর নয় মানে? বিয়ে হলে অন্তত একটা বর আর একটা ঘর হয়, এও জানিস না?'

অমলা হেসে উঠে বলে, 'আমি তো জানি না, তুমি এত জানলে কী করে?'

বুদ্ধি থাকলেই অনেক কিছু জানা যায়। যা না বাবা!'

এটা কি?

অমলার বুকের মধ্যেটা সহসা এক গোপন প্রত্যাশায় দুলে ওঠে।

তবে কি শুধু ঘর বেড়ানো নয়, অন্য কিছু?

ঘরটা শুধু শূন্য ঘরই নয় বিগ্রহ সমেত মন্দির হয়ে রয়েছে?

কিন্তু দুললেই তো আর সেটা দেখিয়ে ফেলা চলে না? বাইরেটা অচঞ্চল রাখতে হবে। তাই অমলাকে বলতে হল, 'হ্যাঁ খেয়ে দেয়ে তো কাজ নেই আমার, তাই এমন আড্ডা ফেলে যাবো ভূতের মত একটা ঘর দেখতে।'

তা' তখন অমলার বাক্যবিন্যাসের পরিধি ওর থেকে আর বেশি বিস্তৃত ছিল না। এখন অনেক কথা শিখেছে, অনেক ভঙ্গিমা শিখেছে। তখন শুধু ওই ঝঙ্কার পর্যন্ত।

সীমা বলল, 'ভূতের মতন কেন বাবা? দেখগে না তোমার কর্তা বৌয়ের আসার আশায় ঘর কত সাজিয়ে রেখেছে!'

অমলার ফর্সা মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠল। অমলা বলল, 'ভারী অসভ্য তুমি।'

এই সময় নির্মলা আর তার জায়েরা এসে পড়ল নেমন্তন্ন খেতে। এখানে মা-বোনকে পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেল বেচারা। অতএব তিনতলায় ওঠার প্রস্তাবটা মুলতুবি থাকল।

কিন্তু অমলাকে নিষ্ঠুরই বলতে হবে। এতদিন পরে সেজদির সঙ্গে গল্প করতে পেয়ে বিভোর হয়ে যাবে, তা নয়, বারে বারেই অনামনস্ক হয়ে যাচ্ছে মন আর একটা অদেখা সাজে সজ্জিত দেখা ঘর তাকে অদৃশ্য আকর্ষণে টানতে থাকছে।

'তোর বেশ মজা'—সেজদি বলে, 'শ্বশুর-বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে এসেছিস, দিব্যি মার সঙ্গে চলে যাবি, একটি বছর ছুটি পেলি! আর আমার? সেই এসেছি তো এসেইছি। যাবার নাম মুখে আনা চলবে না। এরা ওদের আত্মীয়, তবু আকাশ-পাতাল তফাৎ।'

উৎসবে ও অনুষ্ঠানে ঘরদোর মনের মতন সাজাবার জন্য

ঘোষ ডেকরেটর্স

৮৩/এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬ ফোনঃ ৩৪৬৪০১

অমলা সেজদির চোখ দিয়ে এদের দেখে কৃতজ্ঞ হয়। সত্যিই এরা ভাল। কিন্তু এদের ছেলেটা যদি এদের মত ভাল হতো!

এমনি কথায় কথায় সময় চলে গেল, খাওয়ার ডাক পড়লো, আর তিনতলার একখানা ঘর বোধ করি মৌন বেদনায় মূক হয়ে পড়ে রইল।

কিন্তু সে বেদনা কি অমলার মধ্যেও মুচড়ে মুচড়ে উঠছে না? নেমন্তন্নর সময়টা এমন গোলমেলে, যে কোনো সূত্রেই কোনো আশা নেই। অমলা বিকেলে চলে যাবে, তারপর সুধানন্দ আসবে সন্ধ্যায়।

এই বাড়িতে এসে সুধানন্দকে না দেখে, সেই তার ফুলশয্যার ঘরটা পর্যন্ত না দেখে চলে যেতে হবে অমলাকে!

অথচ এরা বার বার বলছে।

কাকীও বলে গেলেন 'হ্যাঁ রে সুধার বৌকে এখানেই বসিয়ে রেখে দিলি? ওর ঘরে টরে নিয়ে যা একটু?'

অমলা কি এবার লজ্জা ত্যাগ করে ফেলে চলে যাবে ওদের সঙ্গে? না আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে, তৃষ্ণার জলটা ঠেলে ফেলে দিয়ে ফিরে যাবে?

সুধানন্দ ফিরে এসে শুনবে তো অমলার অসভ্যতা! জীবনে কি আর কখনো অমলার মুখ দেখবে তাহলে?

তবু এই মানসিকতা নিয়েও খেতে হল অমলাকে গুছিয়ে গাছিয়ে। শ্বশুরবাড়িতে পাতে ফেলা চলে না। আর বিকেল গড়িয়ে গিয়ে যাবার সময় হয়ে এল। কানে আসতে লাগল, 'ওরে, গাড়ি ডাক একটা।' একে একে মহিলারা বিদায় নিচ্ছেন, তাই এই আলোড়ন। এই আলোড়নের মধ্য থেকেই অমলাদের গাড়িও এসে যাবে।

আশ্চর্য সেজদিও চলে গেল!

বলল কিনা, 'এই দেখ গাড়ি এসে গেল। কতবার ভাবলাম, যাই একবার সুধার ঘরটা দেখে আসি। গল্পে গল্পে—'

অমলা কি তবে এবার মান খোয়াবে?

অমলা কি সীমার কাছে গিয়ে বলবে—

না, সেদিন মান খোয়াতে হয় নি অমলাকে। সে দিনটা ছিল অমলার অনেক সোনালী দিনের মধ্যে একটি সোনার দিন।

সেদিন মানুষের সহৃদয়তা, মানুষের মমতা অমলাকে যেন নতুন করে পৃথিবীকে ভালবাসতে শিখিয়েছিল। সেদিন অমলা শুনতে পেয়েছিল তার চুলকাটা থানপরা বালবিধবা পিসশাশুড়ী বলছেন, 'নাই বা ঘর করতে হলো? কাজে কর্মে এলে থাকতে দোষ নেই। আমি বলছি। ধর যদি যমুনার বিয়ে হতো, থাকতে হত না বৌমাকে বাসর জাগতে? এখন বেচারার মায়ের সঙ্গে চলে যাওয়া হবে যেন মুখের গ্রাস ফেলে চলে যাওয়া। এখেনে এলো বেচারা, না হলো সুধার সঙ্গে দেখা। না হলো বা আপনার ঘরখানাকে একবার দেখা। আর দুদণ্ড পরেই আসবে সুধা। না না, বেয়ান তুমি ভাই কাড় যাও। ওকে কাল পাঠিয়ে দেব।'

অমলার মায়ের গলা পাওয়া গেল, দ্বিধাজড়িত, নম্র কুণ্ঠিত, 'বেয়াইমশাই রাগ করবেন না তো?'

'সে ভার আমি নিচ্ছি—' পিসশাশুড়ী বলে উঠেন, 'রাগ যাতে না করে তার ব্যবস্থা হবে।'

অমলার চোখে সেদিন ধরা পড়েছিল, পৃথিবীতে মানুষ আছে মানুষের মধ্যে মমতা আছে।

কিন্তু কী ব্যবস্থা করবেন উনি?

একটু পরেই ব্যবস্থাটি টের পাওয়া গেল। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন সুধানন্দর বাবা। বললেন, 'কী হল? হঠাৎ বৌমার কী হল? বমি টমি হয় নি তো? পেট কি খুব নামাচ্ছে? কী অন্যায় বল দিকি? খেয়েছেন কি? সবাই যা: তার মানে ওই তোমাদের ডাল ছাঁচড়া মুড়িঘন্ট এই সব তো? খুব অন্যায় হয়েছে! পেট যখন ভাল নয়।'

নতুন বৌয়ের শ্বশুরদেব সঙ্গে কথা বলার অভ্যেস এ বাড়িতে নেই, তাই অমলা অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কী কথা এসব?

কার পেট ভাল নেই?

কে ছ্যাঁচড়া খেতে গেল? অমলা তো জন্মেও ওসব মুখে দেয় না।

তা' সে যেই থাক, অমলাকে ওষুধ খেতে হবে। শ্বশুর হোমিওপ্যাথির দুটি পুরিয়া এনে বলেন, 'ধর বৌমা! এক্ষুণি একটা খেয়ে নাও, বাকিটা দু'ঘণ্টা পরে। রিয়াক-শানটা দেখে আবার—অনু, বেয়ান ঠাকরুণকে বলে দে, এ অবস্থায় বৌমাকে পাঠানো সম্ভব নয়। মনে কিছু করেন না যেন। ভাল থাকলে কাল পাঠিয়ে দেব. রবিবার আছে, কেউ না কেউ গিয়ে—বছর পূর্ণ হয় নি, তা' কি করা যাবে? আতুরে নিয়ম নাস্তি!'

কর্তা চলে যেতেই একটা চাপা হাসির ঢেউ খেলে যায় সেখানে। আর পিসশাশুড়ী বলেন, 'ওষুধটা আমায় দিয়ে দাও দিকি বৌমা! এখুনি আর খেয়ে কাজ নেই। তোমার শ্বশুর যখন ধরেছে। বিশ্রাম না করিয়ে ছাড়বে না। ছোটবৌ! ওকে ওর ঘরে একটু শুয়ে থাকতে দাও গে।'

তারপর?

তারপর চাঁদের হাসির বাঁধ ভাঙল। তারপর অমৃতের অনন্ত স্বাদ! কোথায় গেল অভিমান, কোথায় গেল রাগ: নিজের ঘরে নিজের বিছানায় অপ্রত্যাশিতভাবে দুর্লভের দর্শন পেলে কে আবার যত মিথ্যা অভিমানের মামলা সাজাতে?

সুধানন্দর আদরের দাপটে অমলাকে বলে উঠতে হল, 'উঃ প্রাণ সংশয় করে দিচ্ছ যে!'

সুধানন্দ বলল, 'আমার খুশি! করবো তাই। নিঃসংশয় হওয়া গেছে যখন। মিটিয়ে নেব সাধ।'

তারপর খুব হাসতে লাগল

বাঁবার সুর নকল করে করে বলল, 'খেয়ে-ছিলেন কি? ছ্যাঁচড়া? ডাল?

হেসে লুটোপুটি খায় অমলা।

তারপর বলে, 'সত্যি আমি তো ঘোমটার মধ্যে থেকে হতবাক! যাই বল পিসিমার প্রাণে বাপু মায়া আছে! আমার তো ওঁর কথা শুনে চোখে জল এসে গিয়েছিল।"

পিসিমাকে মনে করল অমলা শ্বশুরের সঙ্গে, প্রীতির সঙ্গে।

বিয়ের সময় পিসিমা অবশ্যই কোনো একটু সোনার গহনা দিয়ে ভাইপো-বৌয়ের মুখ দেখেছিলেন। সে গহনার কথা অমলার মনে নেই। অনেকের দেওয়া অনেক উপহারের ঝাকে মিলিয়ে গেছে সে উপহার

কিন্তু পিসিমার হাত থেকে পাওয়া অনুপম উপহার সেই সোনার দিনটির কথা কি ভুলেছে অমলা? না জীবনে কখনো ভুলবে?

সেই খোলা ছাদের উপর একখানি মাত্র ঘর, যে ঘর সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করলে বাড়ির সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সেই ঘরে উঁচু পালঙ্কের উপর ধবধবে বিছানায় বহু স্বপ্নে উদ্বেলিত মনখানি নিয়ে

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিলুক্স

মার্কনী ফ্যান

নগদ মূল্যটা

৯টি কিস্তিতে দিন

মার্কনী ইলেকট্রিক করপো

(প্রাঃ) লিঃ

১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-৩৩৪৮

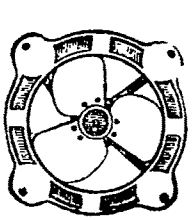

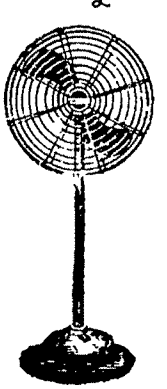

নিজেকে এলিয়ে দিতে পারার অধিকার যেন এক সাম্রাজ্যের অধিকার।

সে বাড়িতে সেইটাই অমলার ঘর ছিল।

'ঘরবসতে' আসার পর থেকে কতদিনই তো অঘরে থেকেছে অমলা। কিন্তু সেই একটি দিনের স্মৃতি আলাদা। সেদিন অমলার উদ্বেলিত মনের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করলো একটি অভিমান-জর্জরিত কাতর মন, যে মন অসহায় হয়ে স্থির করেছিল 'আর নয়! এবার কোনো একটা ছুতোয়—'

সুধানন্দকে জানানো হয় নি অমলা রয়ে গেছে। সুধানন্দ বিশ্বের উপর বিরক্ত মন নিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছিল, নির্মাল্যতারা সকলে বিদায় নিয়েছে ভেবে।

বাড়ির সকলকে 'নিষ্ঠুর হৃদয়হীন' ইত্যাদি অনেক বিশেষণে বিভূষিত করেছে সারাদিন, মুখে সেই ক্লেশের ছাপ নিয়ে নির্লিপ্ত মনে আস্তে আস্তে এসে ঘরে ঢুকেছিল সুধানন্দ।

তারপর? তারপর ঝড় উঠল।

আত্মসমর্পণের সেই উদ্দাম ঝড়ের ছবি এতদিন পরেও যেন শিহরণ এনে দিল অমলাকে।

ওই সন্ধ্যার পিছনে এসেছিল অপরূপ রূপের আলোয় উদ্ভাসিত একখানি জাগরণের রাত, যে রাত একটি কিশোরীকে এক মুহূর্তে নারী করে তুলেছিল।

এ রাত পিসিমার ভালবাসার দান, একথা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রেখেছে অমলা। সেই কৃতজ্ঞতাটুকু, অমলার জীবনের যে ঘরে পবিত্র আর মহৎ বস্তুগুলি তোলা আছে, সেই ঘরে আছে তোলা।

বাবলিদের থাকবে না কোনো কৃতজ্ঞতার দায়।

এ যুগ কারো হাত থেকে 'দান' পেতে চায় না। তা সে দান মমতারই হোক, আর ভালবাসারই হোক। ওরা যা কিছু নেবে, যা কিছু পাবে, সে সমস্তই হওয়া চাই ওদের নিজেদের অবদান। হাত পেতে নয়, কৃতজ্ঞ হয়ে নয়, দাবির জোরে ছিনিয়ে নেবে ওরা ওদের অধিকার।

অপ্রত্যাশিত পাওয়ার অসীম রোমাঞ্চ ওদের জন্যে নয়।

দিনের পর দিন কেটেছে। কিশোরী অমলা কবে হয়ে উঠেছে যুবতী নারী, কবে বা পরিণত হয়েছে সংসারের গৃহিণীতে, খেয়ালেই আসে নি কোনোদিন। বাবলির বিয়ে, বাবলিদের আচরণ হঠাৎ এসে নাড়া দিয়েছে সেই খেয়ালহীন স্তব্ধতায়। সোনার কৌটোয় তুলে রাখা সেই সোনালি দিনের মনখানি আস্তে মুখ বাড়িয়েছে তাই কৌটো খুলে।

অমলা ওকে নিয়ে নাড়াচাড়া করবে, আবার কৌটোয় তুলে রাখবে যত্ন করে।

'কি হল? এমনভাবে বসে যে?'

কি হল? এমনভাবে বসে যে?

সুধানন্দ ঘরে ঢুকে টাইটায় টান দিতে দিতেই প্রশ্ন করে ওঠে।

অমলা সচকিত হয়।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'বসে থাকব না তো কি একা ঘরে বসে গান ধরবো? হল তোমার মীটিং?'

সুধানন্দ গলাটাকে টাইমুক্ত করে উঁচু পালংকটার উপর বসে পড়ে, একটু রহস্যময় হাসি হেসে বলে, 'মীটিং ছিল না।'

'মীটিং ছিল না? তবে?'

'গিয়েছিলাম এক জায়গায়!'

অমলা ওর মুখের রহস্যাভাসে কৌতুক

(শেষাংশ ১৩৪ পৃষ্ঠায়)

ঋণ শোধ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্বশুর জ্যাঠশ্বশুর—পর পর তিনখানা ছবি. টাঙানো দেওয়ালে। দাদা-শ্বশুর আর জ্যাঠশ্বশুরের অয়েলপেণ্টিং, তখনকার রেওয়াজমতো করানো, কিছুটা বিরাট হয়ে এলেও গিল্‌টিকরা বিরাট ফ্রেমের কল্যাণে সেইগুলোই আগে নজরে পড়ে। কিন্তু তাই বলে শ্বশুর গুরুদাস মল্লিকের এন্‌লার্জ করা ফোটোখানাও কম বড় নয়। নিজেই শখ করে করিয়েছিলেন চারু গাহকে দিয়ে—বেশ বড় আকারের, যেমন এবং যতখানি তাঁর মুখের আকৃতি ছিল প্রায় ততখানিই বড় করা।

মাধবী নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে একেবারে দোতলার বৈঠকখানার এই দেওয়াল-টার সামনে এসে দাঁড়াল। সেকালের জমিদার ঘাড়ি, বড় বড় দাঁড়া আয়নাতে, ছবিতে, আলোর-ঝাড়ে সমস্ত দেওয়ালগুলো জেড়া; মেঝেটা জোড়া বড় বড় সোফাসেটি কৌচে এবং ফরাস-গাতা বড় চৌকিতে। মধ্যে মধ্যে পাথরের টেবিলে বিচিত্র আকার ও বিভিন্ন মূল্যের অসংখ্য ঘড়ি—সিকি ঘণ্টা-আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর নানান সুরে বাজে সেগুলো। সবগুলো মিলিয়ে ঘরটা অনধিগম্য, এইসব আসবাব বাঁচিয়ে এদের মধ্যে দিয়ে আনাগোনা করা প্রায় দুঃসাধ্য, প্রতিপদে বাধা, প্রতি হাত ঠোকর লাগার সম্ভাবনা। এই কারণেই মাধবী এ ঘরটাতে বড় একটা ঢুকতে চায় না, পনেরো-কুড়ি দিন অন্তর সাফাই করার প্রয়োজনে ঝি-চাকরের কাজ তদারক করতে দোরের বাইরে এসে দাঁড়ায় হয়ত। কিন্তু আজকে সোজা এই ঘরেই এল এবং আসবাবের গোলকধাঁধা ভেদ করে একেবেঁকে শ্বশুরের ছবিখানার সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

ঠিক মাথার ওপর জ্বলজ্বল করছে ছবি-খানা। ভাল ফোটোগ্রাফারের তোলা ছবি—জীবন্তই মনে হচ্ছে। মাথাজোড়া টাকের নীচে মোটা ভুরু, তার নীচে প্রসন্ন উজ্জ্বল দুটি চোখ—যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তোমার মনের অন্তস্তল পর্যন্ত তাকিয়ে দেখছে। যেন কোন কিছুই ওঁর চোখ এড়ায় নি—শুধু মানুষ কত দুর্বল তা জানেন বলেই চুপ করে আছেন। সেই চুপ করে থাকাটা আরও প্রকট তাঁর দৃঢ়সম্বদ্ধ দুটি ওষ্ঠের ভঙ্গীতে। জানেন অনেক কিছুই, পারিপার্শ্বিক মানুষগুলোর অনেক রহস্য—তেমনি তা চেপে রাখতেও জানেন।

অনেকক্ষণ ধরে সামনে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল মাধবী ছবিখানার দিকে। বুক পর্যন্ত ছবি, মুখখানাই প্রধান—কিন্তু ডান হাতটার একটা আঙুল একদিকের গালে দিয়ে রাখার জন্য হাতটাও উঠে গেছে ছবিতে। হাত আর তার সঙ্গে বাকী আঙুলগুলোও। সেই সঙ্গে অন্য মকার গোমেদের আংটিটাও।

শিউরে উঠে মুখ ফিরিয়ে নিল মাধবী। আংটিটা ওর পরিচিত, বড় বেশী পরিচিত।

যেন সেই পরিচয়ের স্মৃতি এড়াতেই এদিকে মুখ ফেরাল সে। আর সঙ্গে সঙ্গে এ দেওয়ালের বড় বিলিতি দাঁড়া আয়নায় ফুটে উঠল নিজের চেহারার পরিপূর্ণ ছবিটা—

চওড়া লালপাড় শাড়িখানাই চোখে পড়ে সর্বপ্রথম। কিন্তু আর একটু চেয়ে থাকলে বাম মণিবন্ধের গোছাভর্তি চুড়ির মধ্যে বাঁধা (সোনা ও রুপো দুইই) এবং আবাঁধ গাছ-তিনেক লোহাও; এমন কি বয়সের-জন্য-ঈষৎ-বিস্তৃত সীমন্তে চওড়া সিঁদুরের রেখাটাও।

স্পষ্ট আয়তির চিহ্ন।

ললাটের দুই প্রান্তে কয়েকগাছি কাঁচা পাকা চুল দেখা দিলেও মাধবী এখনও প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছয় নি; মধ্যবয়সীও হয়ত বলা চলে না তাকে—এখনও যৌবনের সীমানাতেই পা আছে তার। হয়ত সর্বশেষ সীমা, তবু যৌবনই।

যৌবনও যেমন যায় নি, তেমনি রূপও না। তবে এই রূপ এবং যৌবনই বিধবার বেশে কেমন দেখাত কে জানে। এ শ্রীর এক-দশমাংশও থাকত কি? এই রাজেন্দ্রাণীর মতো চেহারার?

আরও একবার শিউরে উঠল মাধবী।

অসহায়ভাবে চেয়ে দেখল চারিদিকে। যেদিকে মুখ ফেরাতে যায় চারিদিকের অসংখ্য আয়নায় প্রতিবিম্বিত সেই একই ছবি, সেই সৌভাগ্যবতী আয়ুষ্মতী গৃহলক্ষ্মীর রূপটাই নজরে পড়ে শুধু। চেয়ে দেখবার মতো রূপ আর তার উপযুক্ত বেশভূষা, তাতে সন্দেহ নেই—চোখ পড়লে যে-কোন লোকেরই দৃষ্টি মুগ্ধ হয়ে ওঠবার কথা, মুগ্ধ না হোক প্রসন্ন

তো বটেই—কিন্তু মাধবী নিজে যেন সেই মুহূর্তে নিজের এই প্রতিচ্ছায়াটা থেকে মুক্তি পাবার জন্য ছটফট করে উঠল। মনে হ'ল সৌভাগ্যের এই মিথ্যা চেহারাটা তাকে চারিদিক থেকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে জর্জরিত করছে। কতকটা দিশাহারা হয়ে সে একটা কৌচে বসে পড়ে চোখ বুজল—

মিথ্যা, মিথ্যা। সে জানে কতদূর মিথ্যা এ। কিন্তু এ মিথ্যার প্রাসাদ সে নিজে গড়ে নি। গড়ে গেছেন তার স্বর্গগত শ্বশুর। মিথ্যা জেনেও তাই সে ভিত্তিহীন সৌধ ভাঙতে পারে নি মাধবী, ভাঙবার অধিকার ছিল না তার। সেজন্যে ঘরে-বাইরে বহু টিটকিরি ও উপহাস, স্বগতোক্তি ও চাপাহাস্য, বহু প্রচ্ছন্ন ও পরোক্ষ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সইতে হয়েছে তারে। কিন্তু পাছে তার বাপের মতো, দেবতার মতো শ্বশুরের সুনামে এতটুকু দাগ লাগে, পাছে সে আবাল্যের কণামাত্রও তাঁকে স্পর্শ করে—সেই ভয়ে সবকিছুই সহ্য করেছে সে হাসিমুখে ছদ্ম উপেক্ষার বর্মে প্রতিহত করে ফিরিয়ে দিয়েছে বিদ্রূপের নিশিত বাণ।

শুধুই কি গুরুজন বলে সহ্য করেছে এতটা? না, তা নয়। ওঁর কাছে যে মাধবীর অপরিসীম ঋণ। কৃতজ্ঞতার ঋণ। অপরিশোধ্য, অবিস্মরণীয়। তিনি যা করেছেন ওর মুখ চেয়েই করেছেন, আর সেজন্যে তাঁকেও কিছু কম সইতে হয় নি।

দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করেছেন ভদ্রলোক। মাধবী জানে সে সহ্যের পরিমাণ। বুক ভেঙে গেছে, পিষে গুঁড়িয়ে গেছে তাঁর মর্মস্থল মিথ্যার এই জগদ্দল শিলায়—তবু সহ্য করেছেন। করেছেন শুধু মাধবীর মুখ চেয়ে। তিনি যদি এতটা পেরে থাকেন, মাধবী বাইরের লোকের পরোক্ষ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সইতে পারবে না? না, সেটুকুতে তাঁর ঋণ শোধ হয় নি। হয়ত আজ—আজ হল কিছুটা।.....

চোখ চেয়ে মাধবী আর একবার শ্বশুরের ছবির দিকে তাকাল। উঠে কাছে এসে দাঁড়াল আবার।

বাবার মতো শ্বশুর বলে লোকে। কিন্তু গুরুদাস মল্লিক বাবার চেয়েও বেশী ছিলেন। অনেক বেশী আত্মত্যাগ করেছেন পুত্রবধূর মুখ চেয়ে। পক্ষীমাতা যেমন দুই ডানা দিয়ে তার ভীরু দুর্বল শিশুদের ঢেকে আগলে রাখে, তেমনিই রেখেছিলেন চিরকাল। যতটা পেরেছেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ঝড় থেকে ঢেকে রেখেছেন, আত্মীয়দের বসনার বিষ নিজে মাথা পেতে নিয়েছেন।

সেই অপরিশোধ্য ঋণের কি কিছু শোধ হল আজ?

কে জানে, ঋণ শোধ করল, না—কৃতঘ্নতাই প্রকাশ করে এল সে এই মাত্র।

আশান্ত অভৃপ্ত আত্মা ওরই দোষে শেষ শান্তিটুকু থেকেও বঞ্চিত হল না তো? চিরদুঃখী বুভুক্ষু তৃষ্ণার্ত মানুষটা এক ফোঁটা জলের জন্য হাহাকার করে ঘুরে বেড়াচ্ছে না তো?.....

কিছুতেই কেন নিশ্চিন্ত হতে পারছে না মাধবী?

অথচ এই ঘণ্টাখানেক আগে যখন সে রওনা হয়, তখন সিঁড়ির মুখে শাশুড়ী রাজলক্ষ্মীর উদ্বিগ্ন অশ্রুব্যাকুল চেহারাটা দেখে মনে হয়েছিল শ্বশুরের সুস্পষ্ট নির্দেশই দেখতে পেল সে।

প্রায় এক বিঘৎ চওড়া লালপাড় গরদের শাড়ি। পুজো থেকে উঠে এসে রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলেন, সিঁথিতে ও ললাটে সদ্য-সিন্দুর-চিহ্ন, দুই হাতে বেলগাছা চুড়ির প্রান্তে সাদা শাঁখা জ্বলজ্বল করছে। বিশেষ করে সিঁদুর, বেশিরভাগ পাকা, সাদা চুলের মধ্যে ডগডগে লাল সিঁদুরে কী অপরূপই না মানিয়েছে তাঁকে, যেন কোন দেবী এসে দাঁড়িয়েছেন বলে মনে হল. মনে হল সাক্ষাৎ দেব-মাতা অদিতি।

নামতে গিয়ে পা দুটির দিকেও নজর পড়েছিল। সুশুভ্র রক্তাভ দুটি পায়ে অলক্তক-রেখা—কালই সন্ধ্যায় নাপতানী এসে পরিয়ে দিয়ে গেছে বোধহয়।

এর পর আর ইতস্তত করার প্রশ্ন ওঠে নি।

করেও নি সে। ঈশ্বরের নির্দেশ, মৃত শ্বশুরের নির্দেশই যেন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল।

গলিত, স্ফীত, বিকৃত অর্ধভক্ষিত শব দেহটার অনাবৃতকায় গোমেদের আংটিটা দেখেও দেখে নি, স্থির শান্ত অচঞ্চল কণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, 'না, এ আমার শ্বশুরের মৃতদেহ নয়। না, এ আংটিও তাঁর নয়।'

কিন্তু তবু, ফিরে এসে বা ফেরার পথ থেকেই এ একটা কিসের সংশয়, কিসের দ্বিধা তার মনে দেখা দিচ্ছে।

কিছুতেই কেন মনে জোর আনতে পারছে না সে—যেমন তার শ্বশুর পেরেছিলেন।...কে, তিনি কোন অনুশোচনায় কোনদিন দগ্ধ হয়েছিলেন বলে তো মনে হয় নি মাধবীর।...

অকস্মাৎ, যেন দুই চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল তার। তাড়াতাড়ি মুখের মধ্যে আঁচলটা পুরে দিল সে। এ কান্নার এতটুকু শব্দ বাইরে না যায়, কেউ না টের পায় তার এই চোখের জলের কথা।

কোথাও এতটুকু দ্বিধা বা কুণ্ঠা না প্রকাশ পায় তার আচরণে।

বলে দিন বাবা, শুধু একটি বার বলে দিন—আমি ঠিক করেছি কিছু মাত্র অন্যায় করি নি!' চুপি চুপি যেন কার কানে কানে বলে মাধবী।

স্থির হয়ে থাকে ছবি অচঞ্চল থাকে ছবির স্থির দৃষ্টি।

না মেলে উত্তর, না মেলে সান্ত্বনা বা শান্তি।

আবারও বলে মাধবী, তেমনি স্বগতোক্তির মতোই ফিসফিস করে বলে, 'আপনার ঋণই খানিকটা শোধ করার চেষ্টা করেছি বাবা, বলুন—আমাকে ভুল বোঝেন নি তো?'

এইবার, এই প্রথম মনে হ'ল—ছবির স্থির দুটি চোখের অপলক দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ। মনে হল আশীর্বাদেরই ভঙ্গী সেটা, যেমন ভাবে তার দিকে চেয়ে আশীর্বাদ করতেন, তেমনি ভাবেই চাইলেন।

অন্তত মাধবীর তাই মনে হয়।

চোখের ভুল? মায়া? নিজের ইচ্ছাতুর চিন্তা?

এসব কথা ভাবলে তার চলবে না।

গুরুদাস মল্লিক স্বর্গ থেকে প্রসন্ন অন্তরে তাকে আশীর্বাদ করছেন, এটা বিশ্বাস করা মাধবীর একান্ত প্রয়োজন। নইলে—নইলে আজ আর তার আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য পথ থাকে না।

এ মিথ্যার সৌধ বাঁচাতে হতে শুরু করেছে অনেক দিন, অনেক বছর আগে থেকে। আজ তা সমাপ্ত হল বুঝি।

কাল কি সতেরো বছর হবে, কিম্বা আরো বেশী। মাধবী আর হিসেবও রাখে না। হিসেব রাখা ছেড়ে দিয়েছে সে। বড়ই ক্লান্তিকর মনে হয় তার—আর অর্থহীন। কী হবে শুধু কাল সমুদ্রের জল মেপে তার ঢেউ-এর হিসেব রেখে, যখন সে জানে কোনদিনই তার নেয়ে ঐ সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে ফিরবে না।

শুধু এইটে মনে আছে, তার বিয়ের বছর খানেক পরেই ঘটনা সেটা।

হয়ত এক বছর পুরোও হয় নি। কিন্তু সবে হয়েছে।

তার স্বামী অজিতের তখন মাত্র বোধহয় সাতাশ-আটাশ বছর বয়স। ভোরে উঠে ব্যায়াম করা আর তার কিছু পরে গঙ্গায় স্নান করতে যাওয়া তার নিত্য-অভ্যাস ছিল। গঙ্গার কাছেই বাড়ি, হয়ত সেই জন্যই এই অভ্যাসটা গড়ে উঠেছিল। এতে আপত্তিরও

কেউ কোন কারণ পায় নি। বরং স্বাস্থ্যকর অভ্যাস বলে বাহবা দিয়েছে। ভাল সাঁতার জানত অজিত, গঙ্গা পারাপার তার কাছে খেলার মতোই সহজ ছিল। প্রতিদিন সাঁতার কেটে প্রায় একঘণ্টা ধরে স্নান করত সে, তারপর গঙ্গা থেকে ফিরে মোটা জলখাবার খেয়ে কলকাতায় ওদের নিজস্ব অফিসে চলে যেত। সব সেরে ও'টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ত, কোন দিন তার ব্যতিক্রম হয় নি। গুরুদাস-বাবুর এসব ব্যাপারে কতকটা সাহেবী মেজাজ ছিল—ঘড়িধরা কাজ ছেলে অজিতও সেই মেজাজ পেয়েছিল। বেলা একটায় ও'রা দুজনে কোন বিলিতী হোটেলে লাঞ্চ খেতে যেতেন—যতই জরুরী কাজ হাতে থাক আর যতই গণ্য-মান্য লোক এসে পড়ুন—কোনদিনই সেটা দেড়টা হত না।

কিন্তু একদিন হঠাৎ এরই মধ্যে অনিয়ম ঘটে গেল।

আটটা তো নয়ই—নটা-দশটা-এগারোটা বেজে গেল—অজিত স্নান করে ফিরল না।

আগে চাকর গিয়েছিল খোঁজ করতে, তারপর অন্যান্য পরিজন ও কর্মচারী, শেষে গুরুদাসবাবু নিজে গেলেন ছুটে। মুঠো মুঠো টাকা দিলেন মাঝি-মাল্লাদের। দু-তিন শো লোক জলে নামল, বেড়াজালও নামানো হল শেষ পর্যন্ত—কিন্তু কোন ফলই হল না। জীবিত বা মৃত কোন দেহই উঠল না। মানুষটা যেন সম্পূর্ণরূপে উবে গেল এ জগৎ থেকে।

যে ঘাটিয়ালের কাছে জামা-কাপড় রাখত অজিত, সেও সঠিক কিছু বলতে পারল না। স্নানের হাফ-প্যান্ট পরে ঘাটে যেত অজিত, পাণ্ডার কাছে কাচা ধুতি গেঞ্জি রেখে ঘাটে বসে তেল মাখত। সেদিনও কাপড় রেখে তেলের শিশি নিয়ে ঘাটে নেমে গেছে—তার পর কি হয়েছে পাণ্ডা তা জানে না। কতক্ষণ ধরে তেল মেখেছে কখন জলে নেমেছে—বা আদৌ তেল মেখেছে কি জলে নেমেছে কিনা—কিছুই সে জানে না।

দিন তিনেক পরে এই ঘাটের ঠিক ওপারে একটা স্ফীত শবের খবর মিলল। চেনবার কোন উপায় নেই, পচে ফুলে উঠেছে মড়া, মাছে ঠুকরে খেয়ে মাঝে মাঝে গর্ত করে দিয়েছে তার ওপরে। শুধু পরনের খাকি হাফ প্যান্টটা সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নি তখনও, আর আশ্চর্য উপায়ে হাতের আংটিটাও থেকে গিয়েছে।

দামী পোখরাজের আংটি একটা।

এই রকমই এজাহার দিয়েছিলেন এঁরা, বেশ এবং ভুষার। সুতরাং পুলিশ সর্বাগ্রে এঁদেরই খবর দিল। যদি একবার দেখা করে যান—বিশেষ করে অজিত বাবুর স্ত্রী।

পুলিশ আসামাত্র গুরুদাসবাবু চোখ বুজেছিলেন, ওদের বক্তব্য শেষ হতে একেবারে চোখ খুললেন। আর চোখ খুলতেই প্রথম নজর পড়ল ওঁর দিকেই—ব্যাকুল চোখে দাঁড়িয়ে আছে মাধবী, পাংশু বিবর্ণ তার মুখ, থর থর করে কাঁপছে সে,—

সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী পুত্রবধূ তাঁর। অনেক খুঁজে অনেক দেখে লক্ষণ মিলিয়ে নিয়ে এসেছেন। সব দিক দিয়েই মনের মতো, এতবড় সংসারের হাল ধরবার মতো ক্ষমতা লাভ করবে সে—তাতে অন্তত গুরুদাসবাবুর কোন সন্দেহ নেই। রূপে-গুণে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। বিশেষ রূপ, বাংলাদেশে এমন কি তাঁদের ব্রাহ্মণদের ঘরেও দুর্লভ তা উনি জানেন। মাত্র দু-তিন দিনে সেই রূপ আর সেই স্বাস্থ্যের এই হাল হতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টায় যেন আধখানা হয়ে গেছে, সোনার মুখে কে কালি লেপে দিয়েছে।

তবু—তবু তো এখনও আয়তির সমস্ত চিহ্ন বর্তমান। শাঁখা-সিঁদুর, হাত ভর্তি সোনার চুড়ি, বালা—আগুনের মতো লাল রঙের শাড়িটাও। বৈধব্য বেশ ধারণ করলে আরও না জানি কী শ্রীহীন হয়ে পড়ত—

গুরুদাসবাবু একেবারে উঠে দাঁড়ালেন, চলুন, আমিই যাচ্ছি—'

তবুও সসংকোচে একবার বলতে গিয়েছিলেন পুলিশ অফিসারটি, 'ও'র স্ত্রী—'

তাঁকে তাঁর বক্তব্য শেষ করতে না দিয়েই প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে উঠলেন গুরুদাসবাবু, 'জন্মাবধি এই আটাশ বছর আমি দেখছি তাকে, এক দিনের জন্যেও কাছছাড়া করি নি—আমি যদি সনাক্ত করতে না পারি, তার স্ত্রী পারবে? মাত্র বছর খানেক বছর দেড়েকের তো পরিচয় ওদের—তাও দিনের বেলায় আর কতটুকু দেখেছে! চলুন, চলুন—আর দেরি করবেন না।'

যুক্তি অকাট্য, তা পুলিশকেও মানতে হয়েছে।

সঙ্গে যায় নি মাধবী কিন্তু সবই শুনেছে সে।

পল্লবিত রূপেই খবর পেয়েছে।

গুরুদাসবাবু বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে গেছেন সেই গলিত শবটার দিকে। নাকে কাপড় দেন নি, কোন রকম দুর্বলতা প্রকাশ করেন নি, কাছে গিয়ে হেঁট হয়েই দেখেছেন তাকিয়ে। খাকি হাফ প্যান্ট আর হাতের দামী পোখরাজের আংটি দুটোই দেখেছেন বহুক্ষণ ধরে। তারপর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্থির অকম্পিত স্বরে বলেছেন, 'না, এ আমার ছেলে নয়।'

স্তম্ভিত হয়ে গেছে থানাসুদ্ধ সবাই। বর্ণনার সঙ্গে মাল দুটোর এত মিল যে তারা নিশ্চিন্তই ছিল একরকম।

ও-সি তবু মাথা চুলকে বলেছেন, 'প্যান্টটার ধোপার মার্কাটা দেখবেন একবার? খুলে দিতে বলব?'

'না, যা দেখবার আমি দেখে নিয়েছি।'

'কিন্তু আপনার দুজন চাকর বলছিল—আংটিটা নাকি অজিতবাবুরই—তারা ভাল করে দেখেছে—'

'আমার থেকে আমার চাকরদের ওপর যদি বেশী বিশ্বাস থাকে আপনাদের, সে আপনারা বুঝুন। তারা দেখেছে, আমি গড়িয়ে দিয়েছি আংটি তার পৈতের সময়। আমারই বেশী চেনার কথা। যাই হোক—আমি এ শব আমার ছেলের শব বলে য়্যাকসেপ্ট করতে রাজী নই।'

করেনও নি।

বাড়িতে এসে স্ত্রী ও পুত্রবধূকেও সেই কথা বলেছেন।

তিনি ভাল করেই দেখেছেন—ও শব আর যারই হোক, অজিতের নয়।

কিছুদিন পরে আরও রটনা করেছেন—অজিত নাকি ইদানীং গোপনে সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবনী নিয়ে খুব আলোচনা করত, কার কাছে নাকি বলেছিল হিমালয়ে গিয়ে আসল সন্ন্যাসী দেখবার তার খুব ইচ্ছা।.....

কিন্তু মাধবী জানে, সেই প্রথম দিনই বুঝেছিল যে, এ সমস্ত মিথ্যা। শুধু তার মুখের দিকে চেয়ে এতবড় মিথ্যে কথা বলেছেন তার সত্যনিষ্ঠ শ্বশুর, বুকের মধ্যে এতবড় প্রদাহ নিয়ে স্থির শান্ত ভাব বজায় রেখেছেন।

সে জানে—কারণ, বহুদিন আড়াল থেকে বুকফাটা নিঃশব্দ কান্না কাঁদতে দেখেছে সে গুরুদাসবাবুকে। লক্ষ্য করেছে—এর পরই কীভাবে একটু একটু করে শীর্ণ হয়ে বেঁকে পড়েছেন তিনি। দু-তিন বছর পরেই ওঁদের ব্যবসা তুলে বেচে-কিনে ঘরে এসে বসেছেন। যে আশা করে তার ছেলে বেঁচে আছে এবং একদিন ফিরে আসবে সে কখনও চারপুরুষের ব্যবসা এমনভাবে গুটিয়ে ফেলে না।

আরও জানে মাধবী, আরও দেখেছে। ইদানীং নিজের দেরাজের চাবি সদাসর্বদা বয়ে বেড়াতেন গুরুদাসবাবু, এটা তাঁর পক্ষে একটু অস্বাভাবিক আচরণ। তাইতেই সন্দেহ হয়েছিল ওর। এক দিনের এক অতর্কিত বিস্মৃতির সুযোগে গোপনে চাবি খুলে দেখেছিল সে—দেরাজের প্রথম টানাতেই কতকগুলো কাগজপত্রের নীচে একটা পোখরাজের আংটি,

বিবাহের শ্রেষ্ঠ দ্রব্য

আধুনিক রুচিসম্মত—

● গদি ● বালিশ ও তোষক ● লেপ
● মশারি ● ওয়াড় ● বিছানার চাদর
ইত্যাদি ন্যায্য মূল্যে অল্প সময়ে
সরবরাহের একমাত্র প্রতিষ্ঠান

অনন্তচরণ মল্লিক এণ্ড কোং
১৬৭/৪, ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩
ফোন ২৪-৪৩২৮

রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ, সোমবার অর্ধদিবস
আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই

অজিতের আংটি। আংটিটার সঙ্গে একমুঠো শুকনো চামেলি ফুল—অজিতের প্রিয় ফুল।

দেখে আবার নিঃশব্দে দেরাজ বন্ধ করে চাবিটা পূর্ববৎ বাথরুমের কলে ঝুলিয়ে রেখে এসেছে। তারপর সোজাসুজি ডাকহাঁক করে শ্বশুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে চাবির দিকে।

বৈধব্যের এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাবার পর কিছুতেই যেন মাছ-মাংস গলা দিয়ে নামতে চাইত না। একাদশীতে তো নয়ই। কিন্তু তবু মুখ ফুটে একটা কথাও বলতে পারে নি। পারে নি শ্বশুরের জন্যেই। তিনি যে কী সহ্য করছেন পুত্রবধূর মুখ চেয়ে তা সে জানে। তিনি যদি এতটা সইতে পারেন, সে পারবে না? অবশেষে দীক্ষা নিয়ে সে মাছ-মাংস ত্যাগ করার অজুহাত পেয়ে বেঁচে গেছে। বেঁচে গেছেন গুরুদাসবাবুও—ওঁরা সকলে মিলেই নিরামিষ ধরেছেন।

কিন্তু অযুতির অন্য লক্ষণগুলোর কোন-টাই ত্যাগ করতে পারে নি। আর সেজন্য লাঞ্ছনাও বড় কম সইতে হয় নি তাকে। বিশেষত অজিতের অন্তর্ধানের বারো বছর পূর্ণ হতে আত্মীয়-স্বজনদের রসনা খরতর হয়ে উঠেছে। বারো বছর স্বামী নিরুদ্দেশ থাকলে, তাঁকে মৃত বলে ধরে নিয়ে স্ত্রীকে বৈধব্য গ্রহণ করতে হয়—এই নাকি নিয়ম। গুরুদাসবাবু মানেন নি সে কথা, বলেছেন, 'আমি জানি খোকন আমার বেঁচে আছে, যদি কোনদিন তার সুমতি হয়, ফিরে আসে—বৌমার শুধু-হাত আর সাদা সিঁথি দেখে শক্-এই মরে যাবে সে। না, ওসব আইন আমি মানি না। মা আমার যেমন আছেন তেমনি থাকবেন।'

অবশ্যই সেসব নিন্দাবাদ অধিকাংশ এসে সোজাসুজি আঘাত করত মাধবীকেই, গুরুদাস-বাবু বেশির ভাগ খবরই পেতেন না, তবে মাধবীও বিচলিত হয় নি। শ্বশুরের শীর্ণ-ক্লিষ্ট বজ্রাহত মুখের দিকে চেয়ে হাসিমুখে সব সহ্য করেছে সে, নিজের উপেক্ষাবোধ ও তাচ্ছিল্যের বর্মে প্রতিহত করেছে সে সব বাক্য-বাণ। সুবিধা এই—বর্মের নীচে দেহের কোমল ত্বকে কালসিটে পড়ল কিনা, অথবা ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে উঠল কিনা—কেউ চোখে দেখতে পায় না। নইলে এ লজ্জা রাখার স্থান পেত না মাধবী।

সুদীর্ঘ কাল চলে গেছে সে ঘটনার পর।

অজিতের স্মৃতি ম্লান হয়ে এসেছে। এখন সবটাই একটা অনুষ্ঠানের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। বৈধব্য গ্রহণ উচিত কি না তাও যেন আর বড় প্রশ্ন নেই মনের মধ্যে।

মোটামুটি একটানা বইছিল জীবনযাত্রা—তারই মধ্যে আবার এই এক প্রচণ্ড আঘাত।

গুরুদাসবাবু শুকিয়ে উঠেছিলেন ঠিকই—কিন্তু ভেঙে পড়েন নি, ঝলসে গিয়েছিলেন—ভস্মাবশেষে পরিণত হন নি। দৈনন্দিন কাজগুলো নিয়মিত করে যাচ্ছিলেন। ব্যতি-ক্রমের মধ্যে—তিনিও ইদানীং গঙ্গাস্নান ধরে ছিলেন। গৃহিণী একা ছাড়তেন না অবশ্য, কাপড়-চোপড় তেলের শিশি ইত্যাদি নিয়ে পুরনো চাকর ঈশ্বর সঙ্গে যেত। সেই তাঁকে তেল মাখাত। সঙ্গে সঙ্গে জলেও নামত।

এইভাবেই চলছে গত চার-পাঁচ বছর। ঈশ্বর বুড়ো হয়ে দেশে চলে যেতে যদুকে এই ভার দিয়েছিল মাধবী। সেও দেড় বছর ধরে প্রত্যহ সঙ্গে যাচ্ছে, যদু সাঁতারও ভাল জানে বলে ওরা আরও নিশ্চিন্ত ছিল।

গত অমাবস্যার দিন হঠাৎ সব গোলমাল হয়ে গেল। আসলে সেদিনটা যে অমাবস্যা তা কেউ জানত না, পরের দিন ভোরবেলা অবধি তিথি আছে বলে উপবাসটা পড়েছে পরের দিন। তাছাড়া—সবটা জড়িয়ে নিয়তিই মানতে হয়, নইলে যদুরই বা গঙ্গার ঘাটে পেঁাছে অমন পেটটা মুচড়ে উঠবে কেন? আর গুরুদাস-বাবু মাত্র পাঁচটা মিনিট অপেক্ষা করার পর অসহিষ্ণু হয়ে জলে নামবেন কেন! ঘাটে যে সে সময় অন্য স্নানার্থী নেই তা লক্ষ্য করেও তো সাবধান হতে পারতেন। বেলা বেশী হয়েছে বলেই বোধহয় জনবিরলতা অত লক্ষ্য করেন নি।

অবশ্য জলে যে তিনি নেমেছেন তা কেউ প্রত্যক্ষ দেখে নি। ঘাট-পাণ্ডাও না, সে তখন পয়সা গুণছিল, তার সারা সকালের উপার্জন। একটু পরেই যদু এসে দেখে যখন প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছে, 'বাবু? ঠাকুর আমাদের বাবু কোথায় গেলেন?' তখন তার চমক ভেঙেছে। ছুটে জলের ধারে এসেছে সেও। কিন্তু তার বেশী কিছু করা যায় নি। তখনই জলের ধার থেকে আবার ছুটে ওপরে চলে যেতে হয়েছে, যদুকেও টানতে টানতে নিয়ে গেছে। কারণ, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পর্বতপ্রমাণ জল এসে পড়েছে। বানের জল।

তারপর অবশ্য জলে নেমেছে তারা। আরও অনেকে নেমেছে। যেসব মাঝি-মাল্লা নৌকো সুরক্ষিত রেখে বাড়ি চলে গিয়েছিল, তারাও অনেকে এসেছে খবর পেয়ে, যথাসাধ্যই করেছে তারা, কিন্তু সেই উত্তাল বিক্ষুব্ধ প্রচণ্ড জলরাশির গর্ভাবর্ত থেকে পারে নি কেউ একটা দুর্বল শীর্ণ জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত দেহকে খুঁজে বার করতে।.....

সে আজ তিন দিনের ঘটনা।

আজ থানা থেকে খবর এসেছে যে, মাইল-দুই দূরে একটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে, খুব সম্ভব জোয়ারে ভেসে এসে চড়ায় আটকে পড়েছে। ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো কিসে খেয়ে গেছে, দেহে বস্ত্র নেই, তবে বৃদ্ধের মড়া, অনেকটা বড়বাবুর বর্ণনার সঙ্গে মেলে, ডান হাতের অনামিকায় একটা আংটিও আছে, কেউ কি যাবেন এ-বাড়ি থেকে সনাক্ত করতে?

অসহায় বিহ্বল আরক্ত দুটি চোখ মেলে শাশুড়ী তাকিয়েছেন মাধবীর দিকে। মাধবী বলেছে, 'চলুন আমি যাচ্ছি।'

'উনি—?' থানার লোক শাশুড়ির দিকে দেখিয়েছে আঙুল দিয়ে।

'না উনি যেতে পারবেন না। ওঁর শরীর ভাল নেই, শোকে-তাপে জর্জরিত, আর আমি যখন যাচ্ছি—ওঁর দরকার কি?'

সে লোকটি আর কিছু বলে নি।

সিঁড়ি দিয়ে নামার পথে আর একবার শাশুড়ীর মূর্তিটা চোখে পড়েছে মাধবীর। সৌভাগ্যবতী আয়ুষ্মতীর বেশে কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে তাঁকে। ঝলমল করছে দেবী-প্রতিমার মতো চেহারা। দেখলেই মা বলতে ইচ্ছা করে, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মতো রূপ তাঁর।

শ্বশুরের বড় প্রিয় ছিল এই চওড়া লাল-পাড় শাড়িটা।

কতবার বলেছেন, মাধবী নিজে কানে শুনেছে, 'তোমার পাকা চুলের সঙ্গে আর ঐ পাকা রঙের সঙ্গে এই চওড়া লাল পাড়টা যা খোলে গিন্নী, এমন বোধ হয় বেনারসী শাড়িতেও খুলত না!'

সব কথাগুলো একসঙ্গে মনে পড়ে চোখ ঝাপ্সা করে দিয়েছে ক্ষণকালের জন্য, তবু দৃঢ় পদক্ষেপে আন্দাজে আন্দাজে এগিয়ে গেছে সে গাড়ির দিকে। থানায় পেঁাছেও দ্বিধা করে নি। অকম্পিত পায়ে এগিয়ে গেছে লাশ-ঘরের দিকে, ভাল করে তাকিয়ে দেখেছে। তারপর স্থির স্বরে বলেছে, 'না, এ আমার শ্বশুরের শব নয়।'

'নয়?' তারা অবাক হয়ে বলেছে, কিছুটা বিপন্নও, 'ভাল করে দেখেছেন আপনি? আংটিটা?'

'দেখেছি। হ্যাঁ তিনিও গোমেদের আংটি পরতেন বটে, তবে এ সে আংটি নয়।'

'তাহলে, তাহলে কিন্তু এ-লাশ আমাদের মুর্দফরাসের হাতে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকল না।'

'সে আপনাদের যা করবার করবেন বৈকি!'

মাধবী শান্ত পদক্ষেপেই ফিরে এসে নিজের গাড়িতে উঠেছে, কোন দিকে না তাকিয়ে।

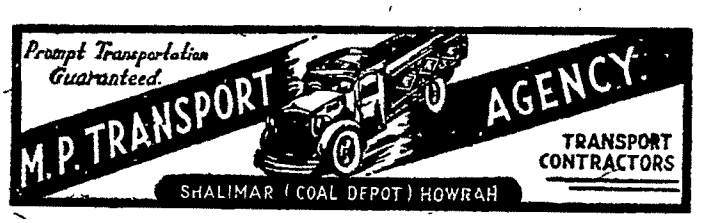

আশা ও প্রেমের কবি দান্তে

জোনী মুখোপাধ্যায়

"আমি, দান্তে আলিঘিরি, জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে আজ আমি র‍্যাভেনায় বাস করছি। জীবনের সুদীর্ঘকাল কেটেছে কত জ্বালা, কত যন্ত্রণায়, ব্যথা ও বেদনার আঘাতে জর্জর, কত কান্না কেঁদেছি। ফ্লোরেন্সের মাটি আমার কাছে ধাত্রীদেবতা, তার সেই স্নেহনীড় থেকে বিচ্যুত হয়ে কত গ্রাম, কত না নগরে ভ্রাম্যমাণ যাযাবরের মত বেড়িয়েছি, আজ অস্তাচলের পানে এসে প্রতীক্ষায় বসে আছি; কবে কোন্ শুভ মুহূর্তে যে শেষের সেই-পরম প্রশান্তি লাভ করে ধন্য হব, পাতালকন্যা স্নিগ্ধস্রোতার পুণ্য সলিলে, কোন বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে চালিত করছে।—"

দান্তের ভিতা নুওভা নামক আত্মকথন-মূলক গ্রন্থ থেকে এই কয়েকটি লাইন উধৃতি দান করা হল। আলিঘিরি ডুবান্টে—এ এক আশ্চর্য নাম। সাতশত বছরের ব্যবধানেও এই নামের অমর মহিমা আজো অম্লান।

পৃথিবীর সমস্ত কবির খ্যাতি ছাড়িয়ে দান্তের কবিখ্যাতি, তার কারণ নরকের যে বীভৎস রূপ তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, যেখানে আশার উদ্ভব সেইখানে প্রবেশ করে কবি স্বর্গরাজ্যে উপস্থিত হয়ে জ্যোতির্ময় আলোকে অভিষিক্ত হন।

দান্তে—তাঁর দুটি নাম দান্তে আর ডুরান্টে—অর্থাৎ সহিষ্ণু এবং মহিমামণ্ডিত। ১২৬৫ খৃস্টাব্দের মে মাসে ফ্লোরেন্সের যে পরিবারে জন্মগ্রহণ তা মাঝারি ধরণের সম্ভ্রান্ত সমাজভুক্ত। তাঁর ডিভাইন কমেডি গ্রন্থে একথার উল্লেখ আছে। তাঁর বৃদ্ধ-প্রপিতামহ কাচ্চা গুইদাকে সম্রাট তৃতীয় কনরাদ নাইট উপাধিতে সম্মানিত করেন একথা দান্তের 'পারাদিসো' কাব্যগ্রন্থে বলা আছে। পাড়ুয়া, বোলোনা এবং সম্ভবতঃ প্যারিসে তিনি পড়াশোনা করেন এবং কালক্রমে একজন যোগ্য সরকারী কর্মচারী এবং কূটনীতিবিদে পরিণত হলেন। দান্তে কিন্তু ভুল করেছিলেন, অর্থাৎ সেই কালের উদ্দাম এবং উন্মত্ত রাজনীতির যুগে তিনি দুর্বল দলটিতে যোগ দিয়েছিলেন। ফলে সাতাশ বছর বয়সেই নির্বাসিত হয়ে আর কোনোদিন স্বদেশে ফিরতে পারেন নি, ১৩২১ খৃস্টাব্দে দান্তের মৃত্যু হয়।

১২৯৩ খৃস্টাব্দে ফ্লোরেন্সে একটা নতুন আইন প্রণয়ন করা হল, এই আইন অনুসারে যারা কোনো শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তারাই শুধু রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। দান্তে এই নতুন আইন সমর্থন করলেন, এতদ্বারা সম্ভ্রান্ত সমাজের প্রতিপত্তি হ্রাস পেল।

পরে অবশ্য এই আইন কিঞ্চিৎ শিথিল করা হয়, তার ফলে শিল্পগোষ্ঠীর মধ্যে কারো নাম থাকলে তিনিও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। দান্তেরও এইবার একটা সুযোগ এল, এতদিন অভিজাত গোষ্ঠীভুক্ত বলে তিনিও অযোগ্য ছিলেন, এইবার চিকিৎসক এবং ঔষধ ব্যবসায়ীদের দলে নাম লেখালেন। এই দলে যোগ দেওয়ার ফলেই দান্তে অনেক সরকারি কাজকর্ম করার সুবিধা পেয়েছিলেন, পৌর সমিতিতে তিনি অনেকবার নির্বাচিত হয়েছিলেন। যে গুয়েলফো দলের সদস্য ছিলেন দান্তে সেই দলেই ভাঙন ধরলো, ফলে রিয়ানকি এবং নেরি অর্থাৎ যথাক্রমে শাদা এবং কালো নামে দুটি দল হল। ফ্লোরেন্সে ভীষণ রাজনৈতিক কলহ সুরু হল। এই দলাদলির সুযোগ নিয়ে পোপ এগিয়ে এলেন ফ্লোরেন্সকে অধিকার করতে, পোপ ফ্রান্সের তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠীর সাহায্যে ফ্লোরেন্স আক্রমণ করবেন স্থির করলেন, এই সঙ্কটময় মুহূর্তে ফ্লোরেন্সের পক্ষ থেকে তিনজন পোপের কাছে একটা ডেপুটেশন গেলেন, তার মধ্যে ছিলেন দান্তে। ফ্লোরেন্সের সেই প্রতিনিধিদলের আর দুজনকে ছেড়ে দিয়ে পোপ এই সুযোগে দান্তেকে আটক করলেন, ফ্লোরেন্স অধিকৃত হল। কালা দল শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে চিরদিনের মত দান্তেকে নির্বাসিত করলেন।

দান্তের বিবাহ হয়েছিল গেমা দোনাটির সঙ্গে, এই বিবাহের ফলে সন্তান জন্মায়, কিন্তু দান্তের সাহিত্যসম্ভারে কোথাও তাদের উল্লেখ নেই। নির্বাচনকালে দান্তে গেনটুচা নামে একটি মহিলার প্রেমে পড়েন এবং অনুমান করা যায় অন্ততঃ আরো একটি প্রণয়লীলায় তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন। এইসব ছোটখাটো জীবনীমূলক তথ্যাদি উপেক্ষণীয় নয়, সমগ্র মানুষটির বিচারে তা প্রয়োজন। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর হল অন্য ঘটনা, যে কাব্য রচনার মূল প্রেরণা হল প্রেম, এবং যে প্রেমের স্পর্শ কবি মাত্র নয় বছর বয়সেই লাভ করেছিলেন, যে আশ্চর্য ঘটনা কবির সমগ্র জীবনকে পরিবর্তিত করেছিল তা চিরন্তন রহস্য। দান্তের সঙ্গে বিয়েত্রিচের প্রথম দর্শনের কথা ভিতা নুওভা'তে কবি এইভাবে বর্ণনা করেছেন—

"এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার পর, বসন্ত সমগ্র বনভূমি, পথ ও প্রান্তর বসন্তের বিচিত্র বর্ণসম্ভারে নবার সাজিয়েছেন, সেইবার আমার জীবনের চিরন্তনী প্রতিমা বিয়েত্রিচে আমার নয়নের গোপন কন্দরে গভীর শান্তির ছায়া মেলে নেমে এল। বিয়েত্রিচের জীবনে তখন বিচিত্রভানু আকাশের অক্ষপথে একই বিন্দুতে আটবার আবর্তিত হয়েছেন।"

বিয়েত্রিচে পোরটিনারি আর দান্তে উভয়ে মিলিত হয়েছিলেন এক উৎসব প্রাঙ্গণে। তখনকার কালে বসন্তের আবির্ভাবে, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব সকলে সমবেত হয়ে উৎসব করতেন, সেই উৎসবে ছোটদের সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া রীতি ছিল। দান্তে তাঁর বাবার সঙ্গে এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন আর এসেছিলেন বিয়েত্রিচে। দান্তে লিখছেন—

"সেদিনকার সেই ছেলেমেয়েদের কোলাহলমুখরিত অঙ্গনে এমন একজন দিব্য কুমারীর আবির্ভাব ঘটেছিল যা এই নরলোকের আঁধার-ঘেরা অস্তিত্বকে ম্লান করে দিল, তখন আমার সব কিছুতেই আশ্চর্য হয়ে যাওয়ার বয়স, কিন্তু মনে হল এ যেন এক স্বর্গলোকবাসিনী কন্যা। সেই পরমক্ষণেই আমি তার কাছে নতিস্বীকার করলাম, তার সার্বভৌম অধিকার মেনে নিয়ে নিজের স্বাধীনতা হারিয়ে তার কাছে সার জীবনের বন্দিত্বের দাসখত লিখে দিলাম।"

সব কিছু বিস্মৃতির গর্ভে লীন হয়ে যায়, ধুয়ে-মুছে যায় জীবনের কত লেনদেন কিন্তু দান্তের কাছে বিয়েত্রিচের এই আবির্ভাব অক্ষয় হয়ে রইল। দান্তে লিখছেন—

"অনেক বছরের বিস্মৃতির ঘন অন্ধকারে সব কিছু মিলিয়ে গেছে, কিন্তু বিয়েত্রিচে এখনও ঠিক সেই দিনের মত আমার স্মৃতির সোপানের কোনো এক স্তরে এক অনির্বাণ আলোকশিখার মত অমলিন দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে আছে।"

বিয়েত্রিচে এসেছিলেন তাঁর পিতা ফোলকো পোরটিনারির হাত ধরে। দান্তের মনে হত তাঁর মানসপটে বিয়েত্রিচে সেইভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। জীবনের এক আলো-আঁধারি রহস্য-পুরীর মায়ামহলে বিয়েত্রিচের সজীব উপস্থিতি।

দান্তে বিয়েত্রিচেকে খুব কমই দেখেছেন, বিয়েত্রিচের বিবাহ হয়েছিল এবং চব্বিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়, তথাপি—

All the strong powers of Dante
were bowed
To a child's mild eyes,
That wrought within to travail
From depths up to skies.

এই বিয়েত্রিচে মহৎ রোমান কবি ভার্জিলকে ঘন অরণ্যে তিনটি অশুভ পশুর হাত থেকে ত্রাণ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। ভার্জিল হলেন মানবিক জ্ঞানের প্রতীক।

ভার্জিল যখন তাঁকে নরক (Hell) থেকে বার করে নিয়ে প্রেতলোকে (Purgator) নিয়ে গেলেন যেখান থেকে আরো ঊর্ধ্বে উত্তরণ সম্ভব নয়, সেইকালে দিব্য-প্রেরণার প্রতীকস্বরূপিণী বিয়েত্রিচে তখন এসে তাঁকে গ্রহণ করলেন এবং দিব্যলোকে (Paradise) তাঁর ভার নিলেন।

অনেক কারণের মধ্যে দুটি প্রধানতম কারণ যার জন্য দান্তের মূল্য সারা পৃথিবীতে আজ অনেক বেশি; বিশেষ করে যাঁরা ইংরাজীভাষী লেখক তাঁদের কাছে, প্রথমতঃ দান্তের সৃষ্টির বিরাটত্ব ইংরেজ বা অন্য যে কোনো আধুনিক প্রতিভা যা সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গে তুলনীয় নয়, দ্বিতীয়তঃ ইংরাজ লেখক সর্বদা যা নয় বা যা হতে চান না, অর্থাৎ সচেতন এবং সংবেদনশীল শিল্পী, দান্তের মধ্যে এই গুণ ছিল। দান্তে তাঁর ১৪,০০০ লাইন কাব্যের এক লাইনও লেখার আগে একটা স্থপতিবিশারদসুলভ পরিকল্পনা প্রসাবিত করেছিলেন। এই পরিকল্পনাটি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করা হয়েছে এবং বহু তথ্যে পরিপূর্ণ করা হয়েছে। দি 'ডিভাইন কমেডি' সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা হিসাব করে রচিত মহাগ্রন্থ।

এইভাবে, দান্তের কাব্যের তিনটি খণ্ড 'ইনফার্ণো' বা নরক, 'পারগেটরী' বা প্রেত-লোক এবং 'প্যারাডাইস' বা দিব্যলোক গঠিত হয়েছে। এই কমেডির তিন রকমের ছন্দ, দৈবীশক্তির প্রতীক। তিনটি Cantiche-র মধ্যে আবার তেত্রিশটি 'Canti' আছে, অর্থাৎ মূল বিভাগেরও তেত্রিশটি উপ-বিভাগ, এর মধ্যে খৃস্টের জীবনের তেত্রিশটি বছরের ইঙ্গিত আছে, আর নিরানব্বইটি ভঙ্গী এবং তৎসহ একটি বাড়তি প্রস্তাবনা সর্গ সংযুক্ত হয়—দশ সংখ্যা সম্পূর্ণ হয়। 'ইনফার্ণো'তে খৃস্টের নাম সোজাসুজি উল্লেখ করা যায় না—পরে যেখানেই সে নাম উল্লিখিত হয়েছে তা শুধু মিলেছে "Christo"—এই কথাটিতেই।

স্বপ্ন সূচনা ম্যানডে-থার্সডে ১৩০০ খৃস্টাব্দে। তখন দান্তের বয়স পঁয়ত্রিশ বছর। তীর্থপথের ধারাবাহিক ক্রমজ্যোতি-র্বিজ্ঞানানুসরী এবং অনুমানে নির্ভুলত্ব বর্তমান। 'কমেডি'র সামগ্রিক বিচার পাঁচটি বিভিন্ন ধারায় করা যায়। আক্ষরিক অর্থে—দান্তে—ফ্লোরেনটাইন। রূপক অর্থে—মানব-জীবনের পার্থিব তীর্থযাত্রা; আর নৈতিক অর্থে — পাপ থেকে পুণ্যে উত্তরণ; ধর্মীয় অর্থে পাপীর ঈশ্বরাভিমুখী হওয়া, আর মরমীবাদের দিক থেকে এর অর্থ হল পাপের অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে গরিমামণ্ডিত ঊর্ধ্বলোকে আত্মার উত্তরণ। প্রতিটি Cánt ca-র শেষ কথা হল তারকা; ইনফার্ণো বা নরকের ভাব থেকে দেখা যাচ্ছে, পারগেটোরিয়ো বা প্রেতলোকে তা সহচর, আর পারাদিসো বা স্বর্গলোকে তা অধিকারে এসেছে।

বলা হয়, যে মানুষ গ্রীক কবি হোমর পড়ে নি, সে সমুদ্র দেখে নি। যে দান্তে পাঠ করে নি, সে কোনোদিন নক্ষত্র দেখে নি, একথা বলা যায়। দান্তের নন্দনতাত্ত্বিক অনুভূতির কথায় আসা যাক, দান্তের মধ্যে রসানুভূতির অভাব আছে এই অভিযোগ, তাঁর তিক্ততা, তাঁর কোমলতা, আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে তাঁর প্রভাব—আর সেই সঙ্গে তাঁর জীবনের সংখ্যাহীন ব্যক্তিগত আনন্দানুভূতি।

দান্তে, ক্যাথলিকবাদের কবি, খৃস্টীয় জগতের জীবন এবং দৃশ্য তিনি পরিবেশন করেছেন; উচ্চাঙ্গের গথিক চিত্রযবনিকার মত দৃশ্যের পর দৃশ্য অব্যাহত ভঙ্গীতে বর্ণিত। গির্জাঘরের দেয়ালের কাঁচের সার্সিতে আঁকা ছবির মত তা ভেসে উঠেছে। যে-সব চরিত্র

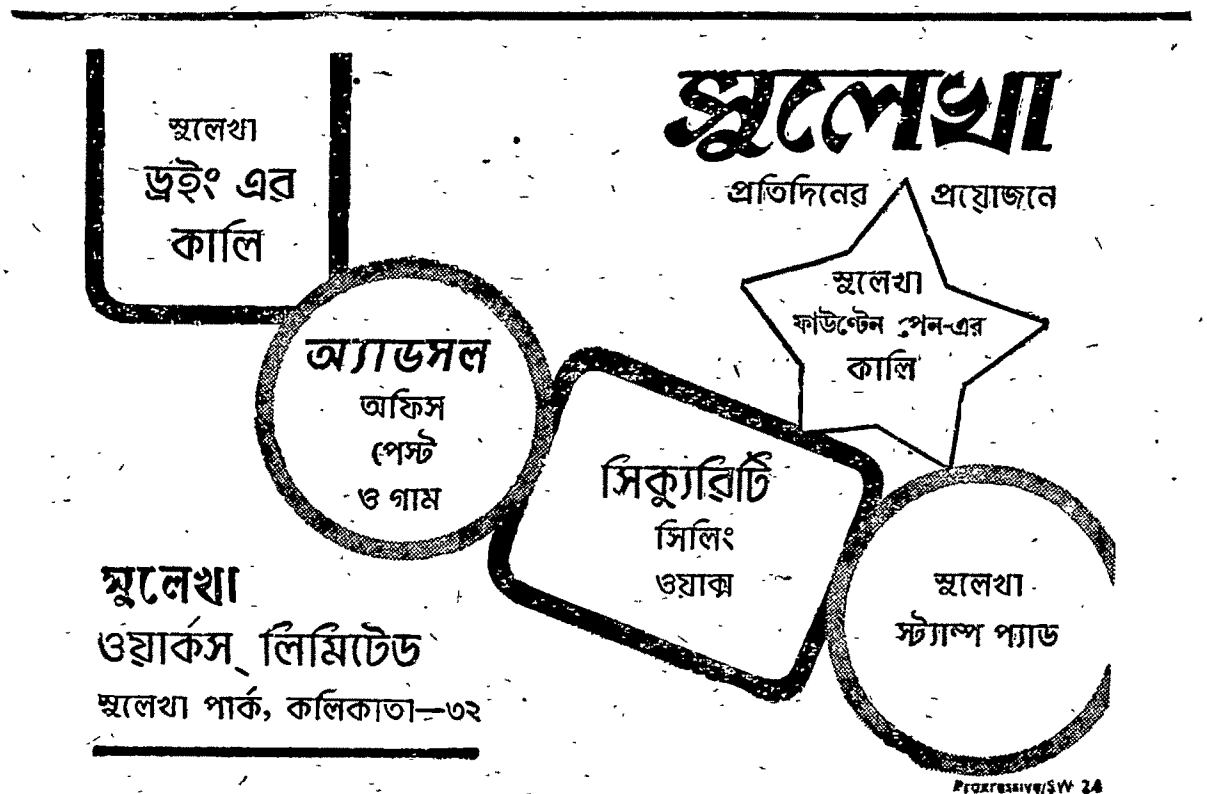

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা আমাদের নিরিখ-গ্রাফিক নয়, তাতে আলোকচিত্রন বা চলচ্চিত্রের ফোকাসে ধরা দৃশ্যও নয়। আদিম ইতালীয় পটভূমির অঙ্কিত ক্ষেত্র, বাইজানটাইন প্রতিমা, গভীরভাবে হৃদয় স্পর্শ করে, কারণ এই পরিকল্পনার মধ্যে একটা চিরন্তনত্ব আছে, উত্তরকালের সকল যুগের কাছে তা স্পষ্ট, পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল হয়ে আছে।

ইতালীয় সমালোচক সাচ্চেত্তি দান্তে সম্পর্কে বলেছেন—'He saw everything.' রঙ সম্পর্কে দান্তে অতিশয় সংবেদনশীল, দান্তের কাছে লাল রঙ অগ্নিশিখার প্রতীক—

Porphyry as flaming red
As blood, that bursts amain
Forth from an open vein.

লাল রঙের স্পষ্টতা দান্তেকে যেন আতঙ্কিত করে রক্তস্রোতের লাল তাঁর মনে শিহরণ জাগায়। কিন্তু লালকেও তরল করা সম্ভব, "... colour less than of roses, and more than of violets."; শেষ পর্যন্ত দান্তে "Sweet colour of oriental sapphire-এ উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। সবুজ রঙের মধ্যে তাঁর অপরূপ অনুভব করেছেন দান্তে, তাই তাঁর কাছে 'মরকত' তেমন সবুজ নয় তাই তাঁর প্রয়োজন 'Fresh emerald at the moment when it is split.'

আর্টের ক্ষেত্রে ফ্যাসনের পরিবর্তন তিনি লক্ষ্য করেছেন, তাই বলছেন—

Nought but a gust of wind
is earthly fame
Which blows from this side
now, and now from that,
And, as it changes quarter,
changes name.

দান্তে একজন সংগীতবিদ, তাই শ্রুতি অতিশয় সূক্ষ্ম—

"What I heard struck my sense exactly in the same way as when they sing to the sound of instruments, and now words are caught, and now lost."

কিন্তু এই অনুভূতির মূল্য আর সব সংগীতবিদের মত তাঁকেও দিতে হয়—'he feels the Joy more acutely and so the pain'—কারণ, তার কাছে একটা সংঘর্ষের শব্দ 'full of terror.

দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র অন্তত পঞ্চাশটি বিভিন্ন রকমের ইংরেজী গদ্য এবং পদ্য অনুবাদ পাওয়া যায়, ইংরেজী ভাষাভাষীরা দান্তেকে ভালোবাসেন, তাই শেলীর কাছে দান্তের কবিতা—'a perpetual hymn of everlasting love." আর রাস্কিন বলেছিলেন—"the central man in all the world as representing in perfect balance the imaginative, moral and intellectual faculties."

কবির জীবনের নিঃসঙ্গতা নিদারুণ হয়ে উঠেছে, অল্প বয়সেই তাঁর পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ হয়, তাঁর আত্মীয়রা অবশ্য তাঁর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের উপযুক্ত শিক্ষা তাঁর হয়েছিল, লাটিন, দর্শন ও বাগ্মিতায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন দান্তে।

দান্তে যে শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা ছিল ক্ষুদ্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সেই সময় এক প্রচণ্ড রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিবর্তনের মুখে দান্তের জন্মভূমিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। যে দুটি দলের কথা আগে বলেছি তার মধ্যে গুয়েলফ্ দলটি পোপের মতানুসারী আর গিবেল্লাইন দল হল রাজকীয় দল। দান্তে ছিলেন গিবেল্লাইন দলে।

ক্যাম্পালডিনা এবং ক্যাপরানাও অঞ্চলে দান্তে গিবেল্লাইন দলভুক্ত সৈনিকের কর্তব্য পালন করেছেন। গিবেল্লাইন দল পরাজিত হওয়ার পর কবি আবার রাজনীতিতে ফিরে এলেন, তাঁর এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা এবং শক্তিলাভই তাঁর পতন এবং নির্বাসনের কারণ।

হুকুম হল যে, দান্তে যদি ফ্লোরেন্সে ফিরে আসেন, তা হলে তাঁকে জীয়ন্ত কবর দেওয়া হবে, তার উপর প্রচুর জরিমানাও ধার্য করা হল। জীবনের শেষ উনিশটি বছর কবি গৃহহীন পথচারী, রক্তের অশ্রুতে দারিদ্র্যের বাসি এবং শুকনো রুটিকে নরম করতে হয়েছে। এতদিন গানে গানে যা শিখিয়েছেন এখন দুঃখের নিবিড় বেদনায় তা নিজে শিখছেন।

মানুষ তাঁকে বঞ্চিত করেছে পারিবারিক আশ্রয়ভূমি থেকে, কিন্তু বিধাতা তাঁকে দিয়েছেন অনন্ত ঐশ্বর্য, মৃত্যুহীন অমর মহিমা, পৃথিবীর আলো যখন অত্যাচারে ম্লান, তখন বিধাতা তাঁকে দিয়েছেন স্বর্গের অনির্বাণ জ্যোতির্ময় আলোকবর্তিকা। সেই আলোয় পথ চিনে চলেছেন কবি। যখন মানুষ দান্তেকে তাঁর স্বভূমি ফ্লোরেন্স থেকে বিতাড়িত করেছে তখন বিধাতা তাঁর স্বর্গরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এই মৃত্যুহীন সংগ্রামী বিপ্লবীকে।

এই নির্বাসনই কবিকে তাঁর সাহিত্যের অমরত্ব দান করেছে। স্বদেশপ্রেমিক কবি অনুতাপ করে বলেছেন যে, আমার এই কবিতা লাতিন ভাষায় লিখিত, হয়ত শুধু শিক্ষিত সাধারণের কাছেই এ পৌঁছাবে তাঁরা ধনী এবং শক্তিমান, কিন্তু দরিদ্রের জন্য সাধারণ শ্রেণীর মানুষের জন্য কিছু দিতে পারলাম না। তাই এমন একটি ভাষার প্রয়োজন যা একেবারে সাধারণ মানুষের মর্মমূলে পৌঁছায়। তাই আঞ্চলিক ভাষার সাহায্যে দান্তে তাঁর মধুর টাসকান ভাষা গড়ে তুললেন।

আলিঘিরি দান্তে কি জাতীয় মানুষ ছিলেন এই প্রশ্ন অনেক পুরাতন। পিয়াজ্জা সান্টা ক্রোচেতে দান্তের যে প্রস্তরমূর্তি আছে এবং ফ্লোরেন্সের সরকারি ভবনে দেয়ালগাত্রে একজন সমকালীন শিল্পী যে ছবি এঁকেছেন তদ্দ্বারা বোঝা যায় যে, দান্তে এক বিচিত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। তাঁর চোখে স্বপ্নবিলাসীর দৃষ্টি, ওষ্ঠদেশে দৃঢ়তার ছাপ, মুখে এক সুগভীর প্রশান্তি, নাসিকা উদ্যত এবং তীক্ষ্ণ, আর সারা অঙ্গে এক বিরাগতার ছাপ।

সামগ্রিকভাবে এই মূর্তিটি দেখলে মনে হবে এ এক উদ্ধত বিপ্লবীর প্রতীক চিত্র, এই মূর্তি যেন বলতে চায়—

"A reckoning soon,
or a reckoning late,
is a reckoning still,
and a reckoning straight."

তাঁর এই আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব আর এক আত্মার সূচী বলা যায়। এই মানুষটি নরক, প্রেতলোক এবং দেবলোকের কল্পনা করেছেন, এবং তাঁর সেই সুদূরপ্রসারী কল্পনার বলিষ্ঠ প্রকাশ আজ সাত শত বছর ধরে মানুষের মনে বিস্ময় সঞ্চার করে এসেছে।

দান্তের মহাকাব্যে নায়ক নেই, কিন্তু একথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে, এই মহাকাব্যের নায়ক লেখক স্বয়ং।

'ডিভাইন কমেডি'র মধ্যে এক সার্বিক মিছিলের আভাষ পাওয়া যায়। ইতিহাস, দর্শন এবং ধর্মতত্ত্ব তিনটিকে একসঙ্গে মিশিয়ে এইভাবে টাসকান ভাষায় যে মহাকাব্য রচিত হয়েছিল, আজ সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানেও তা অমর হয়ে আছে।

দান্তের নাম আজো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী এবং স্বপ্নবিলাসী কবি হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছে।

শারদীয় অভিনন্দন

কোয়ালিটি ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস

ম্যানুফ্যাকচারার্স এবং ইঞ্জিনীয়ারস

মাকড়দহ রোড, দাশনগর, হাওড়া

সিটি অফিস ফোন : ৩৩-৬৩৪৬

দোসর

(৮৭ পৃষ্ঠার পর)

চিলেকোঠার ঘরটায় পৌঁছতে যেন বয়স পেরিয়ে যাবে মনে হচ্ছিল তার। হাঁফাতে হাঁফাতে যখন পৌঁছে গেল—দেখল সুমতি খাটে শুয়ে আছে চুপচাপ। চুলগুলি এলিয়ে পড়ে আছে কাঁধের দু' পাশে। শোভাপিসি বললেন—খোকা হয়েছে। কিন্তু ওর অবস্থা বড় মন্দের দিকে বাবা। হাসপাতালে ফোন করা হয়েছিল। তার আগেই প্রসব হয়ে গেল। প্রথমবারে এত তাড়াতাড়ি প্রসব হওয়া ভালো লক্ষণ না। তুমি শীগ্‌গির দ্যাখো...

শোভাপিসি ঠিকই ধরেছিলেন। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও কোন ফল হল না।

সুমতি প্রলাপ বকছিল। সেই পাখিটার কথা মৃত্যুর আগে বারংবার সে নাকি বলছিল। তাকে ডাকছিল সে। অবিকল পাখির ভাষায়। টুন্‌-টুন্‌-উ, টুন্‌-টুন্‌-উ...সোনা আমার!

দুপুরবেলাতে সুখময়বাবু ছাদে এসে শুয়েছিলেন। বলছিলেন—ওটা অলৌকিক পাখি। ভগবান পাঠিয়েছিলেন। মেয়েটি বড় পুণ্যবতী ছিল বোঝা যাচ্ছে। গ্রীষ্মের রাতে ফ্যানের হাওয়ার চেয়ে খোলা ছাদ অতীব আরামদায়ক। তাই নিত্যকার মতো আরও অনেকে চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ দেখতে দেখতে আরাম উপভোগ করছিল। এবং তার ফলে প্রমথ বা তার বৌ-র কথা ক্রমশ অপ্রধান হয়ে উঠছিল। তারা কেবল পাখিটার কথাই আলোচনা করছিল। প্রমথর তখনও ফেরার সময় হয় নি। সৎকারসমিতির গাড়িতে চেপে ততক্ষণে অনেকদূরে পৌঁছেছে হয়তো। বাচ্চাটা সম্ভবত হাসপাতালেই রয়েছে। বাঁচবে না এ তো জানা কথা।

সুখময়বাবু বলছিলেন—ছেলেবেলায় পাখিপোষার বড্ড লখ ছিল। এখনও না আছে, তা ঠিক নয়। তবে ভালো লাগে না! একবার রথের মেলায় একটা পাখি দেখেছিলুম। আগাগোড়া সিঁদুরে বর্ণ। একেবারে রক্তজবা বলতে পার। তিরিশ টাকার কম দেবে না। তা নিলুম সেই দামে। তারপর কদিন যেতে না যেতেই বাবা মারা গেলেন। একটু খট্‌কা লাগল। ওই হল কাল। দু' মাস পরে দিদি একপাল কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘরে এল বিধবা হয়ে। ছ' মাস গেলে আমার বড়খোকা...ও এক কারচুপির ব্যাপার।

একটু থেমে ফের বলেছিলেন—টেক্কার হাত থেকে তখন ফুড়ুৎ করে পালিয়ে কলতলায় চৌবাচ্চার কাছে বসেছিল। দেখে সন্দেহ হয়েছিল আমার। তাই তাড়া করেছিলুম। ওর মা বুঝল না—মিছেমিছি আমার শ্রাদ্ধ করে ছাড়ল। কিন্তু যেই দেখেছে, সেই যেন ওটাকে শত্রু ভেবেছে—এ এক মজা। দ্যাখো নি, কী রকম চাউনিতে সব তাকাচ্ছিল। যেন রাক্ষস! কোত্থেকে এল, কোথায় গেল—মাঝখানে খানিক মনকষাকষি রাগারাগি, দুত্তোরি! আশ্চর্য, আমারও কম রাগটা হয়নি। ধরতে পেলে মুণ্ডুটা ছিঁড়েই ফেলতুম হয়তো।.....

সুখময়বাবুর চিৎ হয়ে শোওয়া অভ্যাস। একসময় নাক ডাকছিল তাঁর। তিনি স্বপ্নে কীসব দেখে মধ্যে মধ্যে ফুঁপিয়ে উঠছিলেন। তখন নাকডাকা থেমে যাচ্ছিল। এবং এমনি করে কখন ভোর হয়ে গেছে। সুখময়বাবু যদিও গায়ে রোদ ছ্যাঁকা না দিলে ছাদ থেকে উঠে আসেন না, এই ভেবে আচমকা তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন—হ্যাঁ, সেই পাখিটাই বটে—তাঁর বুকের ওপর বসে যেন মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ডাকছে—চিক্‌-চিক্‌-চিক্‌...টুন্‌-উ-উ! প্রথমে আতঙ্কে তাঁর গলা কাঠ হয়ে গেল। তারপর পরমুহূর্তে অমানুষিক হিংস্রতায় ক্ষেপে উঠে ক্ষিপ্রহাতে পাখিটা তিনি ধরে ফেললেন।

অস্ফুটকণ্ঠে হাঁসফাঁস করছিলেন সুখময়বাবু। উঠে বসে হাতের মুঠোয় নাড়া দিচ্ছিলেন তাকে। প্রবলপরাক্রান্ত এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধে যেন লিপ্ত তিনি। তারপর হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠলেন। হাসির শব্দে অন্যেরাও জেগেছে। উঠে বসে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

সুখময়বাবু বললেন— আরে কী অবাক, এইটে এতক্ষণ বুঝতে পারি নি! ছ্যাঃ!

—কী সুখময়দা? তিনতলার অবনী প্রশ্ন করল।

—আরে এটা যে একটা পোষা পাখি আসলে। তাই মানুষের কাছে কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখছ, কী মজাটা ধরা পড়ে গেল?

উঠে দাঁড়িয়ে পাখিটা দেখতে দেখতে ফের বললেন—নইলে এই রসকষহীন শুকনো মরুভূমিতে আসবে কোন্ দুঃখে? ও ব্যাটা বস্তু গায়েপড়া। ছাড়লেও ছাড়বে না। শূন্য আকাশের বিশাল পটভূমিতে সুখময়বাবু যথার্থ কথাটি বলে নীচের দিকে এগিয়ে গেলেন। হাতের মুঠোয় বিচিত্র রঙের পাখিটা।

Why and Why
Reckoned by
ENGINEERS and CONTRACTORS
COLLIERIES, MILLS & FACTORIES
for
- Promptness
- Correctness
- Accuracy
- Readiness
- Honesty
- Huge Stock
- Various Lines

CHANDI CHARAN NAYAK
(PRIVATE) LTD.
PAINT, ENAMEL, HARDWARE, BUILDING MATERIAL, MINERAL, CHEMICAL AND STORES SUPPLIERS.
124/1, BOWBAZAR St., CALCUTTA-12

গৃহ বিদ্যুৎ রংয়ের একটি প্রতিষ্ঠান
চণ্ডীচরণ নায়ক (প্রাঃ) লিঃ
১২৪/১, বিডনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা - ১২
শাখা:
গণেশ পেন্ট মার্ট
২, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

একটু মেঘ

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

উনি কাল দিল্লী যাবেন। সকাল থেকে এই একটি কথা সুধাকে যেন আচ্ছন্ন করে তুলছিলো। প্রতিটি কাজের ফাঁকে ফাঁকে মনে হচ্ছিলো কথাটা। সংসারটা এমন কিছু বড় নয়। বড় ছেলে বাইরে কাজ করে। ছোট ছেলে সবে কাজে ঢুকেছে। তারপরে একটি মেয়ে। সেও বাইরে বোর্ডিংয়ে থেকে পড়ে। এমন ছিমছাম একটি পরিবার বড় একটা দেখা যায় না। সুধা নিজেও ছিমছাম পরিচ্ছন্ন। বয়েস চল্লিশ পেরিয়ে আরও কিছুটা এগিয়েছে বটে, কিন্তু দেখলে বোঝা যায় না। ছোটখাট মানুষটি, আঁটসাট গড়ন, রক্তাভ মুখখানায় হাসি লেগেই আছে আর সেই হাসিটুকুই প্রতি মুহূর্তে প্রমাণ করছে যে, সুখ আর শান্তি এই দুটি দুর্লভ ভাব যেন অতি সহজে তার জীবনে ছড়িয়ে রয়েছে।

আত্মীয়পড়শীরা তো হামেশাই বলে, স্বামীস্ত্রীর ভেতরে এমন ভালবাসা আমরা দেখিনি।

সুধা উত্তরে হাসে। তপ্ত সোনার মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মুখখানি। বড় বড় চোখদুটোয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রশান্তি আর তৃপ্তি। সত্যি প্রশংসা শুনলে মানুষ বিনয়ে একটু লজ্জা পায়, তবু মনে মনে জানে কথাটা মিথ্যে নয়।

মিথ্যে তো নয়ই। নরেন চাটুজ্যের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তার আজ বাইশ বছরের ওপর। ওর বয়েসের সঙ্গে নরেন চাটুজ্যের বয়সের তফাৎটা একটু বেশী ছিল ঠিকই, কিন্তু তাই বলে আজ পর্যন্ত একটা দিনের জন্যেও তাদের ভেতরে কোনও মালিন্য বিরোধ এসেছিলো বলে তার মনে পড়ে না। একে ভালবাসা বলে কিনা সুধা জানে না; তবে এই নির্বিরোধ নিটোল জীবনটা যে বহু ক্ষেত্রে দুর্লভ এটা সে নিজেও জানে। আর তাদের দৈনন্দিন নির্বিরোধ জীবনের যবনিকাটাই যে ছেলেমেয়েদের ভেতরে সংসারের ভেতরে একটা অসামান্য তৃপ্তি এনে দিয়েছে, এটাও সে অস্বীকার করতে পারে না।

এর জন্য সবটুকু প্রশংসা তার একার প্রাপ্য নয়। শান্ত স্বল্পভাষী ওই মানুষটিরও প্রাপ্য।

নরেন যেমন তার কোন কাজে কোন কথায় কখনো বিচলিত হয়নি, উত্তপ্ত হয়নি সেও তেমনি মনের স্বাভাবিক শান্ত ভাবটিকে সব সময় বজায় রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে।

এটা কি তবে দুজনের দুজনকে মানিয়ে নেবার বা মেনে নেবার আন্তরিক একটা চেষ্টা মাত্র? কে জানে এর নাম ভালবাসা কিনা? এত বেশী ভাববার প্রয়োজনটাই বা কি?

বিকেলের জলখাবার গুছিয়ে রাখতে রাখতে সুধা আবার ভাবে কাল উনি দিল্লী যাবেন। ওঁর অফিসের মাল আমদানীর ব্যাপারে কি একটা গোলমাল হয়েছে। দিল্লীর উদ্যোগভবনে সরকারী দপ্তরে গিয়ে একটু তদ্বির করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ওঁকেই যেতে হবে।

—অন্য কাউকে পাঠালে হোত না?—বলেছিলো সুধা। ও জানত, মানুষটির স্বাস্থ্যটা ইদানীং ভাল যাচ্ছে না। মাস চারেক আগে একবার দিল্লী গিয়েছিলেন। আসবার পর থেকে শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না। একটু প্রেসার হয়েছে। যদিও সামান্য তবু বাড়তে কতক্ষণ? তা উনি তো শুনবেন না। ওঁকে যেতেই হবে। কোম্পানীর লোকসানকে উনি নিজের লোকসান বলে মনে করেন। চিরটা কাল দেখছে সুধা সব কাজে ওঁর আন্তরিকতা যেন বড় বেশী।

বিকেলের জলখাবার গুছিয়ে রেখে নিজের খাওয়া সেরে সুধা ওপরে উঠলো। দুপুরে আজ আর বিশ্রাম হবে না। ওঁর সুটকেশ বিছানা সব গুছিয়ে রাখতে হবে।

বাইরে নিয়ে যাবার একটা আলাদা সুটকেশ আছে। গেলবার দিল্লী থেকে আসবার পর সেটা ঝেড়েপুঁছে রাখা হয়নি। অমনি পড়ে রয়েছে খাটের নীচে। আজ ওটাকে বার করে ঝেড়েপুঁছে পোষাক থেকে আরম্ভ করে দাঁড় মাজবার ব্রাশটা পর্যন্ত গুছিয়ে রেখে দিতে হবে।

ওপরে এসে ঘরের মেজের বসে খাটের নীচু থেকে সুটকেশটা টেনে বার করলো। ঢাকাটা খুলে ফেললো। কাপড়ের ঢাকা কেচে দিতে পারলে ভাল হোত। যাক, আর কাচবার সময় নেই। ভাল করে ঝেড়ে দিলেই হবে। যাবেন তো দিন পাঁচ-ছয়ের জন্যে। ওবারে ফিরে এলে ঢাকাটা কেচে দেবে।

সুটকেশটা খুলে ফেললো সুধা। দামোর কাণ্ড। এর ভেতরে আবার দু-তিনখানা ছোট ফাইল খুচরো কাগজ-পত্র রেখে দিয়েছে। এগুলো নিশ্চয়ই তেমন জরুরী নয়। তা যদি হোত, তবে এ্যাম্বিন অফিসে নিয়ে যেতেন। এখানে এই চারমাস বন্ধ পড়ে থাকত না।

গেলবার দিল্লী থেকে এসে সেই যে কাগজ-পত্রগুলো ফেলে রেখেছে নিয়েও যায় নি।

এগুলো আলাদা করে তাকের ওপর রেখে দেওয়া যাক। যদি দরকারী হয়, পরে আবার ভরে দিলেই হবে।

কাগজ পত্রগুলো বার করলো টেনে। সবই অফিসের কাগজ। ফাইল তিনটে বার করে ঝাড়তেই একটা ফাইলের ভেতর থেকে টুক করে একটা ছোট্ট ফটো মেজের ওপর পড়লো।

চোখ পড়তেই সুধা দেখল একটি মেয়ের ফটো। পা ছড়িয়ে বসে ফাইল হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ফটোটার দিকে। একটি মেয়ের ফটো। দেখে বয়েসটা বেশ কম মনে হয়। বড় জোর বাইশ-চব্বিশ। একটু লম্বা ধাঁচের মুখ। তবতবে নাকের নীচে ঠোঁটদুটি একটু চাপা। থুতনীটি বেশ সুন্দর।

না, দেখে মনে হচ্ছে বিয়ে হয় নি। বিয়ে হলে মেয়েদের মুখচোখের আদল কিছুটা পালটে যায়। চাউনীটা অন্যরকম হয়। না, বিয়ে হয় নি মেয়েটির।

ফাইলটা মেজের ওপর রেখে পা গুটিয়ে বসে ফটোটি হাতে তুলে নিলো সুধা। বড় বড় চোখদুটো কৌতুকে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি ফুটে উঠেছে। মেয়েটি কে? ভারী সুন্দর মেয়েটি তো? উনি কি তবে কোথাও দত্তক কন্যা নিলেন নাকি? হতে পারে হয়তো উনি কোন একটি অনাথা মেয়েকে স্নেহ করেন। তাকে পড়ার খরচ দেন। টাকা পাঠান। সাহায্য করেন। এমন কিছু কিছু সাহায্য তো ওঁর কাছ থেকে অনেক ছাত্রছাত্রী পেয়ে থাকে। কেউ বিপদে পড়ে এসে সাহায্য চাইলে উনি না বলতে পারেন না।

মেয়েটিকে দেখলে কিন্তু আপনাআপনি একটা স্নেহ মনে জাগে। মুখখানি কারুণ্যে ভরা, চোখদুটি ভাসা-ভাসা কিছুটা বিষণ্ণ। ঠোঁটদুটি চাপা, হাসির লেশমাত্র নেই, যেন কোন একটি যন্ত্রণা সবসময় স্বাভাবিকভাবে চাপা অভ্যাস করতে হয়েছে। ছবিটি দেখলেই মায়া লাগে।

তার নিজের মেয়ের চেয়ে বড় জোর বছর চারেক-পাঁচেক বড় হবে। বেশ দেখতে কিন্তু মেয়েটি।

ফটোখানা এমন করে রাখবার কি দরকার ছিল। তাহলে বললেই তো হোত। সে কি আর অপত্যস্নেহে কোন ব্যাপ্তি করতে?

ও হরি। এইবারে সে বুঝতে পেরেছে। উনি বোধহয় ভেতর ভেতর বড় ছেলের বিয়ে দেবার মতলব করছেন। হয়তো বেউ বিয়ের সম্বন্ধ পেড়ে কন্যার ফটো পাঠিয়েছে। ওনার হয়তো পছন্দ হয় নি। ফেলে রেখে দিয়েছেন।

তা পছন্দ না হবার কি কারণ আছে! ঘরের বৌ হিসেবে মোটেই বেমানান হবে না। বরং এমনি শান্ত গম্ভীর মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে পারলে-সংসার সুখের হবে।

নিজে নিজে নাচক না করে তাকে একবার দেখালেই হোত। বোধহয় ভয়ে দেখায় নি। পাছে তার পছন্দ হয়ে যায়।

অত খোঁজাখুঁজি করলে কি আর ছেলের বিয়ে দেয়া যায়? ভালকাটা পরী খুঁজে পেতে শেষ অবধি হয়তো একটি কুচ্ছিৎ বৌ ঘরে আনতে হবে।

সুধার মুখের ক্ষীণ হাসিটা কৌতুকে ভরে উঠলো। ফটোটা নিয়ে নিজের হাত-ব্যাগে রেখে জিনিসপত্তর গোছানোর মন দিলো। সব গোছান হোল না। সুটকেশে পোষাক গুছিয়ে রাখতে রাখতে শরীরটা কেমন অবসন্ন মনে হোল। দু'বার হাই তুলে ঘাড়ের ওপরের খোঁপাটা তুলে আঁচল দিয়ে ঘাম মুছলো। বড় গরম পড়েছে আজ। ঘুম ঘুম পাচ্ছে।

এই গরমে দিল্লী গিয়ে ওনার শরীরটা আবার খারাপ না হয়।

মেজের ওপর গা এলিয়ে শুয়ে পড়লো সুধা।

একটু সময় বিশ্রাম করতে না করতে বিকেল চারটে। এখনি ঝি এসে পড়বে রাঁধুনীকে ওবেলার রান্নার ব্যবস্থাটা বুঝিয়ে দিতে হবে। ছোট ছেলে এসে পড়বে। তার কিছুক্ষণ পরে উনি আসবেন। তখন চা-খাবারের পালা।

উঠে পড়লো সুধা। অনেক কাজ রয়েছে। কাজগুলো সেরে সন্ধ্যের পরে বিছানা আর টুকিটাকি জিনিস সব গুছিয়ে দিতে হবে। ওনার সামনে বসে গুছিয়ে দেয়াই ভাল।

বিদেশে বিভুঁয়ে একটি কোন ছোট জিনিস ভুল করে না নিলে বড় অসুবিধা হয়।

স্থির হয়ে বসে ভেবেচিন্তে সব গুছিয়ে দিতে হবে।

নীচে নেমে বাঁধুনী ঝিয়ের সঙ্গে কথায় বার্তায় কয়ে সময় কাটলো। ছোট ছেলে এলো। তাকে জলখাবার দিয়ে আবার রান্নার দিকে এলো সুধা। ছেলে চা-জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে গেলো। পাঁচটা বাজলো। ছটা বাজলো। প্রায় পৌনে সাতটা নাগাদ উনি এলেন। লম্বা মস্ত চেহারার স্বভাবগম্ভীর মানুষ। মাথার টাকের ওপর কাঁচাপাকা চুল। বাড়ি ঢুকে প্রথম কিছুক্ষণ কারো সঙ্গে কোন কথাই বলেন না। ওপরে গটগট উঠে যান। পোষাক-আষাক ছেড়ে ইজিচেয়ারে বসে। চাকরকে ফ্যানের স্পীড বাড়িয়ে দিতে বলে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার পর চা-জলখাবার খাবার পর [illegible] হাত মুখ ধুতে যায়।

আজও তার ব্যতিক্রম হোল না। সুধা চা জলখাবার ইজিচেয়ারের পাশে একটা টিপয়ে রেখে একটা বেতের মোড়া টেনে নিয়ে পাশে বসলো। সুধা চেয়ারে বসতে ভালবাসে না। গোটা তিনেক মোড়া আছে ওর বসবার জন্যে। মোড়ায় বসে ও অনেক আরাম পায়। নরেন চাটুজ্যে বাথরুম থেকে বেরিয়ে তোয়ালে দিয়ে হাত-মুখ মুছতে মুছতে সুধার দিকে তাকালো। কথা বললো না। হাসলো না। অকারণে কথা বলা হাসা ওর স্বভাববিরুদ্ধ, যেটা সুধার স্বভাবসিদ্ধ।

সুধা হাসলো। নরেন চাটুজ্যে এসে আবার ইজিচেয়ারে বসলো।

—সব গুছিয়ে রেখেছ?

সুধা হেসে বললো—সব গোছান হয় নি। তোমার ফাইল কাগজ-পত্তর কি কিছু যাবে?

একখানা লুচি মুখে পুরে নরেন বললে, হুঁ। বেশী নয়। যা আছে ওই একটি ফাইলেই আছে। ওই যে এনেছি।

টেবিলের ওপর একটা ফাইল পড়ে রয়েছে দেখতে পেলো সুধা। অফিস থেকে নিয়ে এসেছেন।

আস্তে আস্তে বললো—তোমার সুটকেসের ভেতরে যে ফাইল কাগজ-পত্তর ছিলো?

—ওগুলো যাবে না। বাজে কাগজ।

সুধা মুখ টিপে হেসে বললো,—সব বাজে নয়। একটি জিনিস ছিল সেটা বাজে নয়।

নরেন শেষ লুচিখানা মুখে পুরে সুধার দিকে তাকালো। ভুরুদুটো ওর আপনা আপনি কুঁচকে উঠলো। লুচিটা ধীরে ধীরে গলা দিয়ে নামিয়ে চায়ের কাপটা তুলে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেলো। আর একবার চায়ে চুমুক দিয়ে একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে বললে,—কি ছিলো? মনে করতে পারছি না।

সুধার চোখে-মুখে কৌতুক।—ভাল করে মনে করে দেখো।

নরেন গম্ভীর হয়ে উঠলো। ইচ্ছে করে একটু সময় নিয়ে চা শেষ করলো। চোখে-মুখে গাম্ভীর্যটা কঠিন হয়ে উঠলো। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে ভারী গলায় বললো,—টেবিল-থেকে ওই ম্যাগাজিনগুলো দেবে?

সুধা জানে, এর পর নরেন ইংরেজী ম্যাগাজিনগুলোর পাতা ওল্টাবে, পড়বে আর বিশ্রাম করবে। সুধা নিজের প্রশ্নের কোন জবাব পেলো না। তবু নরেনের কথা অগ্রাহ্য করে নিজের কথার জবাব চাইবার জেদ করলো না। উঠে গিয়ে ম্যাগাজিনগুলো নিয়ে এলো। তাদের ওপর নিজের হাতব্যাগ খুলে ফটোটাও নিয়ে এলো।

ম্যাগাজিনগুলো ইজিচেয়ারের হাতলের ওপর রেখে পাশে দাঁড়িয়ে ফটোটা দু আঙুলে ধরে হাসি চাপতে চাপতে বললে—এটাও সুটকেসে ছিলো।

নরেনের মুখটা সুধার হাতের তলায়

খানিকটা ঢাকা পড়েছিল, ভাল করে দেখতে পেলো না। এটুকু বেশ বোঝা গেল নরেন কথা বলতে একটু সময় নিলো। কয়েক মুহূর্ত আগের গাম্ভীর্য তার তরল হয়ে এলো।

একটু হাসবার চেষ্টা করে বললো,—অঃ এইটা।

—হ্যাঁ, ছেলের বৌ খুঁজছ তা আমাকে লুকিয়ে কেন?

নরেন এবারে চমকে উঠলো,—ছেলের বৌ! তুমি কি ক্ষেপেছ নাকি? এ মেয়েটি মরে গেছে।

সুধার মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেলো। মরে গেছে।

নরেন একটা ম্যাগাজিন হাতে তুলে নিয়ে বললে,—হ্যাঁ, গেলবারে দিল্লীতে গিয়ে শুনলুম মরে গেছে। তখন ওর বয়েস চল্লিশ বিয়াল্লিশ। এটা অনেক আগের ফটো।

আর কোন কথা না বলে ম্যাগাজিনের পাতা খুললো নরেন। সুধা ফটোটা হাতে করে দাঁড়িয়ে রইলো। ফটোটার দিকে আবার ভাল করে তাকাল। চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর বয়েসে মরে গেছে! কি অসুখ হয়েছিলো? কেন মরেছে? তার অনেক আগের ফটো—নরেনের কাছে কেন?

সুধা আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছলো। সুধার নরম শরীর বড় ঘামে। বড় বড় চোখ-দুটোয় একটা অসহায় দৃষ্টি ফুটে উঠলো। নরেন তো আর কিছু বললো না। নীরবে ম্যাগাজিনের একটা লেখা পড়তে শুরু করেছে।

ভাল করে তাকালো নরেনের মুখের দিকে। ওর ভুরু দুটো আবার কুঁচকে উঠেছে কেন? মুখটা বড় বেশী গম্ভীর দেখাচ্ছে। দিল্লীতে থাকতো মেয়েটি। গেলবার দিল্লীতে উনি শুনে-ছেন। মেয়েটি মরে গেছে। উনি তবে নিশ্চয় এদের বাড়ি গিয়েছিলেন? কই ফিরে এসে তাকে তো কিছু বলেন নি? পরিচিত কোন আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে সেখানে দেখা হলে তাকে তো বলবার কথা। তার সঙ্গে গল্প করবার কথা।

ফটোর দিকে বার বার তাকিয়েও সুধা চিনতে পারছে না, মেয়েটি কে? তাদের আত্মীয়-পরিচিতের মধ্যে এমন কোন মেয়ে তো সে কখনো দেখেনি। তবে কি অফিসের কোন বন্ধুর স্ত্রী, অথবা আত্মীয়া? তাদেরও তো সুধা চেনে?

ধীরে ধীরে সুধা টিপয়ের ওপর থেকে প্লেট কাপ ডিশ হাতে তুলে নিলো। মুখটা ওর আবার ঘেমে উঠেছে। এর চেয়ে কথাটা স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করা ভাল।

সোজাসুজি কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলো না। বললো—ফটোটা কি ফেলে দেব?

নরেন হঠাৎ মুখ তুলে তাকালো,—না, না, ওটা রেখে দাও। ভদ্রলোকটাকে বড় করে পাঠিয়ে দিতে হবে।

—কেন?

—ওর স্বামী বলছিল, কলকাতা থেকে ছবিটাকে বড় করে পাঠিয়ে দিতে।

সুধা একবার ভাবলো, বলে, দিল্লীতে কি ফটো এনলার্জ করবার কোন দোকান নেই? কলকাতায় ফটো বড় করবার কি দরকার? কথাটা যেন নিতান্তই কথার কথা মনে হচ্ছে।

—তা বড় করে সঙ্গে নিয়ে গেলেই পারতে!

নরেন তাচ্ছিল্যের স্বরে বললো,—মনে ছিল না। নানা ঝামেলায় কি সব কথা মনে থাকে। বহুকাল আগে আমাদের পাড়ায় থাকত মেয়েটা। হঠাৎ ওর স্বামীর কাছে গেলবারে শুনলাম, মেয়েটি মারা গেছে!

সুধার বুকের ভেতরটা কাঁপছিলো। কাঁপুনিটা গলা পর্যন্ত উঠে এলো। ও বলতে গেলো, কই আমাকে তো বলো নি। কিন্তু বলতে পারলো না।

অনেক চেষ্টা করে সহজ স্বরে বললে,—দিল্লীতে বিয়ে হয়েছিলো বুঝি?

ম্যাগাজিনে চোখ রেখেই নরেন বললে,—হ্যাঁ।

—তুমি কি দিল্লীতে গেলে ওদের বাড়ি যেতে?

যেন বিরক্ত হোল নরেন।—না, না, রাস্তায় দেখা—শোন, আমার পাজামা চারটে দিয়ে দিও নইলে বড় অসুবিধে হয়। আর একটা এ্যান্টিসেপ্টিক লোশন দিয়ে দিও।

সুধা কথা না বলে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নীচে গিয়ে রান্নাঘরে বসে গায়ের আঁচল খুলে কোলের ওপর রাখলো। বড় গরম লাগছে ওর। গৌরবর্ণ মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। গলার ভাছে একটা কাঁপুনীর মত লাগছে। এমন তো তার কখনো হয় নি।

কেন সে নরেনের কথাগুলো অকপটে বিশ্বাস করতে পারছে না? হতেও তো পারে। নিতান্ত ওপর-ওপর পরিচিত কোন মানুষের সঙ্গে তার রাস্তায় দেখা হয়েছিল—যেটা বলবার মত কোন ঘটনাই নয়। পাড়ার কোন ক্ষীণ পরিচিত মেয়ের স্বামী। দুঃখ করে জানিয়েছিলো, তার স্ত্রী মারা গেছে। তারপর হয়তো হাতের ব্যাগ থেকে ফটোটা বার করে তাকে দিয়েছিলো। অনুরোধ করেছিলো ফটোটা বড় করে পাঠিয়ে দিতে। হয়তো ভাল ফটোর দোকান তার চেনা ছিল না। হয়তো ফটোটা বড় করবার মত খরচ করবার অবস্থাও তার ছিল না।

এ মানুষটাকে হয়তো জানত, অমায়িক ভাল মানুষ। এর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু না। কিছুতেই কথাগুলো পুরো-পুরি বিশ্বাস করতে পারছে না সুধা।

দিল্লীর রাস্তায় কেউ ফটো নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না। পাড়ার কোন পরিচিত মেয়ের দিল্লীতে বিয়ে হলে তার স্বামীর সঙ্গে এমন পরিচয় থাকতেই পারে না যে রাস্তায় দেখা-মাত্র তাকে চিনবে। আবার এমন একটা অদ্ভুত অনুরোধ করে বসবে।

নরেনের সব কথার ভেতরেই যেন ফাঁক রয়েছে।

তবে কি পাড়ায় যখন থাকত, তখন মেয়েটির সঙ্গে ওনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল? দিল্লী যতবার গেছে, মেয়েটির সঙ্গে দেখা করেছে, তারপর গেলবারে তার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ফটোটা চেয়ে নিয়ে এসেছে? এখন সুধার কাছে আগাগোড়া মিছে কথা বলছে? ছি, ছি, এ সব কি ভাবছে সুধা!

তেমন গোপন যদি কিছু হোত তবে ফটোখানা ওভাবে ফেলে রাখত না। নিশ্চয় সযত্নে কোথাও লুকিয়ে রাখতো।

সুধার এতটা ভাববার কোন মানে হয় না।

তেষ্টায় গলা শুকিয়ে এসেছে। এক গেলাস জল খেলো সুধা। রাঁধুনীকে বললে এক কাপ চা করে দিতে। শরীরটা বড় দুর্বল মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো।

সন্ধ্যে উতরে গেলো। উঠোনের ওপরে আকাশের দিকে তাকালো সুধা। বড় গুমোট গরম পড়েছে আজ। এমনি চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে আরও অনেকক্ষণ। কিন্তু না, জিনিসপত্র গোছান এখনো বাকী। এবারে ওপরে যেতে হয়।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলো সুধা। ঘরে ঢুকে চেয়ে পড়ল উনি জানালার বাইরে আকাশের দিকে চোখ রেখে বসে আছেন। অকস্মাৎ মনে হোল সুধার—কে জানে দিল্লীর আকাশ আর কলকাতার আকাশ ওর কাছে একাকার হয়ে গেছে।

সুধার মুখখানা সেই মুহূর্তেই কঠিন হয়ে উঠলো। নরেনের দিকে আর তাকালো না, একটা কথাও বললে না। নীরবে জিনিসগুলো গোছাতে লাগল। দু-একটা কথা যা না বললেই নয়, তাই বললো। উত্তরও পেলো তেমনি।

রাত হোল। খাওয়াদাওয়া শেষ হয়ে গেলো।

ইচ্ছে করেই খেতে বসে একটু দেরী করলো সুধা। উনি ততক্ষণে নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়বেন।

সুধা যখন ওপরে উঠে এলো, তখন রাত্রি নিঝুম।

পা টিপে টিপে ওপরে উঠে এলো। কে জানে কেন আজ ও চোরের মত ওপরে উঠছে। কেন ওর ভয় হচ্ছে এতো? ও যেন কিছুতেই চাইছে না যে নরেন জেগে থাকে।

দুটো খাটে দুজন শোয়। তবু নরেনের কাছে একা একা এই নির্জন রাত্রে ও থাকতে চাইছে না। অন্তত নরেন যেন না জানে ও পাশের খাটে শুয়ে আছে।

ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো সুধা। শুয়ে পড়বার পরে কেন যেন ওর মনে হোল ওর কাছাকাছি কেউ নেই। ও অন্ধকার শূন্যে শুয়ে রয়েছে। সব সময় পড়ে যাবার ভয়।

(শেষাংশ ১৩৪ পৃষ্ঠায়)

বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ

সবার রঙে
রং
মেশান...

এবং আপনার
নিজস্ব অত্যাশ্চর্য্য
নূতন সৌন্দর্য্যজগত
সৃষ্টি করুন

আফগান স্নো

সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক

ই, এস, পাটানওয়ালা, বম্বে-৭৭

সোনালী দিনের মন

(১২১ পৃষ্ঠার পর)

অনুভব করে। খাটের ধারে এসে বাজুটা ধরে দাঁড়িয়ে হাসির গলায় বলে, 'তা জায়গাটা কোথায় বলবে তো? অমন রহস্য হাসি হাসছো কেন?'

সুধানন্দ বলে, 'ব্যাপারটা রহস্যের তাই। আমাদের মুখার্জি? এন মুখার্জি গো, যার কথা—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব মনে আছে, তা' সে কি?'

'হঠাৎ অফিস ভাঙবার সময় এসে বলে বসলো, 'আজ একটু অমাব বাসায় পদধূলি দিতে হবে মিস্টার চৌধুরী—' ব্যাপার কি? বলবে না কিছুতে। অথচ খুব ইনসিস্ট করতে লাগলো। ভাবলাম গিন্নী কিছু নতুন রান্নাবান্না করেছে বোধহয়, খাওয়াবে-টাওয়াবে। গেলামই শেষ অবধি, গিয়ে দেখি এক তাজ্জব কাণ্ড!'

বলে একটু থামে সুধানন্দ:

যেন সেই অজানা তাজ্জবের সরোবরে সাঁতরাতে ছেড়ে দেয় অমলাকে।

অমলা অবশ্য পড়ে পড়ে সাঁতরায় না। বলে, 'কি আবার তাজ্জব? বুড়ো বয়সে খোকাটোকা হয়েছে না কি?'

'আরে না না! আচ্ছা বলব না, অনুমান কর দিকি?'

কাজের মানুষ সুধানন্দ অনেক দিন পরে হঠাৎ যেন ছেলেমানুষ হয়ে পড়ে।

'বেশ আছো! আমি তোমার বন্ধুর বাড়ির ঘটনা অনুমান করবো মানে? বল না শুনি।'

'সে শুনলে হেসেই অস্থির হবে। গিয়ে দেখি ফ্ল্যাটটাকে লাল নীল বাল্‌ব্‌ দিয়ে সাজিয়েছে, টেবিলে রজনীগন্ধার ঝাড়, দেয়ালে দেয়ালে ফুলের কারুকার্য, টেবিলে বেশ একটু ভাল খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন, আর মিসেসটি প্রায় পরী সেজে ঘুরছেন।... ব্যাপার কি? না, ম্যারেজ এ্যানিভার্সারি। এবার সিলভার জুবিলি, ভাই—'

অমলা কিন্তু হেসে অস্থির হয় না।

অমলা একদা ক্লাশ নাইনে উঠেই পড়া ছেড়ে দিয়েছিল বলে যে আধুনিক বিশ্বের কোনো খবর রাখে না তা নয়। বিবাহবার্ষিকী, আর তার 'রৌপ্য, স্বর্ণ এবং হীরক জয়ন্তীর' খবরও জানে, তবে ওদের পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকে নেই ওসব, এই যা।

আজকের এই খবরে তাই হাসল না অমলা, কৌতুক, ঘনানো ঝলমলে চোখে বলে উঠলো, 'ভালই তো! বুড়ো হয়ে যায় নি। চিত্তে রস আছে।'

'তা' বটে!' বলে সুধানন্দ আজকাল যেটা প্রায় ভুলে গেছে, সেইটা করে বসে। হাত বাড়িয়ে অমলাকে কাছে টেনে বেশ ঘনিষ্ঠ করে নিয়ে বেশ একটু আদরই করে ফেলে বলে, 'এসে তো বিরহিণী বিরহিণী লাগছিল, হঠাৎ এত খুসি যে?'

অমলা তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে না, তেমনি ঝলমলে চোখে বলে, 'তখন বিরহিণী ছিলাম, সেটাই দেখাচ্ছিল। এখন তা' দেখাবে কেন?'

'এখনটা কি?'

অমলা মৃদু হেসে বলে, 'সোহাগিনী!'

'হুঁ! পুরনো কথাগুলো দেখছি ভোলা হয় নি! তা' সত্যি বলতে ওদের ওই ঘটা—বুড়ো বয়সের আদিখ্যেতা বলে একটু হাসি পেলেও মন্দ লাগল না। জন্মটা যদি উৎসবের, বিয়েটাই বা উৎসবের নয় কেন? তা' ছাড়া ওদের তো আবার লাভ ম্যারেজ—'

অমলা নিজেকে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে পাশে বসে। পালঙ্কটার উচ্চতার দরুণ পা দুটো ওর মাটি থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে ঝুলে থাকে।

এ পালঙ্ক অমলাদের সেই বিয়ের পালঙ্ক। বাড়িতে অনেক আধুনিক আসবাব এসেছে এখন, কিন্তু এটিকে অমলা ত্যাগ করে নি। সে দিব্য উচ্চ মহিমায় ঘরের অর্ধাংশ দখল করে বিরাজমান।

বাবলি সর্বদা বলে 'তোমার ওই অজলময়রা-সোফা ড্রেসিং টেবল-এর সঙ্গে ওই বিশ্রী বেমানান মা! ওটাকে বাতিল করো।'

অমলা বলে, 'না! ও থাক। তোদের ঘরে তো ঢোকাতে যাই নি।'

খাটটায় অমলার অসুবিধে নেই তা' নয়, ছোটখাটো মানুষ সে—উঠতে হলে প্রায় লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে উঠতে হয়, বসলে পা শূন্যে ঝোলে। তবু—

এখনো পা শূন্যে ঝুলছিল। সেই ঝোলানো পা দোলাতে দোলাতে অমলা মিষ্টি হাসি হেসে বলে, 'আমাদের বিয়েটাও লাভ ম্যারেজ।'

সুধানন্দ হেসে ওঠে।

হেসে হেসে বলে, 'তা' বটে। তা' আমাদের কত বছর হল গো? কুড়ি?'

'শোনো কথা!' ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে অমলা, 'কী মেমারি। বাবলির বয়সই কুড়ি হল না? আমাদের বিয়ে এই চব্বিশ চলছে।'

'তাই নাকি? কবে এতদিন হল?'

'হল দিনে দিনে।'

'তা আমাদেরও লাগিয়ে দেওয়া যাক না একটা 'সিলভার জুবিলি?' কৌতুকের হাসি হাসতে থাকে সুধানন্দ।

অমলা সুখের গলায় বলে, 'দেবই তো লাগিয়ে।'

'দেবেই লাগিয়ে?'

—ঘুমুলে?

চমকে উঠলো সুধা। প্রাণপণে নিজেকে সহজ করবার চেষ্টা করে বললো,—না।

—ওই মেয়েটার ব্যাপারে তুমি কিছু মনে করলে নাকি?

অতি সহজে সুধা বললে,—না, না, মনে আবার কি করব।

—আমি ভাবলুম বুঝি—

শেষের দিকের কথা আর শেষ হোল না। একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলবার শব্দ এলো সুধার কানে।

সুধা পাশ ফিরে নিজের হাতদুটো মুঠো করে রইলো কিছুক্ষণ।

মেয়েটা মরে গেছে। এ হয়তো একটা স্বস্তির কথা! কিন্তু সমীরদা তো মরেনি। কিছুদিন আগেও তো সমীরদা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো। মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না বলে দুঃখু জানিয়ে গেল।

সমীরদা কি তার পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি ছোট ফটো তাকে দিতে পারে না? সমীরদা কি মরে যেতে পারে না?

সুধা উপুড় হয়ে চোখমুখ চেপে রইল বালিশে। চোখের জলে বালিশ একটু ভিজলো।

নরেন চাটুজ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে তখন অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

একটি মেয়ে

(১৩২ পৃষ্ঠার পর)

হুঁ' তবে কি তোমরা ওই অফিসের বন্ধুর মত লোক ডেকে পাড়া জানিয়ে? জানবো শুধু তুমি আমি, আর জানবে এই পালঙ্কটা।'

সুধানন্দর মনে আজ হাল্কা হাওয়ার বেশ। বন্ধুর সেই ছেলেমানুষী নতুনত্বে মন ভরা, খিদের সময় ভাল ভাল খাদ্যে পেট ভরা, অন্যদিনের মত আজ সে শ্রান্ত-ক্লান্ত নয়। তাই সেও সুখের গলায় বলে, 'পালঙ্কটাও বুঝি আজকাল বুদ্ধিমান জীব হয়ে উঠেছে?'

'বুদ্ধিমান নয়, হৃদয়বান!' অমলা বলে, 'ওর মন আছে, হৃদয় আছে, আত্মা আছে। ওকে সেদিন আমি ফুল দিয়ে সাজাবো।'

সমাপ্ত

কিছু পাইনি

শক্তিপদ রাজগুরু

অনেকদিন পর দেখা হতেই সমর থমকে দাঁড়াল। এতদূরে, এখানে শমিতাকে দেখবে কল্পনাই করতে পারে নি সে।

—তুমি!

শমিতাও থমকে দাঁড়িয়েছে। ওর চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে বিস্ময় আর হঠাৎ-পাওয়া আনন্দের আভাস, এগিয়ে আসে সমর শমিতার কাছে। চেহারা তেমনি সুন্দরই রয়েছে। চোখে-মুখে তেমনি উজ্জ্বল মদির স্বপ্নের আভাস। সমীর বলে ওঠে।

—হঠাৎ এখানে?

শমিতার হাসিটুকু বদলায় নি। জবাব দেয় শমিতা।

—তীর্থভ্রমণে নিশ্চয়ই নয়। বেড়াতেই এসেছি বলতে পারো।

সমর ওর সঙ্গে আর কাউকে দেখবে আশা করেছিল। কিন্তু আবিষ্কার করে শমিতা একাই এসেছে। সঙ্গে আর কেউ নেই। কি যেন জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও থেমে গেল সমর।

রাজস্থানের একটি অঞ্চল। পার্বত্য পরিবেশ।

আজমীরের চারিদিকে নীল ন্যাড়া পাহাড়-গুলোর কোলে কোলে আগত সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে। আনা সাগরের জলের বিস্তারে বালি-হাঁসের দল ঘুরে বেড়ায়। শ্বেতপাথরের বাঁধানো চত্বরে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। আকাশ-সীমায় নাগ পর্বতশ্রেণীর মাথায় নেমে-আসা আকাশের বুকে দু-একটা সন্ধ্যাতারার ম্লান চাহনি ফুটে উঠেছে।

সুভাষবাগের মেহগিনি গাছের মাথায়, ঝড় তুলেছে বিবাগী কোন হাওয়া।

অনেকদিন পর দেখা হল।

সমরের কথায় শমিতা ওর দিকে চাইল। ওর চোখে কি যেন শূন্য সবহারানোর দৃষ্টি। কি ভাবছে সে। সমরের কথায় বলে ওঠে একটু ভারি গলায়।

—তোমার কথা কিছুদিন থেকে ভাবছিলাম সমর, মনে করেছিলাম চিঠিও দোব। কিন্তু কি ভাববে—তাই আর চিঠি দেওয়া হয় নি।

—কেন? একটু অবাক হয়ে সমর ওর কথায়।

শমিতা হাসছে, মলিন বিষণ্ণ একটু হাসি। ক্লান্ত কণ্ঠে বলে ওঠে।

—সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না সমর। যাক দেখা হল—ভালই হয়েছে।

দুজনে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে নেমে এল ধাপকাটা সিঁড়ি বেয়ে বাগানের দিকে, বাগান পার হয়ে আবার ধাপে ধাপে উঠে গেছে বিরাট সিঁড়িগুলো ওপাশের রাস্তায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে গাছগুলো জমাট আঁধারে পরিণত হয়েছে। সমরই জিজ্ঞাসা করে।

—শ্যামলবাবুর খবর কি?

হঠাৎ শমিতা একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে। সমর ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। শমিতার সুন্দর মুখে কি বেদনার ছায়া ফুটে উঠেছে। এ প্রসঙ্গ এড়াবার জন্যই জিজ্ঞাসা করে শমিতা

—কোথায় উঠছ?

—বাঙালী ধর্মশালায়। ছুটি পেয়ে গেলাম। বের হয়ে পড়লাম।

ওরা দুজনে উঠে এল উঁচু রাস্তায়। টাঙ্গাওয়ালারা এদিক-ওদিকে দাঁড়িয়েছিল। যাত্রী দেখে এসে ঘেরাও করে।

—স্টেশন?

শমিতা উঠে বসে সমরকে ডাক দেয়।

—কই এসো। ধর্মশালা তো ওইদিকে।

সমর চুপ করে উঠে এল। প্রায় জনহীন পথ দিয়ে টাঙ্গাটি আসছে। ঘোড়ার খুরের একটানা শব্দ ওঠে রাস্তায়। সমর চুপ করে বসে কি ভাবছে।

কলকাতার কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে অতীতের সেই দিনগুলো।

শমিতা তখন আর্ট কলেজের ছাত্রী। ও পড়তো তখন ইউনিভার্সিটিতে। প্রায়ই দেখা হতো। একই পাড়ার ছেলেমেয়ে ওরা।

সন্ধ্যার পর নির্জন দেশবন্ধু পার্কের রেইনট্রি গাছে গাছে আঁধার ঘনতর হয়ে উঠতো, খালের দিক থেকে কোন মাঝির দোতারার সুর জাগে। ওরা দুজনে তখনও বসে থাকতো ঘাসের ওপর।

ক্যানার সবুজ কালো পাতার আড়ালে লাল ফুলের স্তবকগুলো বাতাসে মাথা নাড়তো, ওদের মনেও অমনি কোন নীরব কামনার রঙিন ছবি জাগতো।

—শমি!

শমিতা ডাগর দুচোখ মেলে ওর দিকে চেয়ে থাকতো।

সমর কি একটা স্বপ্ন দেখছে। শমিতার মিষ্টি হাসির সুর ওঠে।

—কি, মাঝে মাঝে কি হয় তোমার?

সমর তৎপ্রতিভের মত জবাব দেয়—পাশ করে কি করবে তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

হাসি থামিয়ে শমিতা বলে—কেন, ছবি আঁকবো।

—নিজের জীবনের দিকে চাইবে না?

সমরের প্রশ্নে জবাব দেয় শমিতা—ও কথাটা এখনও ভেবে দেখি নি। তুমি?

কি যেন আশা ছিল সমরের মনে। বলে ওঠেঃ

—যদি ফার্স্ট ক্লাশ পাই, ভালো কলেজে একটা প্রফেসারী পাবোই। তারপর—

শমিতা বলে ওঠে—রাত হয়েছে। চল ওঠা যাক।

সমরেব কথাটা ও-বেন বন্ধ করে দেয়। কদিন থেকেই সমর দেখেছে শমিতা কেমন আনমনা হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। তার ভাবনার জগৎ ওর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তার অজানতেই।

শমিতার হঠাৎ অনুপস্থিতিতে তাকে একটু বিস্মিত করে তুলেছিল। সেই তেজস্বী সুন্দর মেয়েটিকে অনেক খুঁজেছিল, পড়ায় ট্রামে বাসে পার্কে তাকে দেখে নি। সব মনের কমনীয়তা একটা বেদনা আর হতাশার চাপে কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। লক্ষ্যভ্রষ্টের মত শূন্য মনে ঘুরেছে কেবল সমর।

এমনি দিনে হঠাৎ চিঠিখানা আসে। শমিতার বিয়ের চিঠি।

পাঁটনার কোন এক ডাক্তারের সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে।

সমর অবাক হয়েছিল ওর এই বিয়ের ব্যাপারে।

কদিন পরই তাকে পার্কের ধারে দেখে দাঁড়াল। সমর ভেবেছিল শমিতা ওকে দেখে হয়তো লজ্জাই পাবে, নিজেকে অপরাধী ভেবে একটু কুণ্ঠিতই হবে। কিন্তু মোটেই শমিতা তা হয় নি।

—আসছো তো?

নির্লজ্জের মত বিয়েতে যাবে কি না জিজ্ঞাসা করছে শমিতা। সমর বেদনাহত চাহনি মেলে চেয়ে থাকে। বলে ওঠে শমিতা।

—বলেছিলে না পাশ করে কি করবো?

একটি মনোরম সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে সমরের। সেই তারার আলোভরা সন্ধ্যায় কি একটি স্বপ্ন দেখেছিল সমর ওকে ঘিরে।

আজ শমিতা তার সব কামনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। তাকে চিনতেই চায় নি। রহস্যময়ী ওই নারী। শমিতা বলে চলে।

—আপাতত বিয়েটাই করছি। শ্যামলবাবু, ওই যে ডাক্তার ভদ্রলোক ওর নাকি অনেক টাকা, তাছাড়া খুব সৌখীন। ভাবলাম আঁকতে পারবো নিশ্চিন্তে। তাই মত দিলাম।

সে আজ তিন চার বছর আগেকার কথা।

শমিতাকে তবু ভোলে নি সমর। অলস চিন্তার সময় মাঝে মাঝে মনে পড়েছে তাকে। একটা প্রশ্ন জাগে, শমিতার মত তেজস্বী স্বাধীনচেতা একটি মেয়ে কিভাবে এই বন্ধন সহজে মেনে নিল, জানে না।

কিন্তু আর দেখা পায় নি তার।

হঠাৎ আজ তাকে সুদূর আজমীরে দেখে বিস্মিত হয়েছে।

দুটি মানুষ চলেছে টাঙ্গায়। গতিবেগের দোলানিতে শমিতার দেহের একটু স্পর্শ লাগে ভার দেহে। শমিতার প্রশ্নে মুখ তুলে চাইল সে।

—কি এত ভাবছ?

তার মনে প্রশ্ন একটা নেই। আছে অনেক। সমর বলে ওঠেঃ

—শ্যামলবাবু এলেন না?

শমিতা ওর দিকে চাইল। জনবহুল রাস্তার মধ্য দিয়ে চলেছে টাঙ্গাটা। ওরা তবু দুজনে ওই কর্মব্যস্ততার থেকে কোন নির্জনে সরে গেছে।

বলে ওঠে শমিতা,—তিনি আসবেন না।

—মানে?

—সে অনেক কথা সমর। তবে মনে হয় আজ, ভুল করেছিলাম সেদিন। তার মত তার পথ, তার জীবনযাত্রার পরিবেশকে অনেক চেষ্টা করেও মানিয়ে নিতে পারি নি। জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। সেদিন অন্য পথ নিতে বাধ্য হলাম। জয়পুর আর্ট কলেজের চাকরী নিয়ে সরে এলাম।

সমর রুদ্ধনিশ্বাসে শুনে চলেছে ওর জীবনের বেদনাময় সেই কাহিনী। নীরব সমবেদনায় সারা মন ভরে ওঠে। শমিতা আজ একা, দূর রাজস্থানের এই ঊষর মরু পার্বত্য প্রান্তরে ও-যেন জীবনের সব পানীয় থেকে বঞ্চিত হয়ে নির্বাসিত দিনগুলোকে যাপন করে চলেছে।

শমিতা বলে ওঠে।

—এদিকে আসি নি, কদিনের জন্য তাই বের হয়ে পড়েছি। উঠেছি স্টেশন রিটায়ারিং রুমে। তোমার ধর্মশালা তো ওইদিকে?

টাঙ্গাওয়ালাও চেনে বাঙালী ধর্মশালা, ওকে কেন্দ্র করেই দু-চারজন বাঙালী এদিকে আসেন। ধর্মশালার লাগোয়া সদানন্দবাবুর মিষ্টির দোকান, হোটেল।

সমরই বলে ওঠে।

—কাছেই তো স্টেশন, চল ওখানে বাঙালী ভাত ডাল খেয়ে ফিরে আসবে।

—মাছ মিলবে?

হাসে সমর—সেই স্বভাব এখনও ছাড়তে পার নি?

সদানন্দবাবুর হোটেলের সাইনবোর্ডটা দেখা যায় মিষ্টির দোকান কাম হোটেল। হিন্দীতে বাংলায় সাইনবোর্ড। বাংলা সাইনবোর্ডে লেখা আছে অবশ্য মাছ মাংসের কথা, হিন্দীতে আমিষের ব্যাপার কিছুই নেই।

সদানন্দবাবু বলেন।

—আরে দাদা, ওরা মাছটাছ-এর নাম শুনলে নাক সেঁটকায়, তাই হিন্দুস্থানীতে ওটা বাদ দিইছি।

সমর বলে ওঠেঃ

—একজন অতিথিও আছেন। মাছটাছ-এর ব্যবস্থা।

সদানন্দবাবু ঘাড় নাড়েন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হবে বৈকি। যান ঘরে গিয়ে জিরোন গে—খাবার পাঠাচ্ছি। আর মশায়, আপনার পুরুষ সাবিত্রী ঘুরে আসার ব্যবস্থাও করে দিইছি। কালই চলে যান ভোরে, বেলা বাড়বার আগেই যদি পাহাড়ে উঠতে চান, চেষ্টা করবেন। নইলে আর উঠবেন না।

সদানন্দবাবু এককথায় আজমীর প্রায় তামাম রাজস্থানের বাঙালী সম্প্রদায়ের এনসাইক্লোপিডিয়া।

রাত্রি হয়ে আসে, ধর্মশালার দোতলার একটা ঘরে ওরা খেতে বসেছে। শমিতার মুখে তখনও সেই স্তব্ধতার ছায়া। সমর প্রশ্ন করে—শ্যামলবাবু বাধা দেন নি?

শমিতা ওসব কথা মনে করতে চায় না। সে ঠকেছিল—বাববার চেষ্টা করেছিল শ্যামলের মত উচ্ছৃঙ্খল একটা বেপরোয়া মানুষকে সামলে নিতে নিজের ছবি আঁকার কাজও প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল। মনের মধ্যে একটা স্থায়ী অশান্তি নিয়ে কাজ করা যায় না। রাত্রি নিশীথে তার মদ্যপ কণ্ঠের চীৎকারে বাড়ীর শান্তিভঙ্গ হতো, ওর কণ্ঠস্বর এসে পড়তো যেন শমিতার উপরই চাবুকের মত।

পরে একদিন কথাটা শমিতাও জানতে পারে। শ্যামল কোন নার্সকে ঘিরে নোতুন করে জীবন কাটাতে চায়, সারা-শহরে সেই খবর ছড়িয়ে পড়েছে।

রাত্রির হিমহাওয়া বইছে। দূরে জমাট অন্ধকারে পাহাড়শীর্ষে মন্দিরের একটি প্রদীপশিখার ক্ষীণ আভা উঠছে, তারও মাথায় উঠে গেছে পাহাড়ের উপর তারাবাঈয়ের পরিত্যক্ত গড়। ইতিহাসের বহু বেদনাময় একটি মহাকাল যেন এই রাত্রির অন্ধকারে কি বেদনার আভাসে নৈশপ্রকৃতিকে ভাবিষে তুলেছে; তারই সাথে আজকের ভাগ্যহত একটি নারীর দীর্ঘশ্বাস মিশেছে।

বলে ওঠে শমিতাঃ

—এর পর আর এত অপমান সয়ে ওখানে থাকতে পারি নি সমর।

নিজের পথ নিজেই দেখে নিলাম। কলকাতা ফিরে যেতে সাহস হয় নি, সকলেই হয়তো হাসবে মনে মনে। তাই দূরেই হারিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। মাঝে মাঝে মনে হয় বড় নিঃসঙ্গ—একা।

সমর চেয়ে থাকে ওর দিকে। নিস্তব্ধ শহর। মাঝে মাঝে স্টেশনের দিক থেকে দু-একটা মালগাড়ীর ইঞ্জিনের শব্দ ওঠে। সমর বলে ওঠেঃ

—একাই তো তুমি থাকতে চেয়েছ শমি।

শমিতা একটু চমকে ওঠে। নিজের মনের একটা গোপন বেদনা আর দুর্বলতার খবর জানে সমর। তবু আজ কেমন যেন নির্ভর খোঁজে সে। এতবড় পৃথিবীতে আজ কঠিন একটি মেয়ে—পরাজয়ের অপমানের বেদনায় বিহ্বল হয়ে উঠেছে।

স্বামীর ভালবাসাও পায় নি। একাই নিজের কাজের মধ্যে সৃষ্টির মধ্যে আনন্দ আর তৃপ্তি পেতে চেয়েছে। কিন্তু দেখেছে জীবন-জোড়া হতাশা আর অতৃপ্তি বুকে নিয়ে কোন

সার্থক শিল্পকর্ম করা যায় না। সেখানেও একটা ফাঁক থেকে যায়।

সে ফাঁক জীবনের রূপ বর্ণ রস দিয়ে পূর্ণ করার সাধ্য থেকে সে বঞ্চিত।

দুজনে স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলেছে। শমিতার মনের অতলে নীরব ঝড়ের আক্রমণ, একটা নিঃস্বতার হাহাকার তার মন ভরিয়ে তুলেছে। আজ সমরকে দেখে অতীতের সেই স্বপ্নময় দিনগুলো তার মনে পড়ে—সে-জীবনে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়, শমিতার সারা মন।

কিন্তু ফেরার পথ তার জানা নেই। বার বার তাই মনে হয় সে কোন অসীম শূন্যতার মাঝে হারিয়ে গেছে।

সমর বলে ওঠে।

—কাল ভোরে তাহলে যাচ্ছো পুষ্কর-সাবিত্রী?

স্টেশনের মধ্যে তারা ঢুকেছে। সুদীর্ঘ প্লাটফর্ম, মিটারগেজের লাইন হলেও স্টেশনের আভিজাত্য আছে। এখন অপেক্ষাকৃত নির্জন।

শমিতা বলে ওঠে।

—সাবিত্রী পাহাড়ের নাম শুনেছি।

—কাহিনীটা জানো?

হাসে শমিতা—শুনেছি। পুরুষের সেই একই অত্যাচারের কাহিনী।

—বাগ এখনও রয়েছে?

সমরের প্রশ্নে চমকে উঠে ওর দিকে চাইল শমিতা। অতীতের সেই কাহিনীরই যেন পুনরাবৃত্তি ঘটেছে একালেও। মানুষ এবং দেবতার অন্তরের বেদনা দুঃখ যেন এক-জায়গায় একাত্মীভূত হয়ে গেছে।

প্রজাপতি ব্রহ্মা পুষ্করতীর্থে যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। মুনি-ঋষিরা এসেছেন। সমারোহের সঙ্গে যজ্ঞ হচ্ছে। পূর্ণাহুতি প্রদানের সময় সস্ত্রীক ব্রহ্মাকে উপস্থিত হতে হবে। তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী দেবীকে তৈরী হতে বললেন, কিন্তু কোনও কারণে সাবিত্রী দেবী যথাসময়ে স্বামীর কাছে আসতে পারলেন না, এদিকে যজ্ঞ পণ্ড হবার উপক্রম, তখন ব্রহ্মা তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী দেবীকে পরিত্যাগ করে নোতুন স্ত্রী গ্রহণ করে যজ্ঞ সমাধা করলেন।

শমিতা জিজ্ঞাসা করে।

—আর সাবিত্রী?

—তিনি মনোদুঃখে কোন পাহাড়ে গিয়ে তপস্যারত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেছিলেন।

শমিতা চুপ করে শোনে। তার জীবনের কোথায় একটা বেদনা রয়ে গেছে। শ্যামলের সঙ্গে তার জীবনের সুর মেলাতে পারে নি। তাই হেরে গিয়ে সরে এসেছে সে। সে সংসারে তার ঠাঁই হয় নি।

রাত্রির বিনিদ্র প্রহর কাটে শমিতার কি ভাবনায়।

নিজের জীবনের এই শূন্যতা আর বেদনাটা আজ প্রকট হয়ে উঠেছে। মনে হয় নিজেকে এতদিন ভুলেছিল জয়পুরে, সেইই ছিল ভালো। শূন্য মনে শূন্য হাতে ফিরেই যাবে সে জয়-পুরে। তার কাজের মধ্যে ডুবে যাবে।

অন্যমন ভাবে—সেও বাঁচতে চায়।

সব পেতে চায় তার কাঙাল মন। জীবনের সব দুঃখ বেদনাকে জয় করে তার জীবন আনন্দে পূর্ণ করে নেবে। সাবিত্রীর মত বেদনার অন্ধকারে সে হারিয়ে যাবে না।

কিন্তু তার পথ কোনদিকে—কোথায় তার আলোর সন্ধান জানে না। হু হু বাতাস বয়, মরুভূমির রুক্ষতাভরা রাতের হিমেল হাওয়া ঘুমের আবেশ আনে। কতক্ষণ ঘুমিয়ে-ছিল জানে না।

দরজার কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভাঙে তার। ঘুমচোখে দরজা খুলে দেখে সমর।

—তুমি!

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে।

দুজনে পথ চলার কথা।

—এসো।

সমর তাড়া দেয়—তৈরী হয়ে নাও। রথ প্রস্তুত।

পাহাড়ের মাথায় মাথায় তখনও সকালের ফিকে কুয়াশার আবেশ কাটে নি। ঠাঁই ঠাঁই সাদা আবরণ লেগে আছে নীল পাহাড়ে—ওই আনা সাগরের জলের বিস্তারে। পথটা পাহাড়ের বুক চিরে চলে গেছে। কোন ইতিহাসের যুগের পথ।

আগে বোধ হয় পাকদণ্ডী ছিল, হাঁটা পথে গেছে এখান দিয়ে কোন যুগযুগান্তরের ইতিহাসের চরিত্রগুলো। শাহজাহান বন্দী হয়েছিল এইখানেই, ওই পাহাড়ের কোন গিরি-বর্ত্মে দারাশিকো শেষবারের মত চেষ্টা করে-ছিল লড়াই করতে কিন্তু পরাজিত হয়ে পালিয়েছিল প্রাণ বাঁচাতে পারে নি। তারও আগে এইখানেই কোথাও পৃথ্বিরাজ প্রাণ দিয়েছিলেন।

পাহাড়ের সানুদেশে কিছু মুজ নিম-বাবলার বন, তবেই ছায়ার নীচে দিয়ে সেই মৌনমুক পথটা চলে গেছে, দূরে দেখা যায়

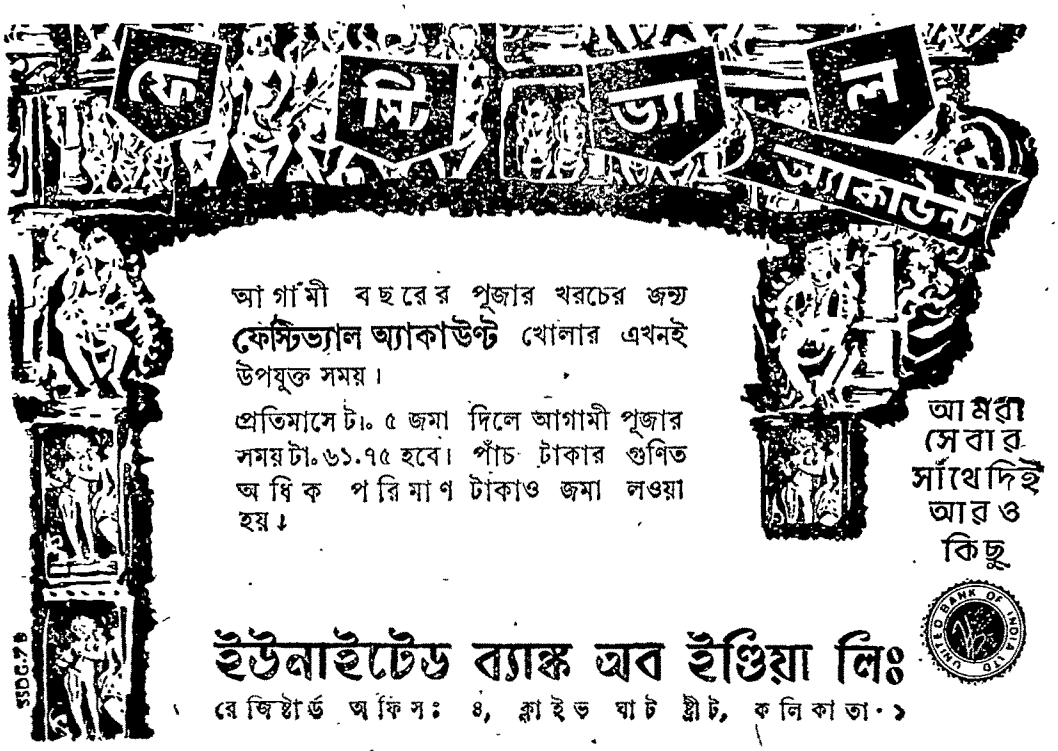

একটা পাহাড়ের মাথায় সাদা একটা বিন্দুর মত মন্দির। সাবিত্রীমন্দির—ও পাশে পুষ্কর-তীর্থের বাড়ীগুলো—নীল জলভরা পুষ্করহ্রদ দেখা যায়।

ড্রাইভার রাস্তা ছেড়ে খানিকটা গিয়ে দাঁড়ায় একটা বটগাছের নীচে। গাড়ী আর যাবে না। হাঁটতে হবে—মরুভূমির মত বেশ খানিকটা বালুময় বিস্তার, তারই একাংশ পার হলে তবে ওই সাবিত্রী পাহাড়ের নীচে পৌঁছানো যাবে।

এরই মধ্যে দু-চার দল তীর্থযাত্রী লোহা-সিন্দুরে ফুল জল নিয়ে পাহাড়ের সরু পথটা বেয়ে উঠে চলেছে। দু-একজন অনেক উপরেই উঠে গেছে।

শমিতা বলে—চল।

সমর এড়াবার চেষ্টা করে, খাড়া একক একটা পাহাড়—ওই পর্বতশ্রেণীর থেকে একটু বিচ্ছিন্ন, ওই চড়াই আর রাস্তার বহর দেখে বলে ওঠে সমর।

—উঠতেই হবে পাহাড়ে?

শমিতার মনে আজ খুশির সুর। চারিদিকে কেমন অবাধ মুক্তির আনন্দ, এদিক-ওদিকে পাহাড়ের রাজ্য। বলে ওঠে

—জীবনের পথ বেয়ে উপরে উঠতে গেলে একটু কষ্ট তো করতেই হবে। চল

বালিতে পা বসে যায়। মিহি বালি—তার সঙ্গে কাঁটাগুল্মও রয়েছে। পায়ে বেঁধে। তার উপর চড়াই। তবু শমিতা কি যেন স্বপ্নের ঘোরে হাল্কা পায়ে এগিয়ে চলেছে। বাতাসে উড়ছে ওর শাড়ীর রঙিন আঁচল।

সুন্দর পুষ্টু দেহে ফুটে উঠেছে লীলায়িত একটি ছন্দ—যার বঞ্চিত নারী কি যেন পরম একটি কামনা নিয়ে দুর্গম জীবনের কোন কামনার পর্বতশীর্ষে যাত্রা করেছে।

দুর্গম পথ, পাহাড়টা যেন বিরাট একটা জানোয়ারের মত শুয়ে আছে আকাশে মাথা তুলে, ওরা তার লেজের দিক থেকে উঠে চলেছে মেরুদণ্ডের রেখা ধরে, দুদিকে গভীর খাদ মাঝে জেগে আছে মাত্র কয়েক হাত চওড়া একটি পথ, দুপাশে নিশ্চিত মৃত্যু যেন ওৎ পেতে আছে, অতল খাদের অন্ধকারে।

শমিতা পাথরের অযত্নরক্ষিত ধাপগুলোয় পা দিয়ে উঠে চলেছে।

সমর চলেছে পিছু পিছু। কি যেন একটা আলেয়ার আলোর সন্ধানে চলেছে শমিতা।

—একটু আস্তে চল।

সমর হাঁপাচ্ছে। খাড়া পাহাড়, মাঝে মাঝে নীচু হয়ে প্রায় হামাগুড়ির কাছ বরাবর ভঙ্গীতে চলতে হয়, তেমনি পিছল আবার পাথরগুলো।

পা হড়কাবার ভয়।

শমিতা বলে ওঠে—দাঁড়িয়ো না, দাঁড়ালেই দম ফুরিয়ে যাবে।

তবু দাঁড়াতে হয়। হিম-হাওয়া বইছে, তবু গরম সারা দেহে ঘাম ঝরায়।

—কিসের জন্য চলেছো উপরে?

শমিতা জবাব দিল না, হাসছে। ক্লান্তিতে ফর্সা রং লালচে হয়ে উঠেছে। তবু সুন্দর দেখায় তাকে। পাহাড়ের মাথার সেই সাদা বিন্দুটা এখন স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে, একটা মন্দির—সাদা রং করা।

ওই পর্বতশীর্ষে সাবিত্রী অতীতের কোন সতযুগে নিজেকে কি বেদনায় নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন। আজও তাই মানুষ তাকে স্মরণ করে—স্মরণাতীত কালের যুগ থেকে এ যুগে আসে তীর্থকামী মানুষ তার কামনা জানাতে।

বুক টেনে তবু চলেছে মানুষ, জীবনের দুস্তর পথের শেষে কি আছে—কি পুণ্য পাবে তাই দেখবার, পাবার অদম্য মানুষ চলেছে প্রাণান্ত পরিশ্রম করে।

শেষের দিকে উচ্চতাটা আরও প্রকট।

সিঁড়ি নেই, পাথরের কঠিন বুকে ঠাঁই ঠাঁই খাঁজ মত করা, পাশে পাশে দু-একটা কাঁটা গাছ না হয় এইটুকু কঠিন বাবলা গাছ, তাই ধরে নামলে নিতে হয়।

দুপাশে তেমনি খাদ, কোথাও বা একটু-আধটু কার্নিশের মত। টিকটিকির ভঙ্গীতে চলেছে সমর—সামনে শমিতা।

তার নিশ্বাসের দ্রুত শব্দটি কানে আসে, সামনেই মন্দিরের চাতাল। উঠে গিয়ে কোন-রকমে বসে পড়ল সমর।

শমিতা মন্দিরের মধ্যে গেছে।

পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গটি কোনরকমে সমতল মত করা, কাঠা দুয়েক জায়গায় উঠেছে মন্দির পাথর দিয়ে কোনরকমে খাড়া করা হয়েছে। শ্রী নেই—সুঠাম কারুকার্য নেই, কালের চিহ্নে সে মহীয়ান।

শমিতা বাইরে এসে দাঁড়াল।

হাড়-হাওয়ায় গতি শীত করে চারিদিকে এর অসীম শূন্যতা—মাথার উপর নিধূম নীল আকাশ। মুক্ত বাতাসে সব ক্লান্তি মুছে গেছে।

শমিতার দিকে চাইল সমর।

—তারপর! এতদূর তো উঠে এলে আকাশে?

শমিতা চারিদিকে চেয়ে দেখেছে, খাড়া পাহাড়ের আশপাশে অনেকগুলো পাহাড়—একটার পর একটা চলে গেছে, অন্তহীন কোন মহাসমুদ্রের ঢেউ-এর মত। দূরে অনেক নীচে দেখা যায়, পুষ্করহ্রদের নীল জলরেখা—তার চারিদিকে গড়ে উঠেছে শহরের বাড়ী-গুলো মন্দিরচূড়া।

শমিতা বলে ওঠে।

—ভেবেছিলাম এর পরও কিছু আছে?

হাসে সমর—কি থাকবে? অসীম শূন্যতা আর মুক্ত আকাশ—

শমিতা চুপ করে কি ভাবছে। উতলা বাতাসে উড়ছে তার আঁচল—এলোমেলো চুল, দু-চোখের দৃষ্টিতে কি বিষণ্ণতার আভাস। কি একটা আশা নিয়ে সে এত উপরে উঠে এসেছিল, সেই আশা কোথায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। বলে ওঠে শমিতা।

—সত্যিই তাই, অনেক কামনা—অনেক বেদনার আবেগে মানুষ উপরে উঠতে চায়, আরও কিছু পেতে চায়। কিন্তু উপরেও সেই শূন্যতার হাহাকার, সব ফাঁকি—কোথাও সঞ্চয় কিছুই নেই।

এটা যখন স্পষ্টতর হয়ে চোখে পড়ে তখন দুঃখটা বড়ো আরও বেশী।

বলে ওঠে সমর।

—তাই বোধ হয় ব্রহ্মকন্যা সাবিত্রী নিজেকে নিঃশেষ করেছিল, বন্ধনমুক্ত করে-ছিল?

শমিতা জবাব দিল না। আনমনে ওই দূর দিগন্তরেখার দিকে চেয়ে থাকে। সবুজ গাছঘেরা জলরাশির স্নিগ্ধতা ফুটে ওঠে, ক্ষুব্ধিত ব্যর্থ একটি মানুষকে ও-যেন ডাকছে হাতছানি দিয়ে, সন্ধান দিয়ে চলেছে একটি স্বপ্ননীড়ের, কোথায় সেই স্বপ্ন দিয়ে গড়ে তোলা ঘর কোথায় সেই তৃষ্ণার পানীয় সন্ধান শমিতা তা জানে না। নীরব ব্যাকুলতায় তার মন ভরে ওঠে।

আজ ব্যর্থ একটি নারী বলে ওঠে।

—দেবতারা আত্মশ্রের জন্য আত্মত্যাগ করে, কিন্তু আমি তো মানুষ। আমি বাঁচতে চাই, সব ফিরে পেতে চাই সমর! একটু ঘর—একটু আশ্রয়, ভালবাসার স্পর্শ আমি চাই। সব হারিয়ে আমি নিঃশেষে ফুরিয়ে যেতে চাই না সমর। ওর দু-চোখ জলে ভরে আসে। বলে ওঠে শমিতা।

—অতীতের একটু ভুলের এতখানি মাশুল দিতে হবে তা যদি জানতেম সমর, এ ভুল করতাম না।

শমিতার দু-চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে সে।

সমর জীবনের শূন্য দিনগুলো কাটিয়েছে নীরব একটি বেদনা নিয়ে, আজ সেই শূন্য-তাকে পূর্ণতার প্রসাদে সার্থক করার স্বপ্ন দেখে তার ব্যাকুল মন।

—শমিতা!

শমিতা ওর দিকে চাইল ডাগর কান্নাভেজা দু-চোখ মেলে। সমর বলে ওঠে।

—আজও সেই ভুল আমরা শুধরে নিতে পারি। সব ভুল শুধরে—সব দুঃখ সয়েও নোতুন করে বাঁচা যায় শমিতা?

পাহাড়ের উপর থেকে নামছে ওরা দুজনে। খাড়া পথটা নীচে মানুষের জগতের দিকে এগিয়ে এসেছে, ঊর্ধ্বলোক থেকে ওটা এসেছে মানুষের ঘরের মাঝে।

—শমিতা!

শমিতার হাতখানা ওর হাতে। সূর্যের প্রথম আলো ওর লেগেছে মুখে-চোখে। এক-দিন ওই পর্বতশীর্ষে কোন স্মরণাতীতকালে কোন নারী আত্মত্যাগ করেছিল কি বেদনায়, আজকের মানুষ সেই বেদনাকে জয় করে আবার বাঁচার আশ্বাস ফিরে পেয়েছে। দুঃসহ দুঃখ দহনের মাঝেও সে আবার পথ খোঁজে—পথ চলে।

শমিতার দু-চোখে সেই আলোর আভাস।

রুক্ষ পাহাড়, মরুভূমির থেকে ওরা সুধা-শ্যামলিমাভরা নীল জলসীমার দিকে, মানুষের বসতের দিকে ফিরে আসছে।

আজকের দিনের নাটক

অশোক সেন

ইংরাজ কবি বলেছেন, যে লোক একথা ভেবে কখনও গৌরব অনুভব করেন নি যে, এই আমার দেশ, এই আমার মাতৃভূমি, সে লোকের দৈহিকমৃত্যু না ঘটলেও আত্মিকমৃত্যু ঘটেছে।

আজ আমাদের সেই দেশ, আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ দারুণ দুর্দিনের সম্মুখীন। সাধারণ লোক তার চারপাশেই দেখছে শুধু অন্ধকার। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, দিনের পর দিন জনসংখ্যা শুধু বেড়েই চলেছে। বেশীর ভাগ যুবকেরা বেকার। এই পরিস্থিতি এবং পরিবেশের ভেতর থেকে লোকে আশার আলো দেখবে কি করে? খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠছে পাকিস্তান থেকে ক্রমাগত উদ্বাস্তুদের অভ্যাগমে। সে বেচারীদেরও তো দোষ দেওয়া যায় না। প্রাণ হাতে করে যতদিন সম্ভব তারা ওদেশে থাকবার চেষ্টা করছে—কারণ ভারতে এলেও তো তাদের দুর্দশার চরম হচ্ছে—উদ্বাস্তু সমস্যার কতটুকুই বা আজ পর্যন্ত আমরা সমাধান করতে পেরেছি? এর উপর আবার দেখা দিয়েছে সীমান্ত প্রদেশে পাকিস্তান এবং চৈনিক আক্রমণ। চীনের হামলা বর্তমানে থেমেছে বটে, তবে এমন কি নিশ্চয়তা আছে যে, যে-কোনো মুহূর্তে আবার তা নতুন করে সুরু হবে না? আর পাকিস্তান তো সুবিধা পেলে হানাদারি চালাচ্ছে। ইংলন্ড এবং আমেরিকার সহানুভূতিটা যে পরোক্ষে কোন্ দিকে, সে কথাও আজ ভারতবাসীর অজ্ঞাত নেই। আর প্রত্যক্ষভাবে চীনের উস্কানি তো আছেই। এসবের ফলে আজ আমাদের যে চরম দুর্দশার দিন সমাগত, সে কথা বোধ হয় কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। এসবের পরিপ্রেক্ষিতেই আজকের দিনের নাটক ঠিক কি ভাবে রচিত হওয়া উচিত, অন্তত যতদিন না দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সর্বাংগীণ উন্নতি হচ্ছে—জাতীয় নাট্যকারদের খুব ধীর-স্থিরভাবে ভেবে দেখা দরকার।

পলাশীর প্রাংগণে যখন আমরা স্বাধীনতা হারাই, সে সময়ে দেশে যে অরাজকতা, যে বিশৃংখলা, যে কুশাসন বিরাজ করছিল, সে কথাই বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় আজকের দিনের পরিস্থিতি। তবু বলবো আবার যেন আমরা সেই বিগত দিনের বিরাট ভ্রমের পুনরাবর্তন না ঘটাই—হিস্ট্রিকে রিপিট করতে সাহায্য না করি।

গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা নাটকে করিম চাচা বলছে—

করিম—কেন চাচা, উল্টো বুঝলে কেন? আমার কি বাংলা দেশে জন্ম নয়, আমি কি মতলববাজ নই, আমি কি আপনি গাঁট দিতে জানি নি? আমি কি আপনার ভালাই খুঁজিনি যে পরের ভালাই খুঁজতে যাবো? প্রজার ভাল হলো না হলো, আমার কি বয়ে গেল? বাংলায় জন্মেছি, আমার আপনার ভালোই ভালো! প্রাণেও বৈরাগ্য আছে—তাই মনে করি—কে কার, কার জন্যে ভাববো—আপনি গুছিয়ে নিই, পরকালে না হোক, ইহকালের তো কাজ বটে।

অথবা,

করিম—এই বংগভূমিরূপ বিধাতার সাধের উদ্যানে স্বার্থকুসুম ফুটেই রয়েছে! ছোট-বড় সব স্ব স্ব প্রধান,—সু-সৌরভে এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ! এ বাংলায় যিনি শান্তিস্থাপন করবেন, তিনি বিধাতা পুরুষ। বাংলা ফিরে গড়তে হবে। পুরাণো বাংলায় চলবে না।

সিরাজ—কেন করিম চাচা, তোমার এত বিরাগ কেন?

করিম—জনাব, এই বাংলায়, যদি তিন-জনের দু'মত দেখাতে পারেন, তা হলে নাকে খৎ দিয়ে, আফিং ছেড়ে দেবো। তিনজনের তিন মত! যদি এক মতে বাংলায় কাজ হতো, বংগবাসী যদি এক মতে বলতে শিখতো, তা হলে বাংলার মাটি থাকতো না—সোনা হতো। বাংলার বুদ্ধিও যেমন প্রখর, প্যাঁচও তেমনি ঝুড়ি ঝুড়ি! এই প্যাঁচখেলা চলেছে—যেটা কাটে, যেটা থাকে!

ক্ষীরোদপ্রসাদের আলমগীর নাটকেও শ্যামসিংহ আলমগীরকে বলছেনঃ রাজপুত বংশে জন্মেছি, বৃদ্ধ হয়েছি—আমি নিজের জাতের সব সমস্যা বুঝতে পারলুম না। আমি আপনাকে কি বুঝাবো! দেশে একটা চলিত কথা আছে—"বারো রাজপুত, তার তেরো হাঁড়ি।"

উপরের কথাগুলো শুধু বাঙালী বা রাজপুতদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয়—সারা ভারতের জনগণের সম্বন্ধেই বোধ হয় কথা-গুলো খাটে।

এই ঐক্যের অভাবেই একদিন হিন্দু সাম্রাজ্যের অবসান ঘটেছিল। আবার ঠিক ঐ একই কারণে এবং দেশনায়কদের কুশাসনের জন্য সারা ভারতবর্ষ গ্রাস করেছিল ইংরাজ, কারণ মুষ্টিমেয় ইংরাজকে রুখে দাঁড়ানোর মত আত্মবিশ্বাস, প্রাণশক্তি, দেশপ্রেম সব কিছুরই একান্ত অভাব ছিল জনগণের মধ্যে।

অবশ্য একথা আমি একবারও বলছি না যে, এভাবে স্বাধীনতা হারানোর জন্য জন-গণই দায়ী। জনসাধারণ সব দেশে মোটা-মুটি একই ধরনের হয়ে থাকে। সেই জন-সাধারণকে ঠিকভাবে চালিয়ে নেওয়া দরকার—কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ তার নির্দেশ আসা চাই সুবিবেচক, সুবুদ্ধিসম্পন্ন আদর্শ-চরিত্রের নায়কদের তরফ থেকে। উদাহরণ হিসাবে আজকের পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর দুটি জাতির উত্থানের ইতিহাসটা একবার পর্যালোচনা করলেই সব স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমি রাশিয়া এবং চায়নার কথাই বলছি। তবে প্রথমেই বলে রাখি, কমিউনিজম আমার আলোচনার বিষয় নয়। আমি লিডারশিপের দিকেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। জারিস্ট রাশিয়ার সাধারণ অন্ন-বস্ত্র, চাকরীর ব্যবস্থা আমাদের সব দেশের থেকে খুব ভাল ছিল না। কিন্তু বেভোলিউশন লিড করলেন লেনিন, ট্রটস্কি, স্ট্যালিনের মত আদর্শ মহানায়কেরা—দেশের ভোল পাল্টে দিলেন কয়েক বছরের ভেতরেই। আর আজকের রাশিয়া তো উন্নতির চরম সীমায় উঠেছে। সর্বাধিনায়ক ক্রুশ্চেভের মত লিডারও তাঁর এগ্রিকালচারেল প্রলিসির অসাফল্যের জন্য গদি ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন রাশিয়াতে এই সেদিন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে চীনের অবস্থা কি ছিল? চিয়াং কাইসেকের চীন তো প্রতিনিয়তই জর্জরিত হয়ে উঠছিল ছোট্ট জাপানের হামলায় হামলায়। এল দু-চারজন শক্তিশালী নায়ক, মাও সে-তুং এবং চু এন-লাই প্রভৃতি—কয়েক বছরের মধ্যে চীন উঠে এল রাষ্ট্র হিসাবে প্রথম শ্রেণীতে।

নানা ধরণের নিষ্পেষণে সাধারণ লোকে ক্রমশ যেন কেমন ক্যালাস হয়ে যাচ্ছে। তাদের মনে এই ধরণের একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে—"আবে খেতে-শুতে পেলে, তবে তো অন্য কথা।" কেউ কেউ এক এক সময় এমন কথাও বলেন যে, "এর থেকে ইংরাজ আমলেও ছিলাম ভাল—তখন এত কষ্ট পেতে হয় নি। দেশের কথা ভাববো কখন, সব সময় এই ভয়েই অস্থির হয়ে আছি স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে কখন গিয়ে পথে দাঁড়াতে হয়।" অর্থাৎ বর্তমানের

দুঃখ-কষ্টে [illegible] পরাধীনতার গ্লানি, পরাধীনতার [illegible]ান, সবকিছু ভুলতে বসেছে —কঠিন বাস্তবের ভয়াবহ মূর্তি দেখে দেখে দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার মূল্য বিস্মৃত হয়েছে।

বিগত যুদ্ধের সময় ইংরাজ জনসাধারণের কথাটা একবার ভেবে দেখুন, চেম্বারলেনের লিডারশিপে সমস্ত জাতীয় অপমানই তারা কতদিন মুখ বুজে সহ্য করেছিল। আবার উইনস্টন চার্চিলের অধিনায়কত্বে তাদের জাতীয় চরিত্রের রূপটাই যেন সম্পূর্ণ পাল্টে গেছিল। প্রাণপণ করে তারা লড়াই করলে, স্বাধীনতার জন্য যে-কোনো রকম কষ্ট সহ্য করতো তারা হাসিমুখে, যে-কোনো মূল্য দিতে তারা ছিল রাজী।

এই স্বাধীনতার মূল্যের কথাটাই আবার প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের মনে জাগিয়ে তোলাটাই এখন সব থেকে প্রথম দরকার। এ বিষয়ে সাহিত্যিকদের এবং বিশেষভাবে নাট্যকারদের একটা গুরুতর দায়িত্ব আছে। নাট্যকারদের বিশেষ দায়িত্ব আছে বলছি এই কারণে যে, নাটকের মাধ্যমে বহু লোকের অন্তরে জাতীয়তাবোধের ভাবটা জাগ্রত করে তোলা যায়। বিদেশী শাসনের অধীনে থাকাকালীন দেশের সত্যিকার অবস্থা যে কি ছিল, বিজেতাদের চোখে এ দেশের লোকেরা যে পশুর অধম বলে পরিগণিত হত, এইসব সত্যকে জীবন্ত আলেখ্যর মত তুলে ধরা যায় রঙ্গমঞ্চে। স্বাধীনতা সংগ্রামে নাটকের অবদান তো কম নয়। নীলদর্পণ, সিরাজদ্দৌলা, মিরকাসেম প্রভৃতি নাটক এক সময় দেশের লোকের প্রাণে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। পথের দাবী দেশের যুবকদের মনে নূতন উদ্দীপনা যুগিয়েছিল।

সিরাজদ্দৌলা, মিরকাসেম একদিন যে প্রেরণা যুগিয়েছিল স্বাধীনতা-যুদ্ধের সৈনিকদের, আজকের দিনে তার স্থান নিতে পারে বাংলা এবং ভারতবর্ষের অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের বিপ্লব-জীবনের উপর ভিত্তি করে রচিত সব নাটক। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘা যতীন, বারীন ঘোষ, সূর্য সেনের বৈপ্লবিক জীবনের ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে যদি নাটক লিখে মঞ্চস্থ করা যায়, জাতীয়ভাবোধের দিক থেকে একটা অত্যন্ত বড় কাজ করা হবে। জনসাধারণকে সত্যিকার দেশভক্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে রঙ্গালয়ের দায়িত্বও সুচারুভাবে সম্পন্ন করা হবে। স্বাধীনতা-যুদ্ধের অত বড় নায়ক সূর্য সেন। বিদেশী শাসক ইংরাজ জাত—যারা চিরকাল নিজেদের এত সিভিলাইজ্‌ড্ বলে গর্ব করেন—শোনা যায়, গোরা সৈন্যদের দিয়ে এই মহান নেতার প্রতি এমন অত্যাচার করেছিল যে, বুটের লাথির চোটে তাঁর একটি দাঁতও অবশিষ্ট ছিল না। বিদেশী শাসনকর্তাদের এইটিই ছিল আসল রূপ। আজকের ইংলন্ডের কালা আদমীদের প্রতি ধলাদের অত্যাচারের খবর তো প্রায় প্রতিদিনের দৈনিক কাগজেই কিছু না কিছু প্রকাশিত হচ্ছে। জাতির প্রত্যেকটি লোকের ভেতর যাতে আবার প্রাণশক্তি ফিরে আসে, তার জন্য সবার আগে দরকার তাদের মন থেকে হতাশা এবং নৈরাশ্যের ভাবটা দূর করা। আজকের দিনে গর্ব করবার মত কিছুই হয়তো আমাদের নেই, কিন্তু আবার আমরা যে বড় হতে পারবো না, অন্যায় আমাদের যুব সম্প্রদায়ে বিনয়, বাদল, দীনেশ গুপ্তের মত ছেলেরা দলে দলে দেখা দেবে না, এ আশা আমরা হারাবো কেন? এইসব মহান দেশপ্রেমিকদের চরিত্র এবং কর্মধারার সঙ্গে আজকের যুবসম্প্রদায়ের আবার নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার নাটকের মাধ্যমে—এ কর্তব্য সাধনের ভার আজকের দিনের নাট্যকারের।

"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা
জীবনের জয়গান
আজ অলক্ষ্যে দাঁড়িয়েছে তারা
দেবে কোন্ বলিদান?"

সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে নেতাজীর আজাদ-হিন্দ্-সংগ্রাম অবধি যে আত্মাহুতি, যে রক্তদান স্বাধীনতা-যুদ্ধের সৈনিকেরা করে এসেছেন, জীবনের প্রতি পদে পদে যে দুঃখ-কষ্ট তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে, বিদেশী শাসকদের হাতে যে অমানুষিক অত্যাচার এবং পীড়নে জর্জরিত হতে হয়েছে তার প্রতিদানে আজকের স্বাধীন ভারতের নাগরিকেরা ঐ সব শহীদদের কি দিয়ে তর্পণ করবে? আজ দেশের এই দারুণ দুর্যোগের দিনে আসমুদ্রহিমাচলের প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে এই একটি মাত্র সংকল্পই সুস্পষ্ট এবং সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠা উচিত যে, যত ভয়াবহ অবস্থারই আমরা সম্মুখীন হই না, যত অভিমান, অনুযোগ, অভিযোগই জাতীয় শাসকবর্গের বিরুদ্ধে আজ আমাদের মনে মনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠুক না—আমাদের দেশ আজ বাইরের শত্রুর দ্বারা বিপন্ন। বহু কষ্টে অর্জিত স্বাধীনতা যদি আবার আমরা হারিয়ে ফেলি, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগও আমরা আর কখনও ফিরে পাব না। কারণ, আবার যদি আমাদের দুর্বলতা, নিশ্চেষ্টতা, ঐক্যবদ্ধতার অভাবে বাইরের শত্রু এসে আমাদের দেশের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, তবে আর কখনও ভবিষ্যতে জাতি হিসাবে আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো না। বিদেশী শাসক সবাই সমান—দীর্ঘকাল পরাধীন অবস্থায় আমরা এক্সপ্লয়েটেড হয়েছি—আজ যদি আবার আমরা সেই অবস্থার সম্মুখীন হই, তবে নতুন বিদেশী শাসকের দল এসে আমাদের ঐসব সমস্যার সব-খোল-চাবির সন্ধান দেবে না। এ দেশকে নিত্য নতুন উপায়ে কৃতকরকমভাবে এক্সপ্লয়েট করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করা যাবে, সেই চেষ্টাই তারা দেখবে।

আজকের নাট্যকারের কর্তব্য হচ্ছে রচনার ভেতর দিয়ে এইসব সত্যকেই জাজ্বল্যমান বক্তব্য হিসাবে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা —জনসাধারণকে এলার্ট করে তোলা দেশের এবং জাতির সমস্ত সমস্যা, সমস্ত বিপদ, সমস্ত দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে, যার ফলে দেশের প্রত্যেক নাগরিক দেহমন থেকে হতাশা ঝেড়ে ফেলে নব উদ্যমে এবং নব উৎসাহে জাতীয় সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, কিন্তু সে স্বাধীনতাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এখনও বহুদিন অবধি আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য হবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করা, শিল্প-কলা-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন, শুধুমাত্র অতীতের গৌরবের কথা নিয়ে রোমন্থন না করে, বর্তমানেও নিজেকে জাতি হিসাবে গৌরবময় করে তোলা। জাতীয় রঙ্গমঞ্চ এবং জাতীয় নাট্যকারেরা এইসব বিষয়েই জনসাধারণের পথনির্দেশকের কাজ করতে পারেন; এই আমার আন্তরিক বিশ্বাস।

একালের চলচ্চিত্র চিন্তা

কৃষ্ণতরু সেনগুপ্ত

"চলচ্চিত্র পরিচালকের জীবনের উদ্দেশ্য হবে তাঁর পারিপার্শ্বিক জীবনকে বর্ণনা করা এবং মানুষের জীবনের আকাঙ্ক্ষা, সত্যিকার অনুভূতিকে প্রকাশ করা। চলচ্চিত্র এবং শিল্প-ফর্ম এমন হওয়া উচিত যা দর্শকদের গভীর-ভাবে স্পর্শ করবে; এবং তা এমনভাবে করতে হবে যাতে আতিশয্য বা কৃত্রিমতা না থাকে। পরিচালককে আধুনিক সমাজে বাস করতে হবে এবং সমাজের সুখ-দুঃখ, সব রকমের কাজে তাঁকে অংশ গ্রহণ করতে হবে। সমাজে যে ব্যক্তিত্ব পরিচালক হিসাবে তিনি অর্জন করেছেন সৃষ্টিকর্মে সেই ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত করতে হবে।"

কোন সমাজবিজ্ঞানী অথবা রাজনৈতিক কর্মী এই কথাগুলি বলেন নি, বলেছেন ৬৪ বছর বয়স্ক জাপানী পরিচালক হেইনোসুকে গোশো। যিনি দীর্ঘকাল জাপানী চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত থেকে ৭২টির মত ছবি নির্মাণ করেছেন। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি উপরোক্ত কথা বলেছেন। জাপানী ছবি আমাদের দেশে ব্যবসা হিসাবে দেখান হয় না। ফিল্ম সোসাইটি বা সিনে ক্লাবের উদ্যোগে দু-চারটা ছবি বছরে দেখান হয়। পৃথিবীতে চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসাবে হলিউডের পরেই জাপানের স্থান। গত ক'বছরে যেক'টি জাপানী ছবি দেখেছি তার কোনটি জীবনবিমুখ নয়—প্রায় সব কয়টিতে জীবনের আকাঙ্ক্ষা, সাধারণ মানুষের জীবনের বলিষ্ঠ দিকগুলি, মানবিক অনুভূতি এবং বস্তুবাদী দৃষ্টিতে ইতিহাস প্রতিফলিত। এই ছবিগুলির মারফৎ আমরা জাপানের মানুষকে দেখেছি, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রাম অনুভব করেছি। তাদের জীবন বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গেও কিছুটা পরিচিত হয়েছি।

তুলনামূলক বিচারে মনে পড়ে আমাদের ছবি ও আমাদের পরিচালকদের কথা। আমরা যদি চলচ্চিত্রের ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই হিন্দী চিত্রজগতে মানুষের মর্যাদা ও মূল্যায়ন সম্পর্কে 'আদমি', সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে 'পড়শী', সমাজে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অছুৎকন্যা, কৃষি সমস্যা নিয়ে 'ধরতিমাতা', ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে 'রোটি', অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতি-রোধের প্রশ্নে 'আওরৎ', সমাজজীবনে অসম ব্যবস্থার প্রতিবাদ 'দো বিঘা জমিন', মধ্যবিত্ত জীবনের নতুন চেতনা উন্মেষ 'হামরাহী', যুদ্ধের পরিণতিস্বরূপ দুর্ভিক্ষ এবং দেশ-ভাগ জনিত কারণে উদ্বাস্তু সমস্যার উপর 'ধরতি কে লাল', আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব ও ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রামের চেতনাসমৃদ্ধ 'ডাঃ কোটনিস'-এর মত ছবি নির্মিত হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে 'ঝাঁসী রাণী লক্ষ্মীবাই' এবং 'আন্দোলন' ছবিতে। যুদ্ধপূর্বকালে বোম্বাই-এর কয়েকজন চিত্রনির্মাতার মধ্যে যে বলিষ্ঠতা ও সাহস দেখা গেছে তা বাস্তবিকই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। হিমাংশু রায়, শান্তারাম, মেহবুব প্রমুখ পরিচালকরা ভারতীয় ছবিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মেহবুবের 'রোটি' ব্রিটিশ সরকার প্রদর্শন নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল।

বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের সূচনাকাল থেকে বাস্তবনির্ভর এবং সমাজ সমস্যামূলক ছবি করার দিকে পরিচালকরা আগ্রহী ছিলেন। বাংলার সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশ এবং রাজনৈতিক চেতনা এই বাস্তব-নির্ভরতার কারণ। পল্লীসমাজ, দেনা-পাওনা, দেবদাস, গৃহদাহ-তে নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের সমস্যার সঙ্গে তৎকালীন সমাজের মূঢ়তা ও সংস্কারের চিত্র ফুটে উঠেছে। কৃষিজীবনের সমস্যা ও সমাধানের মানবিক আবেদন নিয়ে 'দেশের মাটি' জনচিত্ত জয় করেছিল। শোষিত মানুষের সমব্যথীরূপে এক নতুন সমাজ গঠনের রামধনু আঁকা স্বপ্ন নিয়ে 'উদয়ের পথে', 'অধিকার' ইত্যাদি মুক্তিলাভ করেছিল। 'বিদ্যাপতি', 'চণ্ডীদাস' ইত্যাদিতে মানুষকে সবার উপরে স্থান দিয়েছে। বোম্বাই এবং বাংলাতে এমন কয়েকজন পরিচালক ছিলেন যাঁরা সমাজের কথা, আমাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেছিলেন। তখন অনেক প্রতি-বন্ধকতা ছিল—তা সত্ত্বেও ছবিতে তাঁরা সেদিনের চেতনা অনুযায়ী সমাজবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ছবির সঠিক খবর আমরা জানি না, তবে মারাঠী ছবি বাংলারই মত সমাজবোধে উজ্জ্বল ছিল। আজকের বাস্তবধর্মী চল-চ্চিত্রের প্রসঙ্গ উঠলে স্বীকার না করে উপায় নেই যে অতীতের এই চলচ্চিত্রগুলি একটা

হিমাংশু রায় প্রযোজিত বোম্বে টকিজে 'কর্ম' ছবিতে দেবিকা রাণী।

ঐতিহ্য সৃষ্টি করে রেখেছে; বর্তমান কালের পরিচালকদের সামনে দৃষ্টান্ত রেখে গেছে; আরো এগিয়ে যাবার পথ প্রশস্ত করেছে।

যুদ্ধোত্তরকালে হিন্দী ছবি তার পুরানো ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পাঁচমেশালী চরিত্রে দেশকালের পরিচয় হারায়। স্বাধীনতালাভের পরে একদিকে যেমন জাতির বুকে আশার সঞ্চার হয়েছিল, আর একদিকে বাঁধভাঙা বেনো জলের মত অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবধারা প্রবেশ করে। তার কারণ রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে সুস্পষ্ট। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ, আপোষে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং কমনওয়েলথের মধ্যে থেকে স্বাধীনতা ভোগের পরিণতি এর চাইতে ভাল হতে পারে না। এংলো-আমেরিকান পুঁজির অবাধ বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে 'ড্রন পাইপ-স্ল্যাকস' আর 'ক্যানক্যান' কালচার বোম্বাইর চিত্রজগতে প্রভাব বিস্তার করে। 'রক-এন-রোল' আর 'টুইস্ট'-এর সাথে মিশে এমন এক বোম্বাই কালচার সৃষ্টি হয়—যার সাথে ভারতীয় জীবন, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও অনুভূতির কোন মিল নেই। ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সে যেন মার্কিন-ভারতীয় অবৈধ মিলনের এক অনাসৃষ্টি। তার অশুভ স্পর্শে ভারতের চলচ্চিত্র জগৎ আজ কলুষিত। বোম্বাইর চিত্রনির্মাতারা জীবনবিমুখ কেবল নয়; সুস্থ জীবনবোধ ও সুরুচি থেকেও দূরে সরে এসেছে। প্রতিক্রিয়ার সহায়ক হয়ে দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করছে, মিথ্যা মোহে আচ্ছন্ন করে জনগণকে বাস্তবচেতনাবিমুখ করার চেষ্টা করছে।

কিন্তু বাংলা ছবি বোম্বাইর মত 'ক্যানক্যান' কালচারে ভেসে যায় নি। তার অন্যতম কারণ বাংলার ছবি সাহিত্য অবলম্বিত। শরৎচন্দ্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর প্রমুখের প্রভাব তখন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে ছিল, এবং জীবনধর্মী সাহিত্য সৃষ্টির এক প্রচেষ্টা তখন বাংলাদেশে চলছিল। দ্বিতীয়ত যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগের জন্য বাংলাদেশ ক্ষতবিক্ষত হলেও এত দুঃখের মধ্যেও একদল মানুষ স্বাধীনতা ও প্রগতির মশাল জ্বালিয়ে রেখেছিল। কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের ঢেউ বাঙালীর জীবনে এক নতুন চেতনা সৃষ্টি করেছিল। এই চেতনায় বাংলার চলচ্চিত্র-নির্মাতারা বোম্বাইর মত ক্ষয়িষ্ণু হলিউড-অনুকরণমুখী হবার পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতি তথা সোস্যালিস্ট রিয়ালিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। পুডভকিনের মত চিত্রনির্মাতা, ইলিয়া ইরেনবুর্গের মত সাহিত্যিকের সঙ্গে বাংলার শিল্পী ও সাহিত্যিকদের যোগাযোগ এবং সোভিয়েত ছবি দর্শনে চলচ্চিত্র শিল্পে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনে সাহায্য করে। তার সঙ্গে ফরাসী দেশের জেনোয়া প্রমুখ বাস্তববাদী সমাজসচেতন শিল্পস্রষ্টাদের প্রভাবে একদল উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য ও অনুপ্রেরণা এর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। এই নবীন দলের নেতা সত্যজিৎ রায়। তিনি পারিবারিক দিক থেকে যেমন বাংলার এক বলিষ্ঠ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী, তেমনি ব্যক্তিগতভাবে নিজেও বাংলার প্রগতিশীল আন্দোলন থেকে দূরে সরে ছিলেন না। তাঁর পরবর্তী হিসাবে দেখা যায় ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, অসিত সেন, অগ্রগামী প্রমুখকে। বাংলার ক্ষয়িষ্ণু গ্রামজীবন ও গ্রামের মানুষদের দুর্ভাগ্যের চিত্র ফুটে উঠে 'পথের পাঁচালী'তে। দীর্ঘ দিনের বিদেশী শাসনে উপেক্ষিত গ্রামের শীর্ণ চেহারা, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ অথচ মানবজীবনের সম্পদগুলিকে ধরে রাখার জন্য গ্রামের মানুষের আকুল চেষ্টা। এই ছবি প্রগতিশীল চেতনাসমৃদ্ধ বাস্তববোধের এক বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত। বাংলার চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছে 'পথের পাঁচালী' এক নতুন পথের সন্ধান দেয়। তারপরে একই পরিচালকের পর পর কয়েকটি ছবি নতুন মেজাজে, নতুন স্বাদে বাঙালী দর্শকদের চিত্ত জয় করলো। তার মধ্যে স্থবির সমাজজীবনের পটভূমিকায় অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ 'দেবী' তাঁর এক মহৎ সৃষ্টি। 'কাঞ্চনজঙ্ঘায়' তিনি সমাজের দুই শ্রেণীর দুজনকে দাঁড় করিয়ে বর্তমান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সমাজে পারিবারিক জীবনের একটা রূপ এবং মোহবন্ধনহীন মুক্ত জীবনের আবির্ভাবের ইঙ্গিত জানিয়েছেন। এক পক্ষীপ্রেমিকের ছোট একটি কথার মধ্য দিয়ে আণবিক বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দিয়েছেন। 'অভিযান'-এ এক মেহনতি মানুষের সততা ও বলিষ্ঠ জীবনস্পৃহাকে তুলে ধরেছেন। 'মহানগর'-এ ধনতান্ত্রিক সমাজে শহরজীবনে মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং জীবনসংগ্রামের একটা দিক প্রকাশ করেছেন। তাঁর সৃষ্ট 'চারুলতা' ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালীর সমাজে জাতীয় চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে নারীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। অগ্রগামী পরিচালকগোষ্ঠীর 'ডাক হরকরা' গ্রামের পটভূমিকায় এক সাধারণ মানুষের জীবনবোধ ও সমাজচেতনা এবং 'হেডমাস্টার'-এ এক শিক্ষকের মাধ্যমে একটা আদর্শবাদ তুলে ধরেছেন। ঋত্বিক ঘটক 'অযান্ত্রিক'-এ একটা চমকের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন কিন্তু তাঁর 'মেঘে ঢাকা তারা' পরিণত সৃষ্টি। এখানে দেশভাগে দুর্বল বাংলাদেশের নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের চেহারা ও নীতিবোধের মধ্য দিয়ে একটা জীবনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। মৃণাল সেন 'বাইশে শ্রাবণ'-এ যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এক সাধারণ মেহনতি মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডি তুলে ধরেছেন। এ ছাড়া 'গঙ্গা', 'লৌহকপাট', 'কাবুলিওয়ালা' 'পঞ্চতপা' প্রভৃতি ছবি মানবিকবোধসম্পন্ন এবং অভিনন্দনীয়।

যদিও ছবির সংখ্যা বেশী নয়, কিন্তু এই কয়টি ছবির মধ্য দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্র-জগৎ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে। এক ভাগ প্রগতিশীল ও সমাজচেতনাসম্পন্ন। আর একভাগ কালচেতনা ও সমাজের প্রতি

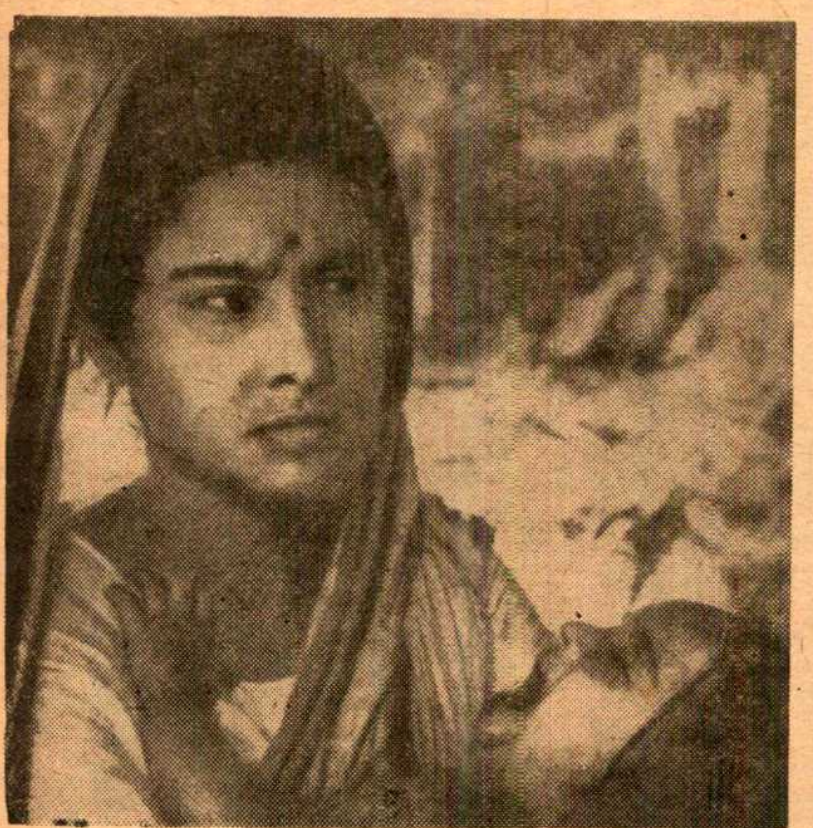

মৃণাল সেনের 'বাইশে শ্রাবণ'-এ মাধবী মুখার্জী।

সুচিত্রা সেন

দায়িত্বহীন। চলচ্চিত্র এঁদের কাছে জীবিকার অবলম্বন, নিছক ব্যবসামাত্র। ছবির প্রতিক্রিয়া সমাজের উপর কি ভাবে পড়বে সে বিষয়ে এঁরা মাথা ঘামান না, টিকেট বিক্রি এঁদের সাফল্যের মাপকাঠি। প্রথম দলে যাঁরা আছেন তাঁরাও যে সকলে সমাজসচেতন এমন কথা বলা যায় না। তাঁদের মধ্যে দোদুল্যমানতা ও সুবিধাবাদ দেখা যায়। তবে তাঁরা চলচ্চিত্রের শিল্পমূল্য সম্পর্কে সতর্ক। শিল্প-মানের দিক থেকে ছবিকে নীচে নামতে দিতে তাঁরা চান না। বাংলা চলচ্চিত্রে সুস্থতা রক্ষা করতে এঁদের প্রচেষ্টা অস্বীকার করা যাবে না। এ কারণে এঁরা জনপ্রিয় এবং এঁদের ছবি দেখার আগ্রহী দর্শক সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় দল হলিউডমুখী এবং 'ড্রেনপাইপ' আর 'রক-এন-রোল' কালচারের প্রতি আকৃষ্ট। বাংলা চলচ্চিত্রে সেই বেনো জল প্রবেশ করিয়ে বোম্বাই ছবির দর্শক সৃষ্টি করতে পারছেন না বলে তাঁদের বড় দুঃখ। তাঁদের কেউ কেউ বাঙালীর উপর আস্থা হারিয়ে বোম্বে চলে যান। এই দল কেবলমাত্র চিন্তাধারার দিক থেকে স্বতন্ত্র শিবির গঠন করে নি, সাংগঠনিকভাবেও এরা প্রগতিশীল-দের কাছ থেকে নিজেদের আলাদা করে রেখেছে। এবং এই ধামাধরা সংগঠন স্টুডিও কর্মীদের সমর্থনবর্জিত।

কাল স্থিতিশীল নয়। যুগের সঙ্গে সঙ্গে যুগচেতনাও এগিয়ে চলে। আজ যাকে দেখি প্রগতিশীলের ভূমিকায় আগামীকাল হয়তো তাঁকে প্রগতিশীল বলা যাবে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রগতির সংজ্ঞা পরিবর্তন হয়। যুদ্ধপরবর্তীকালে যাঁরা প্রগতিশীল স্রষ্টা—তাঁরা বাস্তবজীবনকে ফুটিয়ে তুলে-ছিলেন, রঙিন স্বপ্নজালে জীবনের সত্য পরিচয় আড়াল করতে চান নি, মানুষকে সত্যের পথে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁদের এই অবদান অস্বীকার করা যাবে না, তাঁদের প্রগতিশীল বাস্তববাদী বলে আমরা এযাবৎ-কাল অভিনন্দন জানিয়ে এসেছি। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা বেড়েছে। এই অভিজ্ঞতায় আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? শ্রমকশ্রেণী সম্পর্কে মানুষ মোহমুক্ত—সুখী জীবন গঠনের স্বপ্ন আজ ধ্বসে পড়েছে। মানুষের সম্মান নেই। নারীর ইজ্জত নেই। আর পাঁচটা জিনিসের মত মানুষের জীবনও পণ্য হয়ে উঠেছে। যেখানে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিস অগ্নিমূল্য, কেবলমাত্র মানুষের জীবন বড় স্বল্পমূল্য। ক্ষমতার দম্ভ, মিথ্যাচার, শোষণ আর নেতৃত্বের নামে দালালির দাপটে মেহনতি মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। এই বিপর্যয়ে চারিদিকে কেবল ভাঙন। মানুষের দেশ ভেঙেছে, মন ভাঙছে, সমাজ ভাঙছে। উগ্র জাতীয়তা ও যুদ্ধের উন্মাদনায় আমাদের স্নায়ু দুর্বল হচ্ছে। এই পরি-স্থিতিতে আমরা প্রগতিশীল বাস্তববাদী বলবো তাঁদের যাঁরা কেবল বাস্তবজীবনকে প্রকাশ করে সন্তুষ্ট নন, তার সঙ্গে জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামকে প্রকাশ করতে পারবেন। আজ মানুষ হতাশ ও অপমানিত একথা যেমন সত্য, তাদের মনের মধ্যে যে আগুন জ্বলছে সে-কথাও সত্যি। সেই আগুন অনাচারকে পুড়িয়ে শেষ করতেও প্রস্তুত। যারা মানুষের অগ্রগতির পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে তাদের যেমন চিনিয়ে দিতে হবে, সেই সঙ্গে ভণ্ড জনদরদী ও নেতৃত্বের নামে যারা দালালী করছে তাদেরও মুখোস খুলে ফেলা দরকার। এই দুঃসহ অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষা ও সমাজতান্ত্রিক চেতনা জাগিয়ে তোলা আজকের প্রগতিশীল চিত্র-নির্মাতাদের কর্তব্য। সারা বিশ্বে আজ মানুষের সামনে দুটি মাত্র পথ—হয়তো ধনতন্ত্রের পচনশীল অবস্থাকে ধরে থাকা, নয়তো সাম্যবাদী সমাজ গঠনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এই দুয়ের মাঝখানে আর কি থাকতে পারে! তাই মানুষের আস্থা অর্জনের জন্য কংগ্রেসকে আজ সমাজতন্ত্রের কথা বলতে হচ্ছে।

এই যুগচেতনার বিচারে যদি আমাদের চিত্র-নির্মাতাদের দেখি এবং তাঁদের সৃষ্টির কথা ভাবি তবে বড় বেশী আশা সঞ্চার হয় না। প্রশ্ন জাগে এঁরা কি একটি যুগের সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যাবেন—না আগামী দিনের মানুষের জন্যও তাঁদের মনে রাখার মত কিছু রেখে যেতে পারবেন! যে পরি-চালকের কাছে আমরা পথের পাঁচালী, দেবী ও মহানগর পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে যখন 'কাপুরুষ' পাই তখন সন্দেহ জাগে তিনি কালের যাত্রাপথে সমান তালে চলতে পারছেন কি না। 'আকাশ-কুসুম' দেখে আমরা হতাশ হয়ে পড়ি—যখন দেখি বহু বছর আগেকার অলীকবাবুকে কেবলমাত্র নতুন ভঙ্গীতে উপস্থিত করা হয়েছে। কোথায় এখানে কৃত্রিম জীবনের যন্ত্রণা, মানুষের মূল্য নিরু-পণের প্রতি শ্লেষ! এ ছবি দেখে কি মনে হয় না যে পরিচালক বাইশে শ্রাবণ থেকে টেকনিকে উন্নতি করলেও চিন্তার ক্ষমতায় পিছিয়ে এসেছেন? জানি না ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণরেখা' সত্যিই মানুষের মনে অন্ধকার অবসানের আশা জাগিয়ে তুলতে পারবে কি না।

একালের চিত্র-স্রষ্টাদের কাছে আমাদের অনেক আশা। তাঁদের ছবি হবে অচলায়তন ভাঙার প্রেরণা, নতুন এক জগৎ গড়ে তোলার স্বপ্নে ভরা। মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করার মত অনুভূতিশীল। রূপ, রস, গন্ধে ভরা—মানববন্দনা।

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'পথের পাঁচালী'-র একটি দৃশ্যে 'চুনীবালা ও কুমারী দাশগুপ্তা।

আমাদের নাটকের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মূল্যায়ন

শোভা সেন

আমাদের দেশে অভিনয় শেখার স্কুল এখন দু'চারটি খোলা হয়েছে। যদিও সরকারী কৃপা ও পরিচালনাধীনে সেগুলো চলছে তাই যথারীতি আমলাতান্ত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অযোগ্যতা সেখানেও বর্তমান। প্রতি বছর কতকগুলি ছাত্রছাত্রী সেখানে যায় মিথ্যে আশার ছলনায়। তাদের তিন বছর সেখানে বেশ খেটেখুটেই পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু পাশ করে যে কি করবেন তা কেউ জানেন না। যাঁরা পড়ান তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষকদের এই নাট্যকলা বা নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই নেই। মন্ত্রীদের স্বজনপোষণ—ও আরও কিছু সরকারের কৃপাপুষ্ট লোক এখানে আছেন। তাঁদের অবিশ্যি আস্তে আস্তে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হচ্ছে। কিন্তু অভিনয়, পরিচালনা ও মঞ্চসজ্জা বা আলোকসম্পাতে এমন একজনের নামও দেখতে পাওয়া যাবে না, যাঁরা এসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষমতাবান বা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। কোনো অজ্ঞাত কারণে সরকার তাঁদের নিতে ভয় পান। হয়তো তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য। কিন্তু বিভিন্ন সরকারী কলেজে তো বহু বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী পণ্ডিতলোক আছেন, যাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের রীতিমত জ্ঞান বিতরণ করে বেশ সুনামের সংগেই বিরাজ করছেন। তবে এই প্রতিষ্ঠানে এত ভয় কেন? সরকারের বোধহয় শিল্পীদের বেশি ভয়।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

এতো গেলো শিক্ষকদের কথা। এবার আসা যাক পাঠ্যপুস্তকের কথায়। সে বিষয়েও অনেক কিছু বলার আছে। আমাদের বাংলা ভাষা খুব সমৃদ্ধ ভাষা শুনে থাকি ও গর্বও প্রকাশ করে থাকি। হিন্দীকে তো নস্যাৎ করি কথায় কথায়। কিন্তু অভিনয়-রীতি বা তার কলাকৌশল সম্বন্ধে বা নাটক পরিচালনা সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্যসম্বলিত বই কখানা আছে জানি না। হাতে গুণে যেকটা পাই তার সবগুলি পড়ার যোগ্য নয়। যেগুলো খানিকটা তথ্যসম্বলিত সেগুলোর খোঁজ আবার ঐ নাট্যবিশারদ ঐ মাস্টাররা রাখেন না। একদিন নাট্য বিষয়ে পণ্ডিত বলে খ্যাত এক ব্যক্তিকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম একটি বইয়ের কথা। তিনি আকাশ থেকে পড়ে বললেন, কৈ সে বই-এর নামও তো তিনি শোনেন নি। অথচ তার দু' বছর আগে বইটি প্রকাশ হয়েছে। প্রকাশক বিনে পয়সায় সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীতে বোধহয় বইটি পাঠান নি, তাই এঁদেরও জানবার কথা নয়। আসলে প্রত্যেকেই নিজেকে এত বেশি পণ্ডিত মনে করে বসে আছেন যে, অন্য কিছু পড়ে দেখবার মত সময় কোথায়, ততক্ষণে অন্য আর একটি কলেজে পার্ট টাইম চাকরী করলে কিছু অর্থ আসে।

অভিনয় সম্বন্ধে বই-এর বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের দেশে যেসব স্বনামধন্য

অভিনেতা জন্মোছলেন তাঁদের লেখা বই প্রায় নেই বললেই চলে। গিরিশবাবু যা লিখে গিয়েছেন তা যথেষ্ট নয়। তবে কিছুটা নিশ্চয়ই। আত্মজীবনী বা অন্য অভিনেতার মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপনের মাধ্যমে সেই অভিনেতা সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য আমরা পাই। কিন্তু আমাদের দেশে নাটকের ঐতিহ্য যতদিনের সেই অনুপাতে বই খুব কম। শিশির ভাদুড়ী মশাই লেখার প্রতি বীতরাগ ছিলেন। এত পণ্ডিত লোক অথচ লিখলেন না কিছু। খুব সামান্য লেখা পাই। অথচ তাঁর মত গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আর কজনের ছিল? তাঁর মহড়ার সময় প্রতিটি শিক্ষার্থীকে উনি প্রতিটি চরিত্র যেভাবে বুঝিয়ে দিতেন সেই চরিত্রের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন যে গভীর তত্ত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করতেন, তা আর কোন পরিচালকই করতে পারতেন বলে জানা নেই। শিক্ষকতা ছেড়ে মঞ্চে এসেছিলেন তাই পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ।

এখন নাট্য-শিক্ষার্থীরা এই নাট্যশাস্ত্রের প্রতি সজাগ হচ্ছেন, তাঁরা পূর্বসূরীদের বিষয়ে কিছু জানতে চান। অথচ তা যে কত দুঃসাধ্য তা ভাবলেও হতাশ হতে হয়।

কেন নাট্যকলা সম্বন্ধে বই লেখা প্রয়োজন? শেক্সপিয়ার আক্ষেপ করে লিখেছেন:

Life's but a waking shadow, a poor player, that struts and frets his hour upo the stage, and then is heard no more.

অভিনয়কলাকে তো কাগজে কলমে ধরে রাখা যায় না। তাই অভিনেতা ও তাঁর সৃষ্টি একই সংগে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। অভিনেতারা এ বিষয়ে খুব সজাগ। তাঁরা খুব ভাল করে জানেন—যতদিন পাদপ্রদীপের আলোর সামনে তাঁরা থাকেন ততদিনই তাঁদের পরমায়ু, তারপর আর তাঁদের কেউ মনে রাখেন না। আজ যিনি খ্যাতি ও যশের শিখরে কাল তাঁর নামটুকু ইতিহাসের পাতায় হয়তো একটু স্থান পাবে, কিন্তু তাঁর খ্যাতির মূলে কি তাঁর গুণাগুণ তার বিচার কেউ করবে না। তাই সব দেশেই অভিনেতাদের অভিনয় কলাকৌশল সম্বন্ধে বই আছে। প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও পরিচালকরা তাঁদের রীতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বই ও প্রবন্ধ লিখেছেন বহু। সেই সব বই-ই আমাদের সম্বল। আমাদের নিজেদের দেশের কোনো বৈশিষ্ট্য বা কোন রীতি আমাদের জানবার উপায় নেই। ভরত-নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে বই আছে। কিন্তু কোন ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে সে ধারা আমাদের অভিনয়রীতিকে প্রভাবান্বিত করেছে কিনা তা জানা নেই। আমাদের দেশের অভিনেতাদের উদাসীন্যের কারণ কি?

আমার মনে হয়, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অভিনেতৃদের জীবনী যেভাবে রসালো ও নানা কাল্পনিক তথ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয় সেই হলিউডী প্রথার পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। সস্তার জিনিস সহজে বিকোয় জানি। অলীক যাদুবিদ্যাসম্পন্ন অভিনেতৃদের জীবনী বিকৃত তথ্যভরা একথা পাঠকবর্গও জানেন। কিন্তু জেনেও তাঁরা ঐ বস্তাপচা ন্যাকা ন্যাকা গালগল্পগুলো পড়ে নিজেদের বিকৃত মনের ক্ষুধা মেটান। কিন্তু আমাদের মধ্যেও সুস্থমস্তিষ্ক ও বুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকও তো আছেন। তাঁদের সংখ্যা নেহাৎ নগণ্য নয়। তাঁদের জন্যও কিছু তথ্যসম্বলিত বই-এর প্রয়োজন। প্রকাশকদের দায়িত্ব কিছু আছে এতে। তাঁদেরও এগিয়ে আসাতে হবে।

এখন কথা হচ্ছে—অভিনেতারা তাঁদের এই অভিনয়-রীতি ও কলাকৌশল সম্বন্ধে লিখবেন কিনা। পথে বাধা আছে অনেক। কিন্তু তবুও তাঁদের এগিয়ে আসতে হবে। নৈলে সাধারণ মানুষ অভিনেতৃদের সম্বন্ধে যেসব অলীক ও কাল্পনিক তথ্য জেনে আসছেন তার অবসান হবে কি করে? এই শিল্পকলাটিও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিপূর্ণ এটুকু অনেকেই জানেন না বা বিশ্বাস করতে চান না। কেউ কেউ ভাবেন অভিনেতারা যাদুবিদ্যা জানেন, তাই তাঁদের কলাকৌশলগুলো তাঁরা গোপন রাখতে চান বা তাঁদের মোহিত করে রাখার অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁরা স্মৃতিভ্রষ্ট স্বপ্নচারী। বিশিষ্ট অভিনেতাদের এগিয়ে আসতে হবে ও এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে হবে। তাঁদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য, তাঁদের অভিনয় ধারাকে বিশ্লেষণ করে তথ্য পরিবেশন করতে হবে।

অবিশ্যি এ কাজ সহজ নয়। কারণ, আমাদের দেশের অভিনেতৃবর্গ এতদিন কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অভিনয় কৌশল শিক্ষা করেন নি। দু' একজন সুযোগ্য অভিনেতা বা পরিচালকের সুযোগ্য শিষ্যকে এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এই বৈজ্ঞানিক রীতিতে অভিনয়কলাকে বিশ্লেষণ করতে হবে বর্তমান শিক্ষার্থীদের। এইসব একাডেমীর ছাত্রছাত্রীদের কাছে আমাদের

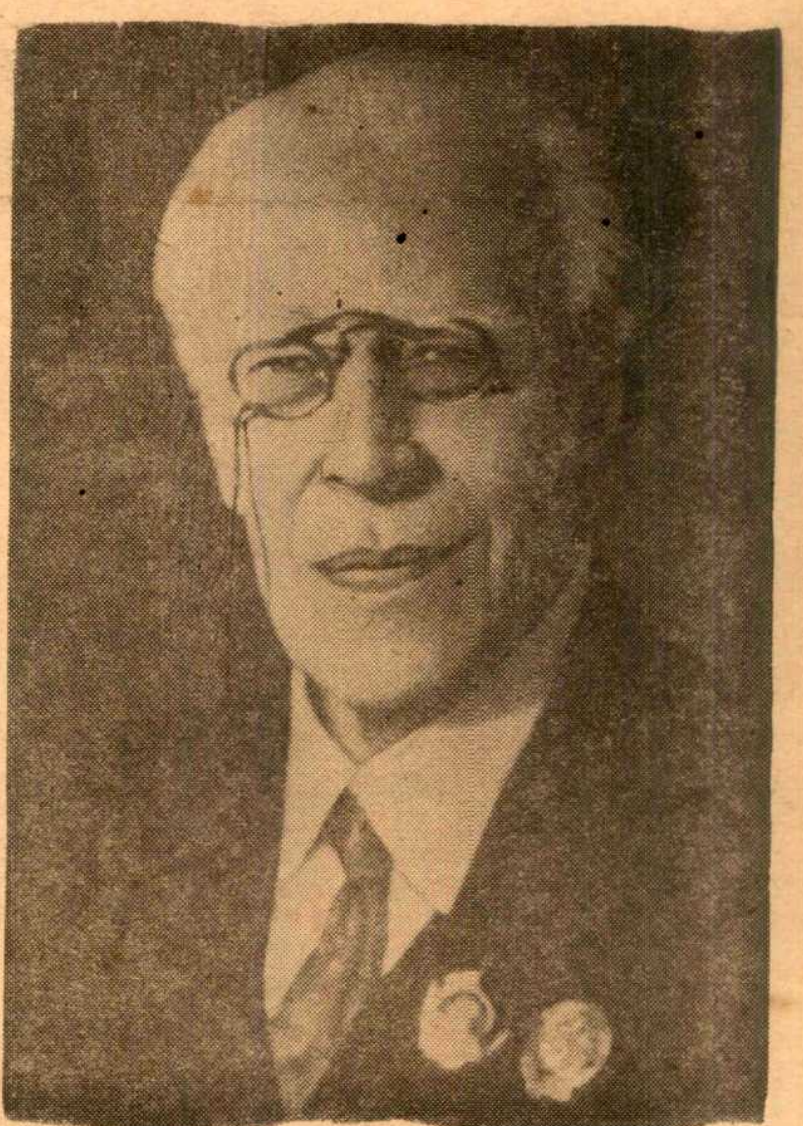

স্টানিস্লাভস্কি

দাবী—এ কাজ তারাই করুন। সরকারের দরজায় মিথ্যে কাজের ধান্দায় না ঘুরে নিজেদের পথ নিজেরাই করে নিন।

পাশ্চাত্য দেশের অভিনয় ও মঞ্চ-গবেষণা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। গ্রীস দেশের এ্যামফি থিয়েটার থেকে বর্তমান যুগের আধুনিক থিয়েটার ও অভিনেতাদের তথ্য-সম্বলিত অনেক বই আমরা পাই। প্লুটো, এ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে এই শিল্প সম্বন্ধে যেখানে যে যা বলেছেন, তাই প্রকাশিত হয়েছে। তা নিয়ে গবেষণা হয়েছে প্রচুর। তবে আধুনিক থিয়েটার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে দুই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের শিক্ষা-পদ্ধতিকে। একজন সোভিয়েত ইউনিয়নের স্টানিস্লাভস্কি ও আর একজন জার্মানীর ব্রেটল্ট ব্রেশট। সোভিয়েত ইউনিয়নের মায়ারহোল্ড ও ভাগতাংগভকেও নিয়ে কম সোরগোল হয় নি। এ'রা সকলেই মঞ্চে অভিনয় ও পরিচালনায় বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অভিনয়-কলা শেখাবার পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। তাই সমস্ত পৃথিবী আজ এঁদের পদ্ধতি জানতে ও শিখতে সক্ষম হচ্ছেন। তাঁদের লেখা প্রচুর বই আমরা পড়তে পারছি এবং সেই সব তথ্য ও রীতি আমাদের দেশের কয়েকজন নতুন পরিচালক ও অভিনেতা অনুসরণ করছেন ও আশ্চর্য ফলও পাচ্ছেন। প্লুটো-র মতাবলম্বী একদল বলে থাকতেন অভিনেতা তার স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি ও আবেগ দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকেন। কিন্তু স্টানিস্লাভস্কি ও তাঁর শিষ্যবর্গ একথাই প্রমাণ করে ছেড়েছেন যে, এই সব অনুভূতি বা আবেগকে প্রকাশ করতে হবে একটি সুপরিকল্পিত ও সুস্পষ্ট নিয়মাবলীর মাধ্যমে। অর্থাৎ অভিনেতার প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি আবেগ আগের থেকেই নির্দিষ্ট থাকবে। মহড়ার সময়ই সে সেগুলি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ঠিক সুনির্দিষ্ট ছকে এনে ফেলবে। অর্থাৎ সমস্ত শিক্ষা-পদ্ধতিটাই বৈজ্ঞানিক উপায়ে হবে।

অভিনেতার ব্যক্তিত্ব বারবার প্রমাণ করতে হয়। কারণ কারুর মতে সে বহুরূপী। সে নানারূপে, নানা চরিত্রে নিজেকে প্রকাশ করে। আবার কেউ কেউ বলেন অভিনেতা সব সময়েই তিনি যা তাই থাকেন কেবল তাঁর ব্যক্তিগত সত্তাকে তিনি প্রতি চরিত্রে বিভিন্ন-ভাবে আরোপ করে দেখান।

যুগের সংগে সংগে অভিনয়-রীতি ও পদ্ধতিরও পরিবর্তন হয়। যখন নাটক লেখা ও অভিনীত হোত মূলত ছন্দে ও কাব্যে ও বীরত্বব্যঞ্জক বক্তৃতার ঢং-এ তখন কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ, স্ববাক্ষেপণ ইত্যাদি-র শিক্ষাই মুখ্য বলে পরিগণিত হোত। কিন্তু আধুনিক নাটকে চরিত্রসৃষ্টি ও আবেগ-এর ব্যবহার করতে হবে কি পদ্ধতিতে—সেটাই হচ্ছে প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। অভিনেতাকে যখন প্রশ্ন করা হয়, কিসের থেকে তিনি তাঁর সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করেন? সাধারণত তাঁরা জবাবে বলেন, তাঁদের শিল্প-সৃষ্টির প্রধান উপাদান তাঁরা পান প্রকৃতি থেকে অর্থাৎ বাস্তব জগৎ থেকে। কিন্তু এই প্রকৃতি যুগে যুগে বদলে যাচ্ছে। অর্থাৎ আজকের যুগে যা স্বাভাবিক ও বাস্তব কাল তা নাও থাকতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাস্তবতাই ছিল বিশাল ও বীরত্বপূর্ণ, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে তা প্রকাশ হোল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাস্তবের রূপায়ণে, আবার বিংশ শতাব্দীতে তার রূপ পেল আধুনিক মনের সংগে কল্পিত বিষয়কে নানারূপে প্রকাশের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে।

এবার আর একটি প্রশ্ন বহু যুগ থেকে অভিনেতাকে বিব্রত করে অভিনেতা কি নিজেই নিজের শিল্পসৃষ্টির স্রষ্টা অথবা সে মাত্র নাট্যকারের চরিত্রের ছায় এবং পরিচালকের হাতের পুতুল? অভিনেতা ও নাট্যকারের মধ্যে বিরোধ বহু যুগ থেকে হয়ে আসছে। গ্রীসের যুগ থেকে Commedia dell' arte ও স্পেনের স্বর্ণযুগ পর্যন্ত। এর মধ্যে আবার গত পঞ্চাশ বছরে পরিচালক এসেছেন আর একটি নতুন বিরোধ সংযোজনা করতে। অভিনেতাদের মধ্যেও কেউ কেউ নাট্যকারের পক্ষ নিয়ে থাকেন আবার কেউ কেউ বলেন, অভিনেতাই মঞ্চে একচ্ছত্র সম্রাট, কিন্তু আধুনিক থিয়েটারে পরিচালকই সর্বেসর্বা।

কিন্তু এসব বিরোধ তো থাকবেই। তার মধ্যে অভিনেতাদের নিজে নিজের মতাদর্শ প্রকাশ করতে হবে। নিজের বক্তব্যকে যুক্তি দিয়ে দর্শক ও পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করতে হবে। অর্থাৎ তাঁদের কথা তাঁদেরই বলতে হবে। তাঁদের নানা সমস্যা, নানা প্রশ্নের তাঁরাই সমাধান করবেন। তাঁদের এগিয়ে আসতে হবে এ কাজে। নৈলে আমাদের দেশের সংস্কৃতি ও শিল্পের একটা বড় দিক অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

নৃত্যশিল্পী নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় 'সূর্যবন্দনা' নৃত্যের একটি বিশেষ ভাংগমায় শ্রীমতী ছন্দা চক্রবর্তী।

চলচ্চিত্রে পরিবেশ পরিবেশনা

একটি সমচেতনা - অস্তিত্বের সমস্যা

পার্থ প্রতিম চৌধুরী

সমস্ত মানুষের যেমন একটা নিজস্ব ভাষা আছে: চলচ্চিত্রেরও তেমনি অত্যন্ত স্বাভাবিক সূত্রেই একটা স্বতন্ত্র ভাষা বর্তমান। সেই ভাষাতেই তার চারুপ্রকাশ। এককথায় এই ভাষার প্রধানতম চেহারাটি হচ্ছে 'মুড্' বা সমচেতনব্যবস্থা। অর্থাৎ যে পরিবেশে যাঁদেরকে ছায়াছবি আলোআঁধারের, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলায় প্রকাশ করবে—প্রমাণ করবে—সেই সর্বকৌণিক চেতনার সমতুল চেতনা দর্শকদের মধ্যে সঞ্জীবিত করার নামই সমচেতনব্যবস্থা বলা যেতে পারে। এর কোনো বাঁধাধরা জ্যামিতিক নিয়ম নিশ্চয়ই নেই—তবু আধুনিক ছায়াছবির বিভিন্ন ও বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচ্ছদপ্রসঙ্গে এই পরিবেশ রচনার নীতিধর্মের দু-একটি উচিত-অনুচিত মনে আসে।

আমার মনে হয় ছায়াছবিতে সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো এই সার্থক পরিবেশ রচনা তথা সমচেতনব্যবস্থার সঠিক মেজাজটি আমদানী করা। এতই কঠিন যে নির্দ্বিধায় বলতে পারি—একটা পূর্ণদৈর্ঘ্যের আধুনিক ছায়াছবিতে এই সার্থক পরিবেশ প্রণয়ন সারা ভারতবর্ষে একমাত্র সত্যজিৎ রায় ছাড়া আর কজন পারেন সন্দেহ। অবশ্য অত্যন্ত ক্ষুর-ধার ও শাণিত বুদ্ধিমার্গের পরীক্ষাধর্মী মননশীল এষণীয় পরিবেশের পরম ছবিটির আবিষ্কারে ঋত্বিক ঘটকের নামটি বোধহয় সর্বাগ্রেই মনে আসে।

ধরুন। খালি চোখে দেখলাম। কনে দেখা আলো ওপাশের ভাঙা দোতলা বাড়ীটার ছাদ ছুঁয়ে নীচে নেমেছে। সাতনম্বর বাড়ীর এক চিলতে বারান্দায় বছর বারোর নাতি-শীতোষ্ণ মেয়েটি চুল বাঁধছে। তেরো নম্বর বাড়ীটার রকে একদল নানান বয়েসী ছেলে-দের বৈকালিক আড্ডা। পাশের লন্ড্রীতে ননীমাধববাবু অবেলায় ঘুমুচ্ছেন। ওপাশের প্রেস থেকে একটানা যান্ত্রিকতার বেসুরো আওয়াজ এবং সেই সঙ্গেই অত্যন্ত সুরে বাজাচ্ছে সামনের বাড়ীটায় কেউ পিয়ানো। দু-একটা ফেরিওয়ালা, চলন্ত সাইকেল, কয়েক-জোড়া চলন্ত পা নিয়ে সামনের রাস্তাটা। সাদা চোখে এর সবটুকু মেজাজই হয় তো আমি পাবো বা পেয়ে থাকি কিন্তু যখনই ছবিতে এই পরিবেশটি আঁকার কথা মনে আসে তখনই নানান বাধাবিপত্তি উঁকি মেরে যায়। প্রথমত চলচ্চিত্রের ক্যামেরার চোখটির যান্ত্রিক নিয়-মানুবর্তিতায় আমরা খালি চোখে যা দেখি বা চট করে যে আলো অন্ধকারের আস্বাদ নিতে পারি সেটা ঠিক সেই একই স্বরলিপিতে সেখানে কখনোই উপস্থিত হতে পারে না—যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে জীবনকে দেখার এই প্রাথমিক বিপদটি তাই শেষ পর্যন্তই থেকে যায়। পরিবেশ রচনায় পরিচালকের ডিটেল রেকর্ড করার অ্যাটিচুডের পরেই যার প্রধান দায়িত্ব তা হলো ফটোগ্রাফী এবং সেখানে

'ব্রেক' ছবিতে নবাগতা সুপর্ণা সেন।

যাদুকর কে ন না কেন ম্যাজিকওয়ার্ল্ডটি কিন্তু ক্যামেরা মানে একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র।

সেই বিকেলের সেই চেনা রাস্তার চেনা ছবিটি আঁকতে বসে একনজরে যা আমরা সবাই দেখি ক্যামেরার নজরে তা দেখার উপায় থাকে না। প্রথমেই বাধা আসে—সে বাধা লেন্সের। অর্থাৎ ক্যামেরার চশমাটির। এখানে প্রসার সিলেকসান অব লেন্সেস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। লং সট—অর্থাৎ দূর থেকে অনেকটা দেখা সুতরাং হয় সেখানে আমরা আঠারো অথবা আটাশ অথবা পঁচিশ নিদেন অভাবে ক্যামেরাকে একটু দূরে ঠেলে পঁয়ত্রিশ লেন্সের সাহায্য নিতে পারি। কিন্তু আঠারো লেন্সের দূরত্বের মধ্যে একটা ঠেলে দূরে সরিয়ে দেওয়ার অ্যাটিচুড আছে—যেন একটা ফোর্সড ডিসটেন্স—কিছুতেই তা দূরে দাঁড়ানো চোখের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে মিলতে চায় না। এমনি করে মানুষের চোখের লেন্সের সঙ্গে এই যান্ত্রিক লেন্সগুলোর তফাৎ স্বভাবতই প্রকট হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে একমাত্র ভরসা, এবং সেই ভরসাতেই যদি নির্ভুল হই তাহলে অনেকেই বাজীমাৎ করি তা হলো দৃষ্টিকোণ নির্বাচনে অর্থাৎ টেকিং-এর অ্যাঙ্গেল সিলেকশানে। অর্থাৎ সহজ কথায় ক্যামেরা কোথায় বসাবো তার ওপরেও আমার সেই চেনা ছবিটিকে বা পরিবেশটিকে ধরে রাখার মজা নির্ভর করে। এবং শেষ পর্যন্ত প্রায় সর্বাংশেই নির্ভর করে। আর এই ক্যামেরা-কোণ-নির্বাচনের ব্যাপারে যার দখল যত বেশী, তাকেই আমরা চলচ্চিত্রের ভাষায় প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন সুরসিক শিল্পী বলবো—বলবো, আর্টিস্টিক। সুতরাং যেমন ছবিতে ক্যানভাস কথা বলে তখনই যখন রঙ-তুলির দৌরাত্ম্যের বদলে লালিত্য এসে উপস্থিত হয়, তেমনি এ প্রসঙ্গেও পরিবেশ রচনাটি সার্থক হবে তখনই যখন শুধুমাত্র কতকগুলো চলন্ত ছবি না তুলে কতকগুলো সুন্দর কৌণিক নির্বাচনে আমাদের সেলুলয়েডের ফ্রেমটিকে লাবণ্যিক করতে পারবো। এই নির্বাচনের শক্তির মধ্যে গ্রহণবর্জনের সংযম, শিল্পীসুলভ মেজাজ ও রসজ্ঞ চোখটি একটা বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে। এবং এই কৌণিক নির্বাচন থেকেই গল্প আঁকার কায়দাটি এসে যায়—আর সেখানেই প্রসঙ্গগত সিনেমার 'স্টাইল' কথাটিও চলে আসে। প্রত্যেক শিল্পরসিক পরিচালকের ক্যামেরার এই চোখটিই তার নিজস্ব স্টাইলে তাকে স্বতন্ত্র করে রাখে যার ফলে আমরা আন্তোনিয়নির সঙ্গে বার্গম্যান অথবা হিচককের স্টাইলের তফাৎ একনজরেই ধরতে পারি।

'রাজা রামমোহন'-এর রূপসজ্জায় বসন্ত চৌধুরী।

'মুখুজ্যে পরিবার' ছবিতে সুলতা চৌধুরী।

কৌণিক চিন্তায়ন এবং লেন্স পছন্দ করার ব্যাপারে কিছু কিছু পরিচালকের কয়েকটি বিশিষ্ট অ্যাটিচুড বা ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়—যেমন আন্তোনিয়নি ও ফেল্লিনি অধিকাংশ সময়েই মিড্‌লং ট্রিট্‌মেন্টে বিশ্বাসী, এঁদের সবচেয়ে আদরের লেন্সও তাই পঁয়ত্রিশ, আঠাশ ও চল্লিশ। ত্রুফো ক্লোজ ট্রিট্‌মেন্টে অধিকতর আস্থাবান, যেমন বার্গম্যান। কুরোসাওয়া প্যারালাল ট্রলির পক্ষপাতী, খুব বেশী ক্রেনসট ব্যবহার করেন হিচকক। খুব কম ক্রেন ব্যবহার করেন বিলি ওয়াইল্ডার। আধুনিক ছবিতে পোলানস্কি, ওয়াইলার, ওয়াজদা লংসট এবং ট্রলি সটে পক্ষপাতী। সত্যজিৎ রায়ও মিডলং-এ এই কাজ করেন বেশী, অধুনা তাঁর ছবিতে জুম্‌লেন্সের অধিক ব্যবহারও লক্ষণীয়। ঋত্বিক ঘটক একট্রিমিস্ট; অত্যন্ত ওয়াইড অ্যাঙ্গেল পছন্দ করেন নয়তো ডেড্‌ক্লোজ—তাঁর সবচেয়ে পছন্দের লেন্স তাই

আঠারো এবং উল্টোদিকে একশো পঁয়ত্রিশ। ক্যামেরা দৃষ্টিকোণ নির্বাচনে অসিত সেনেরও একটা নিজস্ব স্টাইল আছে—উনিও সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন একশো লেন্স অর্থাৎ ক্লোজ আপে কাজ করার। ব্যক্তিগতভাবে আমার আঠারো, চল্লিশ ও একশোর ওপর অত্যন্ত দুর্বলতা—এবং আমিও ক্লোজ আপে কাজ করায় বিশ্বাসী। যদিও এ সবই প্রয়োজন অনুসারে বিধিসংগতভাবেই হয়ে থাকে—নইলে কারুর স্টাইলই কার্যকারণ সম্পর্কিত না হলে তা আর স্টাইলের পর্যায়ে পড়ে না।

পরিবেশ রচনায় ক্যামেরার কৌণিক চন তো গেল প্রকাশভংগীর একটা দিক—আসলে এই পরিবেশ রচনার স্বাস্থ্যপেক্ষটি নির্মাণ করবেন পরিচালক—যাঁর ডিটেল ওয়ার্কের সেন্সটি এখানে কাজ করবে, কাজ করবে সমগ্রভাবে ও প্রয়োজনবোধে অসংলগ্নভাবে জীবন ও তার আনন্দ-যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা, তাঁর সাহিত্যবোধ, তাঁর চিত্রকল্পজ্ঞান, তাঁর স্বধর্ম। কল্পনা করে করে বাস্তবকে আঁকার এ কাজ অত্যন্ত দুরূহ। একটা সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ীর আটপৌরে ড্রইংরুম তো আপনারা কত বাঙলা তথা ভারতীয় ছবিতে দেখেছেন—কিন্তু মনে করুন তো—তার মধ্যে কটি ঠিক ঠিক আপনার বা আমার বাড়ীর ড্রইংরুমটির মতো। ঘর সাজানোর প্রসংগে শিল্পনির্দেশকের দায়িত্বও প্রসংগত এসে পড়ে। শিল্পন-পরিকল্পনায় পরিচালক ও শিল্পনির্দেশক তাঁদের নিজস্ব রুচি নিজস্ব দৃষ্টিভংগী এবং সর্বোপরি নিজস্ব স্টাইলাইজেসন সম্পর্কে যখন একাত্ম হতে পারবেন তখনই চিত্রনাট্যের সেই নায়িকার ঘরটি ঠিক সেই নায়িকার যন্ত্রণাটির সমস্ত উত্তাপ নিয়ে হাজির হতে পারবে। নইলে দরজা-জানালা-খাট-পালংক সবই হবে—প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে না। পরিবেশ রচনা করতে বসে তাই নিষ্প্রাণ বাস্তবের একটা মোটামুটি কার্বন-কপি হয়তো বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা করতে পারি—কিন্তু কোনো মন্ত্রবলেই সে পুতুলকে প্রতিমার দিব্যতায় লালিতকল্যাণ করতে পারি না। এই খামতিই আমাদের সিনেমায় সিনেমার গন্ধটুকু রেখে যায়।

আমাদের বীক্ষণশক্তিকে এই সূত্রে অণুবীক্ষণিক করার কোনো প্রক্রিয়া নেই, কোনো নিয়ম নেই—এই 'চোখের আলোয়' 'চোখের বাইরে' দেখার মেজাজ এবং প্রতিভা দুই-ই পরিচালকের একান্ত অন্তরের ব্যাপার। আর সেই সংগে রুচি, বোধ এবং বুদ্ধিরও। আধুনিক ছবির সর্বাধুনিক অলংকরণে আর একটি চালুকথা শোনা যায়—তা হচ্ছে ডিটেল ওয়ার্ক। অর্থাৎ বাস্তবিক খুঁটিনাটি। এই ডিটেল অঙ্কনে সত্যজিৎ ব্যক্তিত্ব ছাড়াও আর একজন চিত্রকরের কথা মনে আসে—তিনি হলেন মৃণাল সেন। মৃণালবাবুর ছবিতে, ক্রমশ যিনি অত্যন্ত সনিষ্ঠ এবং কৃতবিদ্য হচ্ছেন, পরিবেশ রচনা এবং তার চেয়েও 'ডিটেল' রচনার যে সাহিত্য বর্তমান তার প্রসাদকৌলিন্য তুলনাহীন! এমন ছোট ছোট ডেলিকেসির মধ্যে দিয়ে তিনি বড় কিছু আঁকেন যা তার প্রচণ্ড বিশ্লেষণী শক্তি ও সুগভীর জীবন অভিজ্ঞতারই অনবদ্য অন্বয়। পৃথিবীর ছায়াছবির ইতিহাসে সেই বিশিষ্ট ঐতিহ্য—চার্লি চ্যাপলিনের ডিটেল ওয়ার্ক এবং পরিবেশ রচনার ঐশ্বর্যকেও ভোলা যায় না। তাঁর সব ছবির মধ্যে যে অনলস স্বতঃস্ফূর্তির মাত্রাকাল বর্তমান তার তুলনা কোথায়? প্রসংগত স্বতঃস্ফূর্তি বা স্পন্টেনিটি এই বিশুদ্ধ শিল্পচেতনার অংগীভূত না হলে, সেক্ষেত্রে বোধহয় অনেকটা মজাই নষ্ট হয়ে যায়। আর আজকের দিনে, আজকের চলচ্চিত্রে—পরিবেশ প্রস্তুতি তথা সমচেতন-ব্যবস্থার ঊষ্ণতা সহৃদয় না হলে কোনো আধুনিক ছবিই তার বিশিষ্ট সংজ্ঞার বিশুদ্ধতায়, শিল্পের সেই বলা না বলার ছায়া-বাণীটিকে শাশ্বত করার স্পর্ধা রাখতে পারে না।

চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ললিতা চ্যাটার্জী।

গৌরকিশোর ঘোষ

একটী নটী ও এক সন্ন্যাসীর উপাখ্যান

বর্ষাপক্ষান্ত শ্রাবণের সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর নিশীথে পথে বের হতে আর যেই ভীত হোক, নগরনটী বিন্দুমাত্র ভয় পেল না। দাসীর সহায়তায় নানা অলঙ্কার আচ্ছাদন আর গন্ধদ্রব্য সহযোগে তার শৃঙ্গার যখন পরিপাটিরূপে সমাপিত হল, তখন রাত্রির দ্বিতীয় যাম অতিক্রান্ত।

ক্ষীণ বর্তিকাহস্তে দাসী বাহির দুয়ার অর্গলমুক্ত করে বারেক আকাশ পানে চাইল। দেখাদেখি নটীও।

নম্রকণ্ঠে দাসী বলল, বড় অন্ধকার। পথে সর্পভয়। সঙ্গে যাব কি?

বর্তিকার আলোকে নটীর অনিন্দ্য ওষ্ঠাধরে কৌতুকপ্রবাহ সঞ্চালিত হল।

আসব আবিষ্ট নটী কিঞ্চিৎ স্খলিতস্বরে জবাব দিল, নিতান্ত ভাগ্যহত ছাড়া বর্ষাঘন এই কামুক রজনীতে কোন ভুজঙ্গই প্রিয়ার আলিঙ্গন ছিন্ন করতে উদ্যোগী হবে না। তুই নিশ্চিন্ত থাক। অভিসারের সাক্ষী রাখা উচিত নয়। দুয়ার বন্ধ কর। বরং বর্তিকাটি দিতে পারিস।

দাসীর হাত থেকে বেপমানা বর্তিকাটি গ্রহণ করে নটী শিঞ্জিত চরণে সেই শ্রাবণ তিমিরে প্রবিষ্ট হল। যতক্ষণ দেখা যায় দাসী দুয়ার ধরে অপসৃয়মান বর্তিক শিখার প্রতি চেয়ে রইল। যতক্ষণ শোনা যায় নটীর নূপুর নিরুণধ্বনি শুনল। তারপর মৃদু মৃদু হেসে দুয়ারে অর্গল তুলে ঘরে ফিরে গেল।

নগরপ্রাকারের গা ঘেঁষে যে পথ মদন-উদ্যানে গিয়ে শেষ হয়েছে, নটী সেই পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। ঐ উদ্যানের পুষ্পশোভিত কুঞ্জভবনেই তার আজকের অভিসার। নটী জানে সেখানে রতিরঞ্জন রাজকবি তার উদ্দেশে কাব্য রচনায় নিমগ্ন রয়েছে।

নটী কবির কথাই ভাবছিল। তার জীবনে যত নাগর এসেছে তাদের মধ্যে এই কবিই দুর্বোধ্য। নটী বারবধূ। পুরুষের শয্যার ভাগ নিতে তার কিছুমাত্র জড়তা দেখা যায় না। যে তাকে আমন্ত্রণ জানায়, তার দেহের নৈবেদ্য সে তাকেই উৎসর্গ করে। এ ব্যাপারে নটীর অদ্যাবধি ক্লান্তি আসে নি। নাগরকে তৃপ্ত করাই নটী তার ধর্ম মনে করে।

তার জীবনে প্রভূত প্রতিপত্তিশালী রাজামাত্য, বিত্তবান শ্রেষ্ঠী, পরাক্রান্ত সেনাধ্যক্ষ, এমন কি সদ্য বয়ঃপ্রাপ্ত রাজকুমারদেরও আগমন হয়েছে। তাদের স্নেহের নানা দানের অভিজ্ঞান নটীর আলয়ে এবং দেহের সজ্জায় ছড়িয়ে রয়েছে। কালের স্রোতের মতই এরা এসেছিলেন, আবার একদিন প্রস্থানও করেছেন। কেউই কোনও সমস্যার সৃষ্টি করেন নি। শুধু কবির ক্ষেত্রেই কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছে। নটীর কেন যেন আশঙ্কা হচ্ছে যা পাচ্ছে তাতে কবি যেন তৃপ্ত নয়।

মদনরঙ্গে নিরত কবির গত রাত্রের অদ্ভুত আচরণের কথা নটী ভাবছিল। স্বেদস্রাবী দুটি অস্তিত্বের যে মুহূর্তে সুখশীর্ষে প্রতিষ্ঠ হবার কথা, সেই মুহূর্তেই কবি ক্লান্ত সৈনিকের মত কেমন উন্মনা হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছিল। নিতান্ত আকস্মিকভাবেই কবির সুদৃঢ় বাহুবন্ধন কেমন শিথিল হয়ে এল। দীপ্যমান কোটি সূর্যের বিচ্ছুরিত তেজে যে উষ্ণতা সঞ্চারিত হয়েছিল, তার অপ্রত্যাশিত এই স্তিমিত আচরণে তা পলকে লুপ্ত হয়ে গেল। নটীর জীবনে এ অভিজ্ঞতা একেবারে নতুন এবং বিস্ময়কর। কামনার এমন হঠাৎ মৃত্যু সে এর আগে আর কখনও প্রত্যক্ষ করে নি। এ-যেন তারই পরাজয়।

তবে কি ফুরিয়ে এল নটী? তবে তার

জন্মের যৌবনের ছায়া কি পূর্বগামিনী? আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল নটী। আজ সারাদিন সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের দেহটি দেখেছে। বিলাসগৃহের মুকুরে মুকুরে তার আশ্চর্য সতেজ অঙ্গের যে-সব অনাবৃত প্রতিবিম্ব খেলা করে বেড়িয়েছে, তারাই নটীকে জানিয়ে দিয়েছে, না, এখনও কোথাও চিড় ধরে নি। দাসী মালিনীর চোখে ঈর্ষার আভাস তাকে আশ্বস্ত করেছে, তার ভাণ্ডার এখনও পরিপূর্ণ।

তবে, তবে কি বাজকবিই সুরতক্লান্ত? মা কি নটীর প্রতি সে ক্রমশ বিমুখ হয়ে উঠছে? না, না। নটী নিজেকে প্রবোধ দিল। এ হতে পারে না। কবির নিজের কথাতেই নটী এখনও তার প্রেরণার উৎস। আর শুধু মুখের কথাতেই কবি এটা ঘোষণা করে নি, তার আচরণেও সে তা প্রকাশ করেছে। নটীকে দর্শনমাত্র কবির বিহ্বল মুখে যে ভাব সঞ্চারিত হয়ে ওঠে, মুগ্ধ চোখে যে প্রবল তৃষ্ণা ফোটে তাতো অনুরক্তিরই প্রমাণ। তবে? এই 'তবের সদুত্তর নটী পায় নি। এইটিই তার ভাবনা জাগিয়েছে।

এর আগে কবি একবার নটীকে বলেছিল, স্বর্গের অভিশাপ কি জান, সেখানে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা নেই। স্বর্গ শুধু সুখেরই জন্য। কবির এই হেঁয়ালি সেদিন নটীর মনে কৌতুকের সঞ্চার করেছিল।

হাসতে হাসতে কবির বুক থেকে মুখ তুলে নটী বলেছিল, তাই নাকি? তবে তো সে বড় ভালো জায়গা।

নটীর এই মন্তব্যে কী এমন ছিল সে জানে না। কিন্তু সে দেখে মনে পেয়েছিল যে একথার পর কবি কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখে চেয়েছিল। আর সেই আশ্চর্য চোখ দুটিতে যেন ম্লান মেঘের ছায়া নেমে এল। নটীর মনে হয়েছিল কবির চোখ দুটি সাগরের মতই গভীর। চুম্বনে চুম্বনে নটী সেই সাগরে তরঙ্গ তুলতে চেষ্টা করেছিল। তৎসত্ত্বেও কবি যে কেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল, সে তা বুঝতে পারে নি। নটী ভেবেছিল কথাবার্তার মত কবির আচার-আচরণও হেঁয়ালিতে ভরা।

কবি বলেছিল, তুমি কি স্বর্গের অভিলাষী?

নটী উত্তর দিয়েছিল, নিশ্চয়ই।

কবির প্রশ্ন : ভালোবাসা চাও না?

নটী : স্বর্গে কি ভালোবাসা পাওয়া যায় না?

কবি : না। স্বর্গে ভালোবাসা জন্মাতে পারে না।

নটী : কেন পারে না?

কবি : স্বর্গে মাটি নেই। শস্যের মত ভালোবাসাও মাটিতে জন্মায়। শুধু এই মর্ত্যলোকে। স্বর্গে শুধু এক ঋতু—বসন্ত। একটি মাত্র অনুভূতি—সুখ। স্বর্গে অক্ষিত আলো। পাতালেও প্রেম নেই। সেখানেও একটিই ঋতু—তুষারাবৃত শীত। একটিমাত্র অনুভূতি—দুঃখ। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে পাতাল নিরন্তর আবরিত।

নটী : ভালোবাসা মর্ত্যে জন্মায় কেন?

কবি : মর্ত্যে সবই অনিত্য, সবই অস্থির বলে। মর্ত্যের সীমারেখা যে আলো-ছায়া, রৌদ্র-বৃষ্টি, জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, মিলন-বিচ্ছেদের চক্রবৃত্তে বাঁধা।

নটী : তা হোক। দুঃখে আমার ভয়, যে অনুভূতি দুঃখকষ্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাতে আমার অভিলাষ নেই।

কবি আবার সেই দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নটীর দিকে চেয়ে রইল। তার মুখ ম্লানতর হয়ে এল। ধীরে ধীরে বক্ষের কবোষ্ণ আশ্রয় থেকে নটীকে সুশীতল স্ফটিক বেদীতে নামিয়ে দিল। কবির অন্তস্তল চিরে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসে নটীর কুঞ্চিত কেশে কিঞ্চিৎ দোলা দিয়ে গেল।

তারপর কবি বলল, আচ্ছা নটী, কত পুরুষ তোমার জীবনে এসেছে। যারা চলে গিয়েছে, তাদের কারোর জন্য তোমার মন কাঁদে না?

নটী বলল : আমি বর্তমানের দাসী। তার সেবাতেই আমার সময় কাটে। অতীতে ভক্তি থাকতে পারে, আমার অনুরক্তি নেই।

কবি বলল, নটী, মন বলে কোন বস্তু তোমার নেই। তুমি স্বর্গেরই যোগ্য।

কথাটা স্মরণ হতেই নটী মনে মনে হেসে উঠল। সে উন্মনা হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ হোঁচট খেতেই তার চরণের নূপুরগুলো বেতালা বেজে উঠল। সেই ধাক্কায় বর্তিকার শিখা নিবু নিবু হয়ে এসেছিল। অতি কষ্টে আলোটি বাঁচিয়ে নটী তার পদস্খলনের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হল। ততক্ষণে নটীর চরণাঘাতে পার্শ্বপার্শ্বে শয়ান নবীন সন্ন্যাসীর নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। ধূলিশয্যা ত্যাগ করে সন্ন্যাসী উঠে বসলেন। বর্তিকের ম্লান শিখাতেই দীপ্ত অরুণের মত সন্ন্যাসীর রূপের ছটা নটীর চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

অপ্রস্তুত নটী তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীর চরণে পতিত হয়ে মার্জনা ভিক্ষা করল, প্রভো, এই অপরাধ ইচ্ছাকৃত নয়। ক্ষমা করুন।

সেই সামান্য আলোকে সন্ন্যাসী ক্ষমা-সুন্দর চোখে নটীকে অবলোকন করে শান্ত কণ্ঠে বললেন, কল্যাণ হোক। কল্যাণী, তুমি কে?

নটী সন্ন্যাসীর পায়ে মাথা রেখে পড়েছিল। সেই পবিত্র শরীরের স্পর্শে নটীর দেহ আকস্মিক পুলকের জোয়ারে যেন ভাসতে লাগল। তার হৃৎপিণ্ড, শরীরের অণু-পরমাণু থর থর করে কম্পিত হতে থাকল।

অস্ফুটস্বরে নটী বলে উঠল, প্রভো, আমি সামান্যা নটী।

সন্ন্যাসীর কানে কথাটি সঙ্গীতের মত ধ্বনিত হল। তার চরণে লুণ্ঠিতা নটীকে সন্ন্যাসী দুহাতে তুলে বসিয়ে দিলেন। সন্ন্যাসীর স্পর্শে নটীর দেহ অবশ হয়ে এল। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে রইল।

সন্ন্যাসী বললেন তথাগত তোমার মঙ্গল করুন।

নটী বলল, প্রভো, আপনার এই নবীন কোমল শরীর ধূলিশয্যায় অনুপযুক্ত। আপনি এখানে পড়ে আছেন কেন?

সন্ন্যাসী নটীর সরল আচরণে কৌতুক-লিপ্ত হয়ে বললেন, তথাগতের ইচ্ছায়। কোথায় যাত্রা করেছিল কল্যাণী?

উত্তর দিতে এই প্রথম নটীর দ্বিধা জড়তা দেখা গেল। কুণ্ঠিত হয়ে বলল অভিসারে।

সন্ন্যাসী কিছুকাল আগে গৃহত্যাগ করেছেন। নটীর উত্তরে মনে মনে যৎকিঞ্চিৎ কৌতুক অনুভব করলেন। মায়াবদ্ধ জীব আর নিশ্চয় দুই-ই অপরিণামদর্শী। অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে, এই ঘোর অন্ধকারেও এই নারী অভিসারে বেরিয়ে পড়েছে। প্রভুর কি লীলা!

নটী বলল, প্রভো, কথার ভাবে আপনাকে বিদেশী বলেই মনে হয়। আপনি কোথায় চলেছেন?

সন্ন্যাসী বললেন, মহাতীর্থ কুশীনগরে।

নটী হেসে বলল, ওঃ, অপনিও তবে অভিসারে।

নটীর প্রগলভতায় সন্ন্যাসীর হাস্যোদ্রেক হল ধরেছে ঠিক। এক অর্থে তাঁরও তো অভিসারই।

স্মিতহাস্যে সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, তা বলতে পার

নটী বলল, তথাগত আপনার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

সন্ন্যাসী বললেন, তোমার চক্ষু উন্মিলীত হোক। কল্পনার পরিসমাপ্তি ঘটুক। এখন তোমার অভীপ্সিত স্থানে রওনা হও।

নটী উঠতে চাইল। কিন্তু দেখল তা সম্ভব নয়। কোন অদৃশ্য এক সুদৃঢ় বন্ধনে সে বাঁধা পড়ে গিয়েছে। সন্ন্যাসী অম্লান বদনে সেই ধূলিশয্যায় পুনরায় শায়িত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে নটী তার শরীরে তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল। পথের কঙ্করসমূহ যেন সন্ন্যাসীর নয়, নটীর দেহেই বিদ্ধ হল।

নটী ব্যাকুল হয়ে মিনতি জানাল এই কঠিন কঠোর কঙ্করময় পথের শয্যা আপনার জন্য নয়। কঙ্করের সুতীক্ষ্ণ হিংস্রতা আপনার কমনীয় তনুকে ক্ষতবিক্ষত করবে। হে কিশোর, আপনি এই ধূলিশয্যা পরিহার করুন। আপনাকে এইভাবে এখানে পরিত্যাগ করে যেতে আমার পা উঠছে না।

সন্ন্যাসীর প্রশান্ত কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হল, কল্যাণী, আমার জন্য তোমার কিছুমাত্র উৎকণ্ঠার হেতু নেই। আমি সন্ন্যাসী। এই জীবনেই আমি অভ্যস্ত। বৃথা উদ্বেগে কালাতিপাত না করে, তুমি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশে যাত্রা কর। আমার নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছে।

নটী উঠি-উঠি করল, কিন্তু সেই স্থান ত্যাগ করতে পারল না। একটু পরেই সন্ন্যাসীর নাসিকাধ্বনি শ্রবণে সে বুঝতে পারল তিনি সম্পূর্ণরূপে নিদ্রার বশীভূত

হয়ে পড়েছেন। সন্ন্যাসীর এত সান্নিধ্যে নটী বসে আছে, অথচ তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে একজন পুরুষ নিরুদ্বেগে নিদ্রামগ্ন! নটী নিদারুণ বিস্মিত হল। পরক্ষণেই আহত। এমন পরাভব তার জীবনে ঘটে নি। এ কী সত্য না স্বপ্ন!

নটী এতই অন্যমনা হয়ে পড়েছিল যে, এক সময় অরক্ষিত দীপবর্তিকাটি নির্বাপিত হয়ে গেল, সেদিকে তার চেতনা রইল না। এতক্ষণে সুঘন অন্ধকার নটী ও সন্ন্যাসীকে অবাধে আবৃত করে ফেলল। এবং কালস্রোত অতি মন্থরগতিতে প্রবাহিত হতে থাকল।

নটী এই অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতার আগে আর কখনও কোনও পুরুষকে তার সান্নিধ্যে এত অবিচল থাকতে দেখে নি। কোনও পুরুষের সঙ্গ লাভের জন্য এত আকুলতাও নটী আর কখনও বোধ করে নি। তার কৃপা লাভের জন্যই বরং এতদিন সকলে লালায়িত ছিল। তার উদ্ধত যৌবন অশ্বমেধের অবাধ গতি অশ্বটি এই প্রথম এক কঠিন প্রতিরোধে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে স্তম্ভিত হল।

ওই যে সে, সেই অমিত বাধাটি ধূলি-শয্যায় শায়িত। সেই ঘোর অন্ধকারেও নটী তাকে প্রত্যক্ষ করছিল। কী নিরুত্তাপ, কী নিরুদ্বেগ, কী নিশ্চিন্ত নিদ্রাতেই না অভিভূত! এই প্রথম এক পুরুষ এত নিকটে থেকে নটীর দেহটি স্পর্শ করল না, তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল না, তার দেববাঞ্ছিত থর থর ওষ্ঠাধরে চুম্বনের প্রলেপ এঁকে দিল না। নটীর অভিমান উদ্বেল হয়ে উঠল। ভাবল, তন্মুহূর্তেই সে সেই স্থান ত্যাগ করবে। কিন্তু সেটা কি পলায়ন হবে না?

না, নটী প্রতিজ্ঞা করল, সে যাবে না। থাকবে। কেন? হঠাৎ সে নিজেকেই প্রশ্ন করল, কিসের আশা? সন্ন্যাসী তো কীট-জ্ঞানেই বর্জন করেছে। তবে? না, কীটও নয়। কীটকেও লোকে গ্রাহ্য করে। হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয়। সন্ন্যাসী তো তাকে এটুকু মর্যাদাও দেয় নি। তাকে জ্ঞান করেছে কাষ্ঠখণ্ডবৎ। নতুবা এত নির্বিঘ্নে নিদ্রার কাছে আত্মসমর্পণ করতে সন্ন্যাসীর বাধত। সন্ন্যাসী সতর্ক হওয়ার কথা ভাবত। সে বিচলিত বোধ করত। সে তবে সন্ন্যাসীর কাছে কীটও নয়, মাত্রই একখণ্ড কাষ্ঠপুত্তলি। তার নটীজন্মে ধিক। নিজেকে ধিক্কার দিল।

যে প্রসাধন কাউকে আকর্ষণ করে না সেই প্রসাধনকে নটী ধিক্কার দিল। যে যৌবন ভোগে লাগে না, তাকে সে ধিক্কার দিল। যে নারীর অস্তিত্বকে পুরুষ কাষ্ঠখণ্ড জ্ঞান করে, সেই নারীত্বকে সে বারংবার ধিক্কার দিয়ে নটী তার অপমানাহত মনের জ্বালা প্রশমিত করার প্রয়াস পেল।

পরক্ষণেই ভাবল, এই সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই বেতালসিদ্ধ। নিশ্চয়ই তাকে গুণ করেছে। নচেৎ সে এখানে পড়ে আছে কেন? তার কি নাগরের অভাব? এতক্ষণে তার কবির কথা স্মরণ হল। কবি তার অদর্শনে এতক্ষণে নিশ্চয়ই আশা ছেড়ে দিয়েছে। ভূর্জপত্রে তারই উদ্দেশে রচিত শ্লোকগুলির প্রতি নিবদ্ধ-দৃষ্টি কবির ম্লিয়মান মুখখানি নটীর মনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সংকেতসময় বহুক্ষণ অতিক্রান্ত হয়েছে। নটী আর আসবে না জেনে, নটী জেনে, কবি অস্থির পদচারণায় বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করবে। তার জন্য।

নটী নিজেকেই আবার শোনাল, হ্যাঁ, আমারই জন্য। এ-কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে নটী কিছুটা আশ্বস্ত হল। আত্মতৃপ্তির এই সুখদায়িনী প্রভাব নটীর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করল।

যাই, তবে সেইখানেই যাই। নটী এতক্ষণে উঠে দাঁড়াল। তার চরণের কিঙ্কিনী ধ্বনিত হতেই নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে সন্ন্যাসী বলে উঠল, কে ওখানে?

তন্মুহূর্তে নটী চমকিত হয়ে উঠল। এই কি আহ্বান? তার শরীরে পুলকের স্পন্দন দ্রুততালে নৃত্য করে উঠল। পিপাসাকাতর ব্যক্তি শীতল সলিল দেখামাত্র যেমন শশব্যস্তে করপুট বাড়িয়ে দেয়, তেমনি নটীও সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে কামবিজড়িত চাপা স্বরে বলে উঠল, আমি নটী, তোমার দাসী।

তারপরই নটী নিপুণ নিরিখে নিক্ষিপ্ত বাহুজালে সন্ন্যাসীকে গভীর আশ্লেষে বন্ধন করে তার প্রশস্ত বক্ষে মুখ রেখে অস্ফুটস্বরে বলে উঠল, নিষ্ঠুর, আমি কামপীড়িত। আমাকে তৃপ্ত কর।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল সন্ন্যাসীর আত্মসম্বরণ করতে কিছুটা সময় গেল। প্রশান্তি ফিরিয়ে এনে সন্ন্যাসী বললেন, আমি সন্ন্যাসী। তোমার কামনা নিবৃত্তির মন্ত্র জানি, কামতৃপ্তির মন্ত্র তো আমার কাছে পাবে না। তুমি অন্যত্র অনুসন্ধান কর।

সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা নটীর আবেগকে সংযত করল। নটী বুঝল, সন্ন্যাসীর স্বর দৃঢ় বটে তবে রূঢ় নয়। সে অনুভব করল, সেই স্বরে রাগ বা দ্বেষ লেশমাত্র নেই, বরং অনুকম্পাই ঝরে পড়ল। সন্ন্যাসীর নিশ্চল শরীর থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে মাথা নিচু করে বসে থাকল।

সন্ন্যাসী মনে মনে ভাবল, তথাগত তাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন।

নটী দুঃখে ও লজ্জায় করতলে মুখ লুকিয়ে ভাবতে লাগল, এ কী বিভ্রম! এ কী জ্বালা! এ কী চরম পরাজয়! তারপর ভাবল, সন্ন্যাসীরা কি রক্তমাংসে গঠিত নয়? আমি কি তবে পাপ করলাম? নটী ভীত হল।

হঠাৎ নটী প্রশ্ন করে বসল, আমি কি অপরাধী?

সন্ন্যাসী কোমলকণ্ঠে উত্তর দিলেন, আমার বোধে নও।

নটী বলল, আমি কি কারও কাছে অপরাধী?

সন্ন্যাসী : তথাগতই জানেন।

নটী : আমার মনে কামনার এই আগুন, কে প্রজ্বলিত করেছে? এও কি তথাগত?

এই প্রশ্নে সন্ন্যাসী চমকিত হলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, জানি নে।

নটী আবার সন্ন্যাসীর পায়ে নিজেকে লুটিয়ে দিল। আর্তকণ্ঠে মিনতি জানাল, সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী, তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিও না।

অকস্মাৎ নটীর চোখে অবিরল ধারা নামল। সন্ন্যাসীর পদপ্রান্ত বিধৌত হতে লাগল। এবং সন্ন্যাসীর মনে নটীর শেষ প্রশ্নটি ঘুরে-ফিরে ধ্বনিত হতে লাগল : আমার মনে কামনার আগুন কে প্রজ্বালিত করেছে? তথাগত কী? সন্ন্যাসী মনে মনে এর একটা সদুত্তর খুঁজতে লাগলেন।

সন্ন্যাসীর ভাবান্তর দেখে নটীর প্রায়-নির্বাপিত আশা আবার সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল। তবে কি সন্ন্যাসীর মন ফিরল?

সন্ন্যাসীর পায়ে আত্মসমর্পণ করে নটী প্রার্থনা জানাতে লাগল, আমাকে প্রত্যাখ্যান কর না। এসো, আমার কুটিরে এসো।

সন্ন্যাসী নটীর এই আকুলতায় করুণা-পরবশ হয়ে তার আহ্বান আর উপেক্ষা করতে পারলেন না। বললেন, কল্যাণী, তুমি আজ গৃহে ফিরে যাও। আমি যাব, সময় হলেই তোমার কাছে যাব।

নটী নিজের শ্রবণকে বিশ্বাস করতে পারছিল না, ঠিক শুনেছে তো। সন্ন্যাসীর পা ছেড়ে দিয়ে উঠে বসল। ততক্ষণে প্রভাত-সূর্যের আলো সন্ন্যাসীর তেজোদ্ভাসিত মুখে পড়ে তাতে স্বর্ণপ্রভা মাখিয়ে দিয়েছে। সেই অপরূপ দ্যুতি অসহ্য হওয়ায় নটী চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করে পরম ক্লান্তিভরে জিজ্ঞাসা করল, কবে সময় হবে?

সন্ন্যাসী যেন কিঞ্চিৎ ক্লান্তিবোধ করলেন। বললেন, তোমার প্রশ্নের উত্তরটি যেদিন তথাগত আমাকে জানাবেন।

বকুল গন্ধে বাতাস উতরোল। অশোক পলাশের আপন আপন ভাণ্ডার উজাড় করে বনভূমিতে রক্তিমতা ঢেলে দিয়েছে। নগরীর পথঘাটও কুমকুম আর আবীর-চূর্ণে রাঙা। মদনোৎসবে এখন পূর্ণ জোয়ার। ক্রমাগত রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত পুরবাসিগণ দিবানিদ্রায় নিমগ্ন।

নানা তীর্থে পর্যটন সমাপ্ত করে সন্ন্যাসী নগর প্রাকারের জনবিরল পথের চাতালে এসে বসেছেন। বকুলের তীব্র সুবাসে, কোকিলের অবিরত কুহুস্বরে এবং এলোমেলো বাতাসে, চঞ্চল বসন্তের সাড়ম্বর আবির্ভাবে সর্বত্র অস্থিরতা। সন্ন্যাসীর প্রশান্ত মনে বুঝি বা তার ছোঁয়াচ লেগেছিল। তার মনে সেই এক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। আজও উত্তর মেলে নি। সেটি বিস্মৃতও হন নি। মানুষের মনে আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি, এসব কে দিল? বহুদিন আগে, সন্ন্যাসীর মনে পড়ল, এইখানেই, এখন যেখানে তিনি বিশ্রামরত এক অভিসারিকা তাঁকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেছিল। নগরে প্রান্তরে সুদুর্গম তীর্থে এই প্রশ্ন তাঁকে পলায়মান হরিণের পিছনে

এসো, আমার কুটিরে এসো।

ব্যাধের শরের মত তাড়া করে ফিরেছে। তাঁকে অস্থির করে তুলেছে।

নিবৃত্তি তথাগতের শিক্ষা। সন্ন্যাসী তা জানেন। কিন্তু প্রবৃত্তি কার দান?

অনেকে তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছেন, প্রবৃত্তি মারেরই মারণাস্ত্র। কেউ বলেছেন, প্রবৃত্তি মারেরই রূপ। এতে তাঁর পিপাসা মেটে নি। এরা কার সৃষ্টি? যিনি আমার, এই বিচিত্র ভুবনের স্রষ্টা, তাঁরই কি? তাই যদি হয়, তবে প্রবৃত্তি পরিত্যাজ্য কেন? প্রবৃত্তিকে ভয় কিসের? নটীর সান্নিধ্যে সেদিন সন্ন্যাসী কি তবে ভয় পেয়েছিলেন?

সন্ন্যাসী যখন এই প্রকার চিন্তায় আচ্ছন্ন, তখন গুটিকয়েক চণ্ডাল একটি দেহকে বহন করে নগর প্রাকারের বাইরে নিয়ে গেল।

আসলে এ সবই মায়া। অবশেষে সন্ন্যাসী সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। চিন্তার বোঝা ক্ষণকালের জন্য নামাতে পেরে স্বস্তি বোধ করলেন। ক্লান্তি অপনোদনের জন্য পাষাণ চত্বরে শয়ন করলেন। পার্শ্বস্থ বকুল-বৃক্ষ থেকে নিরন্তর গুঁড়ি গুঁড়ি বকুল বৃষ্টি হচ্ছিল। সন্ন্যাসীর গায়ে বুকে মাথায় কয়েকটা বকুল ঝরে পড়ল। সন্ন্যাসী কয়েকটি কুড়িয়ে নিলেন। দামাল শিশুর দৌরাত্ম্যের মত ঝরা বকুলের ঘ্রাণ সন্ন্যাসীর নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হল। হাতের মুঠিতে সযত্নে বকুল-গুলিকে ধারণ করে সন্ন্যাসী ভাবলেন, এও প্রতিভাসিক। মায়া।

মায়া? অকস্মাৎ সন্ন্যাসীর মনে প্রশ্ন জাগল, মায়া কী? অনুকৃতি? স্বতন্ত্র সৃষ্টি? মুঠিতে ধৃত বকুলগুলি পুনরায় অবলোকন করে সন্ন্যাসী বললেন, এই বকুল, এগুলি যদি মায়া হয়; তবে কার প্রতিচ্ছায়া? শূন্যের নয়। শূন্য আকারহীন, তাই ছায়া-হীন। দৃশ্যমান এই বকুল যদি মাত্র প্রতি-ফলনই হয়, তবে কোথাও এর সত্যবস্তুটি আছে। আমি যদি প্রতিবিম্ব মাত্রই হই, তবে কোথাও একটা সত্যকারের আমি থাকব।

ভীত ত্রস্ত একদল চণ্ডালের কথোপকথনে সন্ন্যাসীর চিন্তা ছিন্ন হল। নগরপালের নির্দেশে এই চণ্ডালগণ মারী আক্রান্ত পুর-বাসীদের নগরীর বাইরে অরণ্যপ্রান্তে নির্বাসন দিয়ে ফিরে আসছে। মারীর সংক্রমণ তাদেরও বিপন্ন করতে পারে, তাই চণ্ডালগণ ক্ষোভ প্রকাশ করছে। তারা এ কার্যে অনিচ্ছুক।

চণ্ডালদের কথোপকথনে সন্ন্যাসী বুঝতে পারলেন কোনও সুন্দরী রমণীকে তারা নগর-পালের নির্দেশে নগর প্রাকারের বাইরে বিষবৎ পরিত্যাগ করে এসেছে।

এই নারীই একদা যখন সুস্থ ছিল, সন্ন্যাসী ভাবলেন, তখন কত পুরুষেরই না ভোগ্যা হয়েছে। তার কৃপাকটাক্ষ লাভের জন্য কতজনই না ধনপ্রাণ উৎসর্গ করেছে। এই সুন্দর তনুটির অধিকার নিতে কত প্রতি-দ্বন্দ্বিতাই না হয়েছে।

আর আজ? সেই নারী, সেই দেহ, যেহেতু ব্যাধিতে আক্রান্ত অমনি সব মিথ্যে হয়ে গেল! কিসে এত পরিবর্তন? মারী মূলত তো কিছু হরণ করে নি? সেই কবিলোভন মুখ, সেই আয়ত নয়ন, সেই সুতীক্ষ্ণ নাসা, সেই সমুন্নত স্তন, সেই সুগভীর নাভি, জঘনদেশের সুখদা সেই কাম্য-ভূমি, সেই গুরুভার নিতম্ব, সেই সুললিত পদদ্বয়—এই সব কিছু যেমন সুস্থদেহে তেমনি অসুস্থ শরীরেও তো বিদ্যমান। সেই এক অস্থি, এক মাংস, এক মেদ, এক মজ্জায় গঠিত, সেই একই ত্বকে আবৃত দেহ তবু আজ কেউ আর তার জন্য লালায়িত নয়। বরং তার সংস্পর্শ এড়াবার জন্য কি ভীত ত্রস্ত প্রয়াস! এই মায়া। যা সত্য নয়, তাই মায়া। যা স্থির নয়, ধ্রুব নয়, নিত্য নয়, তা সত্যও নয়।

অকস্মাৎ সন্ন্যাসীর দৃষ্টির আচ্ছন্নতা যেন অপসারিত হল। এত সহজে নটীর প্রশ্নের উত্তর মিলবে, সন্ন্যাসী তা ভাবতে পারেন নি। সেইদিনই নটীর প্রশ্নে এই উত্তর দেওয়া উচিত ছিল যে, প্রবৃত্তি রিপু মায়ারই সৃষ্টি।

আবার কিছু বকুল সন্ন্যাসীর গায়ে ঝরে পড়ল। সুমধুর ঘ্রাণ সন্ন্যাসীর সচেতন নাসায় সুখকর প্রলেপ বুলিয়ে দিল। অতি যত্নে বকুলগুলি মুঠিতে তুলে তার কোমল স্পর্শ ক্ষণকাল অনুভব করে সন্ন্যাসী ভাবলেন, এও মায়া। বকুলগুলিকে পথের ধুলায় তিনি সবেগে নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু নির্লজ্জ বকুল সন্ন্যাসীর গায়ে ঝরে পড়ল। মায়া! অস্ফুটে কথাটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী তন্দ্রাভিভূত হলেন।

ক্ষণকালের মধ্যেই দূরাগত নূপুর নিক্কণের মৃদু মৃদু ধ্বনি সন্ন্যাসীর শ্রবণে প্রবেশ করতেই তার মন কারও প্রত্যাশায় হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠল। এই অনুভূতি, এই অভিজ্ঞতা তার সন্ন্যাসজীবনে প্রথম। নূপুরের ধ্বনি যতই নিকটবর্তী হতে লাগল, সন্ন্যাসীর দেহে এবং মনে এক অননুভূত অস্থিরতা প্রকাশ পেতে থাকল।

আসুক নটী। সন্ন্যাসী ভাবলেন, আজ আমার ভয় কী। উন্মনাচিত্তকে শাসন করে সন্ন্যাসী নিজেকেই বললেন, তোমার প্রশ্নের আমি উত্তর পেয়েছি নটী (অবজ্ঞামিশ্রিত এই সম্বোধনে সন্ন্যাসী নিজেই বিস্মিত হলেন। তবু নটীকে কল্যাণী বলতে আজ আর তার ইচ্ছা হল না। কেন না, তিনি ভাবলেন, এ মারেরই অনুচর। তবে আর সমীহ কেন?

—তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়েছি। আর আমাকে বিচলিত করতে পারবে না। সন্ন্যাসী যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন।

নূপুরের নিক্কণ স্খলিত হাসির রূপে বেজে উঠল। নটীর চটুল কণ্ঠ প্রশ্ন করল, কী সে উত্তর, সন্ন্যাসী?

সন্ন্যাসীর মনে হল, পূর্বে যে সংযম, যে

(শেষাংশ ১৫৬ পৃষ্ঠায়)

আজকের এই শরৎ-প্রভাতে স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমিকে দু'চোখ ভরে আর একবার নতুন ক'রে দর্শন করলাম। স্বর্ণপ্রতিমার সোনা সেই কবেই না জানি অঙ্গারে পরিণত হয়েছে, কালের বিবর্তনে গৌরী হয়েছেন মহাকালী; দুঃখে শোকে লাঞ্ছনায় নির্যাতনে চিন্ময়ী মা হয়েছেন ছিন্নমস্তা। তাঁর মণিমুক্তাশোভিত কণ্ঠে দুলছে কোটি কোটি নর-করোটি, তাঁর স্বর্ণশয্যা হয়েছে শ্মশানে, তাঁর দেবভূমি হয়েছে শিবার অবাধ বিচরণভূমি।

এই সেই বহুরত্নশোভিতা বঙ্গভূমি—রামায়ণ ও মহাভারতেরও পূর্বকাল থেকে যার ঐশ্বর্য আর ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল বিরাট বিপুলাকারে। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-পুণ্ড্র ও সুহ্মের মধ্যে বঙ্গভূমির প্রভাব ছিল অসামান্য: ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যক থেকে সুরু ক'রে পর্তুগীজ প্রভাবের মধ্য দিয়ে লর্ড ক্লাইভ-প্রবর্তিত ইংরেজ-শাসন পর্যন্ত বিগত কয়েক সহস্র বছরের যে ইতিহাস, বঙ্গভূমি ছিল সেই ইতিহাসের এক অন্যতমা নায়িকা। হিমালয় থেকে সেতুবন্ধ এবং বরুণ নিকেতন থেকে ক্ষীরোদ সমুদ্র পর্যন্ত একদা রাজ্য সম্প্রসারিত ছিল পাল-বঙ্গের। সে ইতিহাস বহু শতাব্দী পূর্বের হ'লেও আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। দেবপালের রাজত্বকালে যে বঙ্গভূমি আমাদের চোখে পড়ে—তার সীমানা ছিল উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত, পশ্চিমে কাশ্মীর ও পূর্বে আসাম পর্যন্ত। সেন রাজত্বেও এই সীমা ও সেই সঙ্গে বঙ্গসংস্কৃতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। তখনকার গৌরবঙ্গের সংস্কৃতিই ছিল মূলতঃ ভারত-সংস্কৃতি। ভারত বলতে তখন তার এই প্রাণকেন্দ্র বঙ্গভূমিকেই বোঝাতো। বিজয় সেনের পৌত্র বল্লাল সেন যেমন রাজত্ব পরিচালনা করেন, তেমনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' এর মতো স্মৃতি ও জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ'ও প্রায় এই সময়েই রচিত। পাল রাজত্বের গোড়ায় বৌদ্ধাচার্যগণের উদ্যোগে যেমন গড়ে ওঠে 'চর্যাপদ', তেমনি বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন জয়দেব।

বিভিন্ন ধারার নানা সৃজনশীলতা ও পতন-অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে গৌড়ীয় সংস্কৃতি একদা বঙ্গ-ভারতীর গৌরবময় ঐতিহ্যের যে আলোক-বর্তিকা তুলে ধরে; সেই আলোর পথ ধরেই গড়ে ওঠে বিশ্বভারতী বাংলা সৃষ্টি করে তার ভাবী কৃষ্টি। বঙ্গোত্তর বাংলার তেমনি রূপ দেখেছি আমরা বার—ভূঁইএকাদের চরিত্রে আর সন্ন্যাসী জাগরণে। শান্তিকামী বৌদ্ধরাও প্রয়োজনের চাপে এক-সময় এখানে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ মূলতঃ বাঙালীচরিত্রে কোনোকালেই খুব বড় ক'রে নেই। একটি সহজ প্রাণাবেগের দ্বারা সে বিধৃত। বাঙালী যেমন অতি স্বচ্ছন্দে অপরকে নিজের ক'রে নিতে পারে তেমনি নিজেকেও অপরের সুর-সংগতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমন্বিত ক'রে নিতে জানে। বাংলার মাটিই চিরকাল বাঙালীকে এই চরিত্র দান করেছে। নদী-মাতৃক বঙ্গভূমি। কোথাও তা সরুখালের মতো বেণীবদ্ধ হয়ে জড়িয়ে আছে, কোথাও বিলের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে, আবার কোথাও বা ক্ষীণ নালার মতো ছড়িয়ে গেছে এদিকে সেদিকে। মাঝে মাঝে জেগে আছে শান্ত

রণজিৎকুমার সেন

সরোবর। পশ্চিমবঙ্গে মাটির ঈষৎ রুক্ষতা হেতু সরোবরের আধিক্য কম ঘটলেও মাটির গভীরতায় জেগে আছে এমন এক শান্ত প্রাণ-রস—যা বিরাগকে রাগে সৃষ্টি করে, রাগকে রাগিণীতে রূপ দেয়। পূর্ববঙ্গের বৈরাগী যখন তার গোপীযন্ত্রে ধ্বনি তুলে কণ্ঠে ভাটিয়ালী ধরে, পশ্চিমবঙ্গের বৈরাগী তখন হাতে একতারা নিয়ে বাউল ধরে গলায়। মূলগত প্রাণরস একই। এই রস বাংলার মাটির রস। এই রসের ভিয়ানেই বাঙালী-চরিত্র সংগঠিত। মন তার বর্ষার স্রোতের মতো। যখন সে প্রধাবিত হয়, তখন সে দুর্মদ সেনার মতো এগিয়ে যায়; আবার ভাটার পথে পলিমাটির উর্বরতার ন্যায় স্নেহ-শীলা জননীর মতো স্নেহে প্রেমে আপনার মধ্যে আপনি মধুর হয়ে ওঠে। তার এই মধুর রূপটিই চিরকালের শ্রেষ্ঠ রূপ। এই মধুরতার ক্ষেত্রেই সে বিশ্ব থেকে স্বতন্ত্র হয়েও আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত। কর্তব্যের অনুরোধে সে সৈনিক হয়ে প্রত্যক্ষ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু লক্ষ্য তার রণক্ষেত্র নয়, সাধনক্ষেত্র। সে-সাধনা জীবনসাধনা, আত্মার সাধনা। আত্মোপলব্ধির জন্যই তাকে রাজনীতিতে সাড়া দিতে হয়, অর্থনীতির ভাঙা বনিয়াদের গরমিল হিসেবের পৃষ্ঠায় কৌটিল্যের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়। কিন্তু এর মধ্যে তার হৃদয় নেই; হৃদয় তার একতারার সহজ সুরে, দৃষ্টি তার ফিরে ফিরে যায় বন-বীথির শান্ত ছায়ায়—নদীর উপলখণ্ডে। এই মনটিই তার বিশ্বমন থেকে স্বতন্ত্র হয়ে বিশ্বকে আপনার দিকে আকর্ষণ করে। বেদে আর কোরাণে পার্থক্য নেই এখানে। শাক্ত, বৈষ্ণব আর ইসলাম এখানে দেওয়া-নেওয়ার একই পাত্রের যেন তিনটি রূপ। সাম্প্রতিক যুগের রাজনীতির দাবার চালের বাইরে এখানে শঙ্করের শিষ্য আর মহম্মদের শিষ্য তো পাশাপাশি বাস করেই একদা রচনা করেছে বিবর্তিত বাংলার প্রাণের গুল-বাগিচা। বাইরে থেকে মুসলিম আক্রমণ এদেশের প্রাণের নাড়ীতে নাড়া দিলেও তাকে বিধ্বস্ত করতে পারে নি। বীণার তার তখন নতুন ক'রে বেজেছে।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের বাঙালী ব্রাহ্মণ ভদ্রবাহু জৈনধর্মে দীক্ষা নিয়ে রচনা করেন 'কল্পসূত্র'। সে গ্রন্থের আজও তুলনা নেই। ষষ্ঠ শতাব্দীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন বাঙালী বৌদ্ধ শীলভদ্র। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের কথা তো একালের লোকেরাও জানে। বাঙালী বাংলার সংস্কৃতি প্রচারে ছুটেছে তখন চীনে, জাপানে, তিব্বতে, লঙ্কায়, ব্রহ্মে, শ্যামে, যবদ্বীপে, সুমাত্রায়। পৃথিবীর এমন ক্ষেত্র খুব কমই আছে—যেখানে বাংলার প্রাণের বাণী গিয়ে পৌঁছায় নি। ঘরমুখী বাঙালী ব'লে আজ যাদের মুখে অপবাদের কলঙ্ক লেপন করা হয়, তারাই একদা বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে সৃষ্টি করেছে নব নব সংস্কৃতির দুর্গ। এখান থেকে মসলীন গেছে, লোহা গেছে; তার স্বাক্ষর তো আমরা বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেণ্ট আর ব্যাবিলনের ইতিহাস থেকেই পেয়েছি। শৌর্য-বীর্য ও বীরত্বেও বাঙালী সেদিন পিছিয়ে ছিল না। রামায়ণ-মহাভারতের কাল থেকে সীরাজদ্দৌলার রাজত্বকাল পর্যন্ত ইতিহাসে বাঙালীর যে শৌর্য-বীর্যের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, তা বিপুল গৌরবের। ভৌগোলিক সীমার ক্রমিক-পরিব্যাপ্তি এবং সেই সঙ্গে ভূমির অখণ্ডতা সেদিন বাঙালীর প্রাণে যে ঐক্যবোধের প্রেরণা দিয়েছিল, এই সূত্রে সে ইতিহাসও বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশজননী সেদিন যেন মহামায়া গৌরী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর রূপের ছটায় দিকদিগন্ত তখন আলোকিত। পদতলে তখন তাঁর শত্রু বিমর্দিত; তাঁর শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত তখন দশদিগন্ত।

কিন্তু বিধাতার আশীর্বাদের সঙ্গে অভিশাপও বুঝি কম ছিল না। বাংলার ভৌগোলিক সীমা ক্রমে এলো সঙ্কুচিত হ'য়ে। ১৭৭৬ সালেও পাটনা, মুঙ্গের, রাজমহল, জৌনপুর, বালেশ্বর ও কটক সুবেবাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯১১ সালেব পূর্বে অবিভক্ত বাংলার মধ্যে যেসব অঞ্চল ছিল, তা হচ্ছে—পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ, কাছাড়, শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া, মানভূম, ধলভূম, সাঁওতাল পরগণা, পূর্ণিয়ার পূর্বাংশ, বালেশ্ববের অংশ, কুচবিহার, ত্রিপুরা ও সিকিম। মোট আয়তন ছিল ১০৭৭৩১ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ছিল ৭০৮২২৪৪৩। এই হিসেবমতেই বুঝি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী ক'রে, মানুষ করো নি।'

প্রাচীন গৌরবের ঊর্ধ্বচূড়া থেকে আদর্শচ্যুতির নিম্নভূমিতে এসে ঠাঁই নিয়েছিল বুঝি সেদিন বাঙালী। লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গবিভাগের ফলে ১৯১১র পব বাংলার মোট বর্গমাইল দাঁড়ায় ৭৭৩৪২, লোকসংখ্যা—৬৩৩০৬৫২৫, আর ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর ভারত-অন্তর্গত পশ্চিম বাংলার এই আয়তন দাঁড়ায় মাত্র ২৯৫৩৩ বর্গমাইল, এবং অবাঙালীর ক্রমিক ভিড়ে লোকসংখ্যা হয় ২,৪৮,১০,৩০৮। অবাঙালীর এই ভিড় ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং এই ১৯৬৫ সালে আজ তা পরিণত হয়েছে সমুদ্রে। ইংরেজ জানতো যে, বুদ্ধিজীবী বাঙালীকে বিপর্যস্ত ও দুর্বল ক'রে তুলতে পারলে তার জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতাস্পৃহা সহজেই নির্বাপিত হবে। কম্যুনাল এওয়ার্ডের সৃষ্টি ক'রে হিন্দু-সমাজের মধ্যে নানা বিভেদ এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ সৃষ্টি ক'রে ইংরেজ এদেশের মানুষে মানুষে দেয়াল রচনা ক'রে চাইল রাজকার্য চালু রাখতে। এ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

'These walls leave their mark deep in the minds of men. They set up a principle of 'Divide and Rule' in our mental outlook which begets in us a habit of securing all our conquests by fortifying them and seperating them from one another. We divide nation and nation, knowledge and knowledge, man and nature.'

আর এরই অবশ্যম্ভাবী ফল হ'লো বঙ্গ-বিভাগ।

১৯০৫-এর সংহারকার্য পূর্ণভাবে সিদ্ধ হ'লো ১৯৪৭-এ। বাংলাকে ভাগ ক'রে ভারতকে টুক্‌রো ক'রে ইংরেজ দিয়ে গেল স্বাধীনতার সনদ। মাথা পেতে সানন্দে তা গ্রহণ করলো ভারত ও পাকিস্তান। লক্ষ লক্ষ সুস্থ মানুষের জীবন হয়ে উঠলো অসুস্থ, প্রাণ নিয়ে ছুটলো তারা এদেশ থেকে ওদেশে। যারা ছিল এক-কালের সুহৃদ, রাতারাতি তারা হ'লো শত্রু। ভারত ও পাকিস্তানের চাপে সিন্ধু, নর্মদা, গঙ্গা আর পদ্মা হয়ে গেল আলাদা। এর জলে হয় তর্পণ, ওর জলে ওজু। এই বিভাগের ফলে শিল্প গেল, বাণিজ্য গেল, শিক্ষা গেল, সামাজিক অধিকার গেল, গেল মান, গেল ইজ্জৎ।

রামমোহনের বাংলা, বিদ্যাসাগরের বাংলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাংলা, সুরেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ- চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রের বাংলা এক নিমেষে কোন্ অতলতলে ভেসে গেল! তাঁদের শিক্ষা, তাঁদের সাধনা পারলো না দেশের প্রাণকে ধ'রে রাখতে। খণ্ড ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বঙ্গভূমি। যে দেশের হিন্দুরা একদা মুসলমানের দরগায় গিয়ে সিন্নি দিত, মুসলমানেরা হিন্দুদের কালীপুজোয় এসে অংশ গ্রহণ করতো, সে দেশ উভয় সম্প্রদায়ের রোষ ও বিদ্বেষ-বহ্নিতে রাঙা হয়ে উঠলো। বাংলা হলো একদিকে পশ্চিমবঙ্গ, অন্যদিকে পূর্ব-পাকিস্তান। পাকিস্তানের মাইনরিটি হিন্দুরা প্রাণের ভয়ে দলে দলে ছুটে আসতে লাগলো পশ্চিমবঙ্গে। হিন্দুর 'হোমল্যান্ড' পশ্চিমবঙ্গ ঠাঁই দিতে পারলো না সমস্ত হিন্দুকে। তাদের ছড়িয়ে দেওয়া হ'লো সুদূর আন্দামান থেকে সুরু ক'রে উড়িষ্যা, বিহার আর আসামে। এখানেও এদেশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ইংরেজ-নীতিই অনুসরণ ক'রে চললো। বাঙালী বড় সাংঘাতিক জাত। তারা যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম ক'রে জেলে গেছে, ফাঁসিতে ঝুলেছে, অন্যান্য প্রদেশ তখন ব্যবসা ক'রে ক্রোড়পতি হয়েছে। স্বাধীন ভারত যখন সেই ক্রোড়পতিদের কবলে, তখন তাদের ইচ্ছে নয় যে, বাঙালী আবার একত্রিত হ'য়ে মাথা তুলে দাঁড়াক; ইংরেজের মতো সেখানে তাদেরও বড় ভয়। তাই ছত্র-ছান ক'রে দেওয়া হ'লো বাঙালীকে।

পশ্চিমবঙ্গে আগত যে সমস্ত বাঙালীকে বাধ্য হ'য়ে বিভিন্ন প্রদেশে গিয়ে বাস করতে হ'লো, পরবর্তী দু'-এক পুরুষেই দেখা যাবে—তাদের অধঃস্তন পুরুষদের কাছে বাংলা ভাষা বিদেশী বা স্বতন্ত্র প্রাদেশিক ভাষার ন্যায়ই অপাংক্তেয় বা বিভীষিকাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত দুটি বাংলার হ'লেও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার অধিকার দেওয়া হ'লো না; বরং তার এ দাবী নিন্দিতই হ'লো। বাঙালখেদা আন্দোলনে ছেয়ে গেল সাবা ভারত। কর্তৃপক্ষ মজা দেখলেন, কিন্তু এর বিরুদ্ধে শাসনযন্ত্র সম্প্রসারিত করলেন না। এ যেমন প্রদেশ-গত সংকট, তেমনি একদিকে যেমন পশ্চিম-বঙ্গের পতিত জমিগুলির উদ্ধারসাধনের অভাবে বসবাস ও খাদ্যোৎপাদন ক্ষেত্রে সংকট দেখা দিল, অন্যদিকে তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে পাশের হার কমে গিয়ে এবং জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে চাকরী ও ব্যবসা সঙ্কুচিত হ'য়ে প'ড়ে বাঙালীর দুর্দশা চরমে উঠলো। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত কবিরাজ, পটুয়া, চাষী, মালাকর, ঢাকী, মাঝি, তাঁতী, ধোপা প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গে এসে যেমন বাড়তি সংখ্যায় পর্যবসিত হ'লো, তেমনি হ'লো মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজ। অথচ তাদের মধ্য থেকেই একদা লোক-সংস্কৃতির প্রাণস্ফূর্তি জাগ্রত হ'য়ে বাংলার ঐতিহ্যময় জীবনকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছে। সে জীবন হতমান ও বিপর্যস্ত হ'য়ে প'ড়লো। পূর্ববঙ্গের যে যুবশক্তি একদা ইংরেজের রাজকীয় শক্তিকে পরাভূত করবার জন্য জীবনপণ সাধনা করেছিল, পশ্চিমবঙ্গে এসে দেখলো তারা অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছে। উদ্বাস্তুর ভিড়ে পথ, ফুট-পাথ, স্টেশন, ময়দান পূর্ণ হয়ে উঠলো। সরকারী দপ্তর থেকে সুরু ক'রে সর্বদিকে দুর্নীতি আর অব্যবস্থা। বাসোপযোগী গৃহের অভাব, চাকরীর অভাব, বাড়িওয়ালা আর ধনিকশ্রেণীর অন্যায় জুলুম, উদ্বাস্তুদের ন্যায়াধিকারের ক্ষেত্রে পুলিসী জুলুম, পণ্যের আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অসাধু আচরণ প্রভৃতিতে আবহাওয়া এমন বিষাক্ত হ'য়ে উঠলো যে, বাংলার প্রাণপুরুষ হাহাকার ক'রে উঠলো। গঙ্গা-ভাগীরথী যে পুণ্য আশীর্বাদ ললাটে নিয়ে একদিন বাংলার সংস্কৃতি নবীন প্রাণে প্রাণময়ী হ'য়ে উঠেছিল, এক নিমেষে কোথায় তা ভেসে গেল, কল্পনা করা গেল না। বাংলার জীবনে, বাঙালীর জীবনে ঘটলো অমাবস্যার পদসঞ্চার। স্কুল-কলেজে ভর্তি হওয়া থেকে সুরু ক'রে মাইনে দেবার মতো সংগতি নেই ছাত্রদের, বইয়ের কাটতি নেই বাজারে, সংসাহিত্য উৎপাদনক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব দেখা দিল। যে সাহিত্যের চাহিদা বাড়লো, তা সস্তা চটুল কথাসাহিত্য। দুর্দশাগ্রস্ত বাঙালীর শ্রান্ত-ক্লান্ত ভগ্ন মন পারলো না এর ঊর্ধ্বে কিছু কল্পনা করতে। একটা সুস্থ সমাজব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এমন অবস্থা হ'তে বাধ্য। বাঙালীর জীবনে পঞ্চাশের মন্বন্তরের ধাক্কা সামলে উঠতে উঠতে দেখা দিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং তার অনিবার্য ফলস্বরূপ দেশ-বিভাগ। মানুষের জীবন যেখানে নিশ্চিন্ত নয়, জীবনের মান যেখানে স্থিরীকৃত নয়, সেখানে সংস্কৃতিচর্চা গতি পাবে কি ক'রে? কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংগীত এবং নৃত্য বা গীতিনাট্যে অতীত বাংলার লোকসংস্কৃতির স্ফুরণ দেখা দিলেও প্রাচীন বাংলার গৌরব-স্বাক্ষরকে নতুন যুগের প্রগতিশীল প্রাণধারার সঙ্গে মিশিয়ে নবীনকালের মধ্যে বহন ক'রে নিয়ে যাবার উদ্যোগ বড় বেশী দেখা গেল না।

বর্তমানে এই সব সমস্যা আরও বেশী জটিল আকার ধারণ ক'রে সমাজদেহকে একেবারেই পঙ্গু ক'রে ফেলেছে। বিগত দু' দুটো মহাযুদ্ধের অভিশাপ এবং নতুন ক'রে আবার একটা যুদ্ধের আশঙ্কা আজ এদেশের মানুষকে তার জীবনবোধ এবং সত্যের প্রতি নিষ্ঠা থেকে অনেক নিচে নামিয়ে এনেছে। যারা যুবক, যারা তরুণ, তারা

দেখছে—তাদের জীবনে অতীতের ঐতিহ্যও যেমন নেই, তেমনি নেই বর্তমানের কোনো নিশ্চয়তা, আর ভবিষ্যৎ—সে তো এক রহস্যময় অন্ধকারে আবৃত। তারা তাই আজ যথেচ্ছভাবে বিচরণ ক'রে নিজেদের কাছেই অপাংক্তেয় হ'য়ে পড়ছে। মনুষ্যত্বহীনতার প্রকাশ ঘটছে আজ আইনসভার উঁচু মিনার থেকে বিভিন্ন পাড়ার রামবাবু, শ্যামবাবু আর যদুবাবুর বাড়ির কালভার্ট পর্যন্ত। সরকার অত্যধিক দুর্বল এবং ততোধিক নিষ্ক্রিয়। ফলে মুনাফাখোরদের পরোক্ষ শাসনে এ বঙ্গ আজ জর্জরিত। নতুন নতুন নানা কলকারখানা এবং স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ'ড়ে উঠলেও প্রকৃত মানুষের অভাবে দেশের অগ্রগতি আজ অবরুদ্ধ। অথচ এই বাঙালীই সারা বিশ্বে একদিন আপন মহিমা বিঘোষিত ক'রে বঙ্গমাতার মুখ উজ্জ্বল করেছে। সেই বাঙালী আজ বাঘের ঘরে ঘোগের মতো নিজের মধ্যে গোঙাচ্ছে। বঙ্গভূমি আজ পরাধীনতার নাগপাশ কাটিয়েও রিক্তা, বিবসনা। আজ গৃহহীন, অন্নহীন, অবলম্বনহীন বাঙালী মাঝে মাঝে পিতৃ-পিতামহের গৌরবে কণ্ঠ উদ্দীপ্ত ক'রে তুললেও আসলে সে বৃহত্তর অবাঙালীর চাপে কুব্জপৃষ্ঠ ও ন্যুব্জদেহ হ'য়ে পড়েছে। তার ব্যবসা গেছে, চাকরী গেছে, ইজ্জৎ গেছে, সতীত্ব গেছে; অর্থাৎ এক কথায় আজ আর চরিত্র বলতে কিছু নেই তার। কিন্তু কেন? এর মূলে কি তার নিজের অপরাধও কিছু নেই? আছে, অবশ্যই আছে। যতক্ষণ না সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে, ততক্ষণ তার আজকের এই নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও অবমানিত জীবন থেকে মুক্তি নেই। 'আনন্দমঠে' এই প্রায়শ্চিত্তের কথাই ঘোষণা ক'রে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

বিশ্বাস করবো, এই ঘোর অমারাত্রির অবসানে আবার একদিন নবসূর্যোদয় ঘটবে, এর সন্ধ্যায় সভ্যতা হয়ে উঠবে বঙ্গভূমি, এবং বাঙালী আবার তার হৃত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়াবে, বলবে—'বন্দে মাতরম্' বলবে—

'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায়
ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।'

আজকের এই শ্মশান-শয্যায় ব'সে আমি চুপ ক'রে দর্শন করছি সেই আগামী দিনের তিলোত্তমাকে।

এক নটী ও এক সন্ন্যাসীর উপাখ্যান

(১৫৩ পৃষ্ঠার পর)

শাসন নটীর আচরণে ছিল, সে আজ যেন তা পরিহার করেছে। নটী আজ অনেক প্রগল্‌ভা। তবে নটীও কি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছে ওকে? সন্ন্যাসী সতর্ক হলেন।

নটীর প্রশ্ন তাঁর কানে বাজল, আমার প্রশ্নের সদুত্তর যদি না দাও, প্রতিজ্ঞা কর সন্ন্যাসী, আজ তুমি আমার হবে?

কী দুঃসাহসিক! কী নির্লজ্জ আহ্বান এক অজানা আশঙ্কার কৃষ্ণছায়া সন্ন্যাসীর মনে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। কী উত্তর দেবেন, সে কথা ভাবতে একটু সময় নিলেন।

নটীর কণ্ঠ তৎক্ষণাৎ ধ্বনিত হল, যদি সংশয় থাকে, তবে আর উত্তর দিও না, সন্ন্যাসী। তুমি বিশ্রাম কর, আমি যাই।

ব্যাকুলকণ্ঠে সন্ন্যাসী বলে উঠলেন, না, যেও না। দাঁড়াও।

নটীঃ তবে তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত?

সন্ন্যাসীঃ সম্মত।

নটীঃ যদি আমার প্রশ্নের সদুত্তর না দিতে পার তবে তুমি আমার হবে?

সন্ন্যাসীর দ্বিধাগ্রস্ত উত্তরঃ হবো।

নটী। আজ আমার কুঞ্জে যাবে? আমার শয্যার অংশীদার হবে?

সন্ন্যাসী অস্ফুটভাবে, যেন নিজের কানেও কথাটি শুনতে না পান, এমনিভাবে বললেন, হবো।

নটীঃ প্রতিজ্ঞা করছ?

সন্ন্যাসীঃ করছি।

নটীর খল খল উল্লসিত হাসি সেই মুহূর্তে আকাশে বাতাসে প্রবলভাবে বেজে উঠল। প্রবল পবন সেই মুহূর্তে মধুমাসের সমস্ত মত্ততা দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে দিল।

নটী বলল, বল সন্ন্যাসী, কী তোমার উত্তর।

সন্ন্যাসীর আত্মবিশ্বাস শিথিল হয়ে পড়েছিল। তাঁর চিত্ত সংযত হচ্ছিল না।

সন্ন্যাসী বললেন, প্রবৃত্তি, লালসা, কামনা, বাসনা, এসব হৃদয়বৃত্তি মায়া।

নটী প্রশ্ন করল, হৃদয়বৃত্তিমাত্রেই মায়া?

সন্ন্যাসী শেষ আঘাত হানলেন, এ জগৎই মায়া, নটী। সন্ন্যাসীর স্বরে অকুণ্ঠ শ্লেষ। তাঁর হিংস্রতা দেখে সন্ন্যাসী নিজেই উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিলেন।

তাই সন্ন্যাসী বললেন, জগতের মধ্যে যা কিছু, সে-সবই মায়া।

এবং নটী প্রশ্ন করল, মায়া পরিত্যাজ্য?

সন্ন্যাসীঃ অবশ্যই।

নটীঃ তবে তোমার কাছে হৃদয়বৃত্তি মাত্রই পরিত্যাজ্য?

সন্ন্যাসীঃ নিশ্চিতই।

নটীঃ দয়া, ক্ষমা, করুণা, তিতিক্ষা—এই সব হৃদয়বৃত্তিও যেহেতু মায়া, এগুলি তোমার কাছে পরিত্যাজ্য?

সন্ন্যাসী ঝোঁকের মাথায় হ্যাঁ বলতে গিয়েই নটীর প্রশ্নের তাৎপর্য উপলব্ধি করে চমকিত হলেন। তারপরেই নিশ্চুপ। সন্ন্যাসী একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

নটী বলল, সন্ন্যাসী, সদুত্তর দিতে তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বল, এগুলি তোমার কাছে পরিত্যাজ্য?

নিরুপায় সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, না।

নটীঃ মায়া হওয়া সত্ত্বেও এই হৃদয়বৃত্তিগুলি যদি পরিত্যাজ্য না হয়, তবে প্রেম কেন পরিত্যাজ্য হবে, সন্ন্যাসী?

আমি, আমি, সন্ন্যাসী আর্তস্বরে বলে উঠলেন, পরাজিত। আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করো না। কোথায় যেতে হবে, আদেশ করো।

নটীর কণ্ঠ মমতায় কোমল হয়ে এল। বলল, আমাকে অপরাধী করো না সন্ন্যাসী। আমি কি তোমাকে আদেশ করতে পারি? আমি যে তোমার দাসী। তোমারই প্রতীক্ষা করছি।

সন্ন্যাসীর মনে হল, নটীর কণ্ঠে সেই প্রথম সাক্ষাতের মিনতি বেজে উঠল।

সন্ন্যাসী বলে উঠল, আমি প্রস্তুত। কোথায় যেতে হবে? কোথায় তোমার কুঞ্জ?

নটীর কণ্ঠে প্রত্যাশার সজীবতা রণিত হল। বলল, নগর প্রাকারের বাইরে। আপাতত অবণ্যপ্রান্তে।

পায়ে কোমল স্পর্শ পাওয়ামাত্র সন্ন্যাসীর তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল। শশব্যস্তে উঠে বসতেই সন্ন্যাসী অতিশয় অবাক হলেন। কোথায় নটী? প্রদোষের স্তিমিত আলোয় সন্ন্যাসী দেখলেন, একরাশ ঝরা বকুল তাঁর পদপ্রান্তে সকুণ্ঠ প্রণতি জানাচ্ছে। তাঁর চিত্ত গভীর বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে এল। আমি মূর্খ, তাই এই আশীর্বাদকেও মায়া বলে ঠেলে দিয়েছিলাম। এই বলে সন্ন্যাসী ছুঁড়ে ফেলা সেই ঝরা বকুলগুলিকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে পরম আদরে অঞ্জলিভরে তুলে নিলেন।

পথ ততক্ষণে সজীব হয়ে উঠেছে। পুষ্পে অলঙ্কারে শোভিত মিথুন দেহবাস থেকে নানাপ্রকার সুগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে বাঁধভাঙা বন্যার মত মদনমন্দিরে পূজা দিতে চলেছে।

সন্ন্যাসীর মন ক্ষমাসুন্দর আনন্দে ভরে উঠল। তিনি বললেন, আমিই বা পড়ে থাকি কেন? আমারও তো অভিসারের লগ্ন উপস্থিত।

সন্ন্যাসী দ্রুতপায়ে নগর প্রাকারের বাইরে যাত্রা করলেন।

অতীতের অগ্নিদিগন্ত

অনন্ত সিংহ

[সাপ্তাহিক বসুমতীর বিগত স্বাধীনতা সংখ্যায় আমি বিপ্লবী শ্রীমান আনন্দ গুপ্ত ও শহীদ দেবপ্রসাদ গুপ্তের পরিবারের কথা লিখেছিলাম।

১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ সাল। রাত্রে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে চট্টগ্রাম সহর দখল করার পর আমরা চারজন—গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত, মাখন ঘোষাল ও আমি—আমাদের প্রধান বাহিনী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। নৌকা করে সহরের বাইরে গিয়ে সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যার কিছু আগে সহরে ফিরে আসি—সহর তখনও জনমানবশূন্য। সেই রাত্রে আমরা আনন্দের বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম—আশা করেছিলাম—আমাদের বাহিনীর প্রধান অংশ সহরে প্রবেশ করলে এই বাড়ীতে নিশ্চয়ই আমাদের খোঁজ করবে।

আনন্দের মা, বাবা, ছোড়দি ও দশ বৎসর বয়স্ক ছোট ভাই ছোটকোন যে কতখানি সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল এবং নির্ভীকভাবে পুলিশী অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন—গত স্বাধীনতা সংখ্যায় তারই সামান্য বর্ণনা আমি দিয়েছিলাম। আত্মত্যাগের মহিমায় তাঁরা সবাই দেশের কাছে কত বরেণ্য, কত পূজনীয়—সেই সম্বন্ধেই লিখেছিলাম।

এই বাড়ীতে সকালবেলা সশস্ত্র পুলিশ হানা দেয় এবং ছোটকোনের হুঁশিয়ারির সঙ্গে সঙ্গে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পাহাড়ের সারির মধ্যে আত্মগোপন করলাম। ঘণ্টাখানেক পরে আবার সেই বাড়ীতে ফিরে এসে খবর পেলাম যে, আনন্দের বাবাকে পুলিশ গ্রেফ্‌তার করে নিয়ে গেছে। আমরা তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে আবার পাহাড়ে আশ্রয় নিলাম।]

তখন প্রায় বারটা বেজেছে। যতদূর মনে পড়ে শারীরিক ক্লান্তির চেয়েও বেশী ছিল মানসিক ক্লান্তি। আমরা চারজন পাহাড়ের আড়ালে গাছের ছায়ায় বসে বসে ভাবছিলাম—কি করা যায়—কি উপায়ে আমাদের প্রধান বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি! আনুষঙ্গিক অবস্থার পর্যালোচনা করে মনে হচ্ছিল তারা খুব বেশীদূরে হয়ত তখনও যায় নি—হয়ত বা কোন পাহাড়ের কোলে শিবির স্থাপন করেছে।

এই রকম একটা আবছা ধারণা নিয়ে আমরা একরকম বেপরোয়া হয়েই পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে বাজিদ্‌-বোস্তানের রাস্তায় এসে উঠলাম ও উত্তর দিকে এগিয়ে চললাম।

পথের ধারে মাঝে মাঝে চা ও পান-বিড়ির দোকান। আপাতদৃষ্টিতে যে দোকানে একটু কম ভীড় মনে হল—কিছু কেনার অজুহাতে সেটাতে গিয়ে উঠলাম। সেখানে নানা কথার ছলে স্বদেশী সশস্ত্র বাহিনীর কোন খবর তারা রাখে কি-না তা জানতে চেষ্টা করলাম। সব কটি দোকানেই অবশ্য চট্টগ্রামের ভাষাতেই কথাবার্তা চলছিল। আমরা তাদের কাছে ভাণ করছিলাম যেন আমরা পুলিশের গুপ্তচর—স্বদেশী বাবুদের খবর জানতে চাইছি। এইভাবে আমরা প্রায় পাঁচ মাইল পথ হেঁটে পাঁচ-সাতটি দোকানে এইভাবে আমাদের বন্ধুদের খবরাখবর নেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনো ফল হল না।

দুপুর রৌদ্রে হেঁটে হেঁটে সকলেই খুব ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। 'হাটাজারী' রেললাইনের ধারে গাছের ছায়ায় বসে আমরা বিশ্রাম করছিলাম। পাশেই দেখলাম একটা তরমুজ ক্ষেত। তরমুজ ক্ষেত চোখে পড়া মাত্র আমাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা যেন একেবারে শত-গুণ বেড়ে গেল। সামনেই একজন গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—এই তরমুজ ক্ষেত কার? যাকে জিজ্ঞাসা করলাম ভাগ্যক্রমে সেই সে ক্ষেতের মালিক। গোটা দুই তরমুজ তার কাছ থেকে তখনি কিনে নিয়ে টুকরো টুকরো করে—শুয়ে বসে যে-যে অবস্থায় ছিলাম সে অবস্থায়ই খেতে শুরু করলাম। তখন প্রায় বিকেল চারটা। সামনে দাঁড়িয়ে সেই মুসলমান গ্রামবাসী। বয়স তার ২৪।২৫ হবে। সে খুব মনোযোগ দিয়ে আমাদের তরমুজ খাওয়া দেখছিল। হয়তো বা আমাদের চালচলন তার কিছু অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল! হঠাৎ সে আমাদের চমকে দিয়ে বলে উঠলো—"বাউ তোঁয়রা ধাই যও। উঁয়িক্কা চ—গুর্খা পল্টন আইয়েব। হেঁদুর পোয়া দেইলে তারা ধরি নিবো গোই।" (বাবু তোমরা পালাও। ঐদিকে তাকাও—গুর্খা পল্টন আসছে। হিন্দুর ছেলে দেখলেই তারা ধরে নিয়ে যাবে)।

সত্যিই দেখলাম গুর্খা সৈন্য সারি বেঁধে ঐদিকে রেললাইনের উপর দিয়ে আসছে। প্রত্যেকে সঙ্গীন-আঁটা রাইফেল উঁচিয়ে চলেছে High-port arm's-এর ভঙ্গীতে। সৈন্যদের দেখামাত্রই আমাদের অতখানি ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লান্তি সবই যেন নিমেষে কোথায় পালিয়ে গেল। গুর্খা পল্টনের দূরত্ব আমাদের কাছ থেকে খুব বেশী হলেও পঞ্চাশ গজের বেশী কোনমতেই নয়। তাদের গতিপথও আমাদের দিকেই। আমরা রেললাইনের পাশে মাত্র ছয়-সাত গজের মধ্যেই বসেছিলাম। এই পথেই তারা অগ্রসর হচ্ছে। এইরূপ আকস্মিক অবস্থার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না মোটেই।

এই সৈন্যবাহিনী Eastern Frontier Rifles-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। Mr. Lowman ইনস্‌পেক্টার জেনারেল অফ্‌ পুলিশ ও কর্নেল ডলাস্‌ স্মিথ এই সৈন্যবাহিনীকে সেই দিন সেই সময় পরি-চালনা করে নিয়ে চলেছিলেন। এ খবর অবশ্য আমরা তখন জানতে পারি নি। এ তথ্য আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল অনেক পরে—যখন সাক্ষীর কাঠগড়ায় সরকারী সাক্ষীরা তাদের সেই দিনের কর্মতৎপরতার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছিল যে, নানা পাহাড় ঘুরেও তারা 'ইন্‌সারজেন্ট'দের খোঁজখবর কিছুই পায় নি। তাদের অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, যখন তারা আমাদের প্রধান বাহিনীর খোঁজে পাহাড়-জঙ্গলে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে আমরা চারজন তখন তাদের এত নিকটেই বসেছিলাম!

দারুণ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা! যদি তারা আমাদের এতটুকু সন্দেহ করে তবে এখনি কাছে এসে পড়বে এবং তখন পালাবার ইচ্ছা থাকলেও তা আর সম্ভব হবে না। তবে কি আমরা এখনি উঠে পড়ব এবং আত্মরক্ষার জন্য পালাবার চেষ্টা করব? সেরূপ চেষ্টা করা হয়ত যেতো, তবে তাতে ভালোর চেয়ে মন্দের সম্ভাবনাই বেশী ছিল। আমাদের উঠে পড়ে পালানোর চেষ্টা নিশ্চয়ই গুর্খা বাহিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতো এবং আমাদের পালানোর তাৎপর্য তাদের বুঝতে দেরী হত না। এত সব কথা এক নিমেষেই ভেবে নিয়েছিলাম এবং ভিতরে ভিতরে একটা অনিশ্চিতের ভয় ও আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও নিজেকে খুব সহজ করে নিয়ে স্বাভাবিক পরিবেশের কোন ব্যতিক্রম যাতে না ঘটে তারই জন্য মুসলমান যুবকটিকে আমিও তৎক্ষণাৎ চট্টগ্রামের ভাষায় উত্তর দিলাম—"ধাইর ক্যা? গুর্খা আঁরা কিরিব?" (পালাবো কেন? গুর্খা আমাদের কি করবে?) এইটুকু বলে বেশ মনোযোগ সহকারে তরমুজ খেতে লাগলাম—আর যেন কোথাও কিছু নেই—

গুর্খা সৈন্যদের প্রতি আমাদের যেন কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। এই অভিনয়ের সংগে সংগে আবার নানা স্বাভাবিক অংগভংগীর সাহায্যে প্রত্যেকে আমরা আমাদের রিভলবারগুলি প্যান্টে ঢাকা কটিবন্ধ হতে এমনভাবে মুক্ত করে রাখছিলাম যেন শত্রুর গুলি ছোটার আগেই সেগুলিকে মুহূর্তে ব্যবহার করতে পারি।

দেখতে দেখতে গুর্খাপল্টন আরও এগিয়ে এলো। ধুতি-সার্ট পরা আমরা চারজন ও লুঙ্গি-পরা একজন তো তাদের লক্ষ্যবস্তু নয়। তারা বীরদর্পে চলেছে মিলিটারী পরিচ্ছদে সজ্জিত যুবক বিদ্রোহীদের সন্ধানে! আমাদের চারজন নিরীহ গোবেচারীকে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় তরমুজ ভোজনে ব্যস্ত দেখে তাদের সন্দেহের কোন কারণ থাকতে পারে না! কাজেই আমাদের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করেই গুর্খাপল্টন আমাদের কুড়ি-বাইশ গজ দূরে দিয়েই রেললাইন অতিক্রম করে সোজা সামনের পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল। আমরাও এতক্ষণে রুদ্ধ নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম।

এক মিনিটের মধ্যেই আমরা উঠে পড়লাম। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই দেখি সেই মুসলমান যুবকটি আশেপাশের লোকজনদের ডেকে আমাদের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে। ভাবগতিক খুবই সন্দেহজনক মনে হল। ইতিমধ্যে আমরা প্রায় ষাট-সত্তর গজ দূরে এগিয়ে গিয়েছি। ক্রমেই গ্রামের লোক জড় হতে লাগলো এবং বিশেষ দু-একজনের প্ররোচনায় তারা সংঘবদ্ধভাবে আমাদের গতিরোধ করবার জন্য ছুটে আসতে লাগলো। আমাদের হাতে রিভলবারগুলি দেখতে পেলে জানি না তারা নিরস্ত হতো কি-না—তবে সেখানে কোন গোলমালের সুযোগ না দিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব পাহাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দেওয়াই আমরা সমীচীন মনে করলাম। তারা যত দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল তার চেয়ে দ্রুততর বেগে আমরা প্রায় পাঁচ শ' গজ অতিক্রম করে এই সন্দেহজনক জনতার দৃষ্টির বাইরে পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম।

মাত্র তখনই সূর্য অস্ত গেল। আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে এলো। সহর প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল দূরে। বসে আমরা ভাবছি প্রধান বাহিনীর সংগে যোগাযোগ স্থাপন করবার আর কি উপায় আছে!

আনন্দ গুপ্ত ও শহীদ দেবপ্রসাদ গুপ্তের বিপ্লবী পরিবারের মত সহরের দক্ষিণ প্রান্তেও অপর একটি বিপ্লবী পরিবারের সংগে আমাদের যোগাযোগ ছিল। এই বাড়ীটি শহীদ রজত সেনের বাবা রঞ্জনলাল সেনের। বাড়ীটি কর্ণফুলী নদীর তীরেই অবস্থিত ছিল। আনন্দদের বাড়ীর পেছনদিকে যেমন ছোট ছোট পাহাড়ের শ্রেণীর মধ্যে আত্মগোপন করার সুযোগসুবিধা ছিল, তেমনি এই বাড়ীটির অবস্থান নদীকূলে হওয়াতে নৌকা করে আসা-যাওয়ার খুব সুবিধা ছিল। রজতের মা, বাবা, ছোট ছোট সব ভাইবোনেরা সকলেই আমাদের সমর্থক। রজতের বাবা আগে অবশ্য আমাদের বিপ্লবী কার্যকলাপের কিছুই জানতে পারেন নি, কারণ আমরা তাঁর কাছে সব সময় বিশেষ গোপনীয়তা অবলম্বন করতাম।

রজতের বাবা রঞ্জন সেন ছিলেন চট্টগ্রামের জজকোর্টের প্রখ্যাত উকিল। তা ছাড়া তাঁর সংগে প্রায় সমস্ত সরকারী উচ্চপদস্থ জেলা প্রশাসনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ টাউন ক্লাবের সভাপতি—যে টাউন ক্লাবের সভ্যরা ছিলেন সবই পুলিশ ও সরকারী কর্মচারী ও তাঁদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব। রঞ্জনবাবু আমাদের সকলের মেসোমশাই—রাশভারী লোক, তা ছাড়া তিনি যে পরিবেশে থাকতেন, তাতে আমাদের সন্দেহের ও আশংকার অনেক কারণ ছিল। কিন্তু আমাদের জীবনের অনেক ছোটখাটো অভিজ্ঞতার ফলে বুঝেছিলাম—আপাতদৃষ্টিতে অবস্থা যতই প্রতিকূল থাকুক না কেন এমন এমন ক্ষেত্র ও সুযোগ আসে যা প্রতিকূল অবস্থারও পরিবর্তন সম্ভব করে তোলে!

রজতের মা—আমাদের সকলের মাসীমা। তিনি আমাদের সশস্ত্র প্রস্তুতির বিষয় জানতেন। তবে চট্টগ্রাম সহরের সমস্ত বড় বড় ঘাঁটি আক্রমণ ও সমস্ত সহরটি দখল করার পরিকল্পনা তাঁর জানার কথা নয়। এমন কি তা রজতের পক্ষেও জানা সম্ভব ছিল না।

রজত এঁদের বড় ছেলে। যখন সে প্রথম আমার সম্পর্কে এলো তখন সে গভর্নমেন্ট কলেজিয়েট স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। ছাত্র হিসাবে রজতের তুলনা ছিল না। ওরকম সুন্দর মুখাবয়ব, দেহসৌষ্ঠব, গায়ের উজ্জ্বল ফর্সা রং, খুব কমই চোখে পড়ে। চট্টগ্রামের যুবসমাজের কাছে খেলোয়াড় রজত, শরীরচর্চা ক্লাবের বলিষ্ঠ রজত, শিল্পী রজত অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। রজতকে বৈপ্লবিক দলে আকর্ষণ করতে চেয়েছিল অনুশীলন পার্টি। ধীরেনদা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড) যদিও তিনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট তবু সেই যুগেই তাঁর প্রতিভার অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। তিনি বোধ হয় রজতের দু-এক ক্লাশ ওপরে পড়তেন। ধীরেনবাবু মেধাবী ছাত্র, বক্তৃতা দেন খুব ভালো—মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠি ও ছোরা খেলায়ও তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তিনিই রজতকে অনুশীলন দলে টানতে চেষ্টা করলেন। আমাদের দলের মনোরঞ্জন সেন ও মাখন ঘোষালের সংগে রজতের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তারা যখন দেখতে পেল যে রজত হয়ত ধীরেনদার প্রভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়বে, তখন মনোরঞ্জন, আমার সংগে রজতের পরিচয় করিয়ে দিল।

রজত বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমাদের বিপ্লবী দলের সভ্য হলো। রজতও টাউন ক্লাবের সভ্য। বড় বড় ফুটবল ম্যাচে রজত অংশগ্রহণ না করলে তাদের চলে না। সাব-ইনস্পেক্টর ছিদ্দিক দেওয়ান, হেম গুপ্ত প্রভৃতিও খুব ভালো খেলোয়াড়। রজতের সংগে তাদের খুব 'বন্ধুত্ব'। যখন-তখন তারা রজতের বাবার কাছে যায় এবং ক্লাবের প্রয়োজনে প্রেসিডেন্ট রঞ্জনবাবুও রজতকে যখন তখন দরকার কোতোয়ালীতে বা পুলিশ ক্লাবে সেই খেলোয়াড় পুলিশদের কাছে পাঠাতেন। শিল্পী রজত বাংগলার লাট স্যার ষ্ট্যানলী ম্যাকসনের ছবি দু-মিনিটে পেন্সিল স্কেচ করে দিয়ে লাট সাহেবের সুনজরে পড়েছিল।

স্বনামধন্য সুবিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক পরলোকগত ডাক্তার কিরণ সেন রঞ্জনবাবুর আপন ছোট ভাই। রজত কাকু কিরণ সেনের অত্যন্ত প্রিয়। রজতকে উচ্চশিক্ষার্থে তিনি বিলাত পাঠাবেন স্থির হয়েছে।

এই হলো রজতের পারিবারিক পরিচয়। তার চারিদিকের বিপ্লব পরিপন্থী পরিবেশের মধ্যেও সে তার বিপ্লবী সাথীদের সংগে অচল অটল হয়ে রইল। আমাদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিন ঘনিয়ে এলো। আমাদের বৈপ্লবিক শিক্ষার পদ্ধতিও সেই সংগে বদলে গেল। অস্ত্র শিক্ষা আরম্ভ হলো। হাতবোমা ছোড়ার কায়দা বিভিন্ন আত্মরক্ষার উপায় শিক্ষা দেওয়া হোলো। মোটর গাড়ী চালানো, ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতিও প্রায় সবাইকেই শিখতে হলো। রজত এই সমস্ত বিষয়েই সুদক্ষ ও আশ্চর্যরকম পারদর্শিতা লাভ করল। বিপ্লবী সভ্যদের মধ্যেও সকল বিষয়ে পারদর্শী যুবক খুবই বিরল। রজতের মত যুবক তাদের মধ্যে আরও বিরল।

বিপ্লবী সংগঠনের দায়িত্ব অত্যন্ত কঠোর। ব্রিটিশ সরকারের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চকে পরাস্ত করে গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার পথে ও সশস্ত্র প্রস্তুতির জন্য আমাদের অনেক বিশ্বাসী বন্ধুকেও সন্দেহ করতে হয়েছে। চট্টগ্রাম সহরে ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ সালে আক্রমণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের চতুর্দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়েছে, এবং সেই কারণে অনেক বিশ্বাসী সদস্যকেও সন্দেহের চোখে দেখতে হয়েছে। উপায় ছিল না, বিপ্লবী পরিকল্পনাকে জয়যুক্ত করে তোলার জন্য আমাদের সাংগঠনিক শ্লোগান ছিল—"ভুলক্রমে একজন অবিশ্বাসীকে নিগূঢ় পরিকল্পনার কেন্দ্রস্থলে গ্রহণ করার চেয়ে হাজার জন অতি বিশ্বাসী তরুণ বিপ্লবীকে প্রত্যাখ্যান করাও শতগুণে শ্রেয়।"

নিরাপত্তার জন্য এইরূপ কঠোর নীতির অনুসরণ না করে আমাদের উপায় ছিল না। রজতকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেও আমরা বিভিন্ন বিপ্লবী প্রতিকূল পরিবেশের জন্য তার প্রতি আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়েছিল। রজতের অগোচরে খুব সতর্কতার সংগে তাকে সর্বদা অনুসরণ করবার জন্য আমি মনোরঞ্জন, মাখন ও দেবুকে নিযুক্ত করেছিলাম এবং বেশ কিছুদিন ধরে তাদের এই কাজ আমি নিজেই পরিচালনা করি। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর গুরুদায়িত্ব যাকে দেবার আমাদের ইচ্ছা—তাকে

সবচেয়ে বেশী পরীক্ষা তবে নিতে হবে! রজত সে পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হলো।

চট্টগ্রামে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালানোর যে পরিকল্পনা আমরা নিয়েছিলাম, তাকে কার্যে পরিণত করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। বাংলার ও ভারতের বিপ্লবীদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে ও আমাদের পূর্বেকার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা নিশ্চিত বুঝেছিলাম যে, রাজনৈতিক ডাকাতির পদ্ধতিতে অর্থ সংগ্রহ করতে যাওয়া ভীষণ ভুল। রাজনৈতিক ডাকাতির প্রস্তুতির ব্যাপারে ও তারপর সেইরূপ ডাকাতির প্রতিক্রিয়া সামাল দিতেই সমস্ত কার্যক্ষমতা ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টা নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমরা ঠিক করেছিলাম ডাকাতি আর কোনমতেই করবো না।

অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে কয়েকজন খুব বড়লোকের ছেলেদের আমরা দলে নিয়েছিলাম। প্ল্যান ছিল একেবারে শেষের দিকে তারা কেউ কেউ নিজেদের বাড়ি থেকে পিতামাতার অগোচরে "পর্যাপ্ত" টাকা নিয়ে আসবে। কিন্তু নিজের বাড়ি থেকেও যদি টাকা নিয়ে আসে, তাতেও হয়ত কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি হবে এবং সেইরূপ সামান্য আলোড়নও আমাদের প্রতিকূলে যাবে। প্রস্তুতি ও সংগঠনের সময় আমাদের প্রতিকূল আবহাওয়া যতই কম হয়, ততই শ্রেয়। তা ছাড়া আমরা চেয়েছিলাম যে, সব বিপ্লবী যুবকদের আরও একটা স্বার্থত্যাগের পরীক্ষা দেওয়া উচিত। নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলাম —পরের বাড়িতে ডাকাতি বা সরকারী ও রেল কোম্পানীর টাকা যথাসম্ভব লুঠ করাতে বিপ্লবী যুবকেরা যতখানি উৎসাহ পেতেন ততখানি আগ্রহ তাঁদের নিজেদের বাড়ি থেকে ক্ষমতা অনুযায়ী সামান্য টাকা আনতেও দেখা যেতো না। এই দুটি কারণের জন্য আমরা সশস্ত্র প্রস্তুতির আগে পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম যে, যাদের সংস্থান আছে সেইরূপ প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ বাড়ি থেকে টাকা, গয়না, ঘড়ি বা সেইরূপ অন্য কিছু অভিভাবক বা পিতামাতার অগোচরে নিয়ে আসবে। যদি তাঁরা সন্দেহ করেন তো করবেন কিন্তু শর্ত হচ্ছে হাতে-নাতে তারা ধরা পড়তে পারবে না। অন্য আরেকটি শর্ত—টাকার পরিমাণ—১০০ টাকার কম হতে পারবে না—আবার ২০০ টাকার বেশীও হবে না। সময় মাত্র ১৫ দিন। তাদের প্রতি কঠোর নির্দেশ —প্রত্যেকটির অপহরণ কৌশল খুব ভালোভাবে খুঁটিনাটি নানা বিষয়ে দৃষ্টি রেখে আগে থেকে প্ল্যান করে করতে হবে এবং কৃতকার্য হতে হবে।

এ বিষয়ে প্রায় প্রত্যেকের বেলায় আমরা মনস্তত্ত্বের দিক থেকে একটা বিষয় খুব লক্ষ্য করেছি। তাদের কাছে ঐরূপ প্রস্তাব করার পর—যে নিজ নিজ বাড়ি থেকে টাকা বা গয়না ধরা না পড়েও যতদূর সম্ভব এমন ভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে আনতে হবে যাতে বাড়ির লোকেরা যেন কেবল তাকেই সন্দেহ করতে না পারে—তখনই দেখেছি প্রায় সবাই বলেছে—'সেটি হবে না। আমার বাড়িতে সেরূপ সম্ভাবনা খুবই কম। টাকা-পয়সা বা গয়না প্রভৃতি এমনভাবে সুরক্ষিত যে আমার পক্ষে অগোচরে নিয়ে আসা অসম্ভব। হয় ২০০ টাকার জন্য আমায় ডাকাতি করতে হবে নয় তো আমায় এ কাজ বাদ দিতে হবে,; ইত্যাদি।'

রজতও প্রথমে তাই বলেছিল। তবে আমার জানা ছিল কি ভাবে বিপ্লবী আত্মসম্মানে আঘাত করলে রজত তার নিজের ভুল বুঝবে। আপাতদৃষ্টিতে প্রথমেই যে বিষয় হবে না বলে প্রত্যাখ্যান করছে তার পক্ষে অতি সহজসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। তাই আমি তাকে বললাম:

"রজত, তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করি—রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোন বড় ব্যবসায়ীর বাড়িতে তুমি ডাকাতি করতে প্রস্তুত কিনা বা ঐ যে সামনে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক দেখছ—আমাদের বিপ্লবী প্রস্তুতির জন্য সেখানে হানা দিয়ে সমস্ত টাকা লুট করে আনতে, তবে তুমি কি উত্তর দেবে? তুমি কি বলবে 'পারবো না'? তুমি কি বলতে পারবে এ অসম্ভব? আমি জানি তুমি কিছুতেই বলবে না যে তুমি ওকাজে অক্ষম ও অপারগ। যদি আমরা সেইরূপ সুরক্ষিত বাড়ি বা ব্যাঙ্কের টাকা ডাকাতি করে নেওয়া সম্ভব মনে করি; তবে কি যুক্তি থাকতে পারে যে একজন বাড়িরই ছেলে যে বাড়ির সমস্ত আঁটঘাট জানে, সকলের গতিবিধির সম্বন্ধেও যে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল, সে নিজ বাড়ি থেকে আমাদের শর্ত অনুযায়ী সামান্য ১০০—২০০ টাকা আনা আনতে পারবে না?"

রজতকে আর বেশী বলার প্রয়োজন হোল না। সে সাত দিনের সময় নিল—তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বললো, তিন দিন সময়ই তার পক্ষে যথেষ্ট। আশ্চর্য সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় সে বেশ কিছু টাকা ও কিছু বহু পুরানো ঠাকুরমার আমলের গয়না নিয়ে এলো। তার পরও বহুবার রজত নিজের বাড়ি থেকে কিছু কিছু গয়নাপত্র নিয়ে এসেছে, কিন্তু কোনদিনই সে ধরা পড়ে নি বা বাড়িতেও তাকে কেউ কোনদিন সন্দেহ করে নি।

বাড়িতে সন্দেহ না করা বা একবারও ধরা না পড়া—এইরূপ ব্যতিক্রম কেবল রজতের বাড়িতেই বোধ হয় ঘটেছিল। কারণ রজত তার বাড়ি থেকে একটি কানাকড়িও তার মাকে না জানিয়ে আনে নি। রজত বাড়ি থেকে ২০০ (দুইশত) টাকার অনেক বেশী এনেছে—হয়ত বা ২০০০ টাকারও বেশী হবে, তা আমার এখন ঠিক মনে নেই। আরও খুব মজার কথা রজত তার ছোট ছোট বোনেদের কাছে চাইলে গয়না—আশ্চর্য হাসিমুখে বোনেরা তাদের ছোট ছোট বালা ও চুড়ি খুলে দাদাকে নিয়ে দিয়েছে! শেষের দিকে অর্থের খুব টানাটানি যাচ্ছিল। রজত একদিন আমাদের খুব বিচলিত দেখে জিজ্ঞাসা করলো—"কি হয়েছে, কেন আপনারা এতখানি চঞ্চল ও অস্থির হয়েছেন?" সে জানলো, আমাদের কিছু টাকার তখনই প্রয়োজন। আমাদের কিছু না বলেই সে তৎক্ষণাৎ সাইকেল নিয়ে চলে গেল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে রজত ফিরে এলো, তার মায়ের গলার শেষ হারটি নিয়ে। ধন্য তার মা! ধন্য তার ছেলে! জিজ্ঞাসা করে জানলাম কি বলে মার কাছ থেকে হারটি নিয়ে এসেছে।

রজত তার মাকে গিয়ে বললো—"মা তুমি তো আমাদের কতো দিয়েছ, তোমার কাছে না চাইলেও পেয়েছি, কিন্তু আজ যে এই মুহূর্তে আমাদের কিছু টাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই তোমার কাছে এসেছি, যদি তার কোন ব্যবস্থা করতে পার।"

আশ্চর্য মা! তিনি হাসতে হাসতে রজতকে বলেছিলেন—"তোকেই যদি স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসর্গ করতে পারি, তবে তোর এই সামান্য অভাব আমি পূরণ করতে পারবো না?" এই বলে মা তাঁর গলার হারটি রজতকে দিয়ে বললেন—"দেখ্ যদি তোদের এই টাকার কাজটি উদ্ধার হয়।" আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত এইসব কথা রজতের কাছে শুনলাম। তারপর রজতকে নিয়ে মার কাছে সেই হারটি আমরা ফেরৎ পাঠালাম—বললাম, "মার গলা খালি করে ঐ হার আমরা নেবো না।" তিনি অনেক দিয়েছেন। এবারের ব্যবস্থা আমরা আর কোথাও থেকে করে নেবো।

রজতের বাড়ির কম্পাউণ্ড অনেক বড়। বাড়িটি দোতলা। দোতলায় দুটি ঘর। রজত যে ঘরে থাকতো সেই ঘরটি প্রায় সময় আমাদের দখলেই ছিল। আমাদের গোপন সভা, রিভলবার-পিস্তলের ব্যবহার ও সেইগুলি পরিষ্কার করা প্রভৃতি কাজ এই ঘরটিতে হোতো। পুলিশের সন্দেহের সম্পূর্ণ বাইরে এই বাড়ির বৈপ্লবিক অস্তিত্বটি রক্ষা ছিল কেবলমাত্র রঞ্জনবাবুর সরকারী মহলের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকবার জন্যে। কি করে পুলিশ সন্দেহ করবে শ্রীরঞ্জন সেনের বাড়িতে তার ছেলে, যে টাউন ক্লাব-এর সভ্য, তারই সহযোগিতায় ও তার মায়ের সম্পূর্ণ সমর্থনে আমাদের বৈপ্লবিক প্রস্তুতির অনেক প্রকার কাজই সেই বাড়িতে চলেছে?

আগের কথায় ফিরে আসি। স্পিটার লোম্যান-এর গুর্খা পল্টনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েও নানাভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমাদের প্রধান জরুরী অংশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে না পেরে ২০শে এপ্রিল রজতের বাড়িতে রাত কাটাবো মনস্থ করলাম। তখন প্রায় রাত সাতটা হবে। সহরে এসে ঢুকলাম। সহরে কার্ফিউ জারী করা আছে। কিন্তু কে পাহারা দেবে। যা সৈন্য তারা এনেছে সব সৈন্যই নিযুক্ত রেখেছে শ্বেতাঙ্গদের বাহ্য রক্ষার জন্য। শ্বেতাঙ্গদের সবাই চট্টগ্রাম পোর্ট ডকল মুরিং-এর কাছে কোন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং তাদের অনেকে আবার কর্ণফুলীর বুকে সমুদ্রগামী জাহাজে অবস্থান করছিল। তাই সহরে যখন আমরা

প্রবেশ করি, আমাদের গতিপথ রুদ্ধ করবার মত কোন পুলিশ বা সৈন্য সেখানে ছিল না।

রজতের বাড়িতে যাওয়ার পথে নন্দন-কাননে সতীদার বাড়িতে গেলাম। ইচ্ছা ছিল তাঁর কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করবো ও জানতে পারবো, আমাদের প্রধান বাহিনীর কেউ সতীদার কাছে আমাদের খোঁজখবর করেছে কিনা! সতীদার সংগে দেখা করলাম। অজস্র ধন্যবাদ ও বিপ্লবী অভিনন্দন তিনি আমা-দের জানালেন। তাঁর কাছ থেকে আমাদের পথ চলার জন্য সামান্য টাকাও নিলাম। সামান্য গুর্খা ফৌজ আসবার সংবাদ পেলাম এবং তখনও মাষ্টারদার কাছ থেকে আমাদের খোঁজে কেউ আসে নি জানলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

সেখান থেকে রজতের বাড়ি প্রায় মাইল দুই হবে। এই দুটি মাইল একেবারে সহরের বুকের ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে হোলো। কোতওয়ালীর আই বি ইন্সপেক্টরের বাড়ির সম্মুখ দিয়েও হেঁটে এলাম। কে কোথায়? কোন বাধাই পেলাম না। তখন প্রায় আটটা বেজেছে। রজতের বাড়ির পেছনে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের সংগে রজত নেই। সেই একই প্রশ্ন—কি অবস্থায় মাসীমাকে আমরা পাবো? রজতের বাবার সামনে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। আবার কে জানে বাড়ির অবস্থা কি? রজত তো তার বাবার বন্দুক নিয়ে এসেছে ও আমরা এই আক্রমণের জন্য তা ব্যবহারও করেছি। কি জানি কোনো পুলিশের উৎপাত ইতিমধ্যেই তাদের বাড়িতে হয়েছে কিনা! এইসব ভেবে নিয়ে প্রথমে মাখনকে পাঠানো হোলো মাসীমার কাছে স্কাউটিং করে দেখে আসতে।

মাখন মাসীমার উদ্দেশ্যে খুব সন্তর্পণে পেছনের দরজা দিয়ে অন্যের দৃষ্টির অগো-চরে বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। তারপর আমরা আর তাকে সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। খুব অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলাম—কি জানি কি হবে! যদি কেউ দেখে ফেলে? যদি মাসীমা উপস্থিত না থাকেন? আর যদি সে মেসোমশাই-এর সামনে গিয়ে পড়ে? ইত্যাদি। কিন্তু মিনিট তিনেকের মধ্যে মাখন ফিরে এলো এবং একটু দূর থেকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাতের ইসারায় ডাকলো এবং ঘুরে আগে আগে চললো। আমরা তাকে অনুসরণ করলাম। মাসীমা সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়ালো। মুখের ওপর আংগুল চেপে ইসারায় বললেন—"কোন শব্দ যেন না হয়"। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা খুব চুপে চুপে দোতলায় রজতের ঘরে চলে গেলাম।

ভীরু পদক্ষেপে ও অতি সন্তর্পণে যখন রজতের ঘরে এসে পৌঁছলাম, তখন দেখি দোতলার দুটি ঘরই সম্পূর্ণ খালি করে রাখা হয়েছে। মেসোমশাই, মাসীমা, ছোট ছোট ভাইবোনেরা সবাই নীচের তলায়। কি অদ্ভুত ব্যবস্থা! মাসীমা কি কোন কারণে রজত ও তার সতীর্থ সাথীদের আগমন অপেক্ষা করছিলেন কি?

কিছুক্ষণের মধ্যে মাসীমা আমাদের জন্য প্রচুর রাত্রের আহারের ব্যবস্থা করে নিয়ে এলেন। মাসীমাকে আমরা সবাই প্রণাম করলাম। তিনি আমাদের প্রাণভরা আশীর্বাদ জানালেন। মাসীমা আমাদের কাছ থেকে সব খবর শুনলেন—কি করে আমরা দলচ্যুত হয়ে পড়লাম এবং তাদের সংগে আমা-দের যোগাযোগ স্থাপনের আর সুযোগ হোলো না। রজত প্রধান বাহিনীর সংগে আছে জেনে আশ্বস্ত হলেন—কিন্তু আমাদের অজান্তে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

আমাদের নিজেদের মধ্যে ও মাসীমার সংগে ফিস ফিস করে কথা হচ্ছিল, যেন নীচের তলায় কেউ টের না পায়। মাসীমা আমাদের কড়া হুকুম দিলেন, যেন আমরা উপরের ঘর থেকে কোন কারণেই নীচে না যাই—খাওয়া-দাওয়া, স্নান, বাথরুম সব ব্যবস্থাই উপরে হবে এবং তিনি একাই এই সবকিছুর ব্যবস্থা করবেন। তিনি আবার

(শেষাংশ ১৭১ পৃষ্ঠায়)

পূজা এসে পড়েছে।
তাই নূতন নূতন ডিজাইনের
পছন্দমত শাড়ী কেনার জন্য
সকলের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

অন্যত্র কেনার আগে একবার দেখে যাবেন—

নিউ শাড়ী মিউজিয়াম

১৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
(বহুবাজার)

খেলা ভাঙার খেলা

(১১০ পৃষ্ঠার পর)

সঙ্গে আলাপ হবার পর প্রথমেই তাকে বাজিয়ে নিয়েছেন নিজের সাধ্যমত, কোথায় কাজ করে, কী কাজ, ইত্যাদি। হীরের টুকরো প্রবীর চৌধুরীর পাশে সমীর সোম ঘষা কাঁচ হয়ত। তবু সময় থাকতে নেড়েচেড়ে দেখে রাখতে ক্ষতি কি? শ্যামলাল ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। শোনা যায় ছেলেবেলায় লক্ষ্ণৌ সহরের রাস্তায় রাস্তায় তিনি ফিরি করে বেড়িয়েছিলেন। তারপর ধাপে ধাপে উঠে আজ তিনি তিন তিনটে মিলের মালিক—তা ছাড়া খুচরো কনট্রাক্টের কাজও চালাচ্ছেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মানুষ, তা দেখেই বোঝা যায়। কথা-বার্তাও ওজন করা। তবে ছোট থেকে বড় হওয়ার জন্যেই হয়ত উল্লাসিক ভাবটা তেমন প্রবল নয়। সমীরের সঙ্গে যেটুকু আলাপ করলেন তার মধ্যে সৌজন্যের কোন অভাব দেখা যায় নি। বরং যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছেন ওর কাজকর্ম সম্বন্ধে।

একটা জিনিস সমীরের নজর এড়ায় নি। ক্লাবে যখনই প্রবীর আর রমলা এসেছে দুজনেই অন্তরঙ্গ হয়ে মিশেছে সকলের সঙ্গে। ব্যতিক্রম দেখা গেছে তনিমার বেলায়। তনিমা স্বভাবতই স্বল্পভাষী। কিন্তু রমলা বা প্রবীর তা নয়। তবু তনিমার সঙ্গে ওদের আলাপ দু-চার কথাতেই শেষ হয়ে যায়। প্রবীরকে যদিও বা কোন সময় দু-চারটে বেশী কথা বলতে দেখা গেছে, রমলাকে কখনো নয়। বরং রমলার কথার মধ্যে চাপা বিদ্বেষের ভাবই বেরিয়ে পড়ে। সমীর এ নিয়ে তনিমাকে কোন প্রশ্ন করার সাহস পায় নি এখনো। কোন্ প্রশ্নের জবাব সে পাবে তনিমার কাছ থেকে আর কোন্‌টার পাবে না তনিমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশে সে অনুমান করতে পারে।

পুজোর উৎসব অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। 'ঘূর্ণি' নাটকে তনিমা সান্যাল তার পুরনো সুনাম বজায় রেখেছে কলঙ্কিনী অশ্রুমতীর ভূমিকায়। বালবিধবা অশ্রুমতী তাদের বাড়ির ভাড়াটে বাদলের প্রেমে পড়ল। বাদল উচ্চ-শিক্ষিত যুবক, দেশকর্মী আর সমাজ সংস্কারক। ঘটনাচক্রে বাদলের সঙ্গে পরিচয় হল পারমিতার। পারমিতা অপরূপ রূপসী ও তার ওপর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর বিবাহ-যোগ্যা কন্যা যথাকালে বাদল অশ্রুমতীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করে এবং পূর্বপ্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে পারমিতার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হল। এ আঘাত অশ্রুমতী হয়ত সহ্য করতে পারত। কিন্তু সে তখন সন্তান-সম্ভবা। অশ্রুমতী বিষ খেয়ে মুক্তি পেলে।

অশ্রুমতীর পাশে বাদলের অভিনয় তেমন হৃদয়গ্রাহী হয় নি। বাদলের ভূমিকায় ছিল প্রবীর চৌধুরী। প্রবীরের অভিনয় দেখে সমীরের মনে হয়েছিল সে যেন প্রথম থেকেই অপরাধীর পার্ট করছে। অশ্রুমতীর ছোট ভায়ের ভূমিকা নিয়েছিল মুকুল মিশ্র, আর তার বালিকা স্ত্রীর ভূমিকায় সুধা মিশ্র। পার্ট ছোট হলেও সুধা মিশ্রের অভিনয় নাটকের চরিত্রের সঙ্গে মানিয়েছিল ভালো। পার-মিতার ভূমিকায় রমলা ত্রিপাঠি তার চোখ-ধাঁধানো রূপ আর নাচগানেই সকলের মনহরণ করেছিল বেশী।

ঘূর্ণির অসংখ্য দর্শকের মধ্যে সেদিন ছিলেন তনিমার স্বামী ধরণী সান্যাল। ধরণী সান্যালকে সমীর এই প্রথম কাছে থেকে দেখল। লোকের মুখে শুনেছে ধরণী সান্যালের অনেক বয়স। দেখে কিন্তু তা মনে হয় না। মাথার চুল অধিকাংশ সাদা হলেও

Our respectful Greetings on the occasion of the

DURGA PUJA

General Auto Service

Automobile & Electrical Engineers

Specialist in Fuel Injection Equipments

7/1C, SIR DEVAPRASAD ROW

CALCUTTA-14

PHONE : 24-2672

দেহের ধাঁধুলি পাউডার। পায়ের রং ডায়মটে উজ্জ্বল। পরণে নিখুঁত মিলিত পোশাক। চলতে সৌখিন ছড়ি। ককটেলে কালো রঙের ড্রাইসলার গাড়ীখানা নিঃশব্দে ক্লাবের ফটকের ভেতর ঢুকতেই নিখিলেশ মুখার্জি ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন সান্যালকে অভ্যর্থনা জানাতে। সমীরও নিখিলেশের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেল। সান্যাল সস্নেহে গাড়ী থেকে নামতে নিখিলেশ সমীরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। করমর্দনের সময় মৃদু হস্তের চাপ অনুভব করল সমীর। —ওরেল! ওরেল! ওয়েল! হিয়ার ইউ মীট এ্যাট লাস্ট! হার্ড টু ইউ টু মিস্টার মোম? নাম শুনেছি আপনার আজ দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হল যা হক!

অভিনয় আরম্ভ হবার প্রথম ঘণ্টা শোনা গেল। নিখিলেশ আর সমীরের মাঝখানে ধরণী সান্যাল হলের দিকে এগোলেন। সমীর লক্ষ্য করেছে সান্যাল সাহেবের চলন খুব স্বাভাবিক নয়, পা ঈষৎ টলছে। করমর্দনের মেয়েই সমীর হুইস্কির গন্ধটা পেয়েছিল।

অভিনয় শেষ হবার অনেক আগেই ধরণী সান্যাল চলে গেলেন। নিখিলেশ তখন স্টেজের ঘরে। সমীর গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল। অভিনয় শেষ হওয়ার আগে কেন চলে যেতে হচ্ছে, সে বিষয় কোন উল্লেখ করলেন না ধরণী সান্যাল। সমীরের নমস্কারের উত্তরে এক হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, —আচ্ছা চলি তাহলে। আবার দেখা হবে।— ড্রাইভারের উদ্দেশে বললেন,—অলিম্পেয়া।

সমীর সোম অনুমান করে নিলে অনেকক্ষণ হলে বসে সান্যাল সাহেবের গলা শুকিয়ে গিয়েছে। চলে যাওয়ার সেইটেই সম্ভবত মুখ্য কারণ।

পুজো উপলক্ষে ইউনিয়ন ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত নাচ-গান, পিকনিক, স্পোর্টস্ ইত্যাদি হরেক রকম অনুষ্ঠান, বিশেষ করে মধুচক্রের সৌখিন নাট্যানুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মেম্বারদের উৎসাহ আর ব্যস্ততা থিতিয়ে পড়লো। ক্লাবের ধান্ধা-আসর বসতে লাগল আবার সেই পুরোনো বাঁধা নিয়মে। অনেক ছোটাছুটি, হাঁক-ডাকের পর সকলেরই কাজকর্ম চলা-ফেরার মধ্যে এসেছে একটা ক্লান্তি আর মন্থরতা সারেঙ্গীতে ঢিমে-একতালা লয়ে বাজানো রাগিণীর মত। উৎসব শেষ হলে ক্লাবের বড় বুকটি ভেঙ্গে গিয়ে আবার ছোট ছোট বৃত্তে পরিণত হল। বী-হাইভ আবার ফিরে এল তার সাবেক অবস্থায়।

এতদিন উৎসব আর নাটকের ব্যস্ততায় কেউ কারো গতিবিধির দিকে মন দেবার অবকাশ পায় নি। এই সময়টা তনিমা আর সমীর কখন ক্লাবে এসেছে আর কখন চলে গেছে বা কোথায় গেল তার হিসেব বোধ হয় কেউ রাখে নি। ক্লাবের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার ফলে তা নিয়ে একে একে অনেককেই সোজাসুজি বা পরোক্ষভাবে বলাবলি করতে শোনা গেল। তপতী আর নিখিলেশের কানেও এ খবর পৌঁছল সুধা মিত্রের মারফত। দুজনে অনেক পরামর্শ করেও কোন উপায় স্থির করতে পারেন নি। নিরুপায় হয়ে দু-জনেই সেই সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন যখন সমীর সোমের কাছে এ প্রসঙ্গ তোলা যাবে তার পৌরুষে কোন-রকম আঘাত না দিয়ে। এমন কোন পথ আছে কি না সে বিষয়ে তপতী আর নিখিলেশ উভয়েই ঘোর সন্দিহান। কিন্তু তাড়াতাড়ি কিছু করতে গেলে হিতে বিপরীত হবার আশংকাও রয়েছে। অগত্যা মুখার্জি-দম্পতি আর মিশ্র-দম্পতি একত্রে পরামর্শ করে স্থির করলেন, যতদিন সমীর সোমকে এ বিষয় সতর্ক করে দেবার উপযুক্ত সুযোগ না আসে ততদিন এঁরা চারজনে মিলে সমীর আর তনিমাকে ঘিরে সাধ্যমত একটা বৃহে গড়ে তুলবেন যাতে আর পাঁচজনের শ্যেনদৃষ্টি থেকে এদের আড়ালে রাখা যায়।

মুখার্জিদের বাড়ি আর মিশ্রদের বাড়িতে ঘন ঘন ঘরোয়া পার্টি বসতে সুরু হয়েছে যেখানে ক্লাবের আস্তার পর তনিমা আর সমীরের ডাক পড়ে। কখনো-হাই টি কখনো পুরো ডিনার। আমন্ত্রিতদের মধ্যে থেকে অবশ্য বাইরের আর সকলকে সযত্নে বাদ দেওয়া হয়। কারণ, তাদের নজর থেকে তনিমা আর সমীরকে আড়াল করে রাখাই এ পার্টির মুখ্য উদ্দেশ্য। মুখার্জিদের বাড়ি অবশ্য এখন সমীরেরও বাড়ি। তাই পার্টি বেশীর ভাগ বসে মুকুল আর সুধা মিশ্রের ফ্ল্যাটে।

মুখার্জি আর মিশ্রদের আতিথেয়তা তনিমা বা সমীর কারো পক্ষেই এড়ান সহজ নয়। এত ঘন পার্টির কারণ কী হতে পারে তাও এদের একেবারে অজানা নয়। তপতী নিখিলেশ, সুধা, আর মুকুল এদের কারো ব্যবহারে সমীর এখনো যেমন কোন আন্তরিকতার অভাব খুঁজে পায় নি, তেমনি দেখতে পায় নি কোন অতিরিক্ত অনুসন্ধিৎসা। এটুকু সহৃদয়তার জন্যে এদের প্রত্যেকের কাছে সমীর কৃতজ্ঞ। কিন্তু তার সমাপ্তিও ঐখানে। যে স্রোতের মুখে সমীর ভেসে চলেছে তার বেগ এমনই প্রবল যে, সেখানে সুধা, মুকুল আর তপতীর আকৃত্রিম বন্ধুত্বের বাঁধনও শিথিল হয়ে খসে পড়ে, এমন কি সামাজিক অনুশাসনের ভ্রূকুটিও সেখানে নিষ্ফল হয়ে যায়।

এমন সময় মিলি ল্যামডেনের সঙ্গে তনিমার সাক্ষাৎ রাঁচি সার্কিট হাউসে। তনিমা সেখানে গিয়েছিল স্বামীর প্রতিনিধি হয়ে দিল্লী সেক্রেটারিয়েটের এক মাতব্বর মিস্টার হামিদকে স্বামীর হয়ে সংবর্ধনা জানাতে। ধরণী সান্যাল জানে কোন সময় কার কাছে প্রথমে নিজের কর্মব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে প্রতিনিধি হিসেবে তনিমাকে পাঠালে কার্যোদ্ধারের সম্ভাবনা আরো বেশী। যাই হ'ক সে কাজ সম্পন্ন করে তনিমা যখন স্বামীর বিরাট ক্রাইসলারে উঠতে যাবে এমন সময় পেছনে নিজের নাম শুনে ফিরে দাঁড়াল। সার্কিট হাউসের বারান্দা পেরিয়ে এক মেমসাহেব তারই দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতে তনিমা চিনতে পারলে। মিলি। মিলি হার্ট। কি আশ্চর্য! স্বপ্নেও সে ভাবতে পারে নি প্যারিসের সেই মিলিকে আজ দেখতে পাবে রাঁচির সার্কিট হাউসে।

তনিমার বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই মিলি দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে তনিমাকে আর আদরে আদরে আচ্ছন্ন করছে তার সারা মুখখানা,—টেল মী টোনি ডার্লিং এ্যাম আই টু বিলিভ মাই আইজ? ও! হোয়াট এ সুইট সারপ্রাইজ?—

তনিমা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার বিফল চেষ্টা করে বলে,—ছাড় ছাড রাক্ষসী! এটা কি তোর প্যারিস সহর পেয়েছিস? এখুনি লোক জমা হয়ে যাবে। তারপর বল কবে এলি এখানে, উঠেছিস কোথায়, থাকবি কতদিন? ইস্ তোর চেহারাটা ত একটুও বদলায় নি! কত বছর হল বল তো?

—এই ত কাল সবে পৌঁছলাম। এখানকার হাসপাতালে কাজ পেয়েছি, কতদিন থাকতে পারব জানি না। এসে উঠেছি এইখানে। আমার ফ্ল্যাট ঠিক হয়ে আছে, আজ বিকেলেই সেখানে চলে যাব। দাঁড়া তোকে সুখবরটা আগে দিই, এখন আমি আর মিলি হার্ট নই জানিস? ববকে মনে আছে তোর,—বব ল্যামডেন। বিয়ে করেছি তাকে দুবছর আগে। বেচারা বব এখন ইণ্ডিয়ায় আসতে পারবে না। আপিস ওকে ছাড়বে না—বেচারা লন্ডনেই পড়ে রইল।—এই দ্যাখ কাণ্ডটা! বাস্তায় দাঁড়িয়েই বকে মরছি। চল্ আমার ঘরে। উঃ কতদিন পরে দেখা!—বলে তনিমাকে একরকম টানতে টানতে বয়ে নিয়ে ঢুকল মিলি ল্যামডেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে মিলি তনিমাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে গেল,—আজই সন্ধ্যের পর তোকে টেলিফোন করব হয়ত। তৈরি থাকিস যদি ডেকে পাঠাই সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবি ত? আর শোন,—কানের কাছে মুখ এগিয়ে এনে বলে,—তোর প্রিন্স চার্মিংকে কিন্তু সঙ্গে আনা চাই। আমার হয়ে তাকে আমার গ্রীটিংস জানিয়ে রাখবি, কেমন? নাথিং টু ওরি, ডার্লিং! মিলি ইজ হিয়ার এ্যাট ইওর সার্ভিস। চিয়ারিও!—

এতদিন পরে ছেলেবেলার প্রিয় বন্ধুকে কাছে পেয়ে প্রাণের উচ্ছ্বাস চাপতে পারে নি তনিমা। মিলির বুকের ওপর মুখ গুঁজে চোখের জল ঝরাতে ঝরাতে মনের দরজা খুলে দিয়েছে। তার গত ছ-বছরের জীবনের সব ঘটনা—প্যারিসে তার বাবার অকস্মাৎ মৃত্যুর ফলে মা আর মেয়ের শোচনীয় দুরবস্থা—দেশে ফিরে আসা, পেটের দায়ে আর্টিস্টের মডেল হওয়া, সমাজের অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে পঁচিশ বছরের বড় লম্পট ধরণী সান্যালকে বিবাহ করতে রাজী হওয়া ও তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—এবং অবশেষে সমীর সোমের সঙ্গে বর্তমান নিবিড় প্রেমের সম্বন্ধ, একে একে সবই প্রকাশ করেছে মিলির কাছে। মিলি ল্যামডেনও কেঁদেছে বন্ধুর দুর্দশার ইতিহাস শুনে। প্যারিসে দুটি বছর ওরা দুজনে একেবারে একাত্মা হয়ে

গিয়েছিল। তনিমার বাবা প্রথমে কিছুদিন লণ্ডনে কাটিয়ে পরে ফ্রেঞ্চ হয়ে প্যারিসে স্থায়ী বাসা বেঁধেছিলেন। শিল্পী ও ভাস্কর হিসেবে প্রতুল লাহিড়ীর তখন খুব সুনাম। মিলি হার্ট যুদ্ধের শেষ দিকে নার্সিং ও ডাক্তারীর কাজ নিয়ে ইংল্যান্ড থেকে প্যারিসে উপস্থিত হয়েছিল। যুদ্ধের পরেও সে হাসপাতালের কাজে প্যারিসে থেকে গেল। এই সময়ে তনিমার সঙ্গে তার আলাপ ও প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। মিলি যে দেশের মেয়ে সে দেশে তনিমার বর্তমান সমস্যার মত সমস্যা কাটিয়ে ওঠা কোন তরুণীর পক্ষে এত কষ্টসাধ্য নয়। সেখানে বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গুরুতর অমিল হলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই নতুন করে ঘর বাঁধার চেষ্টা হামেশাই করে থাকে। তনিমার বর্তমান পরিস্থিতির কথা জেনে মিলি সেইরকম সমাধানের কথাই ভেবেছে এবং তনিমার সামনে সেইরকম রঙীন সম্ভাবনাময় আশার চিত্র তুলে ধরেছে।

মিলি ল্যামডেন রাঁচির স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার ফলে তার সার্কুলার রোডের নিরিবিলি ফ্ল্যাটে সন্ধ্যের পর তনিমা আর সমীরের অবাধ মেলামেশায় আর কোন বাধা রইল না। মিলিকে প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই হাসপাতালে যেতে হয় কিছুক্ষণের জন্যে। তনিমা আর সমীরকে একা থাকার সুযোগ দেবার জন্যে মিলি ইচ্ছে করেই যতখানি সম্ভব হাসপাতালে কাটিয়ে রাত করে বাসায় ফেরে। কোন কোন দিন ফিরে এসেও দেখে ওরা তখনো চলে যায় নি। তখন কফি আর ল্যান্ডউইচের সঙ্গে মিষ্টি রসিকতা চলে তনিমা আর সমীরকে নিয়ে। একটু-আধটু অশ্লীলতাও যে থাকে না এমন নয়। কোন দিন হয়ত হিংসের ভাব দেখিয়ে সমীরকে শুনিয়েই তনিমাকে বলে,—অনেস্টলি ডার্লিং হাউ এ্যাবাউট মাই হ্যাভিং এ হ্যাপি ইভনিং উইথ সোম সাম ডে। আই অ্যাম জাস্ট এ্যাবাউট টু ডাই উইদাউট বব্!—বলে ওদের দুজনের দিকে মিটমিট করে তাকায়।

তনিমার দৈহিক সান্নিধ্য সমীর সোমকে এনে দিয়েছে নতুন এক জীবনের স্বাদ। সন্ধ্যের পর মিলির শূন্য ফ্ল্যাটে যখন দুজন পরস্পরকে কাছে পায় সে নিবিড় মিলনের মধ্যে সমীরের মনে হয় এই বাড়ি, এই সাজান ঘর, সোফা, বিছানা, সবকিছু যেন ওদের দুজনেরই। মনে হয় তনিমা যেন চিরকাল ঠিক এইভাবেই রয়েছে ওর একান্ত কাছে ওর দেহের সঙ্গে তার যৌবনোত্তপ্ত দেহখানা মিশিয়ে। তনিমার বুকের ওপর মাথা রেখে তার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে,—তনু, মনে হচ্ছে আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। এ যে সত্যি তা বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। এই ত তুমি আমার কত কাছে, তোমার এই সুন্দর দেহের কোন অঙ্গই এখন আমার নাগালের বাইরে নয়। তবু তোমায় বুকে নিয়ে রোজই মনে হয় যেন তোমাকে কেবলই নতুন করে দেখছি, জানছি, অনুভব করছি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে। যত পাচ্ছি পাবার তৃষ্ণা যাচ্ছে আরো বেড়ে। তাই কেবলই মনে হয় এ সত্যি নয়, স্বপ্ন। কেন এমন হয় বলতে পার তনু?—

উত্তরে তনিমা গভীর দরদে সমীরের মুখখানা নিজের উষ্ণ বক্ষের মাঝখানে চেপে ধরে অধীর হয়ে বলে,—একটু চুপ করো সমী, কথা বলো না, কেবল অনুভব করতে দাও আমাকে।...তোমার সারা অঙ্গের নীরব ভাষা এখন সমস্ত দেহ-মন দিয়ে আমি শুনবো, শুনে ধন্য হবো। দোহাই তোমার সমী, মুখের কথার ভারে এই সুন্দর মুহূর্তটা নষ্ট করো না।.....

তনিমার ঐ নরম দেহে এখন শত অসুরের বল। ওর বাহুপাশ কাটিয়ে সরে আসে এমন সাধ্য নেই সমীরের। তনিমার নিরাবরণ দেহের উগ্র গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করে...ওর তপ্ত ওষ্ঠের চাপে সমীরের শ্বাসরোধ হয়ে আসে। কামনার জ্বালা সারা দেহে বিদ্যুৎ প্রবাহের মত ছোটাছুটি করে দেহটাকে যেন চিরে ফেলবে। অসহ্য যন্ত্রণায় সমস্ত দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছে। এই বুঝি শেষ। মৃত্যু! এই বুঝি মরণ!...অস্ফুট চিৎকার করে সমীর লুটিয়ে পড়ল তনিমার বুকের ওপর। তনিমার দুই বাহু তনিমার দেহ সাঁড়াশির মত শক্ত হয়ে তখনো আঁকড়ে রয়েছে সমীরের স্থির নগ্ন দেহটাকে। তনিমার আবেশভরা ডাক যেন অনেক দূর থেকে সমীরের কানে ভেসে আসছে,—সমী! সমী! মাই ডার্লিং.....মাই ওন্.....।

দেওয়ালী উপলক্ষে ইউনিয়ন ক্লাবে বিরাট ভোজের আয়োজন হয়েছে। সঙ্গে নাচ-গানের একটা অনুষ্ঠানও আছে। এ অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ত্রিপাঠি-দম্পতি, আসলে মিসেস মৃদুলা ত্রিপাঠি। তাঁর ধারণা অভিনয়-নৈপুণ্যে তাঁর মেয়ে রমলা ত্রিপাঠির যথেষ্ট থাক আর নাই থাক, নৃত্যগীতে এ তল্লাটে রমলার জুড়ি আর নেই। দেশ-বিদেশ থেকে অনেক ওস্তাদ আনিয়ে মেয়েকে সুগায়িকা করাব চেষ্টা করেছেন তিনি। রমলা বড় বড় পার্টিতে নাচ-গানের জন্যে বাহবাও পেয়েছে প্রচুর। এ-হেন গুণপনার প্রচার যদি না হল, তা হলে তাঁর সমস্ত চেষ্টাই বৃথা।

সন্ধ্যা হতে না-হতে অতিথি-সমাগম সুরু হল। মেম্বাররা আগেই এসে গেছে। তপতী যথারীতি অনুষ্ঠান পরিচালনার ভার নিয়েছেন। আজকের প্রোগ্রাম খুবই সংক্ষিপ্ত। অনুষ্ঠানের আরম্ভে তাসের ম্যাজিক দেখাবে মুকুল মিশ্র। তারপর সুধা মিশ্র আর রমলা ত্রিপাঠির দ্বৈত নৃত্য। মাঝখানে সমবেত মেম্বারদের একান্ত অনুরোধে সেতার বাজিয়ে শোনাবেন স্বয়ং মৃদুলা ত্রিপাঠি। সব শেষে অনুষ্ঠানের আসল অঙ্গ রমলা ত্রিপাঠির কণ্ঠসংগীত। কণ্ঠসংগীতে তবলায় সংগত করার কথা ছিল প্রবীর চৌধুরীর। কিন্তু বিলেত থেকে জরুরী কেব্‌ল্ পেয়ে তাকে হঠাৎ চলে যেতে হয়েছে বোম্বাই। কবে ফিরবে তার ঠিক নেই। এমনও হতে পারে, প্রয়োজন হলে বোম্বাই থেক সরাসরি সে বিলেত রওনা হয়ে যাবে। বড় ব্যবসার রীতিই এই। প্রবীর চৌধুরীর অভাবে রমলার মাইনে-করা তবলচিই সংগত করবে।

আজকের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে আরো একজন অনুপস্থিত।—তনিমা সান্যাল আজ দুদিন থেকে অসুস্থ। এমনি অসুস্থ এর আগেও কয়েকবার সে হয়েছে। পেটে এমন এক যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, যখন তিন-চারদিন শয্যায় আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। গত

• গুঞ্জন •

১বি, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পিয়ানো, গীটার ও লঘু-সঙ্গীত শিক্ষার অভিজাত সাংস্কৃতিক সংস্থা, বেতার অনুষ্ঠানে গাহিবার সুযোগ আছে, মাসিক মাহিনা ১০৲ ও ৬৲, পত্রালাপ করুন।

রবি বন্দ্যোপাধ্যায়—সম্পাদক।

দুদিন তনিমার সঙ্গে সমীরের দেখা হয় নি। অবশ্য কথা হয়েছে টেলিফোনে। ধরণী সান্যালও ব্যবসার কাজে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বাইরে গেছেন। তনিমার ভাগ্যক্রমে এবার সে সুযোগ মিলিকে কাছে পেয়েছে। মিলি নিজে ডাক্তার হওয়ায় তনিমার রোগের চিকিৎসাও সুরু হয়েছে, যা এতদিন হয় নি ধরণী সান্যালের অবহেলায় আর তার নিজের উদাসীনতায়।

নাচ-গান শেষ হতে হতে ডিনারের ঘণ্টা পড়ল। মেম্বাররা আমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে খাবার টেবিলে উপস্থিত হল। এখানকার তত্ত্বাবধান মৃদুলা ত্রিপাঠির হাতে। কে কোথায় বসবে তার ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছেন টেবিলের ওপর ভিন্ন ভিন্ন নামের কার্ড সাজিয়ে।

অনেকদিন পরে আজ সমীর সোমকে দেখা যাচ্ছে তার পুরনো দলের মধ্যে। নিখিলেশ, তপতী, মুকুল আর সুধার সঙ্গে আলাপ করতে করতে সমীর খাবার টেবিলের সামনে পৌঁছল। ওদিক থেকে ত্রিপাঠি-দম্পতি কন্যা ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে হাজির হলেন। সমীর আশা করেছিল তার পুরনো দলের সঙ্গে একত্রে সে খেতে বসবে এবং সেই সুযোগে গত কয়েকদিনের অনুপস্থিতির দরুণ যে লজ্জা আর আড়ষ্টতা তা গল্প-গুজবের মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে উঠবে। তপতী আর নিখিলেশের সঙ্গে ক্লাবে না হলেও বাড়িতে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে প্রত্যহই দেখা হয়। কিন্তু মুকুল আর সুধার সঙ্গে ইদানীং তার সাক্ষাৎ অনেক কমে গেছে। ওরা এ নিয়ে কোন অনুযোগ না করলেও কোথাও যে একটা ব্যবধান এসে গেছে তা অবশ্য গোপন নেই।

কিন্তু বার বার টেবিলের ওপরের কার্ডগুলো উলটে-পালটে ঘেঁটেও সমীর তার নামের কার্ডখানা এদিকে খুঁজে পেলে না। এমন সময় টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে মিসেস ত্রিপাঠির ডাক শোনা গেল,—কই মিস্টার সোম, আপনি ওদিকে কি খুঁজছেন? আপনার জায়গা ত এখানে। চলে আসুন এদিকে।—

সমীর ইতস্তত করছে দেখে তপতী তাগাদা দিলেন,—দাঁড়িয়ে থেক না সমীর, চলে যাও। দেখছ না সকলে বসে পড়েছেন। ডিনার শেষ হলে আবার আমরা একসঙ্গে বসব'খন।

সমীর এগিয়ে যেতে যেতে লক্ষ্য করলে ওদিকে একটিমাত্র চেয়ারই খালি আছে। খালি চেয়ারের একপাশে বসেছে রমলা আর অপর পাশে স্বয়ং মিসেস ত্রিপাঠি। চেয়ারে বসে প্রথমেই সমীর রমলার দিকে চেয়ে এক দফা তার নাচ আর গানের প্রশংসা জানাল। রমলা মুখ না ফিরিয়েই যে জবাবটা দিলে সমীর তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না,—থ্যাঙ্কস্ এ লট মিস্টার সোম! কিন্তু তিন ঘণ্টা পরে ঐ কথাগুলো ঘটা করে না বললেও পারতেন। আমার গান যে সকলের ভালো লাগতেই হবে এমন কথা আছে কি?—

সমীর প্রথমে একটু অপ্রস্তুত বোধ করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে গলায় যথাসম্ভব সহৃদয়তার সুর এনে বলে,—আমার সত্যিই বড় অন্যায় হয়ে গেছে মিস ত্রিপাঠি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনার গান আমার চমৎকার লেগেছে—যদিও আমি গানের সমঝদার একেবারেই নই। আমি ভেবেছিলাম কোন জিনিস ভালো লাগলে তা জানাবার অধিকার সমঝদার না হলেও তার থাকে। হয়ত আমি ভুল ভেবেছিলাম। যাই হক আপনি ক্ষুণ্ণ পাবেন জানলে আমি নিশ্চয় বলতাম না। আমাকে ক্ষমা করবেন, মিস ত্রিপাঠি।—

রমলা এবার তার ডাগর চোখ দুটো সমীরের দিকে ফেরাল। দুই চোখে তার ভর্ৎসনা মাখানো,—ছিঃ মিস্টার সোম! আপনি এত সেন্টিমেন্টাল জানলে আমি কখখনো আপনাকে ওভাবে বলতাম না। আমার গান শুনে সকলেই কিছু না কিছু বলে গেল। কেবল আপনি আমার দিকে একবার তাকিয়েও দেখলেন না। আচ্ছা এতে আমার দুঃখ পাওয়া কি এমনই অন্যায়? বলুন ত সত্যি করে।

অভিমানে রমলার চোখ দুটোয় প্রায় জল এসে পড়েছে। সমীর নিজের নির্বুদ্ধিতা বুঝতে পেরে নিজেকে ধিক্কার দেয়। এ কার সঙ্গে সে মান-অভিমান করছে! এ যে একেবারেই শিশু! কি ভাগ্যি এ-পাশে মিসেস ত্রিপাঠি এদের কথাবার্তায় কান না দিয়ে পাশের নিমন্ত্রিত ভদ্রমহিলার সঙ্গে গল্পে মেতে উঠেছেন। না হলে মেয়ের মুখের অবস্থা দেখে এতক্ষণে হয়ত ব্যস্ত হয়ে হৈ-চৈ সুরু করে দিতেন। সমীর সাবধানে মৃদুলা ত্রিপাঠির শ্রবণ এড়িয়ে নীচু গলায় রমলাকে আশ্বস্ত করতে প্রবৃত্ত হয়,—

—আমি সত্যিই না-জেনে অপরাধ করে ফেলেছি। আপনার গান শেষ হওয়ার পরেই আপনার চারদিকে গেস্টদের ভীড় দেখে আমি এগোতে সাহস পাই নি। কিন্তু তা হলেও তারপর আপনার কাছে আসা আমার খুবই উচিত ছিল, তা এখন বুঝতে পারছি। ভবিষ্যতে আর কখনো এ ভুল হবে না কথা দিচ্ছি আপনাকে।—

রমলা ত্রিপাঠির চোখ-মুখ থেকে মুহূর্তের মধ্যে অভিমানের কালো ছায়া অপসারিত হয়ে সেখানে খুশির আমেজ দেখা গেল,—ইস্! আপনি এত ভীতু! আমি ত আপনার চেহারা দেখে ভেবেছিলাম না জানি কত বীরপুরুষ আপনি!—যাক এখন তা হলে কুইটস্ ত? আচ্ছা?

সমীর মন্ত্রমুগ্ধের মত জবাব দেয়,—কুইটস্।

ডিনার শেষ করে রমলা আর ত্রিপাঠি-দম্পতির কাছে বিদায় নিয়ে সমীর তার পুরনো দলে এসে যোগ দেয়। কিছুক্ষণ সকলের সঙ্গে আলাপ করে শেষে তপতী আর নিখিলেশের সঙ্গে এক গাড়িতে বাড়ি ফিরে এল। বাড়ি ফিরে সমীরের মনে হল আজ সারাদিন তনিমার খবর জানা যায় নি। একবার ভাবলে মিলি ল্যামডেনকে টেলিফোন করলেই তনিমার খবরটা পাওয়া যায়। কিন্তু সামনেই তপতী আর নিখিলেশ রয়েছেন দেখে সমীর সে ইচ্ছে পরিত্যাগ করলে। সকালে অফিসে গিয়ে খোঁজ নেওয়া যাবে।

বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রমলার ছেলেমানুষী ভরা চাউনি আর কথাটা মনে পড়ে গেল,—তা হলে কুইটস্ ত? আচ্ছা?—রমলার পাশে প্রবীর চৌধুরীর চেহারাটা সমীর সোমের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সমীরের চোয়ালটা শক্ত হয়ে ওঠে।—একবার লড়ে দেখলে হতো—কে হারে আর কে জেতে! কিন্তু লড়াই করবার হাতিয়ার কোথায়? কোথায় প্রবীর চৌধুরী আর কোন্ খানে সমীর সোম। হাতিয়ারের মধ্যে লম্বা-চওড়া চেহারাটা আর এই চাকরিটুকু। চেহারায় প্রবীর চৌধুরী কিছু কম যায় না। তার সঙ্গে যোগ কর তার দেশী ও বিলিতী ডিগ্রী, তার পিতার লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা ও সম্পত্তি, তার চকচকে দামী জাগুয়ারখানা, ড্রেস সুট আর ডিনার জ্যাকেটের ছড়াছড়ি। সমীরের মত চাকরি নিশ্চয় এবেলা ওবেলা ছেড়ে দেবার ক্ষমতা রাখে প্রবীর চৌধুরী। দরকার হলে সমীর সোমের মত পাঁচ-সাতটা মোটা মাইনের চাকর সে পুষতে পারে। দাঁতে দাঁত ঘসে সমীর কুৎসিত গাল দিয়ে ওঠে,— ব্লাডি সোয়াইন!—

প্রবীর চৌধুরীর ওপর অহেতুক রাগ আর গাত্রদাহ ঠাণ্ডা হয়ে এলে মনে পড়ে যায় ডিনার টেবিলের ঘটনাটা। গত দু-মাসের মধ্যে দেখা হলে কেবল ভদ্রতার দায়সারা সিকি ইঞ্চি হাসি আর মাপা দু-চারটে কথা ছাড়া যার কাছ থেকে আর কিছু পাওয়া যায় নি, আজ সেই মৃদুলা ত্রিপাঠি কি না এত লোক বাদ দিয়ে সমীরকে সেধে বসালেন নিজের আর একমাত্র কন্যার পাশখানে! এর মধ্যমণ্ডু সমীর বুঝতে পারে না। তবে এইটুকু আঁচ করে নেয় যে, এতদিন ধরে বাইরে যা দেখছে যা শুনছে ভেতরে তা ছাড়া আরো কিছু থাকা আশ্চর্য নয়। ভুল চাল যদি কিছু চেলেও থাকে সমীর সোম সে চাল ফিরিয়ে নেবার সময় এখনো আছে।

পরদিন সকালে অফিস থেকে সমীর টেলিফোন করে মিলি ল্যামডেনকে। মিলি জানায় তনিমা এখন প্রায় সুস্থ। তবে জ্বর থেকে বেরোবার মত অবস্থা এখনো হয় নি। মিলি আরো জানায় যে আজ সন্ধ্যার পর তনিমা সমীরের জন্যে অপেক্ষা করবে। মিলির আজ হসপাতালে জরুরী কাজ, তাই বিশেষ দরকার না পড়লে সে আজ আর তনিমার বাড়ি যাবে না। সমীর যেন সন্ধ্যেটা ওখানে কাটিয়ে আসে। টেলিফোন ছাড়বার আগে মিলি গলাটা পরিষ্কার করে বলে,—একটা কথা তোমার আজ জানাতে চাই সোম। হয়ত তুমি নিজেও তা জানো। তনিমা আমার মুখ ফুটে কিছু বলে নি, কিন্তু তার মনের কোন কথা আমার অজানা নয়। শী ইজ রিয়েলি

ভেরি হেল্পলেস—বড় অসহায়—অ্যান্ড শী হ্যাজ অলরেডি সাফার্ড এ বিট টু মাচ ফর নো ফল্ট অফ হার ওন। ওর শরীরেও কোথাও গলদ আছে মনে হয়। সে দিকে আমি নজর রাখব। কিন্তু তোমাকে আমার একটিমাত্র অনুরোধ,—ডোন্ট বি হার্ড অন হার এভার। তুমি যদি ওর ওপর কঠিন হও, ও বোধ হয় সহ্য করতে পারবে না। সেখানে তুমি ছাড়া কেউ ওকে সাহায্য করতে পারবে না।—একটু থেমে ধরা গলায় আবার মিলি বলে,—যা এতক্ষণ ধরে তোমায় বলতে চাইছ—শী ইজ্ ইন লাভ উইথ ইউ, পুওর গার্ল। ও আমায় বেশী কিছু বলে নি। কিন্তু ওকে আমি চিনি। বি গুড টু হার, সোম। অ্যান্ড শী রিয়েলি ডিজার্ভস্ ইট।—

মিলি কখন টেলিফোন ছেড়ে দিয়েছে সে খেয়াল নেই সমীরের। সে বসে বসে ভাবছে, মাত্র সামান্য এই ক'মাসের মধ্যে কী সাংঘাতিক পরিবর্তন সে এনে ফেলেছে তার জীবনে, কী বিরাট দায়িত্ব। মিলির ফ্ল্যাটে পাশাপাশি শুয়ে দুজনে কত আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপ দিয়েছে রঙীন কল্পনার জাল বুনে। ভবিষ্যতের নীড় রচনা করেছে কত সহজে। তনিমা ডিভোর্স নেবে। যে স্বামী এক-দিনের জন্যেও তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয় নি তার ওপর তনিমার কোন মায়া নেই। মুক্তি পেয়ে তনিমা নতুন করে ঘর বাঁধবে। সে ঘর আলো করে আসবে তাদের আদরের সন্তান। তনিমা ধন্য হবে নিজে। পূর্ণ করবে সমীরের জীবন।

টেলিফোন বেজে উঠল আবার। তারের মধ্যে দিয়ে তনিমার গলার আওয়াজ ভেসে এল,—সমী, কাল এলে না কেন? এই নিয়ে দুদিন দেখা হল না মনে আছে? আজ এক-বার আসবে ত? না, না, আমার জন্যে অতো ভাবতে হবে না, আমি বেশ ভালো হয়ে উঠেছি। ঠিকই সঙ্গ দিতে পারব। কিন্তু তুমি এসো। না-চাও তো জোর করে ধরে রাখব না,—একটিবার দেখাও তো দেবে? মিলি বলেছে? বেশ তা হলে এখন রাখলাম। দেরী করো না, কেমন?

সমীর ঘরে ঢুকতেই তনিমা ছুটে এসে পড়ল তার বুকের ওপর। দু-চোখ বেয়ে তার জল ঝরছে। সমীর ওকে জড়িয়ে ধরে বসলো সোফার মাঝখানে।—কী হল তনু, কান্না কেন?—

—কী জানি কেন বড় ভয় করছে আজ সারাদিন।—

—ভয় কিসের? এই ত অসুখ সেরে গিয়েছে। এত অল্প কারণে ভয় পায় কি?—

—না গো! এ অসুখের ভয় নয়। কেবলই মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর একটা কিছু ক্ষতি হতে চলেছে!—বলে তনিমা দু-হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে সমীরকে। ওর কাঁধের ওপর মুখ গুঁজে দিয়ে ফিসফিস করে বলে,—সমী, আমি তো বেশ ছিলুম, আমার নোংরা জীবন নিয়ে। কেন তুমি এলে আমার জীবনে বল ত? কেন আমায় এমন লোভ দেখালে গো! এখন আমি কি করি বলো? কতদিন আর এইভাবে কাটাব এই নরকের মধ্যে!—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে তনিমা। ওর চোখের জলে সমীরের জামা খানিকটা ভিজে গিয়েছে।

কান্না থামে না দেখে সমীর তনিমাকে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিজে ওর পাশে আধ-শোওয়া অবস্থায় ঝুঁকে পড়ে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকে। বিছানার ধারে একটা ছোট টেবিলে কয়েকখানা বই আর ছবির এ্যালবাম পড়ে রয়েছে। মিলি ল্যামডেন সকালে বসে বসে ওগুলো দেখছিল। সেই আধ-খোলা অবস্থাতেই এ্যালবামগুলো পড়ে আছে। বাবার কাছে ছেলেবেলায় তনিমাও কিছু কিছু ছবি আঁকা শিখেছিল সমীর তা শুনেছে। অন্যমনস্ক ভাবে এ্যাল-বামের পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে এক জায়গায় দৃষ্টি পড়াতে সমীর সচকিত হয়ে উঠে বসল। পর পর এ্যালবামের আরো কয়েকটা পাতা উলটে গেল। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় একই নারীর মূর্তি। পেনসিল স্কেচ। সমীর এক দৃষ্টি দিয়ে চার-পাঁচখানা ছবি বার বার মিলিয়ে দেখছে। নারী-মূর্তি, কোথাও সম্পূর্ণ অনাবৃতা, কোথাও অর্ধবিবসনা।

তনিমা এতক্ষণ চোখ বন্ধ করে সমীরের আদর উপভোগ করছিল। এখন সমীরের হাতের স্পর্শ না-পেয়ে চোখ খুলে সমীরের দিকে তাকায়। পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল, নিস্পন্দ হয়ে বসে আছে সমীর। খোলা এ্যাল-বামটি তখনো তার হাতে। তনিমা কনুয়ে ভর দিয়ে সমীরের দিকে এগিয়ে আসে,—কী হল সমী!

এত উদাস কেন?—সমীরের হাতে নিজের প্রতিকৃতি দেখে ছেলেমানুষের মত চেঁচিয়ে ওঠে তনিমা,—ইস্ কী অন্যায় তোমার সমী! আসল মানুষটা পড়ে রইল একা আর তুমি তন্ময় হয়ে আছ তার ছবি নিয়ে! আচ্ছা বল তো সমী, কোনটা তোমার বেশী ভালো লাগছে—পাঁচ বছর আগের ঐ আমাকে না এখনকার আমাকে? কই উত্তর দাও.....

সমীরের কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনে তনিমা চমকে উঠল,—তার আগে আমার কথার জবাবটা দাও। এসব কথা এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলে কেন?

তনিমা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না,—কী বলছ তুমি সমী, আমি বুঝতে পারছি না। কী লুকিয়েছি আমি, কার কাছেই বা লুকোলাম। হঠাৎ এত উত্তেজিত হলে কি দেখে।

ক্রুর বীভৎস হাসিতে সমীরের মুখ-খানা বিকৃত হয়ে উঠেছে।—অভিনয় তুমি ভালোই করো, তা জানা আছে। কিন্তু অভিনয় বা তামাসার সময় এটা নয় তাও কি বলে দিতে হবে নাকি? বেশ! বুঝিয়েই দিচ্ছি তা হলে।—এ্যালবামখানা তনিমার গায়ের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে সমীর ঝাঁঝিয়ে ওঠে,—লুকিয়ে রেখেছিলে এই কদর্য নোঙরা ছবিগুলো। কার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলে তা বোধ-হয় আর বলে দিতে হবে না? কিন্তু কেন কেন এ কাজ করলে তুমি?

তনিমা বুঝেছে এর পর সমীরের কিছু বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা। ঘৃণায় আর বিরক্তিতে মন বিষিয়ে উঠছে তার। সেই সঙ্গে দুস্তর হতাশা। এই সেই মানুষ যার হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে যাচ্ছিল তনিমা! যার সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দিয়ে কল্পনার পাখায় ভর করে ভবিষ্যৎ-জীবনের কত রঙীন চিত্র এঁকেছে দিনের পর দিন। গায়ের এলোমেলো কাপড় গুছিয়ে নিয়ে খাট থেকে নেমে এল তনিমা। ধীরে ধীরে সোফার একপাশে গিয়ে দাঁড়াল। সমীর তখনো খাটের একধারে বসে আছে, তার দৃষ্টি মেঝের কার্পেটের ওপর নিবদ্ধ। তনিমা সমীরের দিকে একবার চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে স্পষ্টস্বরে জবাব দিলে,—এমন কোন কন্ট্রাক্ট জেনেশুনে কখনো করি নি, যার জন্যে কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। তবু বলি—যে ছবিগুলো তোমার চোখে কদর্য নোঙরা মনে হচ্ছে, সকলের কাছে তা নাও মনে হতে পারে। চোখ আর মন সকলের সমান নয়। যে শিল্পীর হাতে ঐ স্কেচগুলো আঁকা, আজ সে বেঁচে নেই। ওগুলো তারই স্মৃতিচিহ্ন। নামকরা বিদেশী আর্ট-জার্নাল খুঁজে দেখলে তার মধ্যে ওর দু-একখানা প্রিন্ট দেখতে পাবে। এইসঙ্গে তোমাকে আর একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিই। তুমি বোধ হয় ভুলে গেছ যে আমি একজন শিল্পীর

মাছ ধরার ও খেলাধূলার সরঞ্জাম বিক্রেতা

সেন ব্রাদার্স— ১৫৫।২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

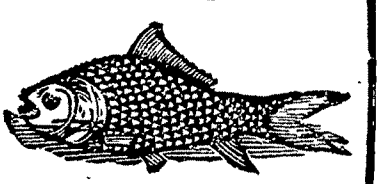

মেয়ে। শিল্পের মুক্ত আবহাওয়ার আমার ছেলেবেলাটা কেটেছে দেশে-বিদেশে। তাই কোন শিল্পীর স্টুডিওকে লুকিয়ে রাখার কথা আমি ভাবতেও পারি না।

সমীর অধৈর্যের সঙ্গে বলে উঠল,—এসব কথা নিয়ে তুমি কি আমাকে বোঝাতে চাইছ যে, শিল্পচর্চা করা আর শিল্পীর মডেল হওয়া একই? বিবস্ত্রা হয়ে শিল্পীর মডেল হওয়া ছাড়া আর কিছুই কি করার ছিল না?

তনিমা শান্ত ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করে বলে,—তোমাকে কিছু বোঝাবার দায় এখন আর আমার নেই, সে চেষ্টাও করবো না। তবে কী অবস্থায় পড়ে মডেলের কাজ আমায় নিতে হয়েছিল তাও তোমার অজানা থাকার কথা নয়। বাবা মারা যাবার পর শূন্য হাতে মার সঙ্গে দেশে ফিরে আসতে হয়, একথা তোমায় জানিয়েছি। ছবি আঁকার কাজে তখনো আমি বেশীদূর এগোই নি। সেই অবস্থায় আশ্রয়হীন হয়ে দু-বছর প্রায় পথে পথে ঘুরতে হয়েছে। সে সময় কলকাতায় একদিন বাবার পরিচিত বিদেশী শিল্পীটির সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমাদের অর্থ-সাহায্য করতে চাইলেন। আমি রাজী হই নি। অবশেষে তাঁর মডেল হয়ে কী হিসেবে তাঁর টাকা নিয়েছিলাম। এত বৃত্তান্ত অবশ্য এর আগে তোমায় জানাই নি। জানাই নি জানাবার অবকাশ হয় নি বলেই, গোপন করার উদ্দেশ্য নয়। আশা করি এর বেশী আর কিছু জানতে চাইবে না?—

সমীর সোফা দু-হাতের মধ্যে মুখখানা ঢেকে ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লে। তারপর হাত নামিয়ে নিয়ে মুখ ফেরালে তনিমার দিকে।—

—না আর কিছু জানাতে চাই না। আমি আর্টিস্ট নই, আর্টের কিছু বুঝিও না। এই টুকু লেবেল বুঝি যে ভদ্রঘরের একজন মেয়ের চালচলন একটা বাঁধা-ধরা সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে। যখনই মনে আসছে নগ্ন দেহ নিয়ে তুমি একজন পুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে আছ, হোক সে শিল্পী বা আর কিছু.....কিছুতে ভুলতে পারছি না.....

—থাক থাক, আর বলার দরকার হবে না সমীর। তীব্র কণ্ঠে বাধা দিয়ে উঠল তনিমা। উত্তেজনায় তার সমস্ত দেহ কাঁপছে। হাঁপাতে হাঁপাতে তনিমা বলে,—আজ দু-দিন আমার সঙ্গে তোমার দেখাশোনা হয় নি বটে। কিন্তু তার আগের কথা ভুলে গিয়ে থাক ত মনে করিয়ে দিচ্ছি, শোন। ছবিতে যার নগ্ন দেহ দেখে আজ তোমার সুরুচি আর শ্লীলতায় এত আঘাত লাগল, দু দিন আগে পর্যন্ত সেই নগ্ন দেহটা নিয়ে তুমি উন্মত্তের মত খেলা করেছ। তোমার সে খেলায় কিছু বাকী রাখো নি তুমি। দিনের পর দিন সে খেলার সময় নিজের সুবিধে মত তুমি ভুলতে পেরেছিলে এ নগ্ন দেহটা যার সে তোমার বিবাহিত স্ত্রী নয়,—সে ভদ্রঘরের মেয়ে কি না তাও বোধ হয় জানবার প্রয়োজন হয় নি তখন। কী বলো, সমীর!

কথার শেষ দিকে তনিমা প্রায় চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটা হাত পেটের ওপর চেপে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো। অপর হাত দিয়ে সে সোফার পিঠটা আঁকড়ে ধরেছে।

তনিমার অবস্থা দেখে সমীর ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এল। তনিমা ততক্ষণে সোফার এক পাশে বসে পড়েছে কিন্তু তখনো সে হাতখানা তার পেটের ওপর চেপে ধরে আছে।

আসল মানুষটা পড়ে রইল.....তন্ময় হয়ে আছ তার ছবি

সমীরকে আগুরে আসতে দেখে বললে,—ভয়ের কিছু নেই। মাঝে মাঝে এরকম হয় আমার। টেবিলের ড্রয়ারে একটা ছোট শিশি আছে। এনে দেবে?

সমীর তাড়াতাড়ি শিশিটা এনে দিতেই তনিমা তা থেকে একটা ক্যাপসুল বার করে মুখে পুরে দিলে। সমীরের দিকে চেয়ে একটু ম্লান হেসে বললে,—এবার আমার শুয়ে পড়া দরকার। না হলে ব্যথাটা আবার আসতে পারে। তুমি আর অপেক্ষা করে কি করবে? বরং ক্লাবে চলে যাও, রাত বেশী হয় নি।—

সমীর কুণ্ঠিত স্বরে বলে,—এ অবস্থায় আমি যাই কি করে তোমাকে একা ফেলে?

—ওমা! আমি আবার একা কোথায়?—তনিমা হেসে বলে,—ঘণ্টা বাজালেই নীচে থেকে খানসামা, বাবুর্চি, আয়া সবাই এসে হাজির হবে এখুনি। জানো আমি মিসেস সান্যাল!—শেষ কথাটা যোগ করে ব্যঙ্গের সুরে।

সমীর সে খোঁচাটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে বলে,—তা হলে বরং মিসেস ল্যাম্ডেনকে টেলিফোন করে ওকে আসতে বলি।

তনিমা ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানায়,—দরকার হলে টেলিফোন আমিই করব। তুমি আর দেরী করো না।—বলে তনিমা উঠে দাঁড়াল।

তনিমার বেদনাক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে হয়ত সমীরের মনে অনুশোচনা জেগে থাকবে। সে দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে তনিমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তনিমার শেষ কথাটার মধ্যে আদেশের স্বর শুনে থমকে দাঁড়াল। কী যে সে বলবে ভেবে পাচ্ছে না। তা হলে আপাততঃ আড়ালে সরে যাওয়াই শ্রেয়। ধীরে ধীরে দরজার কাছে পৌঁছবার আগে তনিমার গলার স্বর শুনে ঘুরে দাঁড়াল। তনিমা আবার সেখানেই বসে পড়েছে।

—শোন! বরং দু-মিনিট বসেই যাও।—সহজ সুরে বললে তনিমা।—একটু কাছে ঐ চেয়ারটায় বসো।

সমীর তনিমার কথামত বসল। মুখের ওপর ক্লান্ত ভাবে হাত দুটো বুলিয়ে নিয়ে সোফায় হেলান দিয়ে তনিমা সমীরের মুখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলতে থাকে,—যাবার আগে একটা কথা বলে দিই। বলতে ত সেই হবেই। এ বোধ হয় একরকম ভালোই হল, কী বলো?

সমীরের চোখে জিজ্ঞাসার ভাব লক্ষ্য করে আবার বলে,—এই জানাজানিটা হতে যত দেরী হত ক্ষতি হত ততই বেশী,—বিশেষ করে তোমার। জানি না কেন সারাদিন ধরে

তনিমার বেদনা.....সমীরের মনে অনুশোচনা জেগে থাকবে।

কেবলই একটা অজানা আশঙ্কা মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল। যাক, এইখানেই বোধ হয় তার শেষ। এখন নিশ্চিন্ত হতে পারি। সমীর! যাবার আগে জেনে যাও যে তুমি মুক্ত, আমার দিক থেকে কোন দাবী আর রইল না তোমার ওপর।—

একটু নীরব থেকে তনিমা বলতে থাকে,—আমি জানি এই কদিনের সামান্য ঘটনার কথা সহজেই তুমি ভুলে যাবে। এমনিই ভুলে যায় মানুষ—বিশেষ করে পুরুষেরা। তোমরা

সত্যিই ভাগ্যবান। শুধু তাই নয়। যদি কখনো আবার মনেও পড়ে আমাকে মনে পড়বে একটা নষ্ট চরিত্রের মেয়েমানুষ, ভ্যাম্পায়ার, একটা সস্তা মডেল বলেই। তাই না?

গদিমোড়া চেয়ারখানায় যেন অসংখ্য ছুঁচ বসানো আছে। সমীর সোম উঠে পড়তে পারলে বাঁচে। এ প্রসঙ্গ শেষ করে দেবার জন্যে সে বলে,—তুমি জানো লুকোচুরি করা আমার স্বভাব নয়। যা সহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই তাকে মনের মধ্যে চেপে রেখে বাইরে মহৎ ভাব দেখালে কি তুমি খুশি হতে, তনিমা?

তনিমা সমীরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে,—একটুও নয়, একেবারেই নয়। তুমি ভেব না, তোমাকে আমি এতটুকুও ভুল বুঝছি সমীর বা একটুও দোষ দিচ্ছি? আঘাত আজ আমার যত বড়ই হোক, তুমি যে মিথ্যে অভিনয় করে আমাকে ঠকাও নি, তার জন্যে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সোফা থেকে উঠে ঘরের কোনে গিয়ে তনিমা জলের পাত্র থেকে জল খেয়ে চোখে মুখে জলের হাতটা বুলিয়ে আবার এসে বসলো।—তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না সমীর কিন্তু আমিও তোমায় ঠকাবার চেষ্টা করি নি। এ দিক দিয়ে তোমার বা আমার ক্ষোভের কোন কারণ রইল না। ক্ষতি যেটুকু হয়েছে তার ওপর কারো কোন হাত নেই। যা সম্ভব নয় তার ওপর জোর খাটিয়ে লাভ কি? তাই বলছি, যাবার সময় জেনে যাও, তুমি মুক্ত।

দুটো হাতের মধ্যে মুখখানা চেপে ধরে তনিমা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। তার ঝুঁকে পড়া দেহখানা কয়েকবার এদিক-ওদিক দুলে আবার স্থির হল। কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুখ আর চোখ দুটো মুছে নিয়ে যেন নিজের মনে মনে বলে,—বাবা মারা যাবার পর থেকে অনেকবার দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়েছে, শিখতেও হয়েছে অনেক। তাই আজকের এ আঘাত আমার কাছে নতুন নয়। কিন্তু...এক মুহূর্ত থেমে হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলো,—কিন্তু ঐ মেয়েটা! কী দোষ করেছিল—ঐ কচি বাচ্চা মেয়েটা, যার জন্যে প্রবীর চৌধুরী আজ তাকে এমনভাবে ঠকাল? একদিন সে আমাকেও ঠকাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি যে রমলা ত্রিপাঠি নই, তা বুঝতে তার দেরী হয় নি। যাক সে কথা। কিন্তু আজ ঐ মেয়েটার কথা কি প্রবীর চৌধুরী একবারও ভেবে দেখল না!

সমীর সোম চমকে উঠলো,—রমলা? কেন, কি হয়েছে তার? প্রবীর চৌধুরী তো শুনেছি জরুরী কাজে বোম্বাই চলে গেছে। হয়ত সেখান থেকে তাকে বিলেত চলে যেতে হবে।

—হয়ত নয়। আজ এতক্ষণে সে লণ্ডন পৌঁছে গেছে। তনিমা সমীরের দিকে চেয়ে বললে,—কাজটা যে খুবই জরুরী তাতে সন্দেহ নেই। সুসান পার্কারের বাবা হ্যারল্ড জে স্পার্কারের জরুরী তলব পেয়েই তাকে লণ্ডন যেতে হয়েছে এয়ারে, সুসানকে অবিলম্বে বিয়ে করবার জন্যে। অন্যথায় প্রবীর চৌধুরীর গুরুতর ক্ষতির সম্ভাবনা—এমন কি চৌধুরী বংশের মুখে চুনকালি পড়ারও আশঙ্কা আছে। মিলি কালই তার স্বামীর চিঠিতে এ-খবর পেয়েছে। অবশ্য মিলি যে প্রশান্ত চৌধুরীকে মেনে, ওর স্বামী তা না জেনেই লিখেছে।—

একটু বিশ্রাম নিয়ে তনিমা সমীরের দিকে চেয়ে বললে,—তোমার রাত হয়ে যাচ্ছে সমীর। তুমি আর দেরী করো না। কেবল একটা অনুরোধ করবো। রমলাকে তুমি দেখেছ। হয়ত এখনো ভালো করে ওকে জানবার সুযোগ পাও নি। মেয়েটা আমায় দু-চক্ষে দেখতে পারে না—সেটা ওর দোষ নয়। প্রবীর যে এক সময়ে আমার সঙ্গে মিশতো সেটা জানার পর থেকেই সে আমার কাছে আর ঘেঁসে না। কিন্তু আমি জানি রমলাকে। বড় সরল মেয়ে। অন্য সেটা জানি বলেই ওর অসহায় অবস্থার কথা ভেবে আমার বড় খারাপ লাগছে। ওর বাবা শ্যামলাল ত্রিপাঠিও খাঁটি লোক—প্রবীর তাকেও ঠকিয়েছে।.....যাক সে কথা। তোমাকে আমার অনুরোধ, ওদের এ বিপদে তোমার যদি কিছু করার থাকে, করো।..... ভাবছ আমি মেলোড্রামা করছি। সেটা ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি দেখছি অন্য দিক থেকে—আমি দেখছি রমলা আমারই মত একটা মেয়ে। বিনা দোষে মেয়েটার ক্ষতি হতে চলেছে।

—আচ্ছা, সমীর, আর নয়, রাত অনেক হল।

এই বলে তনিমা সহজ ভাবে দরজা পর্যন্ত এসে সমীরকে বিদায় জানিয়ে গেল।

* * *

তনিমার সঙ্গে সমীর সোমের সেই শেষ দেখা। পরদিনই মিলি ল্যামডেন টেলিফোনে জানিয়েছিল, রোগ হঠাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় তনিমাকে হাসপাতালে নিয়ে আসতে হয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণার জন্যে মরফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। সমীর সোম হাসপাতালে দেখতে যেতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করছে মিলি ল্যামডেন বলেছিল, তনিমা একটু সামলে উঠলেই সমীরকে খবর দেবে।

খবর এসেছিল ক্লাবে এক সপ্তাহ পরে সন্ধ্যের সময়। সমীর তখন লনে রমলার পাশে বসে কফি খাচ্ছে। প্রবীর চৌধুরীর বিয়ের ব্যাপারটা ইতিমধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। মদ্দুলা ত্রিপাঠি শোককুলা কন্যাকে আপাততঃ সমীর সোমের জিম্মায় ছেড়ে দিয়েছেন। শ্যামলাল ত্রিপাঠি এর মধ্যে একদিন সমীরকে তাঁর নিজের আপিসঘরে ডেকে নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা করে স্থির করেছেন, সমীর তাঁর প্রস্তাবে রাজী হলে তাকে তিনি বিরাট কারবারের পার্টনার করে নেবেন। ইজ্জৎ বাঁচানোর জন্যে কী না-করা যায়। সমীর সোম ত সোনার টুকরো ছেলে।

খবরটা যেমন আসবার কথা ছিল, তা আসে নি। তনিমা আর সামলে ওঠে নি। ম্যালিগন্যান্ট ক্যান্সার আর ওর সঙ্গে হার্ট অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ায় মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই সে মারা গেল। এই খবরটা যখন এসে পৌঁছল, তখন ক্লাবে সকলেই উপস্থিত। রমলা সবল মেয়ে। খবরটা শুনেই দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে,—ও! হোয়াট এ পিটি এ্যান্ড হাউ স্যাড।—তারপর সমীরের কানের কাছে মুখ এগিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলে,—গুড রিড্যান্স, ইজ্ইন্ট্ ইট?

সমীর এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললে,—গুড রিড্যান্স ইন্ডিড।

* * *

ট্রেন রাঁচি স্টেশনে এসে দাঁড়াল। সারা রাত্রির জাগরণে সমীর সোমের অবস্থা একেবারে কাহিল। কাঁচের জানলার মধ্যে দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন চাকর, ড্রাইভার সবাই এসেছে কি-না। প্রথমেই নজর পড়লো রমলাকে। এক পাশে রুমা আর অন্য পাশে সঞ্জয়ের হাত ধরে ঈষৎ স্থূলাঙ্গী রমলা সোম এগিয়ে আসছেন।

[redacted]

সমাপ্ত

প্রাউমাপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ

মূল্য দুই টাকা

অমূল্য গ্রন্থ হয়েছে"—স্বামী অপূর্বানন্দ।

'বইখানি নৃতন ধরণেরই হয়েছে।" ধাঁধ —স্বামী সদাশিবানন্দ

'বইখানি দেখিতে সুন্দর, বিষয়বস্তু অমূল্য ও অতুলনীয়। একখানি গ্রন্থে এত মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ পূর্বে আর হয় নাই।" —স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী।

নূতন উপন্যাস—নূতন সৃষ্টি

বর্ত্তমান সময়ের সমস্যা ও তাহার সমাধান

শ্যাম-সোহাগিনী

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

মানুষ ভুল করে কিন্তু মানুষের মন পবিত্র থাকে, তবে ভুল ভাঙ্গিতে বিলম্ব হয় না মূল্য ১৷৷০ টাকা

যশস্বী কথাশিল্পী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

স্বর্গাদপি গরীয়সী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড), দেবনন্দিন ও বসন্তে। মূল্য—৩·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

গলাকাটা ধীরেন

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়

১৯৩৩ সাল। বিপ্লববিক্ষুব্ধ বাংলাদেশ। মৈমনসিং জেলার জামালপুর মহকুমা-শহরেও বিপ্লবীদের কর্মচেষ্টা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংঘটিত হয়ে চলছে। তখন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক এবং প্রবীণ কর্মিবৃন্দ জেল-জেলে বন্দী। যাঁরা বাইরে বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে যাচ্ছেন তাঁরা কিশোর। পুলিশের নির্যাতন তাই ক্রমশ অধিকতর বেপরোয়া ভাব গ্রহণ করছে। কারণ তাদের ধারণা যে, ডাণ্ডার ঘা দিয়েই এই বালকদের শায়েস্তা করা যাবে। বালকেরা যে আদর্শের অমৃত পান করে অজেয় হতে পারে এ-অভিজ্ঞতা পুলিশের থাকলেও উহার শিক্ষা তারা নেবে কেন? তারা তো ইংরেজের বেতনভুক্ পুলিশ! তারা প্রভুর পদসেবা করতে এসেছে। তারা জাতির তারুণ্যশক্তিকে চিনতে আসে নি।...

মফিজুদ্দিন সাহেব সেই সময় ও-অঞ্চলে একজন জাঁদরেল আই-বি দারোগা। মৈমনসিংহের তৎকালীন পুলিশ-সুপার এস. জি. টেইলরও তাঁকে একান্ত বিশ্বস্ত ও দক্ষ কর্মচারী বলে মনে করেন। ... বিপ্লবীদের শায়েস্তা করবার বহু ফন্দি তাঁর জানা আছে। মফিজুদ্দিন সাহেবের একটি মুসলমান 'স্পাই' ছিল, তার নাম 'গেঁদা'। গেঁদা প্রভুরই পরামর্শ মত জামালপুরের ছেলেদের দলে আস্তে-আস্তে ভিড়ে গেল।...

জামালপুরে 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর'—এই উভয় দলেরই যথেষ্ট প্রতিপত্তি। গেঁদার অনুপ্রবেশ ঘটেছে অনুশীলন দলে। সে গরম গরম কথা বলে। ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়। সাম্প্রদায়িক-মুসলমানদের বিরুদ্ধে কটূক্তি করে। মাঝে মাঝে জীবনটা দেশের কাজে বিসর্জন দেবার জন্যেও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।... বিপ্লবী তরুণ কিশোরদের দৃষ্টি এই লোকটির দিকে যায়। বিপ্লবের পথে পড়শী মুসলমানদেরকে সংগীরূপে পাবার লোভ তাঁদের আছে। গেঁদা তাই অতি সহজে বিপ্লবী-সংস্থায় ঢুকে যায়। ..

দলের ছেলেরা কর্মব্যস্ত। গোপন পরামর্শ ও প্রস্তুতি অবিরাম চলছে।... একটি কিশোর। তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা স্বপ্নচারীর মত। কোন্ অদৃশ্য আরাধনার পশ্চাতে যেন তাঁর ধাওয়া। তাঁকে সকলেই ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। এরূপ স্বপ্নচারী ও সৎ যুবক স্বভাবত সেকালে পুলিশের নজরে পড়ে তাদের কালো তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতো।.. ধীরেন দে-ও তাই পুলিশের দৃষ্টি থেকে অব্যাহতি পাবেন কেন?...

এই ছেলেটিকে পুলিশের বড় ভয়। তাঁকে রেহাই দেওয়া চলে না।... Despotic Government dislike dreamers. স্বৈরাচারী সরকারের কাছে স্বপ্নচারী তরুণ বড়ই অপছন্দের! এ কথা খাঁটি সত্য।...

মফিজুদ্দিনের নির্দেশ মত 'গেঁদা' তাই ধীরেন দে-র পাশে-পাশে ঘোরাঘুরি করে। আপন-ভোলা এই সৈনিকের বিশ্বাস অর্জন করতে তার বিলম্ব হয় না। গেঁদাকে অল্প-দিনের মধ্যেই ধীরেন দে বন্ধুর স্থানে গ্রহণ করে ফেলেন।...

এর পরের ইতিহাস, মফিজুদ্দিনের কলঙ্কিত-হাতে বিরচিত ইতিহাস।...

একদিন সন্ধ্যার পর গেঁদা তার নবলব্ধ বন্ধুকে গালগল্পের ফাঁকে স্থানীয় ডাক-বাংলোর সম্মুখে নিয়ে আসে। ডাকবাংলোয় তখন স্বয়ং মফিজুদ্দিন বিরাজমান। তাঁর চতুষ্পার্শ্বে থানার পুলিশ, স্পাই মজুদ রয়েছে। ধীরেন দে-কে আটক করা হল মফিজের প্ল্যান অনুযায়ী। মফিজের ধারণা যে, ধীরেন দে-কে 'ডাণ্ডার' ঘায়ে কাতর করে দলের সকল খবর জানতে পারা যাবে নিশ্চয়ই। তৎপর গাল-ভরা আখ্যায় একটি 'পলিটিক্যাল-ষড়যন্ত্র কেস' দাঁড় করালেই তাঁর পদোন্নতি তড়িৎবেগে আকাশচুম্বী হয়ে যাবে। অধিকন্তু পরম সহায়ক টেইলরসাহেব প্রভুভক্ত এই ভৃত্যের তদ্বিরার্থে তো আছেন-ই।...

ধীরেন দে-কে নিয়ে মফিজুদ্দিন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। প্রথমটায় প্রলোভন দেখান হল। অর্ধেক রাজত্ব আর পুরো রাজকন্যা তাঁর ভাগ্যে ঝুলছে—কেবল হাত বাড়ানর অপেক্ষা?... গেঁদা কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। ... তারপর প্রলোভনে কাজ হচ্ছে না দেখে কড়া-মিঠে মেজাজ দেখান হল কিছুক্ষণ। তারও পরে অবিমিশ্র কড়া মেজাজ।...ধীরেন দে ব্যাপারটা চট্ করে বুঝে ফেললেন। চিনতে পারলেন গেঁদার স্বরূপ। ধারণা করতে পারলেন মফিজের প্ল্যান।...

ধীরেন দে অটল, অচল্—অবিকম্পিত প্রত্যয়ে অপরূপ। বললেন মফিজের দলকে: 'তোমরা 'মানুষ' চিনতে শেখো নি। তোমরা ঝুটা মাল নিয়ে বাণিজ্য কর। আমার কাছে তোমাদের ঠকতে হবে!'...

ধীরেন দে-র উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। মফিজগোষ্ঠীর এমন হার বুঝি আর কখনো হয় নি! আমরা সে-কাহিনীই এখানে বলে যাবো।...

ইন্সপেক্টর মফিজুদ্দিনের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ধীরেন দে-কে 'পুলিশ-এজেন্ট' করা গেল না। মফিজ ক্ষেপে গেলেন। তাঁর মধ্যে-কার ক্লেদাক্ত্রিন্ন পশুটি তখন ক্রমশ গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে।... গেঁদা ও মফিজ দুজনে মিলে ধীরেন দে-কে হাতকড়া পরিয়ে তাঁর উপর বেদম মারপিট শুরু করে দিলেন। এই প্রহারের পালা সমানে তিন দিন ধরে ধীরেন দে-র উপর চলল। মারপিট যারা করছে তাদেরকে সময়-মত অদলবদল করান হচ্ছে, কিন্তু যাঁকে মারা হচ্ছে তাঁর মনুষ্যদেহের তো অদলবদল নেই! অত্যাচার অবিরাম চলছে—কখনো বর্বর হস্তের নির্যাতন, কখনো অশ্লীল-রসে কুৎসিত কথা বর্ষণ, কখনো আদরযত্ন ও প্রলোভন দেখাবার অভিনয়!...কিন্তু ধীরেন দে-র প্রশান্ত চিত্তে এসব কোন-কিছুরই দাগ কাটে না। বীর্য-মন্ত্রের মহান এই উপাসক ভগবান বুদ্ধের শিক্ষাপ্রভাবেই বুঝি শিক্ষিত হয়েছিলেন। স্বীয় আদর্শের মহিমায় 'মার'-এর আক্রমণ থেকে আপন সত্ত্বাকে তিনি মুক্ত করে নিলেন!...

যে-যুগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে-যুগে অনুষ্ঠিত পুলিশের অত্যাচারের স্বরূপ সভ্যজগতের ধারণাতীত। বাঙালী আজও সম্যকরূপে জানে না কিছু জানলেও ভাল করে বোঝে না যে তাদেরই স্নেহের দুলালদেরকে সেই কালে বৃটিশের তাঁবেদার দেশী-পুলিশ কী যাতনা দিয়ে অর্থোপার্জন করে গেছে! সেসব পুলিশের বহু ছোটবড় কর্তাই অবশ্য স্বাধীনতালাভের পর জাতীয়পতাকা ও জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও রক্ষকরূপে দেশের শোভা-বর্ধন করে এসেছেন! তাতে দেশবাসী লজ্জা-বোধ করেন নি!...

মফিজের আদেশ মত গেঁদা একটি ভিজে গামছা শক্ত দড়ির মত করে পাকিয়ে প্রভুর হস্তে দিল। বর্বর মফিজ সেই মোটা দড়ি দিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ ধীরেন দে-র অনাবৃত অঙ্গে শপাং-শপাং প্রহার করে চললেন। মফিজ ক্লান্ত হলে গেঁদা, গেঁদা ক্লান্ত হলে মফিজ—এইভাবে দুটি দস্যুর হস্তে তরুণ বিপ্লবী অবিরাম প্রহৃত হতে লাগলেন। এত প্রহারের

পরও দেখা গেল ধীরেন দে-র সর্বাঙ্গ ফুলে যাওয়া সত্ত্বেও কোন স্থানে এতটুকু কালশিটে দাগ পড়ে নি! পুলিশের বিজ্ঞানসম্মত মার-এর তাৎপর্য এমনই!...

এর পর আসামীকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে দেওয়া হল। এই বিশ্রামকালে গোপন তথ্য বের করার চেষ্টায় বহু অনুনয়বিনয় ও প্রলোভন দেখনও চলল। কারণ আসামীর মনের ওপর প্রভাব বিস্তারের ইহাই নাকি 'সাইকলজিক্যাল মোমেণ্ট'!...কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। ধীরেন দে তপস্বী হিমালয়ের মত নিরাসক্ত, নির্বাক!...

সন্ধ্যা হতেই পা দুটি হাতখানেক ফাঁক করিয়ে ধীরেনবাবুকে দাঁড় করান হল। হাতে 'হাতকড়া' তো পরানই ছিল। হাতকড়া সমেত হাত দু'খানা ঊর্ধ্বে টেনে সিলিং-এর সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এ-অবস্থায় এই তরুণকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। অজস্র মশার হুল সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। ক্লান্ত দেহ ঝুলে পড়তে চায়। ফাঁক-করা দুটি পা স্বভাবতই পরস্পরের কাছাকাছি আসতে থাকে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সতর্ক প্রহরী ধীরেনবাবুর হাঁটুতে বুল দিয়ে আঘাত করে। দু'পা আবার থরথর কেঁপে ফাঁক হয়ে যায়!.. বোমান 'পিলেট'-এর অনুচরদের দ্বারা নির্যাতিত এবং ক্রুশবিদ্ধ মহামানব যীশু! কোন্ এক অসহায় মুহূর্তে করুণ কণ্ঠে যীশুও প্রশ্ন করেছিলেন তাঁর ভগবানকে :

'My God, My God, why hast thou forsaken me!" কিন্তু কিশোর ধীরেন দে-র কণ্ঠ থেকে তাঁর বিপ্লব-দেবতার কাছে কোন অনুযোগের কথা পৌঁছেছিল বলে কারো জানা নেই!...

দ্বিতীয় দিনের পন্থা আরো অভিনব।... ধীরেন দে-কে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। এর পর তাঁর নাকের ছিদ্রপথে বিরামহীন ধারায় জল ঢালবার নির্মম ব্যবস্থা! সে কী অসহ্য যন্ত্রণা! প্রতি মুহূর্তে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়, কিন্তু বন্ধ হয় না! ছট্‌ফটানির সীমা নেই—অথচ দেহ শৃঙ্খল-জর্জরিত।...

দেহের ওপর যে-কোন মাত্রায় অত্যাচার দস্যু মফিজ মিঞা করতে পারেন, কিন্তু মনের উপর হাত দেবার সামর্থ্য তাঁর নেই। বিপ্লব-সাধনার মহাসাধক যে পুরুষ, তাঁর দেহ তো পূর্বাহ্নেই তাঁর নিজের মনের দাস হয়ে গেছে! একই কালে নিজের দেহকে 'পরিত্যক্ত-বস্তু'রূপে দূরে রেখে সেই দেহেরই ওপর অনুষ্ঠিত নির্যাতনের অচঞ্চল 'দ্রষ্টা' হবার মত চিত্তশুদ্ধি ধীরেন দে-র লাভ হয়েছিল। ধীরেন দে এখনে পরম যোগীর স্তরে-বেন বিরাজমান!..

বিপ্লবের সৈনিক মহাবীর্যবান এই কিশোরকে তৃতীয় দিবসে মুখ মফিজুদ্দিন গুপ্তীভরা রিভলভার দেখিয়ে কাবু করতে চাইলেন। প্রত্যুত্তরে মফিজ ধীরেন দে-র ওষ্ঠে দেখেছিলেন বিদ্রূপের হাসি!...

উপেক্ষিত মফিজের ক্রোধ এতে বেড়ে গেল। এবং নতুনতর উদ্যমে গোঁদাকে সঙ্গী করে মফিজ অবিশ্রাম বর্বরতায় ধীরেন দে-র ওপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করলেন।... দীর্ঘ বাহাত্তর ঘণ্টা ধরে যে মানুষটির ওপর অমন অনাচার চলছে তাঁর দেহ তো ভঙ্গুর হবে আসবেই!...

তৃতীয় দিবসের তখন গভীর রাত্রি। মফিজ ও গোঁদা 'হাতের সুখ' শেষবারের মত করে একবার 'ভাল করে' ধীরেনবাবুর দিকে তাকিয়েছেন। ধীরেন দে-র কোন সাড়া নেই যেন!...হঠাৎ এ লোকদুটোর কেমন যেন ভয় হল। তবে কি ধীরেন দে-র দেহ প্রাণহীন? ভাল করে নেড়েচেড়ে দেখার পর উভয়েরই মালুম হলো যে, ঐ দেহে জীবনের কোন লক্ষণ নেই!...মফিজ মিঞা তৎক্ষণাৎ ছুটলেন শহরের গুরুদেব টেইলরের কাছে।...

সে-রাতেই পুলিশ-সুপার টেইলর সব শুনলেন। তিনি বুদ্ধিমান জীব। ইংরেজের জমিদারী চালাতে জানেন। মফিজুদ্দিনকে বললেন: 'কুছ পরোয়া নেহি।..তুমি এক্ষুণি জামালপুরে ফিরে যাও। থানার অফিসারকে যে-পত্রখানা লিখে দিচ্ছি তদনুসারে কাজ করো। ধীরেনের লাসটা জঙ্গলে ফেলে দিয়ো।...'

টেইলর থানার দারোগাকে যা লিখেছিলেন তার মর্ম এই : 'এখুনি একটি খুনের মামলা রুজু করে দেওয়া হোক। বিষয়বস্তু হল—ধীরেন দে ডাকবাংলো থেকে রাতে গৃহের দিকে ফিরে যাচ্ছিল। তাকে 'পুলিশ-ইনফরমেশনে'র জন্যে সেখানে ডেকে পাঠান হয়েছিল বিকেলের দিকে। বাড়ি ফিরবার পথে তার নিজের দলের পলিটিক্সই তাকে পুলিশ-এজেন্ট সন্দেহে হত্যা করে ঝোপের মধ্যে ফেলে রেখে গেছে।'...

মফিজ মিঞা জামালপুর ফিরে এসে গোঁদার সাহায্যে ধীরেন দে-র লাস ডাকবাংলোর অদূরে একটা ঝোপের মধ্যে ফেলে দেয়।...

পরদিন ধড়াচূড়াধারী পুলিশ শহরময় হুলুস্থুল শুরু করে দিল। দু'চারদিন এই খুনেরই দায়ে বহু নিরীহ মানুষকে পুলিশের নানা উৎপাত সহ্য করতে হল। তৎপর এক-দিন খুনীর কোন হদিস না পাওয়াতে পুলিশ তথা সরকার মামলা প্রত্যাহার করে নিল। সরকার বিশ্বের কাছে অনায়াসে প্রচার করলেন যে, জামালপুরের টেররিস্ট পার্টি' ধীরেন দে নামক দলের একজন সভ্যকে পুলিশের লোক সন্দেহে নির্মম হস্তে গলা কেটে ডাকবাংলোর সম্মুখে ফেলে রেখে গেছে।...

দেশবাসীর কাছে সেদিন ধীরেন দে-কে এভাবে 'গলাকাটা ধীরেন' রূপেই পরিচিত করা হয়েছিল। দলের লোকেরাও জানতে পারলো না যে সবার অজ্ঞাতে একটি আত্ম-সমাহিত অনন্যসাধারণ যোগীর অমূল্য জীবন কী ভাবে বিনষ্ট করা হয়েছে! তাঁর জীবন শুধু নয়, তাঁর সম্ভ্রম পর্যন্ত অপহরণ করে জালিয়াৎ ইংরেজের ক্রিমিন্যাল পুলিশ তাঁকে 'বিশ্বাসঘাতকে'র বেশ পরিয়ে জাতির কাছে দাঁড় করিয়েছে...

বিপ্লবের ইতিহাসে এ-রূপ অজ্ঞাত এবং অখ্যাত মৃত্যুঞ্জয়ী সাধকের সংখ্যা দু'একটি নয়। কিন্তু কে তাঁদের খোঁজ করে?..

বীর্যশালী ধীরেন দে-কে হীনতম বর্বরতায় হত্যা করে কাপুরুষ মফিজের দল খুশি হলো; উদ্ধত টেইলর-এর দল সে মহৎ-প্রাণকে 'স্পাই'-এর অপবাদ দিয়ে অব্যাহতি পাবার পথ খুঁজে নিল; আর দেশবাসী সে-অপবাদের গল্প বিনাবিচারে গ্রহণ করে 'বুদ্ধিমানে'র ভূমিকা মুখের মত গ্রহণ করল।...কিন্তু নৃশংসতার ঘৃণ্য, নীচতার ক্লেদজর্জর এই যে রুচি—এরই ঊর্ধ্বে অজ্ঞাত ইতিহাসের পটভূমি জুড়ে রয়েছে অপূর্ব আলোকবন্যা। সে বন্যাধারায় পরিস্নাত এক দিব্যমূর্তি! সে মূর্তি অবশ্য ইতিহাসের অচেনা নয়। কিন্তু আমরা চিনতে পেরেছি কি ঐ মূর্তির মধ্যে শহীদ ধীরেন দে-কে? শুনতে পেয়েছি কি ঐ রূপময়ের ব্যাকুল কণ্ঠ :

> আমি তোমাদেরি লোক
> আর কিছু নয়—
> এই হোক শেষ পরিচয়—'?...

দ্রষ্টব্য : [এই কাহিনী আনুপূর্বিক শোনা গেছে একজন বিশ্বস্ত পুলিশ-অফিসারের কাছে। তিনি অবিভক্ত-বাংলায় 'ডি-এস্-পি' ছিলেন এবং তাঁর পূর্ব-বঙ্গের কার্যক্ষেত্রে অবস্থানকালেই এই ঘটনা ঘটে। তাঁর নাম শ্রীবিভূতি-ভূষণ সাহা।]

পাখা নগদ ও সহজ কিস্তিতে—জি ই সি • বুশ • টেলিরেড, ট্রানজিষ্টার অলওয়েভ ও লোকাল প্রেসার কুকার রে ডি ও
এলায়েড রেডিও ইণ্ডাষ্ট্রীজ
শোরুম
২৩ পড়িয়াহাট রোড, কলি-১৯
(ন্যাশনাল ইকো পাওয়া যায়) ১৫৩/১ বিবেকানন্দ রোড, কলি-৬ ঃ ফোন ৩৫-৪৬২৬

অতীতের অগ্নিদিগন্তে

(১৬০ পৃষ্ঠার পর

সকালে আসবেন এই কথা জানিয়ে চলে গেলেন। আমরাও চারজন সারাদিনের ক্লান্তির পর নিজ নিজ বিভলবার সংগে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমাদের মনে হয়েছিল রঞ্জনবাবুর বাড়ি হয়ত পুলিশ খুব শীঘ্র খানাতল্লাস করবে না এবং আমরা হয়ত অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বিগ্নে এখানে থাকতে পারবো।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরেটা দেখলাম। সবই ঠিক আগের মতই আছে, কেবল এই বাড়িতে নেই রঞ্জত—বাড়ির বড় ছেলে। মাসীমা আমাদের জন্য চা, ইত্যাদি নিয়ে এলেন। আমরা খুব তৃপ্তির সংগে সবকিছু খেলাম; কিন্তু মনে হচ্ছিল অন্য সবার কথা—কোথায় তারা—কি ভাবে আছে তাঁরা! মাসীমা নীচ থেকে ঘুরে এসে জানালেন যে, মেসোমশাই আমাদের সংগে দেখা করতে চান—আমাদের অনুমতি চাইছেন। যিনি আমাদের আশ্রয়দাতা, যাঁর ছেলে আমাদের বিপ্লবী সংগঠনের গৌরব, যাঁর স্ত্রী ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ বীর নারী, তিনি আমাদের অনুমতি চাইছেন আমাদের সংগে দেখা করতে? মাসীমাকে বললাম—"আপনি মেসোমশাইকে পাঠিয়ে দিন। তাঁকে বলুন তাঁর বিপ্লবী সন্তানরা তাঁর আশীর্বাদের অপেক্ষায় আছে।"

মেসোমশাই এই প্রথম আমাদের বাস্তব স্বরূপ জেনে আমাদের সংগে দেখা করতে আসছেন। রজত যে আমাদের একজন প্রধান বিপ্লবী সাথী তাও তিনি বর্তমানে জেনেছেন। কি প্রতিকূল পরিবেশের লোক তিনি! কে জানতো ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁর অন্তরের এই গভীর অনুভূতির কথা? মেসোমশাই এলেন। আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন—কত শত পুঞ্জীভূত অন্তরের আবেগ কত সহস্রভাবে যে তিনি ব্যক্ত করলেন, তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। সেইদিন সেই মহান পুরুষ তাঁর এতদিনের মিথ্যা আবরণ উন্মোচন করে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁর সত্যিকারের দেশপ্রেমের পরিচয় নিয়ে। তাঁকে আমরা আমাদের বিপ্লবী অন্তরের শ্রদ্ধা জানালাম। তাও যেন তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বের কাছে ম্লান হয়ে গেল। ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার একজন ফিল্ড মার্শাল ও আর একজন জেনারেল, রজতের বাবা রঞ্জনলালের কাছে যে অতি ক্ষুদ্র, তাঁর আকাশচুম্বী দেশভক্তির কাছে তাঁদের স্বদেশপ্রেম যে অতি সামান্য, তাঁর আত্মত্যাগের মহিমা যে কোন বিপ্লবীর তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়।

আনন্দমঠের সেই মহামন্ত্র—"আমাদের ঘর নাই, বাড়ি নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই আমরা জানি জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী!" বিপ্লবী যুবকদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। রঞ্জনলাল, 'সরকারী মহলের বন্ধু' ও আপাতদৃষ্টিতে সেই পরিবেশের মধ্যে যিনি মানুষ, তাঁর ঘর-বাড়ি বিষয়-সম্পত্তি ও স্ত্রী-পুত্রের কোন আকর্ষণ বা মোহ তাঁকে স্বদেশপ্রেমের চেতনা থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের দ্বিতীয় দিনই আমাদের জীবন্ত বা মৃত ধরবার সাহায্যের মূল্য হিসেবে সরকার আমার এবং গণেশের মাথাপিছু পাঁচ হাজার টাকা করে এবং আনন্দ ও মাখনের—প্রত্যেকের জন্য এক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। তখনকার দিনে আমাদের চারজনের মূল্যের বিনিময় রঞ্জনলাল, "সরকারী মহলের" বন্ধু রঞ্জনলাল, অনায়াসে বারো হাজার টাকার মালিক হতে পারতেন—এমন কি পুত্র রজতের প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে রঞ্জনলাল সরকারের কাছ থেকে রঞ্জনের প্রাণভিক্ষাও চেয়ে নিতে পারতেন। সেই সুযোগ রঞ্জনলালের প্রচুর ছিল। এমন কি সেইরূপ কোন প্রতারণা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ গোপন রেখেও তিনি পুলিশকে আমাদের সংবাদ দিতে পারতেন—সেই সুবিধারও রঞ্জনলালের অভাব ছিল না। স্বদেশপ্রেমের মহামূল্যবান কষ্টিপাথরে রঞ্জনলালের সংগে তথাকথিত স্বদেশপ্রেমের ধ্বজাধারী অনেক রথী-মহারথীদের বিচার করলে, তাদের অনেককেই অতি জঘন্য তস্কর বলে প্রতিপন্ন হতে হবে—অন্তত তাদের নিজেদের বিবেকের কাছে।

মেসোমশাই আমাদের কাছে অস্ত্রাগার আক্রমণের মোটামুটি বিবরণ জানলেন। রজত যে তার ভূমিকা অক্ষরে অক্ষরে কৃতকার্যতার সংগে পালন করেছে, সেই জন্য তিনি অত্যন্ত গর্বিত। চট্টগ্রামের বিপ্লবী যুবকদের এই সার্থক স্বতন্ত্র অভিযানকে তিনি অভিনন্দন জানালেন। আর চট্টগ্রামের যুবকরা যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক ঐতিহাসিক গৌরবোজ্জ্বল বৈপ্লবিক অধ্যায় সৃষ্টি করেছে, এই আনন্দে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন।

আমাদের এমনি ধরণের কথাবার্তা চলছিল। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! রজতের ছোট ভাই-বোনেরা বাড়ির কম্পাউণ্ডে খেলা করছিল এবং তাদের ওপর মাসীমা দায়িত্ব দিয়েছিলেন পথের দিকে নজর রাখতে। আবার সেই ঘটনা—আনন্দের ছোট ভাই "মা আসছে" বলে চীৎকার দিয়ে জানিয়েছিল পুলিশের আগমনবার্তা, আজ আর রজতের ভাইবোনেরা চীৎকার দেয় নি, চীৎকার দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পুলিশ খুব কাছেই এসে পড়েছিল। ছুটে গিয়ে তারা মাকে খবর দিল। তক্ষুণি মেসোমশাই জানতে পারলেন। এক মুহূর্তে তিনি একটি ছোট টেবিল টেনে ঘরের মাঝে আনলেন। রজতের বাড়িতে উপরের প্রধান ঢালু ছাদের নীচে একটি ঘর জোড়া কাঠের পার্টাতন ছিল এবং সেই পার্টাতনের উপরে উঠবার একটি চতুষ্কোণ ফাঁক ছিল এক গজ চতুষ্কোণ তক্তা কেটে সেই ফাঁকটির একটি ঢাকনি করা ছিল। এই ঢাকনিটি সরিয়ে ভেতরের ছাদের উপরে লুকোনো যায় এবং সাধারণত বাড়িতে এই ফাঁপা স্থানটিতে ঘরের অনেক জিনিসপত্র রাখা হয়। আমরা এই ফাঁপা জায়গায় আমাদের অস্ত্রশস্ত্রও লুকিয়ে রাখতাম। মেসোমশাই যেমনি টেবিলটি এই চতুষ্কোণ তক্তার ঢাকনিটির নীচে রাখলেন, তক্ষুণি আমরা একের পর এক এই ঢাকনি সরিয়ে ঐ ফাঁপা স্থানটিতে আশ্রয় নিলাম। মাখন ও আনন্দকে "ফাঁপা ছাদের" এক কোণে 'পজিশন' নিতে ইংগিত করলাম। আমি ও গণেশ এই ঢাকনিটির উপর চেপে বসলাম। প্রত্যেকের হাতে দুটো গুলীভরা খোলা রিভলবার। ট্রিগারে আংগুল ঠেকানো আছে। এই সমস্ত ব্যাপারটা সম্পন্ন করতে আমাদের এক মিনিটের বেশী সময় লাগে নি। মেসোমশাই টেবিলটি ঘরের কোণে ঠেলে রেখে নীচে চলে গেলেন তাঁর চেম্বারে। আমরা আমাদের লুকানো 'পজিশন' থেকে ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে বাইরের সব দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু আমাদের দেখতে পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না—যদি না কেউ বাইরে থেকে এই চতুষ্কোণ কাঠের ঢাকনিটি সরিয়ে ফেলে। তবে পুলিশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে এই ছিদ্রপথের ঢাকনিটি তাদের চোখে পড়বেই, যদি কেউ একজনও একবারও উপরের দিকে তাকায়।

সার্জেন্ট কেলী ও ৪৯ বেংগল রেজিমেন্টের প্রাক্তন সৈন্য বর্তমানে ডি আই বি স্যার শচীন ভৌমিক একদল সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে ছুটে এসে বাড়িতে ঢুকলেন। সেপাইরা সবাই রাইফেল, ফায়ারিং পজিশনে, হাতে নিয়ে ঢুকলো, আর কেলী সাহেব ও শচীনবাবু দুজনেই হাতে খোলা রিভলবার নিয়ে আগে আগে এলেন। প্রায় ১৫—২০ জন সেপাই সমস্ত বাড়িটি ঘিরে ফেললো। আর প্রায় দশজন সেপাই নিয়ে শচীনবাবু ও কেলী সাহেব রঞ্জনলালের চেম্বারে এসে উপস্থিত। আমরা তাদের কথাবার্তা, গলার আওয়াজ সব শুনতে পাচ্ছিলাম। দু-এক মিনিট কথা বলার পর বুঝতে পারলাম তারা রজতের বাবাকে নিয়ে সারা বাড়ি তল্লাসী আরম্ভ করেছে। প্রত্যেকটি সঙ্কটাপন্ন মুহূর্তে ক্রমেই আরো বেশী ভয়াবহ হয়ে উঠতে লাগলো। এবার মনে হোল নীচের ঘর সব দেখা শেষ করে তারা উপরে আসছে। সিঁড়ির ওপর বুটের আওয়াজ ক্রমেই স্পষ্টতর হতে লাগলো। মাঝে মাঝে শুনলাম শচীন ভৌমিক বলছেন—'আপনি আগে চলুন।" কানে এলো মেসোমশাই তাদের বলছেন, "আসুন, আসুন—ওপরের দুটি ঘর দেখুন এসে' ইত্যাদি। আমরা বুঝতে পারছিলাম তাঁর কি ভীষণ

অবর্ণনীয় অবস্থা। কি বিদারক অভিজ্ঞতা অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন তিনি!

প্রথম ঘরটাতেই আমরা ছিলাম। কিন্তু প্রথম ঘরটাতেই তিনি যেন কোনক্রমেই আগে পা বাড়াতে পারলেন না—তবুও তো এক মিনিট হলেও বেশী সময় পাওয়া যাবে আসন্ন মৃত্যু থেকে বাঁচবার। সেই ঘরটি দেখাবার পর এই শেষ ঘরে পুলিশ মেসোমশাইকে সামনে রেখে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকলো। কি এক মর্মান্তিক ও করুণ দৃশ্য! মেসোমশাইকে সম্পূর্ণ অসহায় ও অসম্মানজনক অবস্থায় দেখলাম। মেসোমশাইয়ের পিঠ লক্ষ্য করে শচীন ভৌমিক ও কেলী সাহেবের রিভলবার দুটি উদ্যত হয়ে আছে। তাঁকে এই অসহায় অবস্থায় রেখে, তাঁর আড়ালে বীরপুংগব দু'জন মিলিটারী কায়দায় এই ঘরে প্রবেশ করলো। আর সংগে সংগে সেপাইরা উদ্যত রাইফেল নিয়ে রজতের থাকবার ঘরে ঢুকলো।

একবার—যদি একবার ভুলক্রমেও উপরের দিকে তাদের মধ্যে কেউ তাকাতো, তবে যে কি ঘটতো তা আজ বলতে পারছি না। নিঃশ্বাস বন্ধ করে প্রতি মুহূর্ত গুণেছি। মেসোমশাইকে দুই দিকের পরস্পর বিরোধী রিভলবারের মুখের মধ্যে দেখে আমাদের সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম বইছিল। যদি সংঘর্ষ হয়, তবে তাঁর কি হবে! সূক্ষ্ম যুক্তি দিয়ে বেশী ভাববার সময় বা মানসিক অবস্থা ছিল না। খুব সম্ভব হয়ত ফেণী ষ্টেশনের সংঘর্ষের মত গুলী চালাতামই। আমরা মেসোমশাইকে বাঁচিয়ে গুলী ছুড়লেও তারা কি মেসোমশাইকে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই দিত?

যতক্ষণ পড়তে সময় লাগছে তার আগেই তারা সবাই এই খালি ঘরটি ঘুরে দেখে চলে গেল। কি আশ্চর্য, কেউ ওপরে নজরই দিল না! সবাই ব্যস্ত যদি তাদের আশে-পাশে বা পেছন থেকে কেউ তাদের ওপর অতর্কিতে গুলী ছোড়ে! তাই তাদের দৃষ্টি ছিল আশে-পাশে ও রঞ্জনবাবুর দিকে। মেসোমশাই হাজার হলেও উকিল—অভিনয় করলেন চমৎকার। সবাইকে বোকা বানিয়ে বিদায় দিলেন। তবে আমরাই কেবল বুঝছিলাম তাঁর গলা একটু কাঁপছিল, মাঝে মাঝে কিছু সামঞ্জস্যহীন কথাও বলে ফেলছিলেন। সেই সংকটের মধ্যে পড়লে জানি না কয়জন এমন মাথা স্থির রেখে মেসোমশাইর মত কৃতকার্যভাবে সংগে বিপদকে পরাস্ত করে জয়ী হতেন!

দুপুরবেলা মাসীমা আমাদের খাবার জানালেন। খাওয়ার পর মেসোমশাই আবার এলেন পরামর্শ করতে—আমাদের ভবিষ্যৎ প্ল্যান নিয়ে। কিছুক্ষণ কথা বলবার পর প্রায় দুটোর সময় আবার আর একদল পুলিশকে দৌড়ে বাড়ির দিকে আসতে দেখা গেল। আমরা আবার সেই ফাঁপা স্থানে—ঘরের ভেতরের ছাদের ওপর আশ্রয় নিলাম। কিন্তু এবার পুলিশ এই বাড়িতে না এসে পাশের বাড়িতে ঢুকেছিল। এক ঘণ্টা পরে মেসোমশাই ও মাসীমা—দুজনের চোখই ছলছল। আমাদের এখানে থাকা উচিত হবে না, তা তাঁদের জানিয়েছিলাম। আমরা কোথায় যাব, কি করে বিপদের পর বিপদ থেকে বাঁচবো কি করেই বা প্রধান বাহিনীর সংগে আমাদের যোগাযোগ হবে, আমাদের সবার ভবিষ্যৎ কি—ইত্যাদি চিন্তায় তাঁরা আর স্থির থাকতে পারছিলেন না। বেশী বোঝবার কিছু ছিল না। সবাই তাঁরা বুঝতে পারছিলেন যে এর একমাত্র পরিণতি মৃত্যু! অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর জন্য কাতর হওয়া বাতুলতা। তাই তাঁদের দৃঢ় মনোবল তাঁদের সাহায্য করলো বিপদ ও মৃত্যুভয়কে হাসিমুখে জয় করতে।

তাঁরা আমাদের খাওয়া-দাওয়া করে যেতে বললেন কিন্তু তা সম্ভব ছিল না, কারণ তা হলে সময়মত গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। মেসোমশাই আমাদের কিছু টাকা দিলেন সংগে রাখবার জন্য। সন্ধ্যার একটু পরে আমরা তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তাঁরা তাঁদের সন্তানদের এইরূপ জীবন-মরণ অনিশ্চিতের মধ্যে বিদায় দিতে বাধ্য হচ্ছেন, তাই তাঁদের চোখে জল। পিতা-মাতা নিজ পুত্রের কথা না ভেবে পারেন না। পুত্রের সহ-তীর্থ সাথীদের এই দুর্যোগে বিদায় দেবার সময় মায়ের বিগলিত স্নেহের করুণ উচ্ছ্বাস আমাদের অভিভূত করে ফেললো। আমরা তাঁদের প্রণাম করলাম। তাঁরা আমাদের সবাইকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। গদগদ কণ্ঠে বললেন—"এ জীবনে হয়ত তোমাদের সংগে আর দেখা হবে না, রজতকেও হয়ত আর দেখতে পাবো না। জানি না পরলোক আছে কিনা, প্রার্থনা করবো যেন তোমাদেরই আমরা পরজীবনে আবার পাই.....।" আমরা রাস্তার বাঁক ঘুরে তাঁদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেলাম।

এই বিপ্লবী পরিবারের রোমাঞ্চকর ইতিহাসের শেষ এখানে নয়। ১৮ই এপ্রিল রজত অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশগ্রহণ করে। তারপর প্রধান বাহিনীর সংগে ২২শে এপ্রিল জালালাবাদে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তারপর আবার এই মে ১৯৩০ সালে কলার পোল খণ্ডযুদ্ধে রজত ও আর তিনজন প্রাণ দেয়। এই যুদ্ধের একদিন আগে রজত তার পাঁচজন সাথীর সংগে সহরে আসে শত্রুর এক শিবির অতর্কিতে আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যে। সেইদিন তারা ছয়জন বন্ধু, মেসোমশাই ও মাসীমার কাছে এসেছিল। সেইখান থেকেই পুলিশ ও মিলিটারি তাদের অনুসরণ করে। তারপর ভোরবেলা কালার পোলে যুদ্ধ হয়। কাজেই এই বিপ্লবী পরিবারের ইতিহাস এই রচনাতে সব পাওয়া যাবে না। শেষ পর্যন্ত রঞ্জনবাবু, আমার বাবা—গোলাপ সিংহ ও দেবুর পিতা মনোরঞ্জন গুপ্ত দু' বছর ব্রাইবুনাল-এর বিচারের কাঠগড়ায় ছিলেন। তাঁদেরও বিচার হোলো আমাদের সংগে।

আমি এই পরিবারের এই অধ্যায়টি লিখলাম না, কারণ আমার মনে হয় সামান্য দু'চার কথায় লিখলে তাঁদের অসামান্য ত্যাগ ও দেশপ্রেমের পরিমাণ উপলব্ধি করা যাবে না। তাই পরের ঘটনাগুলি এই লেখার সংগে না লিখে এই অধ্যায়টি এখানেই শেষ করলাম।

লোকশিল্পী

(১৮ পৃষ্ঠার পর)

আসরে আসরেই ঘুরি। সেই আসরও তো কই—'

বাস আসছে। পার্কের গাছগুলির আড়াল থেকে দোতলার চূড়টা দেখা গেল।

গৌরগোপাল হঠাৎ বললেন, 'আমার কাছে তো কোন কাগজপত্র নেই। আপনার কাছে বোধ হয় আছে।'

বললাম, 'আছে। কী হবে?'

'দয়া করে আমার ঠিকানাটা যদি রাখেন। আপনাদের এদিকে যখন কোন গান-বাজনার আসর বসবে আমাকে একটা খবর দিলে'—

কলম আর পকেট ডায়েরিটা আমি গৌরগোপালের দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

তিনি জিভ কেটে বললেন, 'ছি-ছি-ছি! আপনি লিখুন।'

আমি তাঁর নাম লিখলাম, ঠিকানা লিখলাম।

তিনি তাকিয়ে ছিলেন। লেখা শেষ হয়ে গেলে বললেন, 'ব্রাকেটে আর একটা কথা লিখুন।'

আমি একটু বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কী লিখতে হবে?'

তিনি বললেন, 'লোকশিল্পী। পাড়ার লোকজন আমাকে ওই নাম দিয়েছে। ঠাট্টা করেও বলে আবার ভালোবেসেও বলে। আমাদের সাঁতরাগাছিতে আমাকে ওই নামে চেনে সবাই।'

বাস এসে পড়েছে।

আমি বললাম, 'উঠুন। উঠে পড়ুন।'

গৌরগোপাল একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আপনি ভিজে যাবেন।'

হেসে বললাম, 'নাওয়ার সময়। ভিজতে আর আপত্তি কি?'

বাসে উঠলেন গৌরগোপাল। জানালার ধারে বসে হাসি মুখখানা বাড়িয়ে রইলেন।

আমি ভিজতে ভিজতে ভাবতে ভাবতে এগোতে লাগলাম। আমি কি সত্যিই এই লোকশিল্পীর কোন কাজে আসতে পারব? ওঁকে দিয়ে আর একটি লোকশিল্প রচনার চেষ্টা ছাড়া আমার পক্ষে আর কিছু করা কি সম্ভব হবে?

যেদিকে দু'চোখ যায়

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

বললেন। বলুন তো কে? পরনে ফুলপ্যান্ট, গায়ে বুশশার্ট, পায়ে জুতো, চোখে চশমা, হাতে ঘড়ি। চিনতে না পারারই কথা। আগেকার সে জমানা আর নেই। ও হল এখনকার চা-বাগানের মজুর। এটা হল বেড়াতে বেরোবার পোশাক। যখন কাজে যাবে তখন হয় হাফ প্যান্ট, নয় খাটো ধুতি, হয় খালি গা, নয় গেঞ্জি। মেয়েরাও তাই। কাজে যায় ব্লাউজের সঙ্গে পরে কালো ঘেরনা। যখন হাটে আসে তখন শাড়ি ব্লাউজ পরে অন্য চেহারা।

ক্ষার কিংবা সাজিমাটির দিন নেই আর। এখন লাইফবয়-সার্বান আর ধার সোপ। এ অঞ্চলে এখন সাইকেলের ছড়াছড়ি। সাইকেল সারানোর দোকানই তো আছে দশ-বিশটা। রেডিওর দোকান আছে দুটো। চা-বাগানে সর্দারদের ওপরে হোল বইদার। এই বইদারদের ঘরে রেডিওর পত্তন শুরু হয়েছে। মজুররা কেউ কেউ কলের গান কিনেছে।

মালবাজারে এখন একটাই সিনেমা। সাধনা টকীজ। সিনেমায় ভিড় দেখতে হয়। চলে সবই প্রায় হিন্দী ছবি।

বাইরের এই কোঁচার পত্তনের পেছনে যে কী, তা অবশ্য ভাল বলতে পারবে এখানকার পাঁচ-সাত ঘর সুদখোর কাবলিওয়ালা।

আর বলতে পারবে সেইসব কারবারী যারা বাকিতে কিংবা কিস্তি-বন্দী হারে মজুরদের জিনিস দেয়।

মালবাজার ছাড়িয়ে বাসের জানলা দিয়ে কোথায় যে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখলাম ঠিক মনে নেই।

নাম জানতে পারলাম না, কী একটা পাহাড়ী নদী। তারপরই সুনাগাছি চা-বাগান এসে গেল। আবার একটা নদী। তারপর চালসা স্টেশন। তারপর ঢেউ খেলানো উঁচুনীচু জমি।

লাটাগুড়ি কাঠেরই জায়গা। কাঠ-গোলার ছড়াছড়ি। ময়নাগুড়ি পেরিয়ে ছোট্ট কুমলাই নদী। ধূপগুড়ির পর গয়েরকাটায় বাস কিছুক্ষণ থামল। বেশ বড় গঞ্জ। হাত-পা ছড়িয়ে বসে আরাম করে চা খেয়ে নেওয়া গেল।

তারপর একে একে বীরপাড়া, জটেশ্বর, ফালাকাটা। ফালাকাটায় দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার। শৌলমারির ব্যাপারে কিসের যেন সভা।

শীতে শুকনো শিলতোর্সার বুকের ওপর দিয়ে বাস গেল। সোনাপুরে নেমে বাস বদলাতে হবে। যাব আমরা আলিপুরদুয়ার।

আলো পড়ে আসছে। সন্ধ্যের আগে আগে না পৌঁছুতে পারলে রাতটা আলিপুরদুয়ারেই থেকে যেতে হবে।

এদিকে বাসের কোনো চিহ্ন নেই। বাচ্চু বুদ্ধি করে ইট-বওয়া একটা ফিরতি লরীর সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেলল। বেশ কসরৎ করে ওপরে উঠতে হল। লরী চলতে চলতে এমন ঝাঁকাতে লাগল যে, এ লরীতে ইট যে কী করে ইট থাকে সেটা আন্দাজ করা শক্ত হল—কেন না এই ঝাঁকানিতে ইট-গুলোর তো শেষ পর্যন্ত খেয়া কিংবা সুরকি হয়ে যাওয়ার কথা।

আমাদের কপাল ভাল, আলিপুর-দুয়ারে পৌঁছে দেখি একটা দোকানের সামনে ধওলাঝোড়ার ট্রাক তখনও দাঁড়িয়ে।

সন্ধ্যে হওয়ার মুখে আমাদের নিয়ে ট্রাক ছাড়ল।

যেতে যেতে একটার পর একটা নদী। নোনাই, চেকো, গদাধর। সাঁকোর গায়ে আলো পড়লে শুধু নামগুলো দেখতে পাচ্ছি। দূরে দেখা গেল পাম্পিং স্টেশনের ঝলমল-করা বাতি।

শামুকতলার হাট পেরিয়ে কোহিনুর বাগান। অন্ধকারে কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না।

যেদিকে দুচোখ যায় বলে আমরা বেরিয়েছিলাম। কথার খেলাপ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

দেখতে পাচ্ছি ধওলাঝোড়ার গেট। দিনেশের ডেরা। দিনেশ। দুচোখই সেইদিকে।

সাহিত্যিক কলহ

(২০ পৃষ্ঠার পর)

কোলরিজ কবি হয়েও গ্যেটের 'ফাউস্টের' বিরূপ সমালোচনা করেছেন অশ্লীল এবং ঈশ্বরের নিন্দাসূচক বলে।

জোলার রুগোঁ-মাকার সিরিজ কুড়ি খণ্ডে সমাপ্ত হবার পর তাঁর বন্ধুরা একটি অভিনন্দন গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন করলেন। প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখক 'স্যাফোর' রচয়িতা দোদেকে অনুরোধ করা হল একটি উপযুক্ত লেখা দেবার জন্য। উত্তরে দোদে জানালেন, আমাকে যদি কিছু লিখতে পীড়াপীড়ি করেন তা হলে আমি বলব যে, রুগোঁ-মাকার বংশতালিকা তো শেষ হল, এবার জোলা গাছের মগডালের সঙ্গে ফাঁসি দিয়ে ঝুলে পড়ুন।

মার্ক টোয়েইন হেনরি জেমসের উপন্যাস—বিশেষ করে শেষের দিকের রচনা পড়াকে নরক যন্ত্রণার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাকে দান্তের ইনফার্নোর আগুনে পুড়ে মরা এবং জেমসের উপন্যাস পড়ার মধ্যে একটিকে বাছাই করে নিতে বললে তা হলে ইনফার্নোর আগুনে ঝাঁপ দেওয়াই আমি বেছে নেব।

আমেরিকান সমালোচক এইচ. এল. মেনকেন বলেছেন, জেমস্ নারী-পুরুষ, পশু-পাখি এবং লেখা সম্বন্ধে কিছুই জানে না। সে ইডিয়ট, তা-ও বোস্টনের ইডিয়ট—যার জুড়ি পৃথিবীর কোথাও মিলবে না।

বিশ্বসাহিত্যের ওপরতলার মুষ্টি-মেয় কয়েকটি বইয়ের মধ্যে দান্তের 'ডিভাইনা কমেডির' নাম করতে হয়। ভলতেয়ার এমন মহাকাব্যেরও বিরূপ সমালোচনা করেছেন। তাঁর কাছে কাহিনীর অসম্ভব ও অতিশয়োক্তিপূর্ণ বিবরণ বিরক্তিকর মনে হয়েছে।

জন ড্রাইডেন তাঁর সমসাময়িক কবি টমস শ্যাডওয়েলকে সহ্য করতে পারতেন না। শ্যাডওয়েলের বিদ্রূপাত্মক নাম তিনি দিয়েছিলেন 'ওগ'। ড্রাইডেন লিখলেন :

...there's nothing lost
in Og,
For ev'ry inch that is not
fool is rogue ;
A monstrous mass of
foul corrupted matter,
As all the devils had
spewed to make the
batter.

ম্যাক্স বীরবম কিপলিং-এর নির্মম সমালোচক ছিলেন। কিপলিং কখনো জবাব দেন নি। একালের সমালোচক এফ. আর. লিয়াভিস স্যার চার্লস স্নোর লেখার সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, স্যার চার্লস উপন্যাসিক তা জানেন না।

উপরের দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাবে কারণে-অকারণে লেখকরা কলহ করতে দ্বিধা করেন না।

ফিরে গেলাম

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি এ কাহিনীর কেউ নই, অথচ, আমার কথা দিয়েই শুরু করতে হচ্ছে। আজ থেকে কয়েকটা বছর আগেকার ঘটনা। ও অঞ্চলটা দণ্ডকারণ্য উন্নয়নের মাধ্যমে এখন সম্ভবত অন্যরূপ ধারণ করেছে, কিন্তু বছর বারো আগে ও সব দিকে শহুরে মানুষদের পদপাত ঘটতোই খুব অল্প। বিশাখাপত্তনম থেকে বাস ছাড়তো খুব ভোরে। বহু গ্রাম আর জনপদ পার হয়ে প্রায়-মধ্যাহ্নে গিয়ে দাঁড়াতো 'এস্-কোটা' বলে একটা জায়গায়। ছোট্ট জনপদ। নামটা খুব বড়ো, সেইজন্য লোকে ছোট করে নিয়ে বলতো,—'এস্-কোটা।'

ভ্রমণ-কাহিনী লিখছি না, নইলে এ পথযাত্রার বর্ণনা বিস্তৃতভাবেই করা যেতো। এখানকার বাসগুলিতে লোক দাঁড়াতে দেয় না, সিট্ ভর্তি হয়ে যাওয়া মাত্রই আর যাত্রী নেওয়া হয় না। ভিতরটা বিশাখাপত্তনম থেকেই বোঝাই হয়ে আসছে। পথে কোথাও দু-একবারের জন্য বাস থেমেছে, কিন্তু কোনো ওঠা-নামা হয়নি। বাসটা খুবই ছোট, জন বিশেক লোক ধরে মাত্র। আমার সঙ্গী রত্নম্ ভিতরেই বসেছিল। আমাকে বসিয়েছিল ড্রাইভারের পাশে। বলেছিল, খালি যখন পাওয়া গেছে একটা সিট্, ফাস্টক্লাশেই বসে পড়ুন। ভাড়া একটু বেশী লাগবে। তা' লাগুক। আরামে যেতে পারবেন। আমি রইলাম পিছনে।

বলা বাহুল্য, মনটা একটু টংফল্লই হয়েছিল। নতুন যাচ্ছি এ অঞ্চলে, জায়গাটা বেশ ভালোভাবেই দেখা যাবে। অবশ্য ড্রাইভারের পাশে বসে মনটা একটু খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলো। ড্রাইভার বসেছিল ডানদিকে, আমি মাঝখানে, বাঁ-দিকে 'মাথায়-পাগড়ী' বেয়ারা-টেয়ারা গোছের একটি লোক। যদিও ড্রাইভারের পাশে একজনের বেশী দু'জন নেওয়াটা উচিত নয়, কারণ বসলে দু'জনকে যথেষ্ট ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে হয়। কিন্তু উপায় নেই, জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ওদের 'পারমিট্' আছে। আমি দীর্ঘদিন এ দেশে বসবাস করলেও 'অন্ধ্র' ভাষা তেমন আয়ত্ত করতে পারি নি এখনো। যদিও, জন্মান্তিকে এখানে বলে রাখি, বিবাহ করেছি জনৈকা অন্ধ্র-মহিলাকে, তিনি উচ্চশিক্ষিতা, স্থানীয় উচ্চ-বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। তাঁর সঙ্গে ইংরেজীতেই বাক্যালাপ হয় বেশী, আর তিনি তাতে স্বাচ্ছন্দ্যও বোধ করেন যথেষ্ট। কিন্তু থাক, আমাদের দাম্পত্য-জীবনযাত্রার কাহিনী,— এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়।

আমার কথা যেটুকু এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে, আমি এ অঞ্চলে আছি কিছু-কিছু দ্রব্যের আমদানী-রপ্তানির ব্যবসায়ে যুক্ত হয়ে, এবং উক্ত ব্যবসায়ের সূত্রেই সম্প্রতি চলেছিলাম 'এস্-কোটা' হয়ে 'আরকু ভ্যালির উদ্দেশে। আরকু ভ্যালি' হয়ে সুবিখ্যাত 'মাচকুণ্ড-প্রোজেক্ট'-এ যেতে হয়। কিন্তু আমার গন্তব্যস্থল ততদূর পর্যন্ত নয়।

'এস্-কোটা'য় বাস এসে থামলো জনপদের বোলাহল ছাড়িয়ে একেবারে বসতির সীমান্তে, পাকা চওড়া রাস্তাটারই ওপর অবশ্য। আশে পাশে কয়েকটা চা-জলখাবার-বিড়ি-সিগারেটের দোকান গড়ে উঠেছে, সম্ভবত বাস যাত্রীদেরই সুবিধার্থে। দেখলাম, বাস থামামাত্রই লোকজন নেমে গেল, নেমে গেল ড্রাইভারটিও। শুনলাম, বাস এখানে থেমে থাকবে পাক্কা আধ ঘন্টা।

আমার পাশের পাগড়ী-পরা লোকটিও নেমে গেছে। হাত-পা একটু ছড়িয়ে বসেছি, এমন সময় জানালার বাইরে থেকে উঁকি দিলো রত্নম। ডাকলো,—বাবু?

সাড়া দিলাম,—কী?

—নেমে আসুন না? চা-টা খাবেন না?

—তা মন্দ কী, বলে পাশের ক্ষুদ্র দরজার ছিট্‌কিনিটা খুলে বাইরে এলাম। পাশের দোকানে চায়ের পালা শেষ করে উঠে আসছি, দেখি, একটি মহিলা দখল করবার চেষ্টা করছেন ড্রাইভারের পাশের সিটটা।

দোহারা শ্যামলী চেহারা, পরণে সাদা খোলের বুটিদার শাড়ী, অবশ্যই অন্ধ্রদেশীয়া, কিন্তু, মাথার চুলের পারিপাট্যে বাঙালী ললনার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। কানে দুটি ছোট ছোট সাদা পাথরের ফুল, নাকেও অনুরূপ একটি পাথর। এগিয়ে গিয়ে বাধা দেবো মনে করেছি, ইতিমধ্যে তিনি দরজা খুলে একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়েছেন। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে সেই মাথায় পাগড়ী-পরা লোকটা। বাসের ছাদে যাত্রীদের বেডিং-সুটকেশ-ট্রাংকগুলো সাজানো রয়েছে, সেখানে বাসের ক্লিনারটি উঠেছে, তার দিকে তাকিয়ে পাগড়ী-পরা লোকটা কী যেন বলছে।

কাছে গিয়ে তাকেই তাড়া দিলাম। বললাম,—কী রকম লোক তুমি হে? মহিলাটি উঠে আমার সিটে গিয়ে বসলেন, আর তুমি হাঁ করে তাই দেখলে? একটা কথাও বললে না?

D.N.SINGHA & CO.

IRON FOUNDERS & MECHANICAL ENGINEERS

Dealers in

HARDWARE & SANITARY GOODS

GOVT. & RAILWAY CONTRACTORS

Exporters & Importers

Hd. Office & Factory-I

64, Sitanath Bose Lane, Salkia,
Howrah. Phone Nos. : 66-2348,
66-3577 & 66-3775
Gram : "DIANSHINCO" Howrah,
INDIA.

Factory-II

12, Gopal Ghosh Lane, Salkia, Howrah.
Phone Nos. : 66-4293/94/95

Printing & Publicity Dept.

21, Sitanath Bose Lane, Salkia,
Howrah. Phone : 66-2348 (INDIA)

Export & Import Dept.

39/1, College Street, Cal-12.
Phone Nos. : 34-4757 & 34-3354
Gram : 'RAINWATER' CALCUTTA
INDIA.

Plumbing & Sanitary Sales & Showroom
No. 1. 38, College Street, Cal. 12.
Phone : 34 4757
Gram : "RAINWATER"
INDIA.

No. 2. 144K, Shama Prosad Mukherjee
Road, Cal-26. Phone : 46-4653
Hardware Dept. & Showroom.
161, Netaji Subhas Road. Cal-7
Phone : 33-5826 (INDIA)

আমার হিন্দী-তেলেগু মেশানো ভাষা-ভঙ্গী কতোটা বুঝলো লোকটা জানি না, উত্তর এলো মহিলাটির কাছ থেকে। তিনি পরিষ্কার ইংরেজীতে যা বললেন, তার অর্থ করলে দাঁড়ায়,—ও আমারই লোক। এ-সব বাসে ভিড় থাকে, তাই ওকে রাত থাকতে পাঠিয়েছিলাম বিশাখাপত্তনমে, বাসের একটা প্রথম শ্রেণীর সিটে বসে এস্-কোটায় আসবার জন্য। আমার এখান থেকেই ওঠবার কথা। লোকটা এ-বাসে আর যাবে না, ও ফিরে যাবে ভিজিয়ানাগ্রাম অন্য বাস ধরে।

আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল রত্নমও। সে ফিসফিস করে বললো,—উঠে পড়ুন স্যর, জানালার ধারের সিটটাই ত পাচ্ছেন এবার। আমি উৎসাহিত হয়ে পা বাড়িয়েছি, এমন সময় সেই পাগড়ী-পরা লোকটি নিম্নকণ্ঠে কী যেন বললে মহিলাকে। আর তিনি সেটা শোনামাত্রই এগিয়ে এলেন, আমাকে বাধা দিয়ে বললেন,—দাঁড়ান, নেমে যাই।

বলতে না বলতেই নেমে এলেন তিনি। মৃদুকণ্ঠে—মুখ নীচু করে বললেন,—আপনি ভিতরে যান জানালার ধারের সিটটা আমার।

অগত্যা তা-ই করতে হলো। রত্নম বিবস মুখে ভিতরে গিয়ে বসলো। যাত্রী যারা নেমেছিল, তারা সব উঠে এলো। কন্‌ডাক্‌টর, ক্লিনার, ড্রাইভার,—তাদেরও সব দেখা পাওয়া গেল।

আস্তে আস্তে গাড়ি ছাড়লো এক সময়। মহিলা যত দূর সম্ভব আমার স্পর্শ বাঁচিয়ে বাঁদিক ঘেঁষে বসেছেন। খানিকক্ষণ বাস চলবার পর তিনি মুখখানা ফেরালেন আমার দিকে, মৃদু কণ্ঠে বললেন,—আপনি অন্নপূর্ণার স্বামী না?

চমকে উঠলাম। আমার স্ত্রীর নাম অন্নপূর্ণা, একথা ঠিক। একটু অবাক হয়েই বললাম,—হ্যাঁ।

ভদ্রমহিলা অল্প একটু হাসলেন, বললেন,—আমি শকুন্তলা।

কিন্তু নামটা বলা সত্ত্বেও আমার মুখে-চোখে যখন চিনতে-পেরে-ওঠার চিহ্ন ফুটে উঠলো না, তখন তিনি একটু হতাশ হলেন মনে হলো। এক মুহূর্ত নীরব থেকে তারপরে বললেন, অন্নপূর্ণা আর আমি একই স্কুলে চাকরী করতাম। এখন অবশ্য আমি ও-চাকরী ছেড়ে দিয়ে ভিজিয়ানাগ্রামে আছি। আপনি চিনতে পারছেন না? আমি কিন্তু আপনাকে দেখামাত্রই চিনেছি। নইলে, মেয়েদেলে হয়ে আগে থাকতে কথা বলতে যাবো কেন পুরুষের সঙ্গে?

একটু বিব্রত হয়েই বললাম,—তা' তো বুঝলাম, কিন্তু আমি—

বাধা দিয়ে অল্প একটু হাসলেন তিনি, বললেন,—আপনার দোষ নেই, আমি আগের থেকে অনেক মোটা হয়ে গেছি। অনেকেই চিনতে পারে না। বছর চারেক আগে আপনি আর অন্নপূর্ণা আমার বিয়েতে সাক্ষী হিসাবে সই করেছিলেন মনে পড়ে? মিস্টার পান্থলু, —ব্যাবেজ রেজিস্টার,—মনে নেই?

মুহূর্তে যেন বিস্মরণের কালো পর্দাটা সরে গেল। ওঁর মুখের দিকে অবাক হয়েই তাকালাম এবার। বলে উঠলাম,—শুধু একটু মোটাই হন নি, রীতিমত ফর্সা হয়ে গেছেন।

হাসলেন মহিলাটি। আমার বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটে নি আমার স্ত্রীর অনুরোধ-উপরোধেই সাক্ষীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলাম সেদিন, নইলে এঁকে আমি এঁর বিয়ের আগে। বার দুই-তিনের বেশি দেখি নি। ঘোর কালো লিক্‌লিকে চেহারা। তার সঙ্গে এই চেহারার মিল কোথায়? সে তুলনায় ইনি ত এখন রীতিমত সুন্দরী!

শকুন্তলা তেমনি মৃদুকণ্ঠে বললেন, —আরকুতে যাচ্ছেন বুঝি?

হ্যাঁ।

এই প্রথম?

—হ্যাঁ।

—আমিও তাই। এই প্রথম।

আমাদের কথাবার্তা চলাকালীন ড্রাইভার ঘনঘন আয়নার দিকে তাকাচ্ছিল। এবার একটা বাঁকের মুখে পড়তে সে তার হুইলের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো।

আমাদের চারিদিকে প্রান্তর। তালগাছের জটলা মাঝে মাঝে, কিছু কিছু খেজুর গাছ। আমাদের সামনে সোজা রাস্তাটার পরপারে বিরাট পাহাড়ের শ্রেণী ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো।

শকুন্তলা জানালার বাইরে মুখ ফিরিয়ে শূন্য প্রান্তর লক্ষ্য করছেন। আমি তাকিয়ে-ছিলাম সামনে। বেশ অনুভব করছিলাম, রাস্তাটা ক্রমশ উঁচু হচ্ছে, গ্রাম-গ্রাম পেরিয়ে ধীরে ধীরে অরণ্যভূমিতে আমাদের অনুপ্রবেশ ঘটছে।

কিছুদূর চলার পর একটা সাঁকো। সাঁকো পেরুবার পরই আমাদের বাসটা হঠাৎ থেমে গেল। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না ব্যাপারটা। বাস বিকল হলো না কি এই জনহীন অরণ্যে? ড্রাইভার-কন্‌ডাক্‌টর-ক্লিনার সবাই নেমে গেল। ড্রাইভার তার সিটের নীচু থেকে একটা আস্ত নারকেল বার করে হাতে নিলো। শকুন্তলাও উৎকণ্ঠিত মুখে আমার দিকে তাকালেন, ভিতরের যাত্রীদলে কিন্তু উত্তেজনার বাষ্পও নেই। তাদের কেউ কেউ রাস্তায় নেমে দাঁড়ালেন এই পর্যন্ত।

—বাবু!

দেখি, রত্নম দাঁড়িয়ে ড্রাইভারের দরজার কাছে। ড্রাইভাররা তিনজনে রাস্তা দিয়ে নেমে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে গেল। বললাম, —কী ব্যাপার রত্নম?

রত্নম বললে,—ওরা পুজো দিতে গেল। আমরা এখন পাহাড়ে উঠবো কি না? রাস্তা খুব দুর্গম। তাই, বাস যেতে-আসতে এখানে প্রতিবার পুজো দিয়ে যায়।

একটু নিশ্চিন্তবোধ করলাম। যাক, তবু ভালো যে বাস বিকল হয় নি সত্যি সত্যি।

রত্নম সরে যেতে শকুন্তলা প্রশ্ন করলেন মৃদুকণ্ঠে,—আপনার লোকটি কী বললো? রাস্তা দুর্গম?

—হ্যাঁ।

আর কোনো কথা নয়। রাস্তা যে কতো বেশি দুর্গম আর বিপদসঙ্কুল, সেটা ক্রমশই টের পেতে লাগলাম। বর্ণনার বাহুল্য এনে লাভ নেই, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের পর পাহাড়। তারই বুকের ওপর দিয়ে পথ কেটে নেওয়া হয়েছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। পাহাড়েরই পাথর ভেঙে টুকরো করে পথের ওপর ছড়িয়ে পথ তৈরি হয়েছে। এক পাশে অতলস্পর্শী খাদ, অন্যদিকে খাড়া পাহাড়, — তারই মধ্য দিয়েই জানবাহী পশুর মতো বাসটা ঠেলে উঠছে কোনক্রমে। এইভাবে চলতে চলতে একটা ছোট্ট গ্রামে এসে আমরা থামলাম। পথের পাশে পাকা বাড়ী পর্যন্ত আছে, চায়ের দোকান, তরকারীর বাজার ইত্যাদি। তার পিছন দিক দিয়ে নাকি একটা ঝর্ণা আছে ভারি সুন্দর। বাস থামা-মাত্রই সবযাত্রী ছুটলো সেই ঝর্ণা দেখতে। ড্রাইভাররা জানালো, এইখানে তারা চান-খাওয়া দাওয়া সেরে নেবে। তার মানে,— অনেক সময়।

রত্নম এখানেও নেমে এসে যথারীতি ডাকলো,—বাবু?

আমি ডানদিক দিয়ে ড্রাইভারের দরজা খুলে নেমে আসতে আসতে দেখি সকরুণ চোখে মহিলাটি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। বললাম,—আসুন না? ঝর্ণা দেখবেন।

খুশি হয়ে উঠলো ওঁর মুখখানা। দরজা খুলে নেমে এলেন, হাতে ওঁর ছোট্ট ব্যাগটা। রত্নমের ভ্রূদুটো কুঁচকে উঠলো। ভাবখানা এই—কী আশ্চর্য, ওকে আবার কেন?

মহিলাটিকে নিয়ে ঝর্ণা দেখতে যাচ্ছি, রত্নম বললে,—এখানে খাওয়াটা সেরে নেবেন স্যর? আবার পৌঁছতে বেশ দেরী হয়ে যাবে দেখছি।

বললাম,—না রত্নম, বরং তুমি সেরে নাও।

শকুন্তলার দিকে ফিরে বললাম,—যাবেন আপনি?

ভদ্রমহিলার মুখখানা ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠলো, মাথা নেড়ে জানালেন,—না।

রত্নমকে পার্শ্ববর্তী খাবারের দোকানে বসিয়ে আমরা দুজনে ঝর্ণা দেখতে গেলাম। কাছেই। বনের ডালপালার আস্তরণের আড়াল থেকে হঠাৎই আত্মপ্রকাশ করেছে ঝর্ণাটি। এইটাই ওর বিশেষত্ব। ছোট্ট ঝর্ণা, সামান্য ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা ক্ষুদ্র জলাশয়ের সৃষ্টি করেছে, তারপরে এঁকে বেঁকে চলে গেছে পাথরের ছোট-বড়ো অজস্র নুড়ি চাষধারে বিছিয়ে দিয়ে। বাসের যাত্রীরা সৌন্দর্য দেখবার থেকে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নেবার তাড়ায় ব্যস্ত। দু-তিনজন মহিলাও রয়েছেন দলে। কয়েকটি শিশু। শকুন্তলা আর আমি একটু দূরে থেকেই দেখছিলাম ঝর্ণাধারা। যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেটি

ঝাঁকড়া মাথা একটা গাছের তলা। মাটি থেকে একটা গৈরিক চওড়া পাথরের অংশ জেগে আছে। শকুন্তলা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছেন দৃশ্য দেখে। বললেন,—একটু বসি?

—বসুন।—আমি বললাম,—আমি বরং রুস্তমের খাওয়ার দামটা দিয়ে আসি।

উনি কিছু বললেন না। আমি ফিরে চলে এলাম রুস্তমের কাছে। রুস্তমের খাওয়া তখনো শেষ হয় নি। আমাকে সামনে বসতে দেখে খেতে খেতেই বললে,—ঐ মেয়েটিকে আপনি জানেন বাবু?

—কেন বলো ত'?

রুস্তম বললে,—মেয়েটিকে নিয়ে আমার পাশে যে ভদ্রলোক-সস্ত্রীক বসেছেন, তাঁর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। তাঁকে মেয়েটি না চিনলেও মেয়েটিকে তিনি চেনেন। ভিজিয়ানাগ্রামে এখন থাকে, ব্যাঙ্কে চাকরী করে। আগে মাস্টারী করতো, বদনাম হওয়ায় সে-চাকরী গেছে।

—বদনাম কীসের?

রুস্তম বললে,—স্বভাবচরিত্র নাকি ভালো না। চার বছর আগে বিয়ে করেছিল, বিয়ের এক বছর যেতে-না-যেতেই স্বামীকে ডাইভোর্স করে দিয়েছে। তাই বলছিলাম, আপনি ওর সঙ্গে—

—থাক রুস্তম, ও আলোচনাটা না করলেও চলবে।

আমি ওর কাছ থেকে উঠে আবার গেলাম শকুন্তলার কাছে। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছেন ঝর্ণার দিকে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই চমক ভাঙলো। বললে,—বসুন?

নিশ্চুপেই পাশে গিয়ে বসে পড়লাম, একটু দূরত্ব রেখে অবশ্য। বললেন,—ভারী সুন্দর জায়গাটি, না?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলে উঠলাম, —আচ্ছা, একটা কথা বলবো?

ভারী কোমল আর স্নিগ্ধ মনে হলো চোখের দৃষ্টি, বললেন,—বলুন?

প্রশ্ন করলাম,—আবুকুতে যাচ্ছেন কী বেড়াতে? কোনো আত্মীয়স্বজন—?

মহিলাটি মুখ নিচু করে অল্প একটু হাসলেন, তারপরে বললেন,—আপনি অন্নপূর্ণার স্বামী, আপনি আমার বিয়েতে সাক্ষী ছিলেন, আপনাকে বলতে আর বাধা কী?

তারপরেই, একটুক্ষণ থেমে থেকে শুরু করলেন,—যাচ্ছি আমার স্বামীর কাছে। ভদ্রলোক রাস্তাঘাট তৈরি করার ইঞ্জিনিয়ার, ক্যাম্পে-ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে দিন কাটে। সম্প্রতি চিঠি পেয়েছি, আবুকুতে এসেছেন। তাই দেখা করতে চলেছি।

শুনতে শুনতে নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি আমার ভ্রু-দুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। যতদূর স্মরণে আছে, ওঁর স্বামী ছিলেন ওঁরই মতো কোনো এক স্কুলের শিক্ষক, তিনি কি শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়েছেন? কিন্তু, তাই বা কেমন করে হবে? ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ না করলে—?

আমার মনের ভাব বোধহয় বুঝতে পারলেন শকুন্তলা। আর বুঝতে পেরে একটু বোধ হয় লজ্জাই অনুভব করলেন। তেমনি মুখ নিচু করেই ধীরে ধীরে বললেন, —আপনি বোধ হয় ধাঁধায় পড়েছেন। না, প্রথম স্বামী নন, ইনি আমার দ্বিতীয় স্বামী। তাঁর সঙ্গে আমার 'বিচ্ছেদ' হয়ে গেছে অনেকদিন। শুনেছি, তিনি অন্যত্র বিয়ে করে সুখেই আছেন।

ভদ্রমহিলার অনুত্তাপ, নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে রইলাম ওঁর মুখের দিকে। আর, আমার দৃষ্টি লক্ষ্য করে ম্লান একটু হাসলেন শকুন্তলা, ধীরে ধীরে, ঠিক তেমনি নিরুত্তাপ কণ্ঠেই বলতে লাগলেন, — অন্নপূর্ণাকে বলবেন, আমিও সুখে আছি। আমি আজকাল চাকরি করছি ভিজিয়ানাগ্রামে, একটা ব্যাঙ্কে, —আর ইনি, অর্থাৎ আমার বর্তমান স্বামী সারা ভারত ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অবসর মতো আমাকে ডাক দেন, আমিও ছুটে যাই। দু-একদিন তাঁর কাছে থেকে আবার ফিরে আসি।

বলে উঠলাম,—এতোটা যখন আমার কাছে বলে ফেললেন, তখন একটা প্রশ্ন করবো?

—করুন না?—বলেই মৃদু একটু

প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য জাতির সেবায়—

জাতির দুর্বার অগ্রগতির সঙ্গে সমান তালে…

পূর্ব রেলওয়ে

হাসলেন,—এ নামে আমি 'বন্ধু' হিসাবেই গ্রহণ করেছি নইলে কী এতসব বলতাম?

বললাম,—আচ্ছা? একসঙ্গে থাকলেই ত' পারেন। অবশ্য, আপনার পক্ষে চাকরি করা খুব প্রয়োজন কি না, ঠিক বুঝতে পারছি না?

অল্প একটু হাসলেন শকুন্তলা, বললেন, —টাকার জন্য চাকরী আমার না করলেও চলে, কিন্তু—

—কিন্তু?

শকুন্তলা একটু অসংলগ্নভাবেই যেন বলে ফেললেন,—একটা-কিছু অবলম্বন ত' চাই।

—অবলম্বন! অবলম্বন ত—স্বামী!

শকুন্তলা আবার একটু হাসলেন, বললেন, —দেখুন, পুরুষ নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা হলো দু-দুবার,—এঁরা দুজনে দু-রকম অবশ্য, কিন্তু স্ত্রী-সম্পর্কে আসল দৃষ্টিভঙ্গী দুজনেরই এক। আচ্ছা, আপনাকে যদি সার অন্নপূর্ণা সম্পর্কে একটা পাল্টা প্রশ্ন করি, আপনি কি রাগ করবেন?

—না—না—বলুন না?

শকুন্তলা বললেন,—ওকে বিয়ে করেছেন, অথচ ওকে চাকরি করতে দিচ্ছেন কেন?

বললাম,—আমি দেবার কে, বলুন? আপনারা কি সব-সময় আমাদের কথা শুনে চলেন?

শকুন্তলা বললেন,—সন্তান ত' একটিও আপনাদের সংসারে আসে নি এখনো, আমি সে-খবর রাখি। বস্তাটও কম।

আর্থিক কারণে যে অন্নপূর্ণা চাকরি করছে না, এটা অনুমান করতে দেরী হয় না, —তবে সে চাকরি করছে কেন জানেন? অন্য কোনো অবলম্বন নেই বলে। সত্যি করে বলুন ত' অন্নপূর্ণা আপনার প্রাত্যহিক জীবনে কতোখানি? স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে যে-সব ধারণা আমাদের ছিল, সে-সব আজ ইতিহাসের কথাবস্তু। কিন্তু না, আপনাদের দুজনের কথা দিয়ে উদাহরণ টানা আমার পক্ষে উচিত হচ্ছে না। আমি বলবো আমার নিজের কথা। আমি নিজে জানি, আমার স্বামীর কাছে আমি একটা বিশেষ প্রয়োজনের কিছু মাত্র তার বেশি কিছু নয়। আমার কথা তিনি ভাবেন কতোটুকু: কাজের ফাঁকে ফাঁকে যখন একটু অবসর পান, তখন হয়ত মনের মধ্যে একটা জৈবিক তাড়না অনুভব করেন, আর তখনই আসে টেলিগ্রাম। এখখুনি চলে এসো। আর আমিও অতি অনুগত ভৃত্যটির মতো যেরকম করে হোক চাকরিতে ছুটি নিয়ে ওঁর ডাকে সাড়া দিতে চলে যাই।

আমি বিস্মিত হয়েই ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলি অনুধাবন করার চেষ্টা করছিলাম। মুখখানা একটা চাপা উত্তেজনায় আরক্ত হয়ে উঠেছে, ঠিক কাকে বলছেন সেদিকে বোধহয় তেমন আর সচেতনতাও নেই। 'উচ্চারিত চিন্তা' বোধহয় একেই বলে।

উনি একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার অল্প একটু হাসলেন, বললেন,—অবশ্য এর অন্য একটা দিকও আছে। আর আছে বলে জীবনটাকে মেনে নিতে পেরেছি। ছাড়াছাড়ি ভাবে থাকার ফলে, এবং স্বাধীন উপার্জনে রত থাকার জন্য আমাদের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র ধরণের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এই অর্জিত ব্যক্তিত্বটুকুই লাভ, কী বলেন?

—ঠিক বুঝলাম না।

—বুঝে কাজ নেই!—বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, বললেন,—বাসের ভোঁ শুনছেন না? ঐ দেখুন, আপনার লোকটিও ছুটে আসছে।

দেখতে দেখতে রহম এসে পড়লো দৃষ্টি-পথে সে হাত নেড়ে ডাকছে,—বাবু, চলে আসুন, বাস ছাড়ছে।

উঠে দাঁড়ালাম। চকিতের জন্য তাকিয়ে দেখি, সেই আশ্চর্য বর্ণাঢ্যটির কাছ থেকে স্নানার্থীর দল কখন বিদায় নিয়ে চলে গেছে।

দ্রুত হেঁটে গিয়ে বাসে উঠলাম। কিন্তু এরপরই শুরু হলো পথের সত্যিকার দুর্গমতা। একপাশে অলঙ্ঘ্যশী খাদ, অন্যদিকে খাড়া পাহাড়। রাস্তা সরু, তার ওপর সাঁকা রাস্তা ঠিক বলা চলে না। এর ওপর দিয়ে মুহুর্মুহু বাঁক নিতে লাগলো গাড়িটি। শকুন্তলা এক-এক সময় ভয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে আমার গায়ের ওপর এসে পড়তে লাগলেন। বললাম,—আপনি বরং ভেতরে আসুন, আমি জানালার ধারে বসি।

—আপনার ভয় করবে না?

—আমি মৃত হলেও—পুরুষ।

আর কিছু বললেন না শকুন্তলা। ড্রাইভারকে বলে এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমরা স্থান-বদল করে নিলাম।

গাড়ি চলতে লাগলো। এর পর একটা জায়গায় গাড়ি এসে পৌঁছতেই বাস-সুদ্ধ যাত্রী সস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো। তাকিয়ে দেখি, খাদের নিচে একটা ভাঙা বাস উল্টে পড়ে আছে দুমড়ে-মুচড়ে।

ভিতর থেকে-কে যেন বললে,—পরশুদিন ঘটেছে ব্যাপারটা। এ-রাস্তায় প্রায়ই ঘটে।

শকুন্তলার মুখখানা ভয়ে পাংশু হয়ে গেছে। নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি আমার হাতখানা আঁকড়ে ধরেছেন তিনি। অস্ফুট, ভীতকণ্ঠে বলে উঠলেন,—না এলেই হতো দেখছি

ড্রাইভার দুহাতে ধরে আছে স্টিয়ারিংটা, চোখের দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ। সেই অবস্থাতেই সে বলে উঠলো,—ঐ পাহাড়ের চূড়োতে উঠতে পারলেই,—ব্যস্, আর ভয় নেই।

—এখান থেকে 'আবুকু' কতোটা?

ড্রাইভার বললে,—তা' অনেকটা পথ। ওটা হচ্ছে ঠিক আধাআধি জায়গা।

ড্রাইভার-কথিত ঐ 'আধাআধি' জায়গাতে পৌঁছেই কিন্তু বিপর্যয় ঘটলো। একটা ছোট ডাকবাংলা ছাড়া কিছু নেই। ডাকবাংলোটা ছাড়িয়েছি মাত্র, এমন সময় কী করে যেন বাস-এ গেল আগুন ধরে। মুহূর্তে কী যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, তা বর্ণনাতীত। আমি লাফ দিয়ে নেমেই শকুন্তলাকে টেনে নামালুম। কী যে কোথায় হতে লাগলো জানি না, এক-জন লোক বাসের মাথায় উঠে তাড়াতাড়ি বাক্স-প্যাঁরাগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে চারিদিকে ফেলতে লাগলো। রহম দৌড়ে কাছে এসে প্রশ্ন করলো,—আপনি ঠিক আছেন, বাবু?

—তা' আছি।

বাক্স-প্যাঁটরা আমাদের কিছু ছিল না, কিন্তু শকুন্তলার ছিল। একটি সাদার বড়ো সুটকেশ, খাকী রঙের থেরাটেপ পরানো। রহমের চেষ্টায় সেটা খুঁজে বার করা হোল। রহম্ অবশ্য খুবই বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক। সে আমাদের এক জায়গায় বসিয়ে রেখে ডাক-বাংলোর চৌকিদারের কাছে ছুটে গেল। সবাই যখন আগুন নেভাতে, কিম্বা, নিজে-দের জিনিসপত্র কুড়িয়ে নিতে ব্যস্ত,—তখন সে আবার আমার কাছে ছুটে এসে পাঁচটা টাকা চেয়ে নিয়ে গেল।

এবং, ভাগ্যে নিয়ে গিয়েছিল। কেউ আহত-টাহত হয় নি অবশ্য, এবং আগুনও যত শীঘ্র সম্ভব আয়ত্তে আনা গেল, কিন্তু বাসটি হয়ে গেল সম্পূর্ণ অকেজো। বাসের সামনের দিকটা একেবারে ঘোর কালো বর্ণ ধারণ করেছে। একটা আহত জন্তু যেন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে নিশ্চুপে।

যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই এদিক-ওদিক গ্রামে চলে যাবার চেষ্টা করতে লাগলো। অধিকাংশই তারা দেহাত। আমরা জনা-ছয়েক ভদ্রলোক শুধু প্রাটকা পড়লাম, সঙ্গে শকুন্তলা এবং আরেকটি 'বধূকে ধরলে,—আট। আমাদের আটজনেরই গন্তব্যস্থল ছিল 'আবুকু'।

এইবার সবার 'আক্রমণস্থল' হয়ে দাঁড়ালো ডাকবাংলোটি। রহমের কৃপায় একটি ঘর আগে থাকতেই 'রিজার্ভ' হয়ে গিয়েছিল বলে রক্ষা। ঘর ছিলও আর একটিই ছিল মাত্র। আমাদের তিনজনকে ছেড়ে দিয়ে ওরা পাঁচজন ঢুকলো সেই ঘরখানায়।

দুখানি খাট পাতা ছিল ঘরে। তার ওপরে বসে বিশ্রাম করছি। রহম্ও বসেছে জড়োসড়ো হয়ে একটা খাটের কোণে, সে বললে,—স্যার, আজ আর যাওয়া হবে না।

—সে কী!

ও বললে,—ড্রাইভার করেছে কী, ক্লিনারকে পাহারায় রেখে, কন্ডাক্টরকে নিয়ে ছুটেছে পায়ে হেঁটে 'আবুকু'। ওরা ওখানে পৌঁছে আর একখানা 'বাস' নিয়ে আসতে-আসতে সন্ধ্যে। তা' যে-রাস্তা দেখলেন, তার ওপর দিয়ে সন্ধ্যাবেলা গাড়ী চালানো যায় কী?

—ওরে বাপ, নির্ঘাৎ খাদে পড়বো তাহলে! —বললাম,—আচ্ছা, রুটের বাস আর নেই?

—না স্যার,—রহম্ বললে,—এই একখানাই যায়, আরেকখানা আসে।

বললাম,—বেশ ত,' না হয় বিপাশাপত্তনমে ফিরেই যাবো। কী বলেন, আপনি?

মহিলাটি উত্তর-দেবার আগেই রহম্ বলে উঠলো,—সেটি ত' ফিরে গেছে, স্যার।

—কখন? পথে দেখলাম না ত'!

রহমৎ বললে,—এস্-কোটাতে তার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে। আপনি লক্ষ্য করেন নি।

একটু উচ্চকণ্ঠেই বলে উঠলাম,—তাহলে রহমৎ, আজ রাতটা আমাদের আরকুতেই কাটাতে হতো, কী বলো?

—হ্যাঁ স্যর।

—বলো নি ত' তুমি? বেডিং নিয়ে আসতাম।

ও জিভ্ কেটে উঠলো,—ছিঃ বাবু—আমার আত্মীয়র বাসা আছে ওখানে বলেছি না? আপনার কোনো কষ্ট হবে না। ওটা একটা মহকুমা-শহর। হোটেল-মোটেলেরও অভাব নেই। যদিও খুব ছোট্ট শহর। তখনো বিরক্তি আমার কাটে নি। বললাম,—যাই বলো, আর ওখানে যাচ্ছি না। এখন পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে পারলে বাঁচি।

—ফিরে যাবেন?

—হ্যাঁ।

—কাজের কী হবে?

—হবে না।—বলে উঠলাম,—এ-রকম পথ জানলে আমি কিছুতেই রাজী হতাম না আসতে।

রহমৎ অপ্রস্তুত হয়ে বললে,—ঠিক আছে বাবু। ফিরেই যাওয়া যাবে। আমি দেখি, মালীকে পঠিয়ে চা-টা কিছু করতে পারি কিনা।

ও চলে যেতেই শকুন্তলা আমার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে একটু হাসলেন, বললেন,—আমার কিন্তু খুব ভালো লাগছে!

—কেন?

—কে জানে! খাঁচা-থেকে-ছাড়া-পাওয়া পাখীর মতো লাগছে নিজেকে।

সেটি একটি বিচিত্র দিন বলা যায় আমার জীবনে। ওঁকে ঘরে রেখে আমি বেরিয়ে পড়লাম। পাশের পাঁচজনও যেন একটা অস্থায়ী সংসার পেতেছেন, কেন্দ্রমণি সেই বোটি। ওদের আর কোনদিকে দৃষ্টি নেই। আমার কিন্তু ভীষণ বিশ্রী লাগছিল প্রথমটায়। আমি ডাকবাংলোর চৌহদ্দি ছাড়িয়ে এসে সেই পুড়ে-যাওয়া বাসটির কাছে দাঁড়ালাম। মৃত একটা জন্তুর মতো পড়ে আছে। তার সামনে দিয়ে রাস্তাটা এঁকে-বেঁকে গেছে,—কখনো নিচে নেমে,—কখনো ওপরে উঠে।

কতক্ষণ যে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ চমক ভাঙলো পায়ের শব্দে। দেখি পাশের পাহাড়ী পাকদণ্ডী পথ বেয়ে দুটি মানুষ নেমে আসছে। একটি পুরুষ, একটি রমণী। দুটিই বয়সে তরুণ। ছেলেটির গা খালি, পরণের ধুতিটা কোমরে শক্ত করে দুটিরে বাঁধা। হাতে লাঠি। পিছনের মেয়েটির পরণে খাটো একটা শাড়ী। সাদা খোলের ওপরে বড়ো বড়ো ফুলের ছাপ। পায়ে রুপোর মোটা বড়ো মল। গায়ে চোলি-জাতীয় কালো রঙের খাটো জামা, হাতে একরাশ কাঁচের চুড়ি, গলায় পুঁতির মালা, কানে পিতলের ছোট ঝুমকো, নাকের গয়নাটা অদ্ভুত। নাকের দুই দিকে দুটি ছোট্ট পেতলের ফুল, ছোট পেতলের চেন্ দিয়ে যুক্ত করা। মেয়েটির মাথার কালো চুল ঠিক সাঁওতালী মেয়েদের মতো করে খোঁপা বাঁধা। দুটি তীক্ষ্ণ চোখ আমার ওপর স্থাপিত করেই ছেলেটির গা ঘেঁষে গা ঘেঁষে চলতে লাগলো। সাঁওতাল-দের মতো মিশ্‌কালো গায়ের রঙ নয়, বরং একটু হলদে হলদে ছাপই লক্ষ্যে পড়ে।

নির্জনে, যেখানে একটা পাখীও ডাকছে না, সেখানে দুটি তরুণ-তরুণীর নীরবে পথ চলা বড়ো অদ্ভুত লেগেছিল সেই মধ্যাহ্নে। ক্রমে ক্রমে ওরা মিলিয়ে গেল পাহাড়ের আড়ালে। আমি ফিরতেই দেখি, বাংলোর দিক থেকে রহমৎ আসছে দ্রুতপায়ে সম্ভবত আমাকেই খুঁজতে।

—বাবু?

—কী?

রহমৎ কাছে এলো হাঁপাতে হাঁপাতে। বাঁতি-মত উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে। বললে,—মহিলাটির সঙ্গে আলাপ হলো। স্যর, আমরা কনট্রাক্ট পাবার জন্য যে-বড়ো অফিসারটির কাছে যাচ্ছি আরকুতে, মহিলাটি তাঁরই কাছে যাচ্ছেন। বলছেন, তিনি নাকি ওঁর স্বামী।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ।

বললাম—তা হলে ত' বেশি করে খাতির করতে হয়। মনে হচ্ছে, কনট্রাক্টটা পেয়ে যাবো, কী বলো?

রহমৎ আমার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সুর না মিলিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বললে—কিন্তু স্যর?

—কী?

—আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

—কেন?

রহমৎ বললে,—আমি সেই অফিসারটিকে ত' চিনি! ভদ্রলোকের স্বভাব-চরিত্র ভালো নয়! কতো গল্প শুনেছি! তখনকার বুনো মেয়েদের ধরে এনে—

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম,—তার সঙ্গে এ-মহিলাটির সম্বন্ধ কী? ইনি দেখছো শিক্ষিতা, ভদ্রমহিলা,—ইনি ওঁর স্ত্রী হবেন না কেন?

রহমৎ বললে,—অফিসার-ভদ্রলোকটি অন্ধ্র-দেশীয় লোক নন, ক্যানারীজ বোধ হয়। তিনি কি—

গম্ভীর হয়ে বললাম,—দেখ রহমৎ, আমি ত' বাঙালী হয়েও অন্ধ্রদেশীয়াকে বিয়ে করেছি। তাতে হয়েছে কী?

রহমৎ লজ্জা পেয়ে জিভ কাটলো। বললে,—না-না—আপনার সঙ্গে তুলনাই হয় না। তবে, এক্ষেত্রে—

একটু ধমকের সুরেই বললাম,—ওসব কথা চিন্তা করো না। চলো দেখি, কী করছেন তিনি?

গিয়ে দেখি, শকুন্তলা নিজের হাতে চা করছেন মালীর সাহায্য নিয়ে। আমরা যেতেই সহাস্যে এগিয়ে দিলেন কাপ। তারপরে বললেন,—জানেন? কাছেই, মানে মাইল দুয়েক দূরে একটা আদিবাসী গ্রামে আজ হাট বসেছে। হাটে সব পাওয়া যায়। পাশের লোকেরা যাচ্ছে। আপনারা যাবেন? তা হলে, বাজার-টাজার করে বেশ ফিস্ট্ করা যেতো।

রহমৎ কিছু বললে না, গম্ভীর হয়ে রইলো। আমি বললাম,—তার থেকে আর একটা কথা ভাবছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে একেবারে আরকুতে চলে গেলে কেমন হয়? আপনার স্বামীর কাছেই আমরা যাচ্ছি, জানেন ত'?

মহিলাটি অল্প একটু হেসে বললেন,—মিঃ বরুমের কাছে শুনলাম। হবে যাবে আপনাদের কাজ।

বললাম,—আপনার অবশ্য হাঁটতে কষ্ট হবে, কিন্তু আমাদের আর তর সইছে না। বুঝছেন ত'?

শকুন্তলা বললেন,—যাই বলুন, অতো হাঁটতে আমি পারবো না। আরকুতে এখান থেকে নাকি? বলতে বলতে বসে পড়লেন ধপ্ করে মেঝের ওপরে, বললেন,—আপনারা যদি যেতে চান, চলে যান। ওঁকে গিয়ে বলবেন, আমি কাল সকালে যাবো। এই পাহাড়ের চূড়ায়, এই আশ্চর্য ব্যাপ্তির মধ্যে একটা দিন আমি কাটিয়ে যাবোই।

অদূরে মালীর দেখা মিললো আবার। সঙ্গে একটি আদিবাসী মেয়ে। এ-ও পরেছে খাটো ছাপা শাড়ী, এর-ও চুল বাঁধা সাঁওতাল মেয়েদের মতো করে। মেয়েটির কাঁখে ছিল কলসী, কোন ঝর্ণা থেকে জল ভরে এনেছে বুঝি আমাদের জন্য।

নতুন মাটির জল-ভর্তি কলসীটা ঘরের কোণে রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই শকুন্তলা তার দিকে এগিয়ে গেলেন। ওদের ভাষায় কী যেন জিগ্যেস করলেন, মেয়েটি বুঝতে পারলো না, সলজ্জ একটু হাসলো মাত্র। শকুন্তলা ওর নাকের গয়নাটা হাত দিয়ে দেখলেন। ওর চিবুকে হাত দিয়ে একটু আদরও করলেন। মেয়েটি আমাদের সামনে লজ্জা পাচ্ছে দেখে তাকে ভিতরের বারান্দায় নিয়ে গেলেন টেনে—আমাদের দৃষ্টির আড়ালে।

রহমৎ আমাকে চুপিচুপি বললেন,—কী করবেন স্যর?

খাটের ওপর বসে পড়েছি ততক্ষণে, বললাম,—রহমৎ, কাজের ইন্টারেস্টেই থেকে যেতে হচ্ছে। যাবে না কি চলে হাটে?

রহমৎ এসব ব্যাপারে সত্যিই উৎসাহী। বললে,—তা যেতে পারি। পাশের লোকেরা তা' যাচ্ছে, ওদের সঙ্গে চলে যাই। টাকা দিন। চাল-ডাল-তরকারী সব নিয়ে আসি।

টাকা বার করে দিলাম ওর হাতে। বললাম,—আমি সঙ্গে যাবো নাকি?

—কী দরকার স্যর,—রহমৎ বললে।—আপনি বরং ওঁকে খুশী রাখার চেষ্টা করুন। কী জানি, যদি সত্যি সত্যি সেই অফিসারটির wife হন ইনি?.

বলতে বলতে হন্‌হন্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রহমৎ। আমি বসে রইলাম চুপ-চাপ। বেশ কয়েকটি মুহূর্ত পরে শকুন্তলা ভেতরে এলেন। মুখখানা অদ্ভুত এক খুশীর

জ্যোতিতে ভরা পা-দুখানিও কী একটা অভাবিত উল্লাসে বুঝি চঞ্চল হয়ে উঠেছে!

আমার চোখে চোখ পড়ায় উনি বলে উঠলেন,—এই, উঠুন ত' একটু? বাইরে যান। আমি ডাকলে আসবেন।

ওঁর হাতের মুঠিতে কী যেন একটি ছিল, সেদিকে চোখ রেখে বলে উঠলাম,—ওটা কী?

ছেলেমানুষের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে উনি বললেন,—বলবো কেন!

আমি আর কিছু না বলে ত্বরিত পায়ে ঘরের বাইরে চলে এলাম।

পাশের ঘরটির সামনে সেই বউটি আর স্বামী রেলিং-এ ঝুঁকে দূরাদগন্তের দিকে তাকিয়েছিল।

আমার দিকে চোখ পড়তেই বউটি তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে চলে গেল। আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বাংলোর চৌহদ্দির বাইরে,—একটা বড়ো পাথরের ওপরে উঠে দাঁড়ালাম। এখান থেকে অতলস্পর্শী খাদ নিচে নেমে গেছে। তাকালে মাথা ঘুরে যায়। খাদের পরপারে আবার পাহাড়। পাহাড় আর অরণ্য।

শকুন্তলার সেই কথাগুলো মনে পড়তে লাগলো। কী-এক বিষণ্ণতা যেন ঘিরে আছে ওর জীবনকে, যার কিছু ও' ব্যক্ত করতে পারে, কিছু পারে না। ওর সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ আমার স্ত্রী অন্নপূর্ণার ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখখানি মনে পড়লো। সত্যিই ত', আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ওদের স্থান কতোটুকু? কতোটুকু ভাবি ওদের কথা? স্ত্রী যদি শুধু ঘরের গৃহরাজ্ঞি নিয়েই মগ্ন থাকতো, তাহলেও একটা অপ্রত্যক্ষ সন্নিধ্যের কথা আসতো, কিন্তু যারা বাইরের জগতের সংস্পর্শে এসেছে, তারা? তাদের সেই অর্জিত 'ব্যক্তিত্ব'? সেই ব্যক্তিত্বের মূল্য কতটুকু দিই আমরা?

—কী করছেন এখানে?

পিছন থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসতেই চমকে উঠলাম। মুখ ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে আরও অবাক হলাম। নাকের গঠনটাই আমাকে অবাক করলো বেশি। নাকের দুপাশে ছোট দুটি পেতলের ফুল, সরু চেন দিয়ে বাঁধা!

বুঝলাম, শকুন্তলা সেই মেয়েটির কাছ থেকে এটিকে হস্তগত করেছেন। শুধু তা-ই নয়, শকুন্তলা বুঝি সত্যিই তপোবনবাসিনী শকুন্তলা হয়ে গেছেন! মাথায় খোঁপা বেঁধেছেন সাঁওতালী ধরনে, কানে ফুল পরেছেন, অবশ্য সোনার। হাতের চুড়িও সোনার, গলার হারও সোনার। গায়ের চেলিটিও দামী, শাড়ীটি দামী হলেও একটি ছাপা শাড়ী, পরেছেন খাটো করে আদিবাসীদের ধরনে।

লিলেন,—কী চিনতে পারছেন না?

বললাম,—অদ্ভুত দেখাচ্ছে কিন্তু!

মুখে একটা সলাজ হাসির আভা ছড়িয়ে পড়লো। মুখখানা একটু নিচু করে ধীরে ধীরে বললেন,—আমরা ত' সিঁথিতে সিঁদুর পরি না, কিন্তু এরা পরে, আপনাদের বাঙালী মেয়েদের মতো। এ-মেয়েটার বিয়ে হয় নি, তাই সিঁদুর পরতে দেয় না। নইলে, সিঁদুরও পরতো

বললাম—হঠাৎ এ সখ?

অল্প একটু হেসে বললেন—খেয়াল। কেন, আপনার কি অপছন্দ হচ্ছে?

বললাম—আমার পছন্দ-অপছন্দে কী আসে যায়?

বললেন—যদি এই বেশে, এই এখানেই সারা জীবন থাকতে পারতাম!

কাছে এসে বললাম—বেশীদিন থাকতে পারতেন না—ক্লান্তি আসতো।

বললেন—না, আসতো না। আমি ভুলে যেতাম আমার অতীত। আমি ভুলে যেতাম আমি কলেজে লেখাপড়া শিখেছি—দেশবিদেশের জ্ঞানী-গুণীদের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে আমি পরিচিত—একথা ভুলে যেতাম।

আমি মুখ নিচু করলাম। অদূরে মালী আর সেই মেয়েটাকে আবার দেখা গেল। তাদের দেখে কলরব করে উঠলেন উনি। বললেন—ও মশাই, শুনুন? আপনি একটু ঘর পাহারা দিন, বুঝলেন? আমি ওদের সঙ্গে হাটে চললাম।

অবাক হয়ে বলে উঠলাম—সে কী!

বললেন—ভয় পাবেন না—কোনো বিপদ হবে না আমার—ওরা আমার সঙ্গে থাকবে।

বললাম—দেখুন, রহমৎ কিন্তু হাটে গেছে।

বললেন—বেশ ত'। আমি যা খুশী কিনে আনবো। আপনার জন্য পেন. একটা প্রেজেন্ট। কী, অনুমতি দিচ্ছেন ত?

বললাম—বারে, আমি কি আপনাকে অনুমতি দেবার মালিক?

চোখের তারা দুটি নাচিয়ে বলে উঠলেন—আপাতত।

বলেই আর দাঁড়ালেন না, ছুটে গেলেন ওদের কাছে, বন্যহরিণীর মতো।

বেলা প্রায় তিনটে, এমন সময় নির্জন রাস্তার শিস বহু পদধ্বনি শোনা গেল। পাশের লোকজনদের সঙ্গে ফিরে এলো রহমৎ, একটা আদিবাসী লোকের মাথায় নতুন-কেনা হাঁড়ি-কুড়ি সব চাপিয়ে।

আমি সেই পাথরটার ওপরই বসেছিলাম। কাছের একটা ঝাঁকড়া-মাথা অচেনা গাছ ছায়া দান করছিল আমাকে। রহমৎ কী সুন্দর হাট করেছে, জিনিষপত্রের দাম কতো সস্তা, এসব সবিস্তারে বোঝাচ্ছে আমাকে, আমি ওকে একসময় বাধা দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, শকুন্তলা কোথায়?

হতবাক হয়ে গেল। অস্ফুটকণ্ঠে বললে—তার মানে?

বললাম ওকে সব কথা। ও বললে—ভয়ানক ভীড় ওখানে আদিবাসীদের। আমি ঠিক চিনতে পারি নি।

বললাম—মালীকে দেখেছিলে?

রহমৎ বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। সে কী যেন জিনিষ কিনছিল একা।

—তার সঙ্গের মেয়েটি?

রহমৎ বললে—অতটা লক্ষ করি নি। ভাবছেন কেন, ফিরে আসবেন

হ্যাঁ, ফিরে এলেন ওরা একে একে। প্রায় সন্ধ্যাসন্ধি। মালীর সঙ্গে সেই মেয়েটিও ছিল, শকুন্তলাও ছিল। বাংলোর কাছে আসামাত্র শকুন্তলা রীতিমত ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। ঢুকে, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করলো দরজা।

রহমৎ বললে—কী হলো?

মালী বললে—ভয় পেয়েছেন!

—কেন?

মালী অল্প একটু হেসে চুপ করলো। মেয়েটা হেসে ফেললো ফিক্ করে। ওদের কাছ থেকে আর কোনো কথা বার করতে না পেরে রহমৎ বললে—যান, আপনি যান, দরজায় ঘা দিন।

—ঘর তো অন্ধকার। একটা বাতির জোগাড় করো।

মালী গোটাকয়েক হেরিকেন বার করে দিলো। একটি হেরিকেন ধরিয়ে আমি গেলাম দরজার কাছে। অন্য একটা হেরিকেন হাতে সেই আদিবাসী মেয়েটি চলে গেল রাস্তার দিকে। সম্ভবত একা তার গ্রামে ফিরে গেল মেয়েটি।

দরজায় ঘা দিতেই দরজা খুলে গেল।

—কী হয়েছে আপনার!

শকুন্তলা সেই বেশবাস খুলে ফেলেন নি। শুধু হাট থেকে কিনে আনা একটি ছোট ঝুড়ি রয়েছে মাটিতে পড়ে, তাতে টুকিটাকি জিনিষ রয়েছে পড়ে।

—অমন করে ছুটে এলেন কেন?

ভয় পেলে মানুষ যেমন করে কথা বলে, তেমনি করে শকুন্তলা বললেন—আমি কী করবো বলুন? আমি ত' জানতুম না। হাটে যে ওদের বিয়ে হয়, আমাকে কি কেউ তা বলেছে! হাটে ঘুরতে ঘুরতে দেরী হয়ে গেল। আবছা আঁধার হয়ে আসছে, আমরা ফিরে আসবো, এমন সময় একটা লোক হুড়মুড় করে আমার গায়ের ওপর এসে পড়ল। আমার মাথাটা জোর করে ধরে কী যেন ঘষে দিলো। আলোটা নিয়ে দেখুন, কী করে দিয়েছে!

আলোটা তুলে ধরে দেখি, সত্যিই, সিঁথিটা সিঁদুরে মাখামাখি।

—আমি কিছু বুঝবার আগেই, বলতে লাগলেন শকুন্তলা—দেখি, আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। ভাগ্যি চীৎকার করে উঠেছিলুম। আমার সঙ্গের মেয়েটি আমাকে অন্য হাতে ধরে একটা ঝট্‌কা দিয়ে ছাড়িয়ে নিল। তারপরে, এমন ভীড়, কোথায় যে লোকের ভীড়ে ভীড়ে ছিট্‌কে এলুম কে জানে। দেখি মেয়েটা আমার হাত ধরে আছে ঠিক। আমাকে ইঙ্গিতে বললে—পালিয়ে চলো!

—তারপর?

শকুন্তলা বললেন—তারপর আর কী? মালীকে খুঁজতে লাগলুম দুজনে। হাটের পাশে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল মালী। আমরা জোরে জোরে পা ফেলে চলে এলাম। যা ভয় করছিল না!

—ভয় কেন?

Some Valuable Text & Help Books

FOR STUDENTS OF H. S., P. U. & INTERMEDIATE Coursés

Basu & Chatterjee's

PRE-UNIVERSITY PHYSICS (Theoretical & Practical)
—Complete in one Volume **Rs. 10·00**

INTERMEDIATE & HIGHER SECONDARY PHYSICS
(In 3 Volumes) Per Set **Rs. 20·00**

Prof. J. Chatterjee & Prof. H. Biswas.

NUMERICAL EXAMPLES IN PHYSICS
(Solution) **Rs. 6·00**

Prof. P. Dey's (Panchanan Dey)

TEXT BOOK OF INORGANIC CHEMISTRY

Rs. 8·50

(Revised by : Dr. S. Ghosh—Presidency College, Calcutta)

Also we are selling Agents & Stockists of Publication of
A. Mukherjee & Company Private Ltd. Calcutta.

B. CHAND & CO.,

1/2, RAMANATH MAZUMDAR STREET, CAL-9

Gram: LEVERFILE Phone : 34-4708

শকুন্তলা বললেন—আমাকে আদিবাসী মেয়ে ভেবে যে আমার মাথায় সিঁদুর দিলো, সে আমাকে খুঁজবে না? খুঁজে খুঁজে যদি এখানে আসে?

হেসে উঠলাম এবারে। বললাম—পাগল! এলেই বা? আপনি এসব ছেড়ে ফেলুন।

ভদ্রমহিলা কিন্তু আশ্চর্য মানুষ, পোষাক ছাড়লেন না, এমন কি সিঁথির সিঁদুরও মুছলেন না, বললেন—থাক না, দেখাই যাক না কী হয়! যদি আসে কেড়ে নিতে, আপনি ত' রইলেন বীরপুরুষ, যুদ্ধ করতে পারবেন না?

বললাম—কাড়তেও কেউ আসছে না, যুদ্ধও কেউ করছে না, আপনি নিশ্চন্ত থাকুন।

তার পরের কথা অতি সংক্ষিপ্ত। তিনি মালীর সাহায্যে রান্নাবান্না করলেন, রাত আটটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সব হয়ে গেল। আমি রুমের সাহায্যে একটি খাট ভিতরের বারান্দায় নিয়ে এলাম। রুমু মালীর কাছ থেকে একটি খাটিয়া সংগ্রহ করে আনলো। ভদ্রমহিলা দরজা ভেজিয়ে ভিতরে শুয়ে পড়লেন।

সবাই রাত্রির প্রশান্তিতে নিমগ্ন। পশের ঘরের 'সংসার' থেকেও আর কলরব ভেসে আসছে না। ওঁরাও আমাদের মতো ব্যবস্থা করেছেন। স্বামী-স্ত্রীকে ভিতরে দিয়ে বাকী তিনজন বাইরে শুয়েছেন।

রাত তখন গভীর। সবাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। হঠাৎ কী একটা চীৎকার-কলরবে ঘুমটা ভেঙে গেল। দরজা খুলে শকুন্তলা বাইরে এলেন ভয়ার্ত চীৎকার করতে করতে—শীগ্‌গির আসুন—বাইরে একটা লোক।

হৈ-হৈ চীৎকার। আলো নিয়ে খোঁজা-খুঁজি। কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না। ভদ্রমহিলা খোঁপা খুলে ফেলেছেন, নাকের নয়নাও অপসারিত, কিন্তু মোছেন নি সিঁথির সিঁদুর আর পরণের ছাপা শাড়ীটা।

তাকিয়ে দেখি, ভয়ে পাংশু হয়ে গেছে মুখ। আমি ওঁর ঘরের ভিতরে গিয়ে জানালাগুলি ভালো করে বন্ধ করে দিলাম। বললাম—ভয় কী? আপনি শুয়ে পড়ুন।

—বড্ড গরম হবে না?

বললাম—কিন্তু জানালা খুললে যে আপনি ভয় পাবেন!

উনি বললেন—ভালো করে খুঁজে দেখেছেন, কেউ এসেছিল কি না?

বললাম—আপনার মনের ভুল। কে আসবে?

বললেন—মাথায় ঝাঁকড়া চুল, এই চওড়া বুকের ছাতি, দুটি উৎসুক চক্ষু—আমি কি তাহলে ভুল দেখলুম!

—হ্যাঁ। ভুল ছাড়া আর কী? বলে উঠলাম—শুয়ে পড়ুন আপনি। এখনো রাত আছে অনেক।

—হ্যাঁ, শুচ্ছি। জানালা খুলে দিন!

দিলাম। দিয়ে বার হয়ে যাচ্ছি ঘর থেকে, উনি এসে খপ্ করে আমার হাত চেপে ধরলেন, বললেন—আসুন না ঘরে? আলোটা জ্বেলে দিয়েছি দেখছেন না? ঘুমোবো না, বসে বসে গল্প করবো, কেমন?

এক্ষুণ্ণ থেমে থেকে বললাম—আমি কন্ট্রাক্টর, আপনার আদেশ অবশ্যই আমাকে শুনতে হবে, কারণ আপনি আমার অফিসারের স্ত্রী। হঠাৎ আমার বাহুমূলে মাথাটা রেখে সিঁথিটি ঈষৎ নুয়ে নুয়ে উনি আর্তকণ্ঠে বলতে লাগলেন—না, না, আমি কারুর স্ত্রী নই। প্রথম যে বিয়েতে আপনি সাক্ষী ছিলেন, সে বিয়েটা সরকারী অনুষ্ঠানমাফিক হয়েছিল অবশ্য, কিন্তু ভদ্রলোকের সঙ্গে মৌখিক কন্ট্রাক্ট হল এক বছরের মাত্র। সবটাই আসলে ভুয়ো। Inte ectual comp:nionship বোঝেন, আমি ছিলাম তাই। আমার দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে আসলে আমার বিয়েই হয় নি, টাকার বিনিময়ে—!

বলতে বলতে দুটি চোখ দিয়ে ধারা নামলো তাঁর—আমি উচ্চশিক্ষিতা, কিন্তু আমার এ কী প্রফেশন হলো বলুন ত? স্কুল-কলেজে পড়তে পড়তে যৌবনের প্রথম লাবণ্যে ভাঁটা পড়লো, তারপরে চাকরী করতে করতে বয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে বন্ধুত্ব। আমাদের সেই 'অর্জিত ব্যক্তিত্ব' এঁদের আকর্ষণ করে, নছক নারীত্ব নয়। এই ভদ্রলোক, অর্থাৎ আমার তথাকথিত দ্বিতীয় স্বামী, ইনি আদিবাসী মেয়েদের উপভোগ করতে করতে ক্লান্তি অনুভব করলে তখনই Inte lectu l co panionshi -এর জন্য আমাকে টেলিগ্রাফ করেন। অবশ্য, প্রতিবারের জন্য আমাকে উনি টাকা দেন, মোটা টাকা দেন। আমি একটু অবাক হয়েই ওঁর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে উনি আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে আঁচলে চোখ মুছলেন, বললেন—আমার ভয় হচ্ছে—ভীষণ ভয় হচ্ছে, যে আমার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছে তার জন্য। কিন্তু আমি ভয়ে মূর্ছা গেলেও তার উচিত ছিল আমাকে ডাকাতের মতো জোর করে তার ঘরে নিয়ে যাওয়া। আমি সুখী হতাম—সত্যি সুখী হতাম!

—সর্বনাশ! তাই কি পারে মানুষ!

আমার এসে আমার দুটি হাত ধরলেন তিনি, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন পারে, নারী পারে। সত্যি বলছি, সভ্যতা-শিক্ষা—এসব আমি কিছুই চাই না! এ সবই মেকী!

বললাম—আমারও যে কতখানি ভয় হচ্ছে, তা তুমি জানো না শকুন্তলা। ভয় হচ্ছে অসম্পূর্ণের জন্য।

—কেন?

বললাম—যদি কোনদিন ওর মধ্যেও তোমার এসব চিন্তা আসে!

বিচিত্র হাসি ফুটে উঠলো ওর মুখে, বললো—অসম্পূর্ণা অসম্পূর্ণাই, শকুন্তলা নয়। শকুন্তলাও শকুন্তলা হতো না, যদি না আজ এমন করে আমার সিঁথিতে সিঁদুর পড়তো। যাও না একটু বাইরে, খুঁজে এসো না তাকে? হয়ত ভয়ে ভয়ে সে আশেপাশে ঘুরছে!

—তাকে আনলে কী করবে তুমি?

শকুন্তলা বললে—বলবো, আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে যাও। আমার চীৎকার চেঁচামেচি কিছুই তুমি শুনো না—যারা আমার হয়ে রুখে আসবে, তোমার হাতের লাঠি পড়ুক তাদের ওপর।

কিছুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললাম—তোমার ভাষা সে বুঝবে না।

—চাই না আমার ভাষা তাকে বোঝাতে!—বলে উঠলো শকুন্তলা,—বরং তার ভাষা আমি ধীরে ধীরে শিখে নেব।

আস্তে আস্তে ওকে টেনে নিলাম কাছে। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললাম—এতটা ভাবপ্রবণতা ভালো নয়। শুয়ে পড়ো। আমি জেগেই রইলাম। ভোরে বাস আসবে—আরকুতে চলে যাবো, কেমন?

লক্ষ্মী মেয়ের মতো আমার কথা শুনে ও বিছানায় শুয়ে পড়লো। আমিও ধীরে ধীরে বাইরে এলাম। রুমু জেগে উঠেছিল জানি, কিন্তু সাড়া দিলো না।

আমি শুয়ে পড়ে 'ঘুমোবো না, ঘুমোবো না' করতে করতেও ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙলো একটু বেলাতেই। রুমের উত্তেজনা। বাইরে বাসের ভোঁ। জেগে উঠতেই রুমু বললে—স্যার, আপনার চিঠি।

—মানে!

হাতে নিয়ে দেখি, ছোট্ট একটি কাগজ। শকুন্তলার স্বাক্ষর। লিখেছে—"সবাইকে বোলো, আমি ফিরে গেলাম।"

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—কোথায় গেছেন তিনি?

—জানি না স্যার।

—বাস্?

—বাস্ যাচ্ছে বিশাখাপত্তনম। আপনি চলুন? —উনি?

—বাসে ওঠেন নি।

—তাহলে?

ছাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে বাসের দিকে গেলাম। না, বাসের কোনো আসনেই সে নেই।

—গেল কোথায়?

মালী কোনো খোঁজ দিতে পারলো না, কেউ কোনো খোঁজ দিতে পারলো না।

বললাম—এ বাস ছেড়ে দাও। আরকুতে যাবো। —সে তো অনেক দেরী হবে।

—হোক অনেক দেরী।

বাস হর্ন বাজিয়ে ছেড়ে দিলো। আমি মালীকে দিয়ে সন্ধান করাতে লাগলাম আদিবাসীদের গাঁগুলিতে। সেই পরিত্যক্ত হাটের যায়গাটিতেও গেলাম। খুঁজে বার করলাম সেই মালীর সন্ন্যাসীটিকে। কিন্তু সে-ও কোনো সন্ধান দিতে পারলো না।

সন্ধান পাওয়া গেল বিকেলের দিকে। একটি কাঁকড়া-মাথা আদিবাসী ভদ্রলোক তার মৃতদেহটি কাঁধে বহন করে আনলো। আমাদের বাংলোর পিছন দিকার উঁচু পাথরটা থেকে সে ঝাঁপ দিয়েছিল।

ধমকে দিয়েছিলাম ছেলেটিকে,—ওর সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছিল কে? সে কথার উত্তরও পাওয়া গেল না।

PHONE : 34-1785

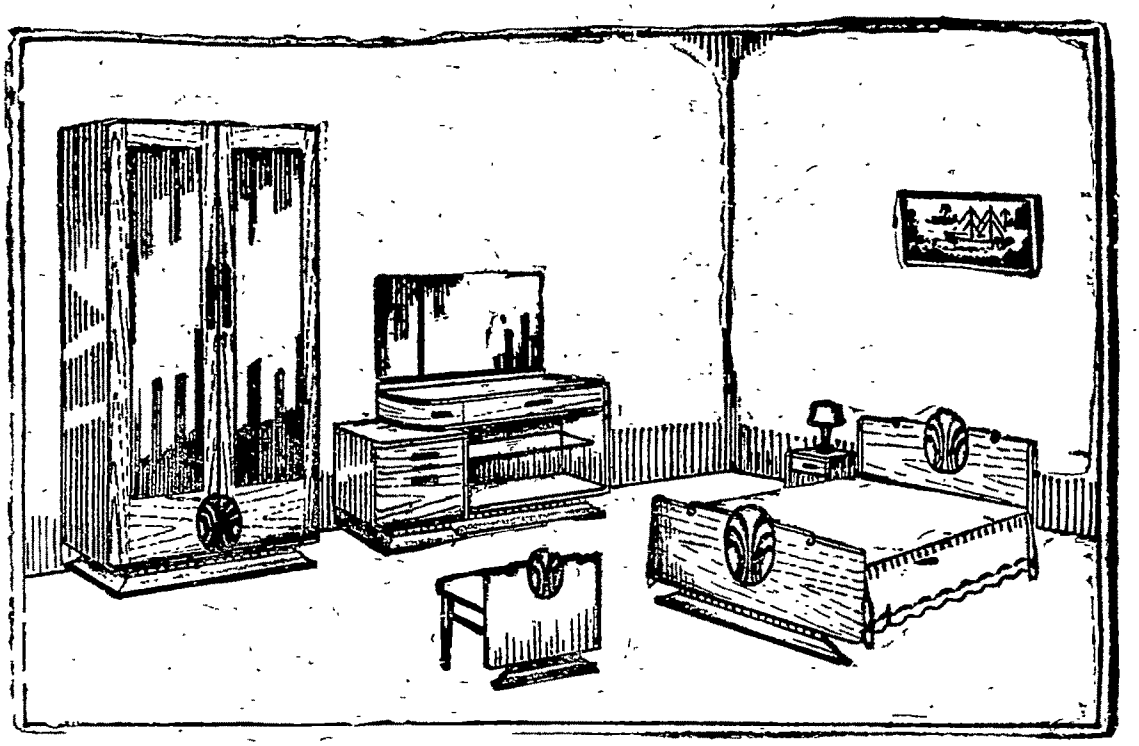

Calcutta Furnishing Stores (Private) Ltd.

Cabinet Makers, Government Contractors
And General Order Suppliers

Worksop :
211A BIPIN BEHARY GAGULY ST.
CALCUTTA-12

Show-Room & Office :
62, BIPIN BEHARY GANGULY ST.
CALCUTTA-12

কস্তুরী

বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

হরিদ্বার থেকে কনখল—দূরত্ব খুব বেশি নয়। মাইল তিনেকও হবে কিনা সন্দেহ। সাইকেল রিক্সা যাতায়াত করছে অনবরত। আগে টাঙা যেত ঘন ঘন।

ভাড়াটা একটু বেড়েছে। তা কোন্ জিনিসটার দাম বাড়ে নি?

কনখলের বড় আকর্ষণ এখানকার রামকৃষ্ণ মিশন। স্থানীয় লোকেরা বলে বাঙালী হাসপাতাল। সেই নামেই ওটা পরিচিত। রিক্সাওয়ালা থেকে সাধারণ কুলি পর্যন্ত বাঙালী হাসপাতাল চেনে। সম্প্রতি এখানে বিবেকানন্দের একটা মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের মর্মরমূর্তি হরিদ্বারের ঘাটে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে আরও কিছুদিন আগে।

রামকৃষ্ণ মিশন থেকে দক্ষঘাট খুব বেশি দূরে নয়। অনায়াসে হেঁটে যাওয়া যায়। আমরা প্রতিবার হেঁটেই যাই। পথে পড়ে কয়েকটা প্রাচীন মন্দির। ছোট ছোট বাজারের সাথে কনখলের পরিচয় নতুন।

দক্ষঘাটে জল নেই। গঙ্গা অনেক দূরে সরে গেছে। মাঝখানে আবার চর পড়ে গেছে। বছর পনেরো আগেও এখানে খরস্রোতা গঙ্গার পূর্ণযৌবনা রূপ দেখেছি। ওপারে নীল পাহাড়। নীলকণ্ঠের মন্দির আছে। কেউ বা বলে অঞ্জনা পাহাড়। মাইল তিনেক চড়াই ভেঙে উপরে উঠলেই মন্দির।

দক্ষঘাটে শিবহীন যজ্ঞ হয়েছিল। শিবের অপমানে সতী দেহরক্ষা করেন। তারপর শিবঠাকুর কি করেছিলেন সবাই জানেন। ঘাটের তীরে পুরাণো মন্দির। রিমডেলিং হচ্ছে। মন্দিরের পাশে হনুমানজীর নতুন মন্দিরটি বিরাট স্কেলে গড়ে উঠছে। হনুমানজীর ভক্তসংখ্যা এখানে আজকাল সর্বাধিক। ব্যবসায়ীশ্রেণীর কোনো ভক্ত নতুন মন্দিরের খরচ দিচ্ছেন নাকি। একজন যাত্রী বললেন, তা ঠিক নয়। খরচটা দিচ্ছেন একজন রাজা।

বোধ হয় কোন কামনা সিদ্ধি হয়েছে। দরজা থেকে ঘাট পর্যন্ত সারিবদ্ধ ভিখারী বসে। কেউ বা হঠযোগ অভ্যাস করছে।

পুরাণো বটগাছটা একটুও বদলায় নি। তারই নীচে শিবমন্দির। মন্দিরের সামনে পুরাণো ভাস্কর্যের নমুনা দুটি ষাঁড়। ভগ্নপ্রায়। তবুও বোঝা যায় তারা কোন্ শ্রেণীর প্রাণী।

ঠিক যেন জমে উঠছিল না।

যাঁরা পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় এসেছেন তাঁরা বেশ হাঁটুজলে নেমেই কাজ সেরে নিচ্ছিলেন। যাঁরা শুধু প্রকৃতির শোভায় মুগ্ধ হবার বাসনায় এসেছেন তাঁরাই এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। রুক্ষ ভাব। যেন রুদ্র বেশ।

মনে পড়লো দক্ষঘাটের সামনে একটা মন্দির ছিল। মন্দিরের মোহন্ত বঙ্গসন্তান। নাম যোগানন্দ।

স্থানেশ্বর মন্দির। যোগানন্দর সাথে আমার বছর পনেরো আগে প্রথম পরিচয়। শুধু মুক্তির আশায় নয়, একটা নতুন জগতের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন পরিব্রাজক। যোগানন্দ সংস্কৃতে বক্তৃতা দিতে পারতেন। সে তো অনেকেই পারেন। সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম যাতে সেটা ছিল তার স্নিগ্ধ মন।

মন্দিরে প্রবেশ করলাম।

অনেকদিন পরে দেখা। চিনতে পারলেন। বললাম, আর কোথায় কোথায় ঘুরে এলেন?

হেসে বললেন, অনেক ঘুরেছি। ঘোরাঘুরির জন্য একদিন সব ছেড়ে বেরিয়েছিলুম। আজকাল আর পারি না। শক্তিও নেই। সেই অদম্য উৎসাহও যেন হারিয়ে ফেলেছি।

বছর পনেরো আগে একবার এঁর মুখে পায়ে সমগ্র এশিয়া ঘোরার গল্প শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাই তাঁর এ অবসন্ন ছবিতে যে মনটা দমে গেল সেটা বলাই বাহুল্য।

ছোটবেলায় বৈরাগীদের কাছে শুনতাম তীর্থের গল্প। এক তীর্থ থেকে আর তীর্থ। বাংলারই হয়তো একটা প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের। যিনি বেশি বেড়াবার সৌভাগ্য করেছেন তিনি হয়তো গল্প করতেন ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানের।

কেউ এসে কেদারবদরীর গল্প বলে শিশুমনকে তাক লাগিয়ে দিতেন। কেউ বা বলতেন অমরনাথের শ্রাবণ পূর্ণিমার উৎসবের কাহিনী। দক্ষিণে যাঁরা যাবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের কাছে কান পেতে মুগ্ধ হয়ে শুনেছি সেতুবন্ধ রামেশ্বরমের কাহিনী। পুরীর জগন্নাথের মন্দির, তারকেশ্বর মন্দির বাংলার অনেক সাধু-সন্ন্যাসীরই দেখা।

একবার একজন বৈরাগী চন্দ্রশেখরের মন্দিরের গল্প বলে একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। জীবনে বহু সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে

এসেছি। পদব্রজে এত পথ কেউ অতিক্রম করেছেন বলে জানি না।

খেয়াল। জীবনটাই একটা খেয়াল জানবে পরিব্রাজক। আমার বয়স তখন আর কত? ধরো একুশ-বাইশ। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম কার ডাকে?

না, মুক্তি নয়। নেশায়। বেড়াবার নেশায়। নির্লিপ্ত ভ্রমণের একটা অনির্বচনীয় স্বাদ। ঠিক যেন যাযাবর। চিন্তা নেই। ভাবনা নেই। আজ এখানে আছি। নিজেই জানি না কাল কোথায় থাকবো।

পকেটে মাত্র পাঁচ আনা নিয়ে বেরিয়েছিলুম। হিমালয় ছিল আমার প্রথম গন্তব্যস্থল। বিশেষ কোন অসুবিধে হয় নি।

পাহাড়ী লোকেরা তখনও অতিথি সেবায় তিক্ত হয় নি। নতুন লোক দেখলে বরং আদর করে ডেকে নিয়েই সেবাযত্ন করতো। তাদের সাথেই থাকতাম, খেতাম। যখন জানলো আমি ইংরিজীও জানি তখন গ্রামশুদ্ধ লোক তাদের লেখাপড়ার কাজ করিয়ে নিত।

গ্রামের মুখিয়া একদিন এসে পাঠশালা খোলবার প্রস্তাবও করলো। মনে মনে আতঙ্কিত হলাম। এরা যে বাঁধতে চায়। পরদিনই শেষ রাত্রে গ্রাম ছেড়ে চললাম অন্য গ্রামে।

হিমালয়ের কোলের এই পাহাড়ী লোকজন, জানবে অল্পেই ভারী সন্তুষ্ট। আনন্দ এদের মনভরা। স্ফূর্তি করতে ও করাতে জানে। প্রাণখোলা হাসিটুকু আজও এদের ছেড়ে যায় নি। তোমাদের বর্তমান সভ্যতার ছোঁয়া এদের গায়ে এখনও লাগে নি। তাই আন্তরিকতায় এদের মন সমুদ্ভাসিত।

সেদিন কিন্তু মুখফুটে ভিক্ষে চাইতে হত না। নিজের থেকেই পাহাড়ী চাষী বা দোকানী এসে জিজ্ঞাসা করতো 'খাবার কোথায় খেলে আজ মহারাজ?'

ভালো হিন্দী জানা ছিল না। আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেই হত। যেন আত্মীয় এসেছে দূর গ্রাম থেকে। সে যত্ন আজকাল মুছে গেছে। অপরূপ লাবণ্যবতী পাহাড়ী মেয়ে এসে ছুটে আব্দারের সুরে জিজ্ঞাসা করবে কি এনেছো আমাদের জন্য? এনেছো সিঁদুর। কপালের টিপ?

কেদারনাথ বদরীনাথের পথে পাহাড়ী শিশুর দল ছেঁকে ধরতো।

আমার কিন্তু বিরাট যাত্রীদল কখনও ভালো লাগত না। নিরালা একাকিত্বেই আমি হিমালয়ের সান্নিধ্য উপভোগ করেছি। চিন্তা-ভাবনা কিছুই ছিল না। যখন যেখানে সন্ধ্যা নেমেছে সেখানেই রাত কাটিয়েছি। এ যেন একটা অপরূপ নতুন জীবন।

মাঝে মাঝে পেনসিল দিয়ে একটু-আধটু নোট করে রাখতাম। তোমাকে বলতেই ভুলে গেছি, বেড়াবার পর আমার দ্বিতীয় সখই ছিল লেখা।

যোগানন্দদেব লেখা একাধিক বই আছে হিমালয়ে ভ্রমণের ওপর। এ বই প্রকাশে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের ভিতর একজন ছিলেন ভারতের বিচারপতি। এ বই-এ যোগানন্দ শুধু পরিব্রাজক জীবনেরই নয়, আপন সাহিত্য প্রতিভারও যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। একখানা বই তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। ট্রেনে একজন বন্ধু পড়তে নিয়ে আর সে বই ফেরত দেন নি।

হিমালয়ের তীর্থগুলো শেষ করতে বেশ কিছুদিন লাগলো। কেদারবদরী, অমরনাথ সবই হেঁটেই ঘুরেছি। তখন ভাবলাম গ্রামে ফিরে কি করব?

পূজোতে অবিশ্বাস ছিল না।

অভ্যাসের মতনই সেটা রোজ করতাম ঠিক যেমনটি ছিল খাওয়া, নাওয়া, ঘুমোনো।

হিমালয়ে একটা জিনিসের সন্ধান পেলাম। স্থানীয় পাহাড়ীদের কাছ থেকে আমি ধীরে ধীরে চিনতে শিখলাম পার্বত্য

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—
বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

মুক্তি তোমার

সন্ধ্যারাণী • সন্ধ্যা রায়
কমল মিত্র • অনুপ কুমার
পাহাড়ী সান্যাল • অজয় গাঙ্গুলী
বনানী চৌধুরী • রেণুকা রায়
নিরুপা বালা • জ্যোৎস্না বিশ্বাস • দিলীপ রায়
শিউলী মজুমদার ও ভানু বন্দ্যো
অভিনীত

ডাঃ নীহার রঞ্জন গুপ্ত-র

তাপসী

ব্রহ্মসফল
নাটকের
চিত্ররূপায়ণ

পরিচালনা
অগ্রদূত

সঙ্গীত • গোপেন মল্লিক

প্রযোজনা ও পরিবেশনা
শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাঃ লিঃ

শিকড়ের গুণ। পৃথিবীতে এমন কোন অসুখ নেই এই হিমালয়ে যার ওষুধ নেই। বিদেশী বৈজ্ঞানিকরা এই শিকড় থেকেই সব ওষুধ তৈরি করেন। অনেক আগে একটা জার্নালে পড়েছিলাম।

সব বিষয়েই গুরু চাই জানবে। গুরু ছাড়া কিছুই হয় না। কোথাও পাহাড়ী বুড়ীকে ধরে, কোথাও বা কোনো নাগাল পায়ে ধরে, কোথাও বা কোনো দোকানীর দোকানের কাজ করে দিয়ে আমি এই ওষুধগুলোর ফর্মুলা নিয়ে নিয়েছিলুম।

এতে একটা সুবিধে হলো। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতাম। কোনো বাড়িতে কাউকে অসুস্থ দেখলে গায়ে পড়ে ওষুধ দিতাম। আশ্চর্য ব্যাপার। অসুখ সম্পূর্ণভাবে সেরে যেতো। গ্রামের লোকদের কিন্তু অন্য ধারণা হলো। তারা রটিয়ে দিল মন্ত্র দিয়ে আমি অসুখ সারাতে পারি।

বললুম, "মন্ত্র-তন্ত্র আমি কিছুই জানি না। যা হচ্ছে তার সব কেরামতি ঐ হিমালয়ের।"

তাতে ওদের বিশ্বাস আরও বেড়ে গেল।

প্রতারণা কাউকে কখনও করি নি। প্রতারিত হতে হতেও বেঁচে গেছি। একাধিক পাহাড়ী মেয়ে এসেছে বশীকরণের মন্ত্র শিখতে। বিশ্বাস করে নি আমি কিছু জানি না। এদের একটা বদ্ধমূল ধারণা যে বাঙালী মাত্রই যাদু জানে।

শেখাবো কি? নিজেই কিছু জানি না। তখন তারা উল্টো ভয় দেখিয়েছে। ইংরিজীতে তোমরা যাকে বলো ব্ল্যাক মেইলিঙ।

তাই মাঝে মাঝে বিপদেও পড়েছি। ডাকাতরাও ধরে নিয়ে রান্না করিয়েছে। রান্না আমি জানি। কিন্তু ভালোভাবে করি নি। ঐ এক ভয়ে। আটকে যাবার ভয়ে। সেই ঝাল রান্না খেতে বসিয়ে তারা পালিয়ে গেছে।

একবার ভাবলাম গ্রামে গিয়ে ওষুধ বিতরণ করি। তারপরই ভয় হলো—বন্ধন সহ্য হবে না।

কেমন করে জানি না কোনো কোনো শহরেও রটে গিয়েছিল যে, আমি মন্ত্র দিয়ে অসুখ সারিয়ে দিতে পারি। একজন উচ্চ-পদস্থ রক্ষকর্মচারীর লোক আমাকে এসে ধরে ফেলল। ভদ্রলোক মুসলিম। লক্ষ্ণৌ-এর কায়দামাফিক ভদ্রতা বিনিময়ের পর হাঁটু ছুঁয়ে বললেন, তাঁর অসুস্থা কন্যাকে সারিয়ে দিতেই হবে। ভদ্রলোক তখন বেরেলীর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট।

একটু ভয়ও পেলাম। কি জানি বাবা। আদালতের লোক। যা খুশি তাই করতে পারে, করাতে পারে। তাঁর গাড়িতে বেরিলী গেলাম।

ডাক্তাররা মেয়েটিকে জবাব দিয়ে দিয়েছিল। আমার অবস্থা দেখে ম্যাজিস্ট্রেট অভয় দিয়ে বললেন, মহারাজ, ঠিক করতেই হবে। মন্ত্র দিয়ে ঠিক করে দিতে হবে। তবে যদি না হয় বুঝবো খোদাতালা মেহেরবানি করলেন না। আমি ভাগ্যহীন। তোমার কোনো ভয় নেই।

ভদ্রলোকের সাথে রামপুরের নবাবের আত্মীয়তা ছিল। সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব।

কি জানি কেমন করে মেয়েটি সেরে উঠলো। আমি শুধু তাকে কয়েক টুকরো শিকড় খেতে দিয়েছিলুম। একটা কথা তাকে বলা ছিল। তাঁকে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলুম আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে কাউকে কিছু না জানাতে।

প্রচারকে আমি ভয় পাই। এই প্রচারের জন্যই হিমালয় ছেড়ে শহরে আসতে হয়েছে। ও-ই জিনিষটাই মানুষকে অনেক সময় উঁচু থেকে টেনে নীচে নামিয়ে দেয়।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ভারী খুশি। একমাত্র রূপসী কন্যা বেঁচে উঠেছে। সবাই উঁকি-ঝুঁকি মারে আমাকে দেখতে। সবই টের পাই। সামনে যাই না ভয়ে—ভীড়ের ভয়ে।

একদিন ব্যাকুলভাবে তাঁকে নিবেদন জানালুম, 'এবার আমাকে ছেড়ে দাও যাঁরা মেহেরবানিতে তোমার মেয়ে বেঁচে উঠলো তাঁকে স্মরণ করো। আমায় যত দাও।'

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, "সে কি কথা মহারাজ? আপনি আমার মৃত মেয়ের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আপনাকে কখনও আমি এমনি-ভাবে যেতে দিতে পারি? তা হয় না। বলুন আপনার কি চাই? অর্থের আমার কোনো অভাব নেই। সেদিকে আপনি বিন্দুমাত্র সংকোচবোধ করবেন না। বলুন এই বেরেলীতে আপনার জন্য একটা ইমারত তৈরি করে দেব। আপনি সেখানে নিশ্চিন্ত মনে ধ্যান-জপ করবেন। এই শহরেই থাকুক আপনার মঠ-মন্দির।

বললাম, "অনেক ধন্যবাদ। আমি মঠ চাই না। মন্দির চাই না। মুক্তির আশায় আমি বেরুই নি। আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াতেই ভালবাসি। আমি সাধারণ ফকির সাধারণ দরবেশ মাত্র।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "দেখুন মহারাজ, আমি মানত করেছিলুম এই মেয়ে সেরে উঠলে আমি ওকে নিয়ে সপরিবারে মক্কা-মদিনা ঘুরিয়ে নিয়ে আসব। আপনি তো বেড়াতে ভালই বাসেন। চলুন না আমাদের সাথে। কোনো অসুবিধে হবে না।"

সত্যি বলছি তাঁর এ প্রস্তাবে আমার খুব আনন্দ হলো।

ক'দিন পরেই তাঁর সাথে আমি চললুম মক্কা-মদিনা। তিনি সবাইকে বলে দিয়েছিলেন যে, আমি মৌন দরবেশ। কোন কথাবার্তা বলি না। চুল-দাড়ি দীর্ঘই ছিল।

তাঁর সাথে আমি মক্কা-মদিনা তন্ন তন্ন করে ঘুরে এসেছি। কোন কথা বলি নি কোথাও। বলার কথা কিই-বা আছে? দেখার সখ ছিল দেশ-বিদেশ। প্রাণভরে দেখেছি দেশ। কেমন করে জানি না পাথেয়টুকুও ঠিক জুটে গেছে।

পথেও অনেক রোগীকে
।
গও সেই বেরিলীর
ায় নিয়ে গিয়েছিলেন।
দ্রলোক মারা গেছেন।
প্রতিষ্ঠাতে তিনি বহু অর্থ
ন। এই মঠের ইতিহাস অন্য
দান গ্রহণ করলে তিনি সুখী
জানি, আমি নিরুপায় ছিলুম।
আসে রাজস্থানের কোন রাজ-
স্বপ্নে দেখে এ মঠ তৈরী
াজমাতা।
র মুখে শুনেছি পায়ে হেঁটে
বে তিব্বত-চীন ঘুরে এসেছেন।
সেই ডজনখানেক কথা ভাষা তাঁর
চীনে তিনি কালীমন্দির
সেখানে নাকি তন্ত্রের উপাসক-
ার আলাপ হয়েছিল। তিনি
া, বোর্নিও ঘুরে এসেছেন।
তাঁর কাছে শ্যামবাজার থেকে

বিদেশ ঘুরে কি দেখলেন?"

বেশ শক্ত প্রশ্ন করে বসেছো।
াহে আমিও ঠিক এই কথাই

ামি রাজস্থানে ঘুরছিলাম। আবু
মুগ্ধ মনে চারিদিকে প্রকৃতির
াম। ওষুধ বিতরণ শেষ করে
তাম শুধু, আমি কে? অসুখ
তিনিই সারাবেন। ঐ ওষুধ
াড়িয়ে মাঝে মাঝে অহমিকাটা
তো। সেটাও ছাড়লাম।
সন্ধ্যা নামে নি আকাশে।
র্যের কিরণচ্ছটা এসে প্রতিফলিত
পাহাড়ের গায়ে। আমি কিসের
ন্ময় হয়ে ছিলুম।
ছবাড়ীর লোক এতক্ষণ পিছনে
খেয়াল করি নি। আমাকে
লেন, "রাজমাতা আপনাকে
। অদূরে গাড়িতে তিনি বসে।"
বললেন, "আমি অধীক হয়ে
বোধ হয় ভুল করছেন। আমি
মাত্র। কোনো রাজার সাথে
নেই।"
পরে গাড়ি থেকে রাজমাতা
এলেন। হাত জোড় করে
বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ মহারাজ,
ম খুঁজছিলুম এতদিন।"
র বললাম, "আপনারা বোধ
। আমি পরিব্রাজক মাত্র।"
লেলেন, আপনি একাগ্র মনে
াবৃত্তি করছিলেন। ঐ মন্ত্র
যেন অমৃত ঢেলে দিচ্ছিল।
স্তাব আছে। স্বপ্নে আদিষ্ট
লে একটা স্থানেশ্বর শিবের
রেছি। সে মন্দিরের পূজারী
পাচ্ছি না। পূজোয় বিন্দুমাত্র ত্রুটি হলে পূজারীর মৃত্যু অনিবার্য। এখন পর্যন্ত দুজন পূজারী নিযুক্ত করেছিলাম। দুজনই মারা গেছেন। আশ্চর্য ব্যাপার, যা স্বপ্নেতে দেখেছিলাম ঠিক তাই। মুখে রক্ত উঠে তাঁরা তেরোদিন যেতে না যেতে মারা গেছেন। আমি নিরুপায়। আপনি শৈব। আপনি প্রাণ-ভরে একাগ্র মনে যে মন্ত্র আবৃত্তি করছিলেন আমার স্থানেশ্বরের মন্দিরে শুধুমাত্র সেই মন্ত্র আবৃত্তি করুন। তাহলেই তাঁর পূজো হবে। চাই শুধু একাগ্র মন। আমার মনে হয় আমি তাঁর সন্ধান পেয়েছি। এ বিষয়ে আপনি আমাকে সাহায্য করুন মহারাজ।

ভয়ে শরীর কেঁপে উঠলো।

ভাবলাম এ কি নতুন খেলা? শিবের স্তোত্রটা সময়ে-অসময়ে আবৃত্তি করে থাকি। অভ্যাসদোষেই বলতে পারো। স্তোত্রটা আমারই লেখা।

বাস্। সেই যে এখানে বসেছি আর নড়ি নি। স্থানেশ্বরের মন্দিরে বাঁধা পড়েছি। একটা প্রশ্নের সমাধান বোধ হয় হয়েছে। অশান্ত মনে যা পাই নি তার সন্ধান পেয়েছি। যার সন্ধানে লক্ষ যোজন ছুটেছি সেটা আমার অতি নিকটেই ছিল। সেটা লুকিয়ে ছিল আমারই ছোট্ট মনে। শান্তি। অপরিসীম শান্তির সন্ধান পেয়েছি। সব জায়গাতেই সেটা খুঁজে বেড়িয়েছি এতদিন। আসলে সেটা আমার নিজের মনের মধ্যেই লুকানো ছিল। এতবড় সত্য সন্ধান করতে জীবনটাই প্রায় কেটে গেল। একটা কবিতার বহুদিন আগে পড়েছিলুম—

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু॥

তবে এটার জন্য দু পা যাবারও দরকার ছিল না। একেবারে নিজের মনের গহনেই এটা ছিল লুকানো।

বাঙলা ছবির বর্তমান গতি — প্রগতি, না অধোগতি?

পঙ্কজ দত্ত

একখানা 'চারুলতা' কিংবা একখানা 'আরোহী'-কে ধরলেই বাঙলা চলচ্চিত্রের সামগ্রিক চেহারাটা বোঝায় না। এসব ছবি এবং আগেও 'পথের পাঁচালী' থেকে 'মহানগর' পর্যন্ত কিছু সংখ্যক ছবি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে সমগ্র দেশের মান বাড়িয়েছে, গৌরব এনে দিয়েছে। সে ছবিগুলিকে ধরতে হয় ব্যতিক্রম বলেই—বাঙলা ছবির সামগ্রিক পরিচয় বলতে গেলে বছরে যে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশখানি ছবি মুক্তি-লাভ করে, তাদের সবাইয়ের কথাটি ধরতে হয়।

এই সামগ্রিক বিচারের প্রসঙ্গ ওঠবার সঙ্গে অর্থনৈতিক দিকটা বিচারের মধ্যে এসে পড়া স্বাভাবিক। কারণ চলচ্চিত্র এমন এক সামগ্রী যার উৎকর্ষ বাজারের অবস্থার ওপর বিশেষ-ভাবে নির্ভরশীল। অন্য যে কোন সামগ্রীর ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতর-র চাহিদাই হয় বেশী, কিন্তু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বিচিত্র ব্যাপার সাধারণের পক্ষপাত দেখা যায় মহৎ সৃষ্টির চেয়ে অসার স্থ ভাবালুতাপ্রবণ উপাদানের প্রতি। 'বাদশা' যে আর্থিক সাফল্য অ সক্ষম হয় 'মহানগর' কিংবা 'অ ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারে না মতো ছবি 'পলাতক'-এর সিকি সাফল্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয় চলচ্চিত্রকে প্রমোদ-উপাদান বলে দরুণ, সাধারণত লোকে 'প্র অত্যন্ত হাল্কা অর্থে ধরে নেও এই অবস্থা-বিপর্যয়। প্রমোদ বল বর্জিত হবার কথা নয়, কিন্তু এই ব্যাখ্যাটাই আজ দাঁড়িয়ে অধিকাংশ ছবিরই কাহিনী, ঘটনা পরিকল্পনাতে বাস্তবের সঙ্গে একটা কিম্ভূত রূপ দৃষ্টিতে প

'গুলমোহর' ছবির নায়িকা অমৃতা রায়

অথচ বাঙলা ছবির আদি ছিল না। তৎকালে কলাকৌশ এখনকার তুলনায় নগণ্য ছি প্রযোজক ও পরিচালকদের সেক বিশেষভাবে নিবদ্ধ থাকতো বেশ ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশে এব কাহিনী পরিবেশনের দিকে। এখ প্রযোজক-পরিচালকের রীতি অ করা অভিনয়শিল্পীদের সঙ্গে নেওয়া হলে এমন ধরণের কাহি অথবা, শিল্পীদের অভিনয়ের ি পরিস্ফুট হতে পারে এমন ব নেওয়ার রেওয়াজ আগেকার দিনে দেখা যেত না। কাহিনীর দেওয়ার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচ নাথ, গিরিশচন্দ্র এবং আরো অনে ও জনপ্রিয় রচনাবলীকে অবলম্বন বলে বাঙলার ছবি একটা বৈশি দ্বারা সমগ্র ভারতেই সমাদর পরবর্তীকালে বড়ুয়া, দেবকী চলচ্চিত্রে, যাকে বলে auteur তার প্রয়োগ দ্বারা ছবির নিজ ফুটিয়ে তোলায় কয়েক ধাপ এগি আরো পরে সত্যজিৎ রায় চলা নিজস্ব ছৈবিক ভাষায় প্রকাশের করেন, যার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন তপন সিংহ, অগ্রগামী, মৃণাল কয়েকজন পরিচালক। এঁদের স

এম সরকার এণ্ড সন্স

সন অব লেট এম·বি·সরকার

২৪ ও ১২৪/১ চিত্তরঞ্জন মিত্তির সাহেলী ষ্ট্রীট

বড়বাজার

কলকাতা - ১২.

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে অভিনয়শিল্পীদের প্রাধান্যের চেয়ে তাঁরা ছবিতে চলচ্চিত্রের নিজের ভাষায় একটি দৃষ্টিনন্দন মনোজ্ঞ কাহিনী পরিবেশনেই তাঁদের প্রচেষ্টা নিবদ্ধ রাখেন। বলিষ্ঠ কাহিনী না হলে যে সত্যিকারের শিল্পমান্য একটি অনিন্দ্যসৃষ্টি সম্ভব হতে পারে না, 'পথের পাঁচালী' থেকে 'অতিথি' পর্যন্ত এ সত্যটা বারবারই প্রতিপন্ন হয়েছে। এঁদের ছবি আন্তর্জাতিক সমাদর ও সম্মান লাভ করে সমগ্র ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পেরই গৌরব বাড়িয়েছে এবং বাড়িয়ে যাচ্ছেও।

কিন্তু, তবুও এঁদের সবায়ের সব ছবি যে দেশে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয় নি, এই রূঢ় সত্যটিও স্বীকার করতে হয়। এই অসাফল্যের একটি কারণ অবশ্য হিন্দী ছবির প্রতিযোগিতা। হিন্দী ছবি মুখ্যত অবাস্তব দুনিয়ার একটা রঙীন চমক সৃষ্টি-দ্বারা সাধারণ দর্শকমনে একটা মাদকতার আমেজ ধরিয়ে তাদের নেশাগ্রস্ত করে রাখার চেষ্টাতেই নিবিষ্ট থাকে। হিন্দী ছবির প্রধান উপজীব্য তার অভিনয়শিল্পী এবং সংগীত-কার। এরাই হচ্ছে দর্শকসাধারণের কাছে সুখতারা। হিন্দী ছবির এই ধারার অনুসৃতি বাঙলা ছবিতেও দেখা যায়। কাহিনীর চেয়ে ছবিতে তারকাদের প্রাধান্য ছাড়া আরও একটা ঝোঁক বাঙলা ছবির ক্ষেত্রে ইদানীং দেখা দিয়েছে।

বোম্বাইয়ের তারকাদের বাঙলা ছবিতে অবতরণ করানো আগেও ঘটেছে। চল্লিশ দশকে 'চন্দ্রশেখর' হয়েছিল অশোককুমারকে নায়ক করে। তার আগে এবং পরে বোম্বাই ছবির, বিশেষ করে চটুল নাচের জন্য খ্যাতি-মান শিল্পীর কতককে বাঙলা ছবিতে দেখা গিয়েছে। তবে হালের ঝোঁকটা, সম্ভবত, 'অভিযান' থেকে। সত্যজিৎ রায় ওয়াহিদা রহমানকে নায়িকা চরিত্রে গ্রহণ করেছিলেন কাহিনীর চাহিদা পরিপূরণের উদ্দেশ্যে—বোম্বাইয়ের এক জনপ্রিয় তারকাকে অন্তর্ভুক্ত করে, ছবির জৌলুস বৃদ্ধির প্রতি তাঁর লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু ওই ছবির প্রযোজকরা সেই অভিনবত্বটাই ছবিকে জনপ্রিয় করে তোলার একটা নতুন উপায় দেখতে পান। তাঁরা তাঁদের পরবর্তী 'দেয়া-নেয়া'-তে নায়িকার চরিত্রে অবতরণ করান বোম্বাইয়ের উঠতি তারকা তনুজাকে। 'দেয়া-নেয়া' আর্থিক দিক থেকে একখানি 'হিট' ছবি হওয়াতে অন্যান্য প্রযোজকদেরও এদিকে ঝোঁক দেখা দিয়েছে। আর তাই দেখা যাচ্ছে আগামী ছবির মধ্যে 'দোলনা'তে তনুজা, 'পাড়ি'তে দিলীপকুমার, ধর্মেন্দর, অভী ভট্টাচার্য এবং আরও কয়েকজন, 'ত্রিপর্ণা'-তে শশী কাপুর ও ওমপ্রকাশ, 'অকাল বসন্ত'তে সঞ্জয় ও আরেকজন, 'অ্যান্টনী ফিরিঙ্গী'-র নায়িকার জন্য নির্বাচিত হয়েছে আজরা। এইসঙ্গে বোম্বাইতে গিয়ে বাঙলা ছবি তোলায় উদ্যোগী হতে দেখা যাচ্ছে কয়েকজনকে। এঁদের মধ্যে অগ্রণী হলেন সরকার প্রোডাকসন্স, যাঁরা বোম্বাইয়ের তারকাদের নিয়ে তুলেছেন 'এক-টুকু ছোঁয়া লাগে'। আরেকখানি বাঙলা ছবি বোম্বাইতে তৈরি হয়েছে 'দুষ্টু প্রজাপতি'।

এই ঝোঁক বা প্রবৃত্তির একটা লাভের দিক অবশ্যই আছে। বোম্বাইয়ের তারকা দেখে যাঁরা হিন্দী ছবির ভক্ত, তাঁদেরও অনেককেই পাওয়া যাবে এইসব ছবির দর্শকের আসনে। তাছাড়া বাঙলা ভাষা-ভাষী নন এমন জনসাধারণকেও এইভাবে আকৃষ্ট করা সম্ভব হতে পারে। বাঙলা

প্রভাত ফিল্মস প্রযোজিত ভি শান্তারামের 'অমর জ্যোতি'-র একটি দৃশ্য।
ছবিটি ১৯৩৬ সালে ভেনিস উৎসবে দেখান হয়েছে।

অশোককুমার

ছবির অর্থার্জন ক্ষমতা এতে
সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ
বোম্বাইয়ের তারকারা ভূমিকালি
দরুণ বাঙলার বাইরেও বাঙলা
ক্ষেত্র অন্তত কিছুটাও বিস্তৃত

বোম্বাইয়ের তারকাদের
অন্তর্ভুক্তির আরো একটা দিক
ভারতে যে সংহতির ওপর জোর
চলচ্চিত্রক্ষেত্রে সেটা সহজসাধ্য হ
পন্থা। বাঙলার বা মাদ্রাজে
বোম্বাইয়ের হিন্দী ছবিতে অংশ
আগে থেকেই হয়ে আসছে।
ছবিতে বোম্বাইয়ের তারকা
হয়তো ভবিষ্যতে কেউ মা
তারকাকেও গ্রহণ করবেন-
পরস্পর অঞ্চলের মধ্যে
আত্মিক সম্পর্কও একরা
হয়ে উঠবে। বলা যায় না,
পরস্পর অঞ্চলের ঘনিষ্ঠতার
বাঙলা ছবির ভাবধারা
বাস্তবতাও হিন্দী ছবিকে প্রভা
পারে। বাঙলা ছবির এই
অভিযান সম্পর্কে এখনই নিশ্চি
বলা সম্ভব নয়।

এটা প্রগতি কিনা সে বি
নির্ধারণ এখনই সম্ভব নয়।
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে কখনো
স্থির হয়ে না থাকা। অনবরত
ধারা বা স্টাইলের উদ্ভবের
নতুনভাবে আকর্ষণীয় করে
নির্মাতাদের একটা সর্বক্ষণের
থেকে বাঙলা ছবিতে বোম্বা
সমাবেশকে একটা অগ্রগতি ব
করা চলে। তবে এই কারে
বোম্বাই তারকাদের সঙ্গে হিন্দী
ধারা ও প্রকৃতিও বাঙলা ছবি
করার প্রয়াসী হন, সেক্ষেত্রে
ছবির অধোগতির একটা নিশ্চিত
স্বীকৃত হবে।

...কুৎসিত মানুষে দেখি
...কেমন যেন হিংস্রও।
...ছিলাম সে পরি-
...একেবারে সুন্দর-
...অথচ তাকে নিয়েই
...কাটাতে হয়েছিল।
...ক্ষতি কিছু হয় নি,
...। সেই লাভের কথাটার

...সাবা।
...পাঁচ আঙুলের মতো
...নালা ছড়িয়ে গেছে চাবি-
...ল সাগরের হাতছানি।
...ত্রী আসে কলকাতা থেকে,
...টিকান্তপুর থেকে। শুধু
...দলও আসে। হঠাৎ এক-
...জির। ভারী জুতো মস্
...লে ঢুকল। পিঠে ঝুলছে
...টা সুটকেশ।

...রে বন্দুকে পেয়ে খুশি
...ষ। ভারতবর্ষের কোনো
...রি নি।
...ল, সময় অল্প। শীগ্‌গিরই
...। তার আগে সুন্দরবন

...কিন্তু মুশকিল। ওটা
...রেস্ট। যেতে গেলে পারমিট
...র থেকে।
...ও, ওসব রীতিনীতি আমার
...বন আমায় দেখাতেই হবে।
...নাম। আগে থেকে পার-
...হয়। কিন্তু এখন তা সম্ভব

...পর্যন্ত ঠিক করা গেল
...র বীট অফিসারের কাছে
...যাক যদি উনি কিছু
...।
...। ঝপাঝপ্ দাঁড় পড়ছে।
...চলেছে। দু মাইল পরেই
...এসে পড়া গেল।
...রেস্ট। কিন্তু ওদিকে যখন
...পার দিয়েই চলা গেল প্রায়
...অফিসের দিকে।
...বাঘলোভেই ছিলেন।
...এসে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে
...।
...র দাঁড়ালাম। —এক গেলাস

...বলে বীট অফিসার উঠে
...ত হয়ে বললেন, কোথায়
...নাদের। বলে দুটো কাঠের
...গিয়ে দিলেন।
...তা পারছেন, একা একাই
...জনের পায়ের ধুলো পড়ে

...তে হাসতে স্বচ্ছন্দে কাঠের
... বসে আলাপ-পরিচয় শুরু

অফিসার বললেন, জল খাবেন, না চা?

এইরকম জঙ্গলে জায়গায় যেখানে একটু জল পাওয়া যায় না সেখানে চা! এ যে অদ্ভুত প্রস্তাব!

বীট অফিসার বললেন, এখানে আমার ঐটুকুই বিলাস। চা আর সিগারেট। বলে সিগারেটের টিন এগিয়ে দিলেন।

একটু পরে বাবুর্চি চা দিয়ে গেল। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে কথাটা তুললাম।

শুভেন বললে, উড়িষ্যা, কুমায়ুন, আসাম কিছুই বাদ যায় নি। বাকি আছে 'ঘর থেকে শুধু দুই পা ফেলিয়া' এই সুন্দরবন। সুন্দরবন আমায় দেখতেই হবে।

সব শুনে বীট অফিসার কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, এভাবে পারমিসান

বিবি

মনীন্দ্র পাল

দেওয়া আমার পক্ষে মুশকিল। তবু যখন বলছেন—সঙ্গে তো আপনাদের বন্দুক-টন্দুক নেই?

শুভেনের দিকে তাকিয়ে ইতস্ততঃ করে বললাম, আছে একটা রাইফেল।

অফিসার বললেন, ওটি বের করা হবে না। সেই কথাটা আগে দিন।

এই সময়েতেই সেই বেঁটেখাটো বীভৎস চেহারার লোকটি এসে দাঁড়ালো। কালো কুচকুচে রঙ—ঠোঁট পুরু, নাক মোটা, মাথায় কাঁকড়া কাঁকড়া চুল, চোখ দুটো বড়ো হিংস্র। দেখলে বুকের ভেতরটা ভয়ে কেঁপে ওঠে।

সে এসে দাঁড়াতেই বীট-অফিসার বললেন, জহুর, কি খবর?

সে কোন কথা বলল না। মাথা নীচু করে রইল।

বীট অফিসার নিজেই তখন প্রশ্ন করে করে জেনে নিলেন—বাগানের কাজ যা তাকে করতে দেওয়া হয়েছিল তা হয়ে গেছে। এখন যদি নতুন কোনো ফর্মাশ থাকে।

অফিসার টি-পট থেকে খানিকটা চা ঢেলে দিয়ে কাপটা এগিয়ে দিলেন তার দিকে। সে লোভীর মতো দু হাত বাড়িয়ে চাটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করল।

বীট অফিসার বললেন, জহুর, বাবুরা এসেছেন জঙ্গল দেখতে। একটু সঙ্গে যা না। বখশিস দেবেন।

জহুর রাজি হল।

অফিসার আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ হচ্ছে খাস সুন্দরবনের মানুষ। জঙ্গলেই জন্ম—জঙ্গলেই বাস। একে সঙ্গে নিয়ে যান, অনেক জিনিস জানতে পারবেন।

সানন্দে রাজি হলাম—একথা বলতে পারব না। কারণ লোকটাকে দেখে পর্যন্ত কিরকম যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। তবু রাজি হতে হল।

রিজার্ভড ফরেস্ট দেখা হল, কিন্তু মন ভরল না শুভেনের। সুন্দরবনে এসে যদি শিকার করতেই না পারা গেল তা হলে বৃথা এ পরিশ্রম। তবে শুভেনের যেন নতুন একটা আকর্ষণ লক্ষ্য করা গেল। জহুরের ঐ হিংস্র চোখ দুটোর মধ্যে যেন কিসের সন্ধান পেয়েছে। শুভেন জঙ্গলের জানোয়ার ছেড়ে জঙ্গলের মানুষকে নিয়ে পড়ল।

জহুর কথা বলে কম। মুখে হাসি নেই। সেই বোবা পাথরে আঘাত করে করে শুভেন কথা বার করতে লাগল। সে তো কথা নয়—রূপকথা। এই সুন্দরবনে ছোট্ট একটা ঘর বানিয়ে ছিল সে।

—আর তোমার পরিবার?

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে জহুর নিজের [illegible] বলে গেল। তার কাজ ছিল মৌচাক ভাঙা। মৌচাক ভেঙে মধু পাড়ত। এই গরমের দিন হলেই তার সুন্দরবনের কথা বড়ো বেশি করে মনে পড়ে। এই তো মধু পাড়ার সময়। গরান ফুলের মধু খেয়ে মৌমাছি উড়ল আর তার পিছু নেওয়া। এক-একটি মৌমাছির পিছু পিছু এক-একটি মানুষ ছুটেছে মৌচাকের সন্ধানে। কাঁটার খোঁচায় পা কেটে রক্তারক্তি। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। সে কষ্টে বিরক্তি নেই। আসলে এই মধুসঞ্চয় এ তো কেবল তাদের জীবিকা নয়—এ যে জীবন।

এই গরমির সময়েতেই গোলপাতা কাটা হয়। কাঠ কাটতেও আসে কত নৌকো। যারা আসে তাদের সবাই ফেরে না। বনবিবির 'কোধ' যে কখন কার ওপর গিয়ে পড়ে তার কি ঠিক আছে? দেয়াসীর মন্ত্র পর্যন্ত কতবার ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে।

এই তো সেবার। একদল কাঠুরে এল কাঠ কাটতে। জঙ্গলে ঢোকার আগে তারা শরণাপন্ন হল দেয়াসীর। বনবিবির থানে

পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তুতকারক কর্তৃক সর্বাধিক প্রদর্শিত ও বিক্রিত
প্রামার ফার্মাসিউটিক্যালস
কলিকাতা-৪৭

বেয়াদবী পাবে। বলি কিন্তু, ভয় পাচ্ছ, নায়কেল হেরেও তার কম নিয়ে হেরিদিদের থান ধুয়ে দিল। তারপর দেখলে ভবলে অমোঘ বাণী—ভয় নেই।

পূর্ব কাহিনীর গল্প সেইটুকু আশ্বাসবাণী সম্বল করে এগিয়ে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে। কিন্তু সেই দিনই জানোয়ার দিল হানা। চক্ষের পলক ফেলতে না ফেলতেই একটানে মুখে করে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওরা এসেছিল বাপ আর ছেলে। বুড়ো বাপ পাগলের মতো ছুটে গেল দেয়াসীর কাছে—এ কী হল? বন-বিবির কেন এ গোঁসা?

দেয়াসী গোপ চুমড়ে বললে, হবে না। যাবার সময় ঐ ছোঁড়া বনবিবির থানের দিকে পিছন করে গেল! এর কি গুণাহ হয় রে বোকা?

এ ছাড়াও অন্য বিপদ আছে। জঙ্গলের অপদেবতা কতবার কতজনকে আপন মানুষের গলার স্বর নকল করে নাম ধরে ডেকেছে। যে হতভাগ্য সেই ডাকে সাড়া দিয়ে বনের মধ্যে ছুটে গিয়েছে তার আর তল্লাস পাওয়া যায় নি।

এই রহস্যঘেরা সুন্দরবনের মানুষ সে। এ বনের প্রতিটি গাছের পাতায় পাতায় মৃত্যুর সংকেত—জীবনের জয়গান! সাব, এ কথা কি বলে শেষ করা যায়?

জহুর থামল। শুভেন উত্তেজিত হয়ে বললে, চলো না নিয়ে একবার সেখানে।

—কী করবেন?

—'জানোয়ারের' সঙ্গে মোকাবিলা।

জহুরের চোখ দুটো ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠল। গম্ভীর গলায় বললে, শিকার করবেন?

—হ্যাঁ। নিশ্চয়।

জহুর চাপা গলায় বললে, ভালো ভালো হরিণ আছে। হরিণ! মনটা দমে গেল শুভেনের। বাঘ পাওয়া যাবে না? জহুর বললে, মাদী হরিণগুলো অতি সাংঘাতিক। যাবেন সাহেব? শুভেন কী ভাবছিল আমি বললাম, হরিণ হরিণই সই। চলো। জহুর বললে যেখানে নিয়ে যাব সেখানে তো অত বড়ো বজরা চলবে না। সঙ্গে একটা ডিঙ্গি নিতে হবে।

জহুরই ডিঙ্গি যোগাড় করল। বজরার সঙ্গে ডিঙ্গি বেঁধে নতুন পথে যাত্রা শুরু হল। রিজার্ভড ফরেস্ট ছাড়িয়ে নৌকো চলেছে ধারে ধারে। একটা খালের মধ্যে নৌকোটা ঢোকালো জহুর। ঘোলা জল। দুপাশে গভীর জঙ্গল। ভাটার সময় এখন। খালের জল নেমে গেছে। খালগুলো কাদায় ভর্তি। দুপাশে হিতোল, বড় বড় কেওড়া এবং সুন্দরী গাছের জঙ্গল। সাধারণত এইসব হিতোল গাছের ঝোপের মধ্যে বাঘ লুকিয়ে থাকে। কাছেই খাল। ভাটার সময় খালে নেমে মাছ খায়।

এক জায়গায় নৌকো বেঁধে জহুর নেমে গেল। আমাদেরও নামতে হল। জহুর এগিয়ে চলল দু হাতে লতাপাতা সরাতে সরাতে।

হঠাৎ জহুরের কান খাড়া হয়ে উঠল। শুভেন সন্তর্পণে এগিয়ে গেল। হাতে সেমেডেড গান।

—সাহেব, শুনছেন? ফিস্‌ফিস্‌ করে উঠল জহুর।

—কী?

—ঐ যে টাঁট টাঁট করে হরিণ ডাকছে।

হরিণের ডাক শোনার জন্যে শুভেনের আগ্রহ নেই। সে চায় বাঘের ডাক শুনতে—'জানোয়ারের' সঙ্গে মোকাবিলা করতে। এ অঞ্চলে ভয়ে বাঘের নাম উচ্চারণ করে না। বনে 'জানোয়ার'।

কিন্তু জহুরের ঝোঁক যেন হরিণের দিকেই। এগিয়ে চলেছে জহুর। পিছনে আমরা। পায়ের নীচে কাদা, মাঝে মাঝে কেওড়ার বড়ো বড়ো শক্ত কঠিন গোঁজ। তা ছাড়া ডাঁসের উৎপাত তো আছেই। এসব কষ্টই মুখ বুজে সহ্য করা যায়, কিন্তু সে কি সামান্য হরিণ মারার জন্যে?

এক জায়গায় এসে জহুর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। জঙ্গলটা সেখানে পাতলা। জহুর গাছের ওপর এক ঝলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখে নিল। গাছের ডালে ডালে বাঁদর। তারপর ইশারায় সেখানেই দাঁড়াতে বললে। শুভেন ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, জহুর জানে এখানেই হরিণ পাওয়া যাবে। ঐ যে বাঁদরের ভিড়। গাছের পাতা ঝরায় ওরা আর হরিণের দল আসে খেতে।

শুভেন বললে, কিন্তু বাঘ পাব কোথায় জহুর? বাঘ চাই যে।

জহুর সে কথায় কর্ণপাত করল না। হঠাৎ তার সেই হিংস্র চোখের ওপর ছায়া ঘনিয়ে এল। গাঢ়স্বরে বললে, ঐ ওখানে আমার ঘর ছিল সাব। ওখানে আমার বিবি থাকত। আমাকে একদিন জানোয়ারে তাড়া করেছিল—বিবি বাঁচিয়েছিল। শুধু বাঁচায় নি—জানোয়ারটাকে জখম করেছিল। কিন্তু আমি ওকে বাঁচাতে পারি নি সাব।

চমকে উঠলাম। ঐ বীভৎস চেহারা মানুষের গলায় এ আবার কোন্ সুর! ওর ঐ হিংস্র চোখের কোলে কোলে ও কি অশ্রুর ফোঁটা?

—তাকেও কি বাঘে ধরেছিল?

—না সাব, তাকে মেরেছিল হরিণে। হরিণ পোষ মানাতে ভালোবাসত। বুনো হরিণগুলোকে গাছের ডাল ভেঙে ভেঙে খাওয়াতো। একদিন একটা চিতল পাশ থেকে হঠাৎ গুঁতিয়ে দিল ওর পেটে। বিবি পড়ে গেল। আর উঠতে পারল না।

আমরা চমকে উঠলাম। —সে কী!

জহুর ক্ষোভের সুরে বললে, তার চেয়ে যদি জানোয়ারে ওকে নিয়ে যেত—কিম্বা লাল-মুখো সাহেব তার ইস্ক করত শ্যাম কষ্ট পে হঠাৎ জহুর আবার পাতার ওপর শব্দ আঙুল চেপে ইশার... হরিণ আসছে।

জহুর যতই সন্তুস্ত শুভেনের কিন্তু তেমন বদলে হরিণ! আসামের বনে এসে হরিণ শিকার!

হঠাৎ চাপা উত্তেজনায় সাব্ হরিণ! মাদী হরি

হ্যাঁ, একটা মাদী হরি থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এ

জহুর পাগলের মতো ধরে নাড়া দিয়ে বললে, সাব,

শুভেনের হাত উঠছিল —তাও মাদী।

কিন্তু হত্যার নেশা! সুন্দর এসে রাইফেলটা কি একবারও করবে না?

শুভেন রাইফেল তুলে সিঙ্গ রাইফেল। ঝ্‌কঝ্‌ গর্জে উঠল। মুহূর্ত মাত্র। পড়ল হরিণটা। সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে ছুরিটা হাতে পিছন চললাম আমরা। ও নেই। তবু—

কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। হরিণ। হরিণ নয় হরিণী।

জহুর ততক্ষণে মহা উ চিঁ করে ফেলেছে। ছাল করবে বোধ হয়। কিন্তু হঠ হরিণের পেটে ঢুকিয়ে মারলে টান। পেট চিরে দ অমনি চমকে উঠলাম—এ ছিল! লজ্জায় ক্ষোভে শ

কিন্তু জহুর হঠাৎ সে শূন্যে তুলে উল্লাসে লাফ চোখ আবার সেই হিং নয় প্রতিহিংসা।

তাকে জিজ্ঞাসা করা হল কারণ কি। কিন্তু কোনো উ না। সে তখন মড়া হরিণীর ভাবে বাচ্ছাটাকে টেনে ব বীভৎস দৃশ্য সহ্য করা গেল হাত ধরে টান দিয়ে বললাম, আমরা ওদিকে গিয়ে দাঁড়া

শুভেন আর একবার জ হিংসা-ভয়াল মূর্তির দিকে লোকটা বউটাকে ভালোবাস

আমি সায় দিলাম।

শুভেন নিজের মন্তব্যটা নিয়ে বললে, ওর প্রেমের স অপত্যস্নেহ। বিবি নিশ্চয়ই

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন। বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রী
কলিকাতা-১২ বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ASHOK

India's first stainless steel blade

SHAVE AND SAVE your prestige & purse. Look elegant, bright & own a charming personality with ASHOK STAINLESS BLADES.

The finest blade now manufactured in India. ASHOK ensures smooth & pleasant shave. It causes economy, safety & extra smooth shaving.

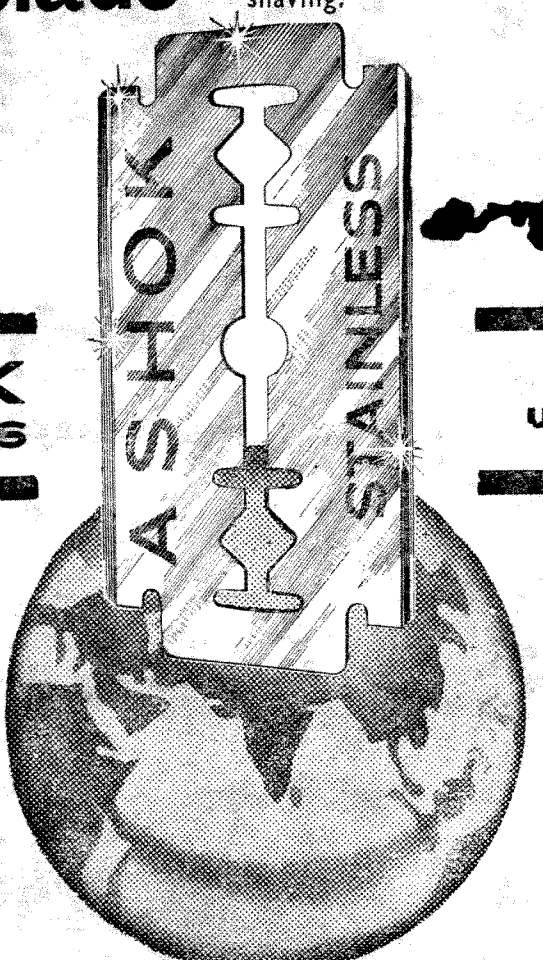

ASHOK
STAINLESS

USE ONCE
USE FOR EVER

BB/As-1

Distributors: **MULLER & PHIPPS (INDIA) PRIVATE LTD.,** Bombay • Calcutta • Delhi • Madras

শারদীয় আনন্দের মধ্যে পশ্চিমবাংলাকে চিনুন

পশ্চিম বাংলার বহু দর্শনীয় স্থান দেখার আদর্শ সময় আশ্বিনের বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ অবকাশ। তখন প্রকৃতি আনন্দের অজস্রতায় সরস সবুজের সোনা গলানো রৌদ্রে ঝলমল করে ওঠে। প্রকৃতির সাথে সাথে মানুষও আনন্দময় হয়ে ওঠে, প্রতিটি গৃহ হয় উৎসবে মুখর।

প্রকৃতি ও মানুষের সব—ভোলা আনন্দের মধ্যে বেরিয়ে পড়ুন, দেখুন দুর্গাপূজায় দেশ জোড়া সমারোহ···ঝাউবীথি-মণ্ডিত দীঘল সমুদ্র সৈকত···দার্জিলিঙে তুষারমৌলি হিমালয়ের ধ্যানগাম্ভীর্য্য···

ট্যুরিষ্ট ব্যুরো

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৩।২, ডালহৌসি স্কোয়ার (ইষ্ট), কলিকাতা-১ টেলিফোন : ২৩-৮২৭১